ধর্ম ও ধর্মাত্মা

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

"ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

শ্রীজ্ঞানদারঞ্জন দত্ত শর্ম্মা

স্ট্যাণ্ডার্ড পাব্লিশার্স
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

গ্রন্থনে :
শ্রীজ্ঞানদারঞ্জন দত্ত শর্ম্মা, চট্টগ্রাম,
অধুনা—বিন্দুনিলয়
২৩।৩, কবি নবীন সেন রোড,
দমদম, কলিকাতা-২৮

প্রুফসংশোধনে :
খ্যাতশিক্ষাবিদ্ : শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সেন—এম. এ.
১১নং অনুপমা রোড, মল্লিক কলোনী
বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

মুদ্রণে :
শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী
ষ্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১১৫-এ, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশনে :
দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাব্লিশার্স
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপটে :
শ্রীঅমল ভট্টাচার্য

ছবির ব্লক :
শ্রীআশীষ দাশ শর্ম্মা —বি. ই.
প্রথম প্রকাশন :
১লা বৈশাখ—১৩৭৬ বাংলা

মূল্য—দশ টাকা

প্রার্থনা

হে প্রাণের ঠাকুর !

না চাহি সুন্দর ঠাঁই ধন মান নাহি চাই
ভোগ-সুখ চিত্ত নাহি চাহে ।
যাহা আছে সব নাও শুধু এই বর দাও
প্রাণারামে যেন মতি রহে ।
কৃষ্ণময় কলেবর গর্বহীন অন্তর
অন্য কোন অভিলাষ নাই ।
অশ্রুজলে দিবাযামি শ্রীচরণে ভিক্ষামাগি
অন্তে যেন তব পদ পাই ।

সেবক
জ্ঞান

সাধুসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্ ।
যস্য নাস্তি নরঃ স অন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঃ ॥
(কুলার্ণবতন্ত্র)

বৈদিক যুগ হইতে সনাতন ধর্ম্মের উৎপত্তিকাল

খৃষ্ট পুর্ব্বাব্দ—	ধর্ম্মের আবির্ভাব ও শাস্ত্র।
৪৫০০ (বালগঙ্গাধর তিলক মতে ৫০০০)	ঋক্‌বেদ।
৩২২৬	শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব (শ্রীনাম ভাগবত)।
২৫০০	অন্যান্য বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।
১৬০০	উপনিষদ ও ব্রহ্মবাদ।
১৪০০	সাংখ্যযোগ, ন্যায়, জ্ঞানধর্ম্ম ও ভক্তিমার্গ।
৯০০	মহাভারত ও গীতারচনা কাল।
৫৯৪	বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও পরিনির্ব্বাণ।
খৃষ্টাব্দ	
২০০	পৌরাণিক যুগ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ কৃষ্ণলীলা বর্ণন, দেবী ভাগবত ইত্যাদি।
	শঙ্করাচার্য, অদ্বৈত মায়াবাদ, সন্ন্যাসবাদ ইত্যাদি।
৭০০	বেদান্তবাদ ও গীতার ব্যাখ্যা।
৯০০	রামানুজের মায়াবাদ প্রচার।
১১০০	নিম্বার্কবাদ।
১৫০০	চৈতন্যদেব, ভুক্তিমার্গ, গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ। গীতার ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা।
১৮০০	শাক্ত ও বৈষ্ণবের বাদ বিসম্বাদ।
১৯০০	পরমহংসদেবের আবির্ভাব, বিবেকানন্দ, সমন্বয় ধর্ম্ম প্রচার।
১৯৩০	সাধু তারাচরণ ও সত্যধর্ম্মের অভিব্যক্তি।



(প্রাণারাম)

॥ উৎসর্গ ॥

যাঁহাদের শুভ ইচ্ছায় ও শুভ আশীর্ব্বাদে
এই অযোগ্য সেবকাধমের
"ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা" প্রকাশনে
মতি হইয়াছে
সেই
৺প্রাণারাম-প্রাপ্ত গোলোক-গত
পরমারাধ্য ৺জনক জননীর পুতস্মৃতিতে পূণ্যাত্মাদের পুণ্যকথা
আমারই **৺প্রাণারাম চরণে**
উৎসর্গ করিলাম।
প্রাণের ঠাকুর! সবই তোমার ইচ্ছা।
॥ ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

সেবকাধম
জ্ঞান।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা

সূচনা।

ধৃ ধাতু মন্—ধর্ম। ধরতি পাপাৎ অনেন। পাপ হইতে রক্ষা করে যাহা তাহাই ধর্ম। পাপ কি? বিবেক-বর্জ্জিত বা বিবেক-গর্হিত কর্ম পাপ। বিবেকানুমোদিত কর্ম একমাত্র ধর্মজ্ঞানে সমাধান হয়।

মানবজীবন শুধু ঐহিক নহে। পারমার্থিক ও নয়। ঐহিকও পারমার্থিক লইয়াই পূর্ণজীবন। সুতরাং আমাদিগকে পূর্ণজীবন লাভ করিতে হইলে ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয় সমস্যাই সমাধান করিতে হইবে। এই দুরূহ সমস্যার সমাধানে ধর্মই আমাদের একমাত্র সহায়।

ধর্ম জানিতে হইলে ধর্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। এই ধর্মতত্ত্ব ঠিক নির্ণয় সম্ভব নহে। পণ্ডিতেরা বলেন।

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
"ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

বেদ, স্মৃতি ও মুনিদিগের মত সকল বিভিন্ন এবং ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহামধ্যে নিহিত। ধর্মের এই প্রকৃত তত্ত্ব কি এবং কি হওয়া উচিত তাহা ধর্মাত্মা উচ্চকোটী সাধকগণের জীবনী পাঠে জানা যায়। ভারত ধর্মপ্রধান দেশ। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এই চারিধর্ম এইখানে পারস্পরিক সম্প্রীতিতে বিরাজ করি.তছে।

এইসব ধর্মের ধর্মাত্মাদের জীবনে দেখা যায় সকলেই একেশ্বর বাদী এবং প্রেম, ভক্তি ও সাধনার দ্বারা অলৌকিক বিভূতি সম্পদ ও ভগবদ্দর্শন পাইয়াছেন। তাই তাঁহাদের জীবনীও সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পুস্তকে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ হইল।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে ও অনুধাবনে ধর্মের ক্রমবিকাশ উপলব্ধি হয়। কোরান, বাইবেল, পরিনির্ব্বাণ (বৌদ্ধ), বেদ, ব্রহ্মগায়ত্রী গীতা, চণ্ডী, সবই একই অধ্যাত্মমার্গের প্রদর্শক। সব ধর্ম অনন্ত উদার অসীমের পানে উদাত্ত আহ্বান জানাইতেছে, সব ধর্ম বিশ্বজনীন, সংকীর্ণতা বিহীন, ইহা স্মরণ করিয়া ধর্ম ও ধর্মাত্মা বইখানি সঙ্কলনে প্রয়াসী হইলাম। এই গ্রন্থে সনাতন ধর্মের ক্রমবিকাশ গায়ত্রী, গীতা, চণ্ডী ও সাধু মহাত্মাদের বাণী ও জীবনী আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে যাবতীয় তথ্য আর্য্য মিশন ইনষ্টিটিউশান্, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমহানামাব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্ত্তী, ৺শিবানন্দ স্বামী মহোদয়গণের পুস্তক হইতে যাহা আমার ভাল লাগিয়াছে তাহা সংগ্রহ করিয়াছি। তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী। এই পুস্তক প্রকাশনে শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ. ও স্টাণ্ডার্ড প্রিণ্টার্স্ এর শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি.এ. মহোদয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। প্রখ্যাত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্ত্তী, এম্. এ. মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন এবং খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন, এম. এ. মহোদয় প্রশস্তি লিখিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সমস্ত ভুল ক্রটী নিজস্ব ও ক্ষমার্হ।

ইতি—

শ্রীজ্ঞানদারঞ্জন দত্তশর্ম্মা।

১লা বৈশাখ ১৩৭৬ বাংলা।

—ভূমিকা—

স্বল্পভাষী প্রেমাবতার "শিক্ষাষ্টক" নামে প্রখ্যাত আটটি মাত্র শ্লোকে অতলস্পর্শ গভীর অনুভব ব্যক্ত করে গিয়েছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে আছে, "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ"। এর এযাবৎকাল পর্যন্ত সুগৃহীত অর্থ এই, অনেক নাম তোমার। প্রতিটি নামে তোমার সমগ্র শক্তি সঞ্চার করেছ। নামস্মরণে বিশেষ কোনও কাল নেই। সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বত্র ভগবন্নাম স্মর্ত্তব্য।

অনেকদিন থেকে একটি অসম-সাহস উঁকিঝুঁকি দিয়েছে এই দীনের অন্তরে। "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।" "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমুদ্রের মতো গভীর অনুভবসিদ্ধ এই উক্তিটির কি একটু অন্যরকম অর্থ গ্রহণ করা যায় না? অপার উদার মহিমা, অনন্ত অমেয় সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে এই বাগর্থের অভ্যন্তরে, যা কোনদিন নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে না আমাদের অনুভবে আচরণে।

"ন" এই নিষেধার্থক অব্যয়টিকে একটু বাম দিকে ধাক্কা দিয়ে 'স্মরণে' এই সপ্তম্যন্ত পদের সঙ্গে জুড়ে দিলে পাওয়া যায় 'স্মরণেন', অনুক্তে কর্ত্তরি তৃতীয়া হ'ল যার পরিবর্তিত পদপরিচয়। 'কালঃ' উক্তে কর্ম্মণি প্রথমা, 'নিয়মিতঃ' কৃদন্ত বিশেষণ। বাক্যের পদসংখ্যা কমে গিয়ে চার থেকে তিন হল। পাঠ ও ছন্দের বোধ হয় তাতে ব্যতিক্রম হল না। অথচ অর্থটি একটি অপূর্ব্ব অভিনব অতিরিক্ত দ্যোতনার সৃষ্টি ক'রল। অক্ষরার্থ দাঁড়াল, কাল ভগবৎস্মরণের দ্বারা নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত, কাল আর কিছুই নয়, ভগবৎস্মরণের বিততি বা বিস্তার (an expansion of the Divine Idea)। মহাপ্রভুর মহাবাক্যের আড়ালে আমরা পেলাম কালের একটি সংজ্ঞা, যা নির্ণয় করবার জন্যে নানাদেশের নানাযুগের দর্শন বিজ্ঞান নিয়ত চেষ্টা করে চলেছে। এই অর্থের আলোকে প্রতিভাত হয় সাধ্যসাধনের একটি গূঢ় ইঙ্গিত। ভগবৎস্মরণ কালযাপনের প্রকৃষ্টতম উপায়। ভগবৎস্মরণে আত্মচেতনার নিমজ্জন সাধ্যসার। মহাপ্রভুর গুরুদত্ত দীক্ষোত্তর নামটিও যে তাই! শ্রী কৃ ষ্ণ চৈ ত ন্য! এই নাম ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল নামপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্যের জীবনে ও

আচরণে একই সঙ্গে, Life Divine এবং Consciousness Divine, রহস্য-গভীর, রহস্যমধুর।

'ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা' গ্রন্থের জ্ঞানপ্রবীণ ভাবভক্তি-সমৃদ্ধ লেখকের বর্ত্তমান সারস্বতপ্রয়াসের মধ্যে আমার এই প্রকাশভীরু অনুভবটি যেন একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। গ্রন্থকারকে শৈলকিরীটিনী সরিন্মালিনী সমুদ্রমেখলা চট্টলার একজন কর্মী সুসন্তান এবং বহুসম্মানিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব বলে আমি চল্লিশ বছর ধরে জেনে এসেছি। চট্টগ্রাম হিন্দু বৌদ্ধ ইস্‌লাম তিনটি ধর্ম্মসংস্কৃতির ত্রিবেণীতীর্থ। অথবা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান চারিটি ধর্ম্মসংস্কৃতির চতুরস্রভূমি। চট্টলের বহিঃপ্রকৃতিকে এবং চট্টলবাসীর অধ্যাত্মপ্রকৃতিতে একটি উদার সমন্বয়বুদ্ধি এবং "বিবিক্ত দেশসেবিত্বজনিত" "অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব" লক্ষ্য করে আমরা চট্টলপ্রবাসী অ-চট্টগ্রামীরা মুগ্ধ হয়েছি। "চট্টলে সব্যবাহুশ্চ ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।" চট্টগ্রাম তন্ত্রোক্ত শক্তিপীঠ। চট্টেশ্বরী মায়ের প্রচণ্ডমনোহর বাহুর আশ্রিত এই ভূভাগ। অদূরে চন্দ্রনাথ ভৈরব। পার্শ্বে প্রজ্বলিত বাড়বকুণ্ড। "ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।" "ভগবান তথাগতের নামাঙ্কিত গিরিপাদশায়ী 'মহামুনি' গ্রাম চট্টগ্রামে বিরাজ করে। ধর্ম্মবীর ইস্‌লামীয় পীরের স্মরণ-চিহ্নিত "বায়াজিদ-বোস্তান" ও সুপ্রাচীন খ্রীষ্টীয় ভজনমন্দির এখানে বিদ্যমান। চট্টগ্রামপ্রবাসের মধুময় দিনগুলিতে আমাদের নিত্যপাঠ্য মহিম্ন-স্তোত্রের মর্ম্মার্থ নিত্য উপলব্ধির বিষয় হয়ে উঠেছে। "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্-ঋজুকুটিল-নানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

এই গ্রন্থপাঠে গ্রন্থকারের কর্ম্মি-পরিচয় গৌণ হয়ে গেল। অথবা সে পরিচয় "এহো বাহ্য আগে কহো আর।" এই গ্রন্থে তিনি "আগে কহিয়াছেন"। দেখা গেল, তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ভগবৎস্মরণে যাপিত হয়েছে। দেখা গেল, মহাপ্রভুকে তিনি ভালবাসেন। তাঁর নির্দেশটি তিনি ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ করেছেন। ভগবৎস্মৃতিতে আত্মনিমজ্জনের পথ বেয়ে তিনি চিরায়ুঃ লাভ করুন, এর বেশি আমি আর কি বলতে পারি এই ভূমিকায়? "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা" তাঁর পরিণত প্রজ্ঞা, অতন্দ্রিত স্বাধ্যায়, গভীর মনন, অটুট সাধনসামর্থ্য ও ঐকান্তিকী ভজননিষ্ঠার অভ্রান্ত পরিচয় বহন করে। বিষ্ণুপাদপদ্মের নিয়ত সান্নিধ্যে তাঁর যে অন্তঃসলিল ফল্গুপ্রবাহ এতদিন ব্যাবহারিক জীবন-

মরীচিকায় বালুকার তলদেশে সবার অলক্ষিতে বয়ে এসেছে আজ তার পরিদৃশ্যমান প্রসন্নসলিল ধারাস্রোত অধ্যাত্মপিপাসার্দীর্ণ জীবনপথিকের তৃষ্ণানিবারণের উপায় হয়ে উঠেছে।

মুদ্রিত আকারে গ্রন্থের যতটুকু পেয়েছি ও কর্ম্মপাশ-বিড়ম্বিত জীবনের বিরল অবসরে যতটুকু পড়তে পেরেছি, তাতে মনে হয়েছে, আমাদের সাধনশাস্ত্রের গভীর মর্ম্ম সমগ্র অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন সুধী ভক্ত লেখক। তাঁর স্বানুভব তাঁর স্বচ্ছন্দ সাবলীল লিপিমুখে উৎসারিত হয়ে জীবনজিজ্ঞাসুর হৃদয়সংবেদনের উপযোগী বাণীপ্রমূর্তি গ্রহণ করেছে। লেখকের প্রতিটি অনুভব তাঁর রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে। এখানেই তো ভাষার সাহিত্যগুণ। সেই সাহিত্যগুণের সদ্ভাবে তাঁর রচনা সমৃদ্ধ ও সর্ব্ব-চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে। ধর্ম্মের সংজ্ঞাশ্লোকে আদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তা মনু "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" বিশেষণটী ব্যবহার করেছেন। বিদ্বজ্জন-নিষেবিত ও রাগদ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত সাধুজনের নিত্য আচরিত হয়ে যে বস্তু হৃদয়ের অনুমোদন লাভ করেছে তাই ধর্ম্ম। বাংলার আদি গীতিকবি চণ্ডীদাস এই "স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ" তত্ত্বের ইঙ্গিত করে বলেছেন,

> "মরম না জানে ধরম বাখানে
> এমন আছয়ে যারা,
> কাজ নাই সখি তাদের কথায়
> বাহিরে রহুন তারা ॥"

বর্ত্তমান গ্রন্থকার ভারতীয় সাধনশাস্ত্রের সমস্ত প্রস্থানের, বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত তন্ত্র পুরাণ গীতা ভাগবত চণ্ডী ভজন দোহা ও পদাবলীর মরমী বোদ্ধা ও অভিনিবেশ-সম্পন্ন নিরভিমান প্রবক্তা। মহাজীবনের জন্য আকুতি এবং মহদ্‌জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর সুলিখিত গ্রন্থের সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থ একদিকে ধর্ম্মপিপাসু ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কোষগ্রন্থ (Encyclopaedia) হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে একালের জীবনতাপদগ্ধ মানুষের শান্তি ও সান্ত্বনার নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। "মধুগন্ধি মধুস্মিতম্ এতদহো"—এ যেন কেউ মধুগন্ধি মধুময় হাসির সন্ধান পেয়ে প্রেমভরে তাঁর মধুময় প্রাণের মধুবার্ত্তা মধুক্ষরা বাণীতে বিলাবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষের ভক্তিসাধনার যে কটি মুখ্যধারা স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশে বয়ে

এসেছে তার অতিসরল সর্বজনবোধ্য পরিচয় এই গ্রন্থে সমাহৃত হয়েছে। শুধু সমাহার নয়, সমন্বয়সাধনে গ্রন্থকর্তা তাঁর গভীর ধর্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

"বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ" বলে সপ্তশতী চণ্ডী যাঁকে বন্দনা করেছেন তিনিই আবার "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা" বলে স্তুতা হয়েছেন। যিনি জ্ঞানদায়িনী তিনিই আবার বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী বিষ্ণুসহায়িনী। গ্রন্থকার তাঁর জনকজননীর আশীর্বাদের সঙ্গে জীবন ভরে তাঁদের দেওয়া নিজের যে নামটি বহন করে এসেছেন তা তাঁর এই পরিণামরমণীয় সারস্বত অধ্যবসায়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। তাঁর 'জ্ঞানের ফুল প্রেমভক্তির ফল হয়ে ফলেছে।

ভারতের মনীষা ও সাধনার পরিপূর্ণ বিগ্রহ যাঁরা, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, দাদূ, কবীর, রামানন্দ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দপ্রমুখ মহামানবের জীবন ও বাণী গ্রন্থকার সংকলন ও নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যাঁরা মননবিমুখ ও মনঃশক্তি-বিহীন তাঁদের মননের কৃচ্ছ্র প্রয়াস থেকে ত্রাণ করবার জন্যই মন্ত্র। মন্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি বোধ হয় এই। এদেশের ঋষি ও গুরুপরম্পরা যে সমস্ত মন্ত্রসংকেত রেখে গিয়েছেন তার গূঢ়ার্থ প্রকটনের আন্তরিকতাপূর্ণ প্রয়াসে গ্রন্থখানি সাধনপর্যায়ের অঙ্গীভূত হয়েছে। ব্রহ্মগায়ত্রীর সরল ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে গ্রন্থারম্ভ হয়েছে। নামতত্ত্ব ও স্তোত্রমাহাত্ম্য নানা প্রসঙ্গে প্রাঞ্জলভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

মহাজীবনের প্রসঙ্গ, সাধুসন্তের জীবনকথা এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একটি বহু-আস্বাদিত শ্লোক,

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি॥"

ভগবদ্‌বীর্যের সংবিৎ বা চেতনা যাঁদের আছে এমন সাধুজনের প্রসঙ্গে চিত্তহারী শ্রবণমঙ্গল যে সমস্ত কথার উৎপত্তি হয় তার শ্রবণে অচিরাৎ মোক্ষমার্গ প্রশস্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা অনুরাগ ও ভক্তির সঞ্চার হয়।

মহাপ্রভুর জীবনকথা এই গ্রন্থে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁরই সমকাল

কর্তা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বিস্মৃতপ্রায় জীবনকথাও গ্রন্থকার সমান দরদ দিয়ে বলেছেন। শ্রীচৈতন্যপার্ষদদের, শ্রীরূপ, সনাতন ও অপরাপর গোস্বামী, চট্টগ্রাম থেকে আগত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও মুকুন্দ দত্ত এবং অন্যান্য পার্ষদদের পবিত্র জীবনবৃত্ত সরস ভঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকার ভালবাসা দিয়ে ভালবাসার কথা এবং প্রেমের ঠাকুরের কথা বলেছেন। তাঁর ভক্ত্যুপহৃত এই উপচারসম্ভার দেবতা গ্রহণ করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। আমরা একালে বাস করে আজ মনুষ্যত্বের দুর্ভিক্ষে হাহাকার করছি, দেবতা যেন কোথায় কোন শূন্যে মিলিয়ে গেছেন! শ্রদ্ধেয় মানবপ্রেমিক গ্রন্থকার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার উপচারে মহামানবতার মাধ্যমে দেবতার পূজা করেছেন; বিশ্বাসী বলিষ্ঠ পূজারীর দাক্ষিণ্যে প্রসারিত কর থেকে পূজার প্রসাদ নেবার জন্যে আমরা হাত বাড়িয়ে ধন্য হয়েছি। এইবার আসুন, সকলে মিলে সাত্ত্বিক পূজার এই প্রসাদ গ্রহণ করি।

"প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।"

দীপান্বিতা অমাবস্যা
১৩৭৫
১৬২।১৬৫ লেক গার্ডেন্‌স্
কলিকাতা-৪৫

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

প্রশস্তি

ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী প্রবীণ গ্রন্থকার পূর্ব্বজীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম আইনজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য দেশ-বিভাগের পরেও বহুকাল পূর্ব্ব পাকিস্তান তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে নাই। সম্প্রতি পরিণত বার্দ্ধক্যে তিনি চট্টগ্রামের বিপুল পশার, যশঃ ও খ্যাতির মোহ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে পুত্রকন্যা আত্মীয়-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে সুখশান্তিময় দীর্ঘজীবন দান করুন।

প্রায় অশীতিবর্ষদেশীয় গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় জ্ঞানদারঞ্জন দত্তশর্ম্মা মহাশয় সারাজীবন ব্যবহারশাস্ত্রের চর্চ্চা করিলেও তাঁহার মানসিক প্রবণতা কোনদিকে তাঁহার পরিচিত লোকদের তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়া আসার সময় তিনি তাঁহার উপাস্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং বাণেশ্বর শিবকে সেখানে ফেলিয়া আসিতে পারেন নাই; অনেক তদ্‌বির তাগাদা করিয়া অতি সযত্নে বিগ্রহ দুইটিকে আনিয়া দমদমে নিজের গৃহে স্থাপন করিয়া নিজেই নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তাঁহার মানসিক প্রবণতার আর একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁহার লিখিত এই "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা" নামক গ্রন্থখানি। আমার অগ্রজ-কল্প প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত গ্রন্থকারের দীর্ঘকালের পরিচয়। তিনি গ্রন্থখানির একটি পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের ধর্ম্মবোধের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানদারঞ্জন বাবুর একান্ত বাসনা যে, আমিও গ্রন্থখানি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলি। কিন্তু জনার্দনদাদার ভূমিকার পরে আর কিছু বলা আমার পক্ষে একান্ত বাচালতা বলিয়া মনে করি। তথাপি পরমশ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের অনুরোধ উপেক্ষা করাও অতিশয় কঠিন বলিয়া গ্রন্থখানি সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিতে চাই।

"ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা" দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গীতাতত্ত্ব, চণ্ডীতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণের স্বরূপ, সাধ্যসাধনতত্ত্ব, লিঙ্গপূজারহস্য, জপতত্ত্ব, চণ্ডীর ষোড়শ মূর্ত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনার পরে, বুদ্ধদেব, মহাপ্রভু, তুলসীদাস, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের বাণী সংকলিত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ এই সকল আলোচনা হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় ও আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই খণ্ডে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, ভক্ত নামদেব, স্বামী বিদ্যারণ্য, স্বামী রামানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, দাদু, শ্যামানন্দ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, লালাবাবু, যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ, হংসরাজ অবধূত প্রভৃতি সাধক মহাত্মাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে "যত মত তত পথ" বলিয়া একটি কথা আছে। এই নানা মত ও পথের প্রকৃত নিশানা এই সব সাধুসন্তদের জীবনীর সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে চিত্তের প্রসার ও ঔদার্য না আনিলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অন্য কোন উপায় নাই। এইরূপ গ্রন্থপাঠে সেই চিত্তপ্রসার ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়াই এই জাতীয় সাধু প্রচেষ্টাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাই। বর্ত্তমান যুগে, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এই সকল বিষয়ে আমরা অনেক নূতন তত্ত্ব শিখিতেছি এবং আমাদের মনকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু ইহা তো আমাদের মনে প্রশান্তি আনিতে পারিতেছে না। ইংরেজ কবির ভাষায় "The world is too much with us" হইয়া উঠিয়াছে। ঠিক এমন সময়ে "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা" জাতীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার মানবকল্যাণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। শ্রদ্ধেয় ভক্ত গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সার্থক হউক ইহাই প্রার্থনা করি।

বড়দিন, ১৯৬৮
১৩, রাষ্ট্রগুরু এভিনু্য, দমদম

শ্রীকালীপদ সেন

প্রশংসাপত্র

আপনার প্রেরিত "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মার" পাণ্ডুলিপি পড়িয়া সুখী হইলাম। আপনি এই বয়সে এত শ্রমস্বীকার করিয়া যেভাবে গায়ত্রী, গীতা, চণ্ডী, সাধুমহাত্মাদের বাণী ও ধর্ম্মাত্মাদের জীবনী সংগ্রহ করতঃ সরল সুললিত ভাষায় এই সদ্গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে আপামর জনসাধারণ অত্যন্ত উপকৃত হইবে ও অন্তরে পরম পরিতোষ লাভ করিবে—সন্দেহ নাই।

যুগধর্ম্মে বিমার্গগামী বাংলার সমাজের সাধুপথ প্রদর্শিত হয় যাহাদের দ্বারা তাহারাই দেশের, দশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। আপনার গ্রন্থখানি সেই শ্রেণীর পুস্তক বটে। সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এতবড় গ্রন্থের মূল্যও কম করায় ইহা সকলের সহজলভ্য হইবে এবং ইহার বহুল প্রচার সম্ভব হইবে।

আমি অতীব আনন্দের সহিত ইহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। পাঠক ও সুধীসমাজ এই গ্রন্থপাঠে অপার সন্তোষ ও বিমল শান্তি লাভ করিবেন আমার ধ্রুব বিশ্বাস। অলমিতি বিস্তরেন।

১১নং নর্থ রোড।
যাদবপুর কলিঃ ৩২
২০. ১০. ৬৭ ইং

সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ.
ভূতপূর্ব এডুকেশান অফিসার।,

"ধর্ম ও ধর্মাত্মার" পাণ্ডুলিপি পাঠে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। আপনার এই কর্মবহুল ব্যবসায় জীবনে এত বই পড়িবার ও সৎকথা প্রণয়নের সময় পাইলেন কখন? গ্রন্থখানি যতই পড়িতেছি ততই একটি অবর্ণনীয় তৃপ্তি পাইতেছি। এবং বুঝিতেছি আপনি একজন ধর্মনিষ্ঠ মহাজন।

গায়ত্রী, গীতা, চণ্ডী, মোহমুদ্গর, তুলসীদাসের দোঁহাবলী, সাধুমহাত্মাদের বাণী এবং ধর্মাত্মাদের জীবনী যেমন সুন্দর, প্রাঞ্জল

ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা যুগধর্ম ও কালোপযোগী হইয়াছে আমি অন্তরের সহিত স্বীকার করি। ইহাতে আপামর সকলেরই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপকার হইবে। মূল্য স্বল্প হওয়ায় নির্ধনের ঘরেও পৌঁছিবে। বইখানি যত সত্বর প্রকাশিত হয় ততই সমাজের মঙ্গল সাধন হইবে।

ইতি—

চট্টগ্রাম,
৭. ৩. ৬৮

শ্রীসতীশচন্দ্র দে, এম. এ.
সেক্রেটারী, সীতাকুণ্ড শ্রাইন কমিটি।

আমি আনন্দের সহিত আমার মতামত প্রকাশ করিতেছি যে গ্রন্থকার একজন স্বধর্মনিষ্ঠ মহান ব্যক্তি। তিনি এই ধর্মগ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা উপলব্ধির কথা এবং সমাজের ও মানবের নিশ্চিত কল্যাণকর। ধর্ম ও ধর্ম্মাত্মার বিষয়বস্তু গায়ত্রী, গীতা, চণ্ডী, সাধুমহাত্মাদের বাণী এবং ৪১ জন বিশিষ্ট ধর্মাত্মার জীবনী অধ্যয়নে ও অনুশীলনে প্রাণে বিমল আনন্দ ও অন্তরে শুভপ্রেরণা জাগে। ইহা পাঠে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে নিঃসন্দেহ। প্রত্যেক মানবজীবনে শান্তি দিবে। সুধীগণ এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠে বিমল আনন্দ পাইবেন। গ্রন্থকার এত বৃহৎ সংগ্রহ ও পবিত্র ভাবধারা জনসাধারণের সহজলভ্য করিয়া মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং ধনী দরিদ্র সকলেরই পাঠে সুযোগ দিয়াছেন, ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি।

দমদম, বরদা কুটীর,
কলিকাতা-২৮
২১. ৯. ৬৮

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ সেনশর্ম্মা
(প্রাক্তন—প্রেসিডেন্ট, ক্রিমিন্যাল বার এসোসিয়েশান)

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা।

প্রথম খণ্ড।

সূচীপত্র।

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
৫।	উমা	....	৭৬
৬।	কৌশিকী	....	৭৬
৭।	হৈমবতী	....	৭৭
৮।	শ্যামা	....	৭৮
৯।	শিবদূতী	....	৭৯
১০।	গণেশজননী	...	৮০
১১।	ছিন্নমস্তা	....	৮১
১২।	অন্নপূর্ণা	....	৮১
১৩।	শাকম্ভরী	....	৮২
১৪।	ভদ্রকালী	....	৮৩
১৫।	সাবিত্রী	....	৮৪
১৬।	বরদা	....	৮৫

ঘ। ধর্ম্মাত্মাদের বাণী

১।	শ্রীগৌতম বুদ্ধদেবের বাণী	....	৮৬
২।	শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী	....	৮৭
৩।	সাধু তুলসীদাসের বাণী	....	৮৯
৪।	সাধক কমলাকান্তের বাণী	....	৯০
৫।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী	....	৯১
৬।	শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের প্রশ্নোত্তর মালিকা	....	৯২
,,	(ক) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম	....	৯৩
৭।	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী	....	৯৩
৮।	যুধিষ্ঠিরের প্রতি যক্ষের প্রশ্নোত্তর	....	৯৫
৯।	শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাণী	....	৯৬
১০।	পরমপণ্ডিত শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্তের বাণী	....	৯৭
১১।	শ্রীকালিকানন্দ অবধূতের বাণী	....	৯৮
১২	পরম বৈষ্ণব গোপীবন্ধুর বাণী	....	৯৮

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মা

(প্রথম খণ্ড)

ক। বেদ।

ব্রহ্ম গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানবহৃদয় এই দুইকে সামঞ্জস্য করিয়া যিনি মিলাইয়া রাখিয়াছেন—তাঁহাকে এই দুইয়ের মধ্যে একক ভাবে জানিবার যে ধ্যানমন্ত্র—সেই মন্ত্রই গায়ত্রীরূপে বিদিত। এই মন্ত্রটিকে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত পবিত্রশাস্ত্র বেদের সারমন্ত্র বলিয়াই বরণ করিয়াছে।

একদিকে ভূলোক, অন্তরীক্ষ, জ্যোতিষ্কলোক—অপরদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা। এই দুইকেই যিনি একই শান্তির কিরণে উদ্ভাসিত করিতেছেন, তাঁহাকে, তাঁহার এই মহান শক্তিকে, জগতের মধ্যে এবং নিজচিত্তের মধ্যে ধ্যান করিয়া উপলব্ধি করিবার যে মন্ত্র তাহাই গায়ত্রী।

নিরালা মানুষের নিভৃত মনের শান্ত চিত্তের মাঝে বাহিরের দৃশ্যমান বনের যে স্নিগ্ধ প্রকৃতি প্রকাশ পায় বা পরিস্ফুট হয়—তাহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া "বরেণ্যং ভর্গঃ"—সেই বরণীয় তেজকে "ধীমহি" ধ্যানগম্য করিয়া যাহা তুলিয়াছে—তাহাই গায়ত্রী। তাই "গায়ত্রী" আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র।

ভক্তিকে বাহিরের দিকে নিয়োজিত করিয়া নিজকে প্রতারিত করা যায় না। অন্তরের অন্তরে, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে—তাঁর সাড়া পড়ে। তিনিই জগতের মধ্যে জগদীশ্বরকে এবং অন্তরাত্মার মধ্যে

পরমাত্মাকে দেখিতে পান। তাই আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে ও বিশ্বের মধ্যে বিশ্বরূপকে দর্শন করাই "গায়ত্রী"।

"যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। জগতে যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তের ভিতর দিয়াই সেই মহান শক্তি, সেই পরম চৈতন্য-স্বরূপের কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনিই সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, প্রান্তর যেখানেই যান না কেন, অন্তরের অন্তরতম প্রিয়তমকে হারাইতে পারেন না। কারণ, তিনি যে সর্ব্বত্র। তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার মধ্যস্থলে পরমাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে দেখিতে পাওয়া বড়ই আনন্দের। আবার যিনি এই বিশাল বিশ্বের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপ, রস, গীত, গন্ধের নব নব রহস্য নিত্য নূতন ভাবে জাগাইয়া তুলিতেছেন এবং সকল বস্তুকে আবৃত করিয়া আছেন, তাঁহাকেই আত্মার অন্তরতম হিসাবে নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা অকৃত্রিম আনন্দ। এই প্রকাশের একদিকে আছে ভগবৎপূজায় উৎসর্গীকৃত আত্মজীবন। অপরদিকে রহিয়াছে, সেই বন, সেই প্রান্তর, সেই তরুশ্রেণী এবং সেই উন্মুক্ত আকাশ। এই খানেই মিশিয়াছে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং ধিয়ঃ"। গায়ত্রী মন্ত্র এমনই করিয়া প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে।

যেখানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ অন্তরের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিময় সৌন্দর্য্য মিলিত হইয়া গিয়াছে—সেখানেই সাধনার সমাপ্তি। সেইখানেই আমাদের পুণ্যতীর্থ। এবং সেইখানেই ধ্যানমন্ত্র গায়ত্রী· এইখানেই সাধকের চিত্ত উদ্বোধিত হয় (প্রচোদয়াৎ)। এই মন্ত্র স্বতঃই আমাদের মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠে। আমাদের অন্তরে জাগে "হে ভর্গদেব! তোমার মধ্যে "তেজ" পাইয়াছি। হে আনন্দময়! তোমার মধ্যে "আনন্দ" পাইয়াছি। হে সুন্দর! তোমার পানে চাহিয়া "মুগ্ধ" হইয়াছি। হে পবিত্র! তোমার সুন্দর শুভ্র হস্ত আমায় স্পর্শ করিয়াছে। হে অন্তরের ধন! তোমার

প্রকাশ বাহিরে দেখিতেছি। হে বাহিরের ঈশ্বর! তোমার অনুভূতি অন্তরের মধ্যে লাভ করিয়াছি। আমার গায়ত্রী মন্ত্র সার্থক হইয়াছে। আমার গায়ত্রী মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রুতি দৃষ্টিতে ব্রহ্মস্বরূপের দ্বিবিধ প্রকাশ। বাহিরে দৃশ্যমান জগতে "সর্ব্বব্যাপীরূপে"। ভিতরে ভাবময় ও কর্ম্মময় রাজ্যের সকল প্রেরণার মূল উৎস "সর্ব্বভূতান্তরাত্মারূপে।" শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্ট বলেন, "সংসারে দুইটি বস্তু দেখিয়া আমার ভয় হয়। তন্মধ্যে একটি Starry Heaven, নক্ষত্রখচিত আকাশ অপরটি Moral conscience, অন্তরে অন্তর্যামীর সাড়া। তিনি বলেন—"নক্ষত্রখচিত বিশাল আকাশের আড়ালে যে শক্তি, আমার বিচারবুদ্ধির পরিচালকও সেই শক্তি।" ক্যাণ্ট সাহেবের এই কথার সঙ্গে বেদের চরমমন্ত্র ব্রহ্মগায়ত্রীর সঙ্গে অদ্ভুত মিল দেখিতে পাওয়া যায়। গায়ত্রী ঋষি বলিতেছেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবকারী যে শক্তি—আমাদের বুদ্ধির প্রচোদকও সেই শক্তি।

আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে তিনটি সত্যের সন্ধান পাই। প্রথম বিশাল বিশ্বের একটি কেন্দ্র আছে সেখানে "বরেণ্যং ভর্গঃ" স্থিত। দ্বিতীয়—প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে একটি কেন্দ্র আছে সেখানে "ধিয়ো য়ো নঃ" স্থিত। তৃতীয়—এই দুইটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে—তাহা "প্রচোদক"।

জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর ধর্ম্ম ভিত্তি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি "গায়ত্রী আত্মদা"। আমাদের স্বার্থবুদ্ধি ছাড়িয়া গায়ত্রী উপলব্ধি করিলে দেখিতে পাই—এই গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে প্রাচুর্য্য ও পূর্ণতা। তখনই আমরা এই পরম মঙ্গল ও পরমানন্দের প্রকাশ অনুভব করি। তখনই এই আনন্দময়কে নিঃসংশয় সত্যরূপে বিশ্বাস করিতে আমাদের কষ্ট হয় না।

ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের মধুময় প্রকাশ। ভক্তের

জীবনে সর্ব্বমঙ্গলময়ের প্রতিফলিত প্রসন্ন রশ্মি। ইহাও জগৎব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা। ফুলের সুবাসে, ফলের মিষ্টতায় ও বাহিরের সৌন্দর্য্যে ভগবানের আত্মদান যেমন অনুভব করি, ভক্তের অন্তরে ও অন্তর্যামীরূপে তেমনি ঐশী আত্মদান অনুভব করি। এই আত্মানুভূতি অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ ও অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

এই জন্যই গায়ত্রী মন্ত্রে একদিকে বাহিরের "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" এবং অন্যদিকে অন্তরের "ধী" এবং উভয়কে একই পরমশক্তির "প্রচোদক" প্রকাশরূপে জানিয়া ধ্যান করার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। এই ধ্যান-মন্ত্রই হইল গায়ত্রী।

গায়ত্রী মন্ত্রকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই অংশের নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ "বি+আহৃতি।" অর্থাৎ যখন আমাদের চিত্ত সাংসারিক জটিলতায় জড়াইয়া পড়িয়া উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে—তখন মনকে 'আহৃতি' বা আহরণ করিতে বা নিজের মধ্যে ভূলোক, ভুবর্লোক, ও স্বর্লোক অর্থাৎ এই নিখিল বিশ্বকে অনুভব করিতে হইবে। গায়ত্রী মন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে সাধককে এই ব্যাহৃতি সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে। ব্যাহৃতির সাধনা ঐক্যবোধে আরোহণে সহায়তা করে। ঋষিগণ প্রভাতে উঠিয়া, ধ্যানযোগে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে আপন আত্মাকে একীভূত করিয়া লইতেন। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, অনন্ত জ্যোতিষ্ক ও এই বহির্জগৎ ও তাহার প্রতি বস্তুকে আপনার ভাবিয়া বিশ্বজনীনভাবে আপ্লুত হইতেন।

এইভাবে বিশ্বলোক নিজের মধ্যে আহৃত হইলে, গায়ত্রীর সাবিত্রী অংশ "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি" (সেই জগৎ প্রসবিতা অন্তর্যামী পুরুষের সর্বলোক প্রার্থনীয় (বরেণ্য) জ্যোতিকে (ভর্গ) আমরা ধ্যান করি (ধীমহি); আমাদের অন্তরের গভীরে ধ্বনিত বা উপলব্ধি হয়।

তখন সাধক উপলব্ধি করেন, এই বিশাল জগৎ আমার বাহিরে নয়। তাহা আমার মধ্যেই বিরাজিত। আমিও তাহাকে লইয়া পূর্ণ। সেই পূর্ণতার ক্ষয় নাই।

নিখিল বিশ্বের সহিত সাধকের ঐক্যবোধ জাগ্রত হইলে, তিনি নিজ স্বার্থের হীনতা বিসর্জ্জন দিয়া আত্মশক্তি বাড়াইয়া তোলেন।

তখন তাঁহার আত্মাভিমান থাকে না, অশান্তি দূরে পালায়, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। তখন তিনি জীব ও ব্রহ্মে একাত্ম হইয়া পরমকরুণাময়ের মোহনিয়া সুর অন্তরের গভীরে শুনিতে পান। তখনই তাঁহার উপলব্ধি হয় গায়ত্রীর তাৎপর্য্য ও গায়ত্রীর সার্থকতা।

খ। গীতা।

ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ

১। বন্দনা।

(১)

হে কৃষ্ণ। করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

(২)

সব্যে ভুজে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং।
কটিতটে দুকূলং নেত্রান্তে সহচর কটাক্ষং বিদধতে॥
সদা শ্রীমদ্ বৃন্দাবন-বসতিলীলাপরয়ো।
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

(৩)

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং।
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চি নুতং শরণ্যং॥
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং।
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

(৪)

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্॥
মায়ামৃগং দয়িতেপ্সিত অন্বধাবদ্।
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

(৫)

যথা শিবময়ো বিষ্ণু র্বিষ্ণুময় স্তথা শিবঃ।
যথান্তরং ন পশ্যামি তথামে স্বস্তিরায়ুষি॥

(অর্থাৎ—বিষ্ণু যে প্রকার শিবময়—শিব ও সেই প্রকার বিষ্ণুময়। জীবন এমন মঙ্গলময় হউক—যেন আমি ভেদ দর্শন না করি॥

ক্ষমা প্রার্থনা।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যৎ কল্পিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তৎবিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।

"ব্যাসদেব।"

অর্থাৎ—তুমি রূপবিবর্জ্জিত। আমি ধ্যানে যে তোমার রূপকল্পনা করিয়াছি।

তুমি অখিলগুরু ও বাক্যের অতীত। আমি স্তবের দ্বারা তোমার যে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থযাত্রাদিদ্বারা যে সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি।

হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটা বিকলতা দোষ ক্ষমা করুন।

২। গীতার প্রতিপাদ্য।

গীতা শান্তির জিনিষ। শান্তি সাধনের ধন। "জল" এই শব্দটা মুখে সহস্রবার উচ্চারণ করিলেও যেমন পিপাসা মিটেনা, তেমনি মুখে "শান্তি" "শান্তি" বা "ভগবান" "ভগবান" লক্ষবার বলিলেও শান্তি বা ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না।

মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায় ও পরম শান্তি লাভ হয়। সেই মন ও প্রাণ কি এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি এবং কেমন করিয়াই বা এই উভয়ের একতা স্থাপন করিতে হয় ভগবান তাহা গীতাতেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

গীতা রূপক। শ্রীভগবান আজ্ঞাচক্রস্থ কুটস্থ চৈতন্য। শ্রীঅর্জ্জুন শরীরস্থ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে নাভিপদ্মস্থিত মনস্তত্ত্ব। সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার কালে মন (ধৃতরাষ্ট্র) অন্ধ। এই অন্ধ মনের প্রবৃত্তি-পক্ষীয় দশ ইন্দ্রিয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দশবিধ প্রবৃত্তি। অর্থাৎ দুর্য্যোধনাদি শত তনয়, নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেন। নিবৃত্তি পক্ষীয় পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চতত্ত্ব। কুরুক্ষেত্র নিজদেহ, রণক্ষেত্র। সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি। এবং এই দেহেই আত্মা ও মন উভয়ের মধ্যে নিয়ত সমর চলিতেছে। ইহাই কুরুপাণ্ডব সমর। ইহাই গীতা। গীতার ১—৬ অধ্যায় দর্শন ৭—১২ অধ্যায় উপলব্ধি। ১৩—১৮ অধ্যায় ধারণা বা মোক্ষ।

শ্রীগীতায় একটিও অপ্রয়োজনীয় কথা নাই। শ্রীগীতা অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী। এই অদ্বৈত, ব্রহ্ম বা বেদের স্বরূপ। অর্থাৎ "আপনি" "আপনি" ভাব। বেদ ও গীতা কিন্তু দ্বৈতবাদকে নিন্দা করেন নাই। যতদিন সাধক সাধনার রাজ্যে অবস্থিতি করেন—ততদিন মাত্র দ্বৈতবাদ থাকে। সাধনা যখন শেষ হয় তখন্ সাধকের স্থিতি অদ্বৈতে।

অদ্বৈতবাদ কাহারও সঙ্গে বিরোধ করেন না। ব্যষ্টি সমষ্টিকে ভিন্ন দেখিয়া, অংশ পূর্ণকে অবজ্ঞা করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়

দ্বৈতবাদের বিরোধও অনেকটা সেই প্রকারের। আধুনিক দ্বৈতবাদীরা যে অদ্বৈততত্ত্বের নিন্দা করেন তাহা সম্প্রদায় গঠিত ও সম্প্রদায় সৃষ্টির জন্য।

যিনি নির্গুণ স্বরূপে "আপনি" "আপনি" অবিজ্ঞাত স্বরূপ, অবাক, মনের অগোচর, আবার যিনি সগুণভাবে সকল প্রকার স্থাবর জঙ্গম জড়িত বিশ্বরূপ, সর্ব্ব নরনারীর মধ্যে বিরাজিত বিশ্বমূর্ত্তি, আবার যিনি জগতের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতে দুষ্কৃতি বিনাশ করিতে, সাধুদের পরিত্রাণ করিতে ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে "মায়ামানুষ" বা অবতার রূপে উদ্ভব হইতেছেন, শ্রীগীতা সেই পরমপুরুষকে উপাস্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নির্গুণ, সগুণ ও অবতার এই তিনে এক এবং এই একে তিন। ইহা বেদের ও পরমপুরুষ। ইহা গীতার "সাধ্য।"

গীতা এইভাবে "সাধ্য" নির্ণয় করিয়া সাধনার পথও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সাধনা জীবের বিশেষ প্রয়োজন। সাধনা তাঁহারই (সাধ্যের) আজ্ঞা। তাঁহার নির্দ্দেশ মত কার্য্য, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই মানুষের প্রকৃত পুরুষার্থ।

শ্রীভগবান গীতায় বলিতেছেন—তাঁহার জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। সম্পূর্ণ দ্বাদশ অধ্যায়ে ধর্ম্মের সাধন কি তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষর উপাসনায়—"আপনি" "আপনি" ভাবে স্থিতি প্রথম। ইহাই ধ্যান যোগ। বিশ্বরূপের উপাসনা দ্বিতীয়। প্রকৃতি হইতে পুরুষকে ভিন্ন করিয়া দেখা যে সাধনা—তাহা জ্ঞানযোগ। অভ্যাসযোগ হইতেছে মূর্ত্তি অবলম্বনে উপাসনা। ইহাই তৃতীয় এবং ইহাই ভক্তিমার্গ। ইহাতে যিনি অসমর্থ তিনি "মৎকর্ম্ম পরমোভব" (১২।১০) এবং "মচ্চিত্ত সততং ভব" (১৮।৫৭) হইবেন। ইহাতেও অসমর্থ হইলে "সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ" (১২।১১) আশ্রয় করিতে হইবে। ইহাই ভক্তিমার্গের শেষ পন্থা।

শ্রীগীতা কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। ইহা সমগ্র

'মানব জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলেই ইহা গ্রহণ করিতে পারেন। গীতার সেই সর্ব্বজনীন উপদেশগুলি কি এবং সেই উপদেশানুযায়ী চলিয়া কিভাবে স্বীয় কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রণ করতঃ সকলেই ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভ করিতে পারেন—তাহাই গীতার মর্ম্ম কথা।

সংক্ষেপে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ধর্ম্মে উদারতা, ২। কর্ম্মে নিষ্কামতা, ৩। জ্ঞানে ব্রহ্ম সদ্ভাব, ৪। ভক্তিতে ভগবৎ শরণাগতি, ৫। নীতিতে সাম্যবুদ্ধি, ৬। ধ্যানে ভগবানে চিত্তসংযোগ, ৭। উপাসনায় ভগবৎকর্ম্মে স্বধর্ম্মপালন, ৮। সাধনায় ত্যাগানুশীলন। ইহাই গীতার প্রতিপাদ্য।

৩। গীতার বিশ্লেষণ।

অধ্যায়-সংক্ষেপ।

প্রথম অধ্যায়ঃ বিষাদ যোগঃ জিজ্ঞাসা বিনা জ্ঞান হয় না। দুঃখ বিনা সুখ বুঝা যায় না। জীব ইন্দ্রিয়ের বশে থাকায় ধর্ম্মকে নানাপ্রকার বলিয়া মনে করে এবং ধর্ম্ম লোপের নানা আশঙ্কাও করে। জিজ্ঞাসুর নিকট এই সব প্রশ্ন আসিবেই। মোহ অভিভূত জিজ্ঞাসু অবসাদগ্রস্ত হয়। তাহাই বিষাদযোগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সাংখ্য যোগঃ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। ব্রহ্মাণ্ড-রূপ একমাত্র গৃহে একাকী আমি আমাকেই ডাকি। এই অধ্যায়ের ইহাই সারমর্ম্ম এবং ইহাই সমগ্র গীতা। মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুন আপনার ও পরের মধ্যে ভেদ করিয়াছিলেন। এই ভেদ যে মিথ্যা ও অমূলক তাহা দেখাইবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহ ও আত্মার ভিন্নতা দেখাইতেছেন। এই অধ্যায়ে—

১—১০ শ্লোক—অর্জ্জুনের শিষ্যত্ব গ্রহণ।

১১—৩৮ শ্লোক—আত্মা ও দেহজ্ঞান (সাংখ্য যোগ)

৩৯—৫৩ শ্লোক—কর্ম্মযোগ।

৫৪—৭২ শ্লোক—স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কর্ম্মযোগঃ ইহা গীতার স্বরূপ জ্ঞাত হইবার চাবি। কর্ম্ম কেমন করিয়া করিব, কেন করিব এবং সত্যকার কাজ কাহাকে বলে—এই অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের যাবতীয় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর। ইহাতে বলে আত্মা (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) দ্বারা আত্মাকে জয় করিয়া কামরূপ শত্রুকে পরাভূত বা নাশ কর। ইহাতে বলে প্রকৃত জ্ঞান পারমার্থিক কর্ম্মেই পরিণত হওয়া চাই। ইহাই কর্মযোগ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জ্ঞানকর্ম্ম সন্ন্যাস যোগঃ তৃতীয় অধ্যায়ের বিশেষ আলোচনা এই অধ্যায়ে আছে। ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞের আলোচনা আছে। অজ্ঞানোৎপন্ন সংশয়কে জ্ঞান দ্বারা জয় করিবার নির্দ্দেশ এই অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। ইহাই জ্ঞানকর্ম্ম সন্ন্যাস যোগ।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ কর্ম্ম সন্ন্যাস যোগঃ এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে প্রাণাপাণ বায়ুকে সমান করিয়া ইন্দ্রিয় বুদ্ধি সংযমকারী ব্যক্তি সদা মুক্ত। কর্ম্মযোগ বিনা কর্ম্ম সন্ন্যাস হয় না। বস্তুতঃ উভয়ই এক—তাহা এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ধ্যান যোগ বা অভ্যাস যোগঃ যোগ সাধনার অর্থাৎ সমত্ব পাওয়ার কতকগুলি সাধন প্রণালী ইহাতে পাওয়া যাইবে। ইহা শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে মদ্গতচিত্ত হইয়া ভজনার অভ্যাস করিতে বলে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ জ্ঞান বিজ্ঞান যোগঃ ঈশ্বরতত্ত্ব ও ঈশ্বর ভক্তি কি তাহা এই অধ্যায়ে বুঝান আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান

বলিয়াছেন—তাঁহাতে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও তাঁহাকে জানিতে পারে।

অষ্টম অধ্যায় ঃ অক্ষর ব্রহ্মযোগ ঃ এই অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষ-রূপে বুঝান হইয়াছে। বেদ ও তপস্যা দান ইত্যাদি শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য দ্বারা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়।

নবম অধ্যায় ঃ রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ ঃ মন্মনামদ্‌যাজী হইয়া কাজ কর। ইহাই ভগবানের নির্দ্দেশ। এই অধ্যায়ে ভক্তির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা অতি উচ্চস্তরের গোপন বিষয়।

দশম অধ্যায় ঃ বিভূতি যোগ ঃ সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে ভক্তি ইত্যাদি নিরূপণ করিয়া পরে ভগবান নিজের অনন্ত বিভূতির যৎকিঞ্চিৎ দেখাইতেছেন। ভগবান অনন্ত, অতএব তাঁহার বিভূতিও অনন্ত।

একাদশ অধ্যায় ঃ বিশ্বরূপ দর্শন যোগ ঃ সপ্তম, অষ্টম নবম ও দশম অধ্যায়ে ভক্তি ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া—ভগবান সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় ও ভক্তির কথা নানাভাবে বলিয়াছেন। দশম অধ্যায়ে নিজের বিভূতির বর্ণনা অর্জ্জুনের নিকট করিয়াছেন। অর্জ্জুনের সেই বিভূতিময় বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা একাদশ অধ্যায়ে মিটাইতেছেন। দেবতারাও যাহা দেখিতে পান না, সাধকেরা নিজ সাধন বলে তাহা দেখিতে পান। এই অধ্যায় ভক্তগণের অতিপ্রিয়।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ ভক্তি যোগ ঃ ইহাতে ভক্তের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন, শ্রদ্ধাশীল মৎপরায়ণ ভক্ত আমার অতি প্রিয়। এই অধ্যায়টি ছোট এবং সকলেরই মুখস্থ করা উচিৎ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগঃ এই অধ্যায়ে শরীর ও শরীরীর ভেদ দেখান হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন "ক্ষেত্রী ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ঃ গুণত্রয় বিভাগ যোগঃ গুণময়ী প্রকৃতির পরিচয়ের পর ত্রিগুণের বর্ণন এই অধ্যায়ে আছে। ইহাতে গুণাতীতের লক্ষণ ভগবান উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই গুণ স্থিতপ্রজ্ঞে দেখা যায়। দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা ভক্তে দেখা যায়। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ইহা গুণাতীত দেখা যায়। গুণাতীত ব্যক্তির কার্য্য এই অধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ পুরুষোত্তম যোগঃ এই অধ্যায়ে ক্ষর ও অক্ষরের পর নিজের উত্তমস্বরূপ (পুরুষোত্তমরূপ) ভগবান বুঝাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন যিনি আমায় পুরুষোত্তম বলিয়া জানিতে পারেন তিনি সর্ব্বমুক্ত।

ষোড়শ অধ্যায়ঃ দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগঃ এই অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের বর্ণনা আছে। কার্য্য হইতে অকার্য্য পৃথক করিয়া কাজ করিতে বলা হইয়াছে।

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগঃ শিষ্টাচার ব্যতীত শ্রদ্ধা হয় না এবং শিষ্টাচার ত্যাগ করিলে শ্রদ্ধায় আশঙ্কা আছে। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কাজ করিতে বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ৪র্থ হইতে ১৭ শ অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাপক সমালোচনা।

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ সন্ন্যাস যোগঃ এই অধ্যায় উপসংহাররূপে গণ্য। সমস্ত কর্ম্মই ত্যাগ কর। আমার শরণ লও। সমস্ত কর্ম্মের ফল ভগবানে অর্পন কর। ইহাই সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ ও প্রকৃত সন্ন্যাস। মোহ ত্যাগ করিয়া মোক্ষ লাভ কর। ইহাই এই অধ্যায়ের সার মর্ম্ম। ইহাই মোক্ষ যোগ।

৪। গীতায় স্বধর্ম্ম।

গীতায় দেখা যায়ঃ—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ,
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" ৩।৩৫

সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধন ও ভাল। কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। এখন প্রশ্ন হইতেছে শ্রীভগবান স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিলেন কেন? তবে কি ভগবানের কাছে আত্মপর ভেদ আছে? তবে কি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে?

একটু অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে তাহা কখনই নহে। গীতা সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক। ভগবান স্বধর্ম্ম অর্থে আত্মধর্ম্ম, পরধর্ম্ম অর্থে ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ অর্থে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, ক্ষত্রিয় অর্থে যিনি ব্রহ্মকে জানিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করেন, বৈশ্য অর্থে যিনি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করেন ও শূদ্র অর্থে যিনি সাধু পরিচর্য্যা করেন, বুঝাইতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম ও ত্রয়োদশ শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৭ ও ৬৬ শ্লোকের অর্থ দেখিলে ইহা জানা যাইবে।

এখন বুঝা যায় এই স্বধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম এবং পরধর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়া অপেক্ষা আত্মধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ।

কেহ কেহ স্বধর্ম্ম স্বীয়ধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম পরের ধর্ম্ম ও অর্থ করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আমাদের জীবনে দুঃখ বর্ত্তমান আছে। যখন একটী আকাঙ্ক্ষিত ধন পাইতে গিয়া আর একটী আকাঙ্ক্ষিত ধন হারাইতে হয় তখন জীবনের মাঝে দুঃখের উদয় হয়। শ্রীরামচন্দ্র সত্য রাখিতে গিয়া অযোধ্যা হারাইলেন। রাজাদর্শে অটল থাকিতে গিয়া প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে ত্যাগ করিলেন। আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে গেলে বয়স হারাইতে হয়। আব্রহ্মস্তম্ব

পর্য্যন্ত সকলেরই এই দুঃখ। এই দুঃখ এক নাই—ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের। আর নাই প্রস্তর খণ্ডের। এক পূর্ণচেতন—আর এক পূর্ণ অচেতন। এই দুই প্রান্ত মধ্যে অবস্থিত সকলেরই দুঃখ আছে। এই প্রকার অবস্থায় পতিত মানব জীবনের দুঃখের অবসান ঘটাইয়া শান্তিলাভের পন্থাই শ্রীগীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

গীতার আঠারটা অধ্যায় যেন আঠার সিঁড়ি। প্রথমটা বিষাদ যোগ, শেষটা মোক্ষযোগ। বিষাদিত বা দুঃখগ্রস্থ মানবকে একটীর পর আর একটী সিঁড়িতে ধাপে ধাপে লইয়া যাওয়া হইতেছে। শেষধাপে মুক্তির রাজ্য। এই মুক্তি মৃত্যুর পরবর্ত্তী কোন অবস্থা বিশেষ নহে। গীতা তজ্জন্য ব্যাকুল নহে। জীবন্ত অবস্থাতেই, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যস্থলেই অসংখ্য বন্ধন মাঝে দ্বন্দ্বময় বিষাদভূমি হইতে দ্বন্দ্বাতীতে শান্তির ভূমিতে উন্নয়নই গীতার মোক্ষ। জীবন্মুক্তিই গীতার লক্ষ্য। ইহাই গীতার স্বধর্ম্ম।

৫। গীতায় ভক্তের প্রতি ভগবানের বাণী।

(গীতার সার কথা)

১। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। ৪।৭

২। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৮

৩। জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম ন এতি মামেতি সঃ অর্জ্জুন। ৪।৯

৪। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ৪।১১

৫। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি। ৫।২৯

৬। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি। ৬।৩০

৭। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। ৭।১৬

৮। যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং। ৭।২১

৯। যেষাং তু অন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ। ৭।২৮

১০। অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্তি অত্র সংশয়ঃ। ৮।৫

১১। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ। ৮।৬

১২। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যস্ব।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেব এষ্যসি অসংশয়ম্। ৮।৭

১৩। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্। ৮।১৩

১৪। অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ। ৮।১৪

১৫। পিতা অহং অস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রং ওঙ্কারঃ ঋক্‌সামযজুরেব চ। ৯।১৭

১৬। গতিঃ ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্। ৯।১৮

১৭। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং। ৯।২২

১৮। যে অপি অন্যদেবতাঃ ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকম্। ৯।২৩

১৯। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। ৯।২৬

২০। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্। ৯।২৭

২১। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেব এষ্যসি যুক্তৈ্বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ। ৯।৩৪

২২। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে॥ ১০।১০

২৩। তেষাম্ এব অনুকম্পার্থম্ অহম্ অজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়ামি আত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। ১০।১১

২৪। ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ অহম্ এবম্বিধোর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। ১১।৫৪

২৫। মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ সঃ মামেতি পাণ্ডব॥ ১১।৫৫

২৬। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ১২।৬

২৭। তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময়ি আবেশিত-চেতসাম্॥ ১২।৭

২৮। ময়ি এব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেবম্ অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ১২।৮

২৯। মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪।২৬

৩০। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষুমদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮।৫৪

৩১। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং॥ ১৮।৫৫

৩২। মচ্চিত্ত সর্ব্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বং অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি। ১৮।৫৮

৩৩। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেব এষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে। ১৮।৬৫

৩৪। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবাঃ নীতি মর্তিম্মম। ১৮।৭৮

৬। বঙ্গানুবাদ।

(ভক্তের প্রতি ভগবানের বাণী)

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়ে আপনাকে সৃজন করি। (৪।৭) আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। (৪।৮) যিনি আমার এই স্বেচ্ছাকৃত জন্ম ও অলৌকিক কর্ম্ম যথার্থ অবগত হইতে পারেন, তিনি দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করেন। তাঁহাকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। (৪।৯) যাহারা যে রূপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে তদ্রূপেই অনুগ্রহ করি। যে যাহাই করুক সকলেই আমার সেবা পথে আগমন করিতেছে। (৪।১১) সমাহিত চিত্ত, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শীব্যক্তি সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সকল ভূত অবলোকন করিয়া থাকেন। (৬।২৯) যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং সেই ব্যক্তি ও আমার অদৃশ্য

হয় না। (৬।৩০) হে অর্জ্জুন! আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার পূণ্যবান লোক আমাকে আরাধনা করেন। (৭।১৬) যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে আমার মূর্ত্তিবিশেষে, যে কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই অচলাভক্তি প্রদান করি। (৭।২১) কিন্তু যে সকল পূণ্যাত্মা ব্যক্তিদের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দনিমিত্ত মোহ অবগত হইয়াছে, সেই সমস্ত কঠোর ব্রতপরায়ণ মহাত্মারাই আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন ও আমাতে প্রয়াণ করেন, তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। (৮।৫) হে পার্থ! যে ব্যক্তি একান্ত মনে অন্তকালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে, সে সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৮।৬) অতএব তুমি সর্ব্বসময়ে আমাকে স্মরণ কর এবং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমাতে মন্ ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে নিশ্চয় আমাকে প্রাপ্ত হইবে। (৮।৭) যিনি অনন্যচিত্তে আমাকে নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করেন। (৮।১৪) যিনি "ওঁ" এই একাক্ষর উদাহরণ পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন্। (৮।১৩) আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা এবং আমিই ঋক্, সাম্, যজুর পবিত্র ওঁকার বলিয়া জানিবে। (৯।১৭) আমিই গতি (অর্থাৎ কর্ম্মফল) ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস (বাসস্থান), শরণ (রক্ষক) সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, স্থান (আধার) নির্ব্বান (লয়স্থান) বীজ এবং অব্যয় (৯।১৮) যাহারা অনন্যচিত্তে আমাকে চিন্তা ও উপাসনা করে আমি সেই মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম বহন করি। (৯।২২) আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না। তাই স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। (৯।২৩) যিনি ভক্তি সহকারে আমাকে ফল, পুষ্প, পত্র ও তোয় (জল) প্রদান করেন, আমি সেই সংযতাত্মা পুরুষের তৎসমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি।

(৯।২৬) হে কৌন্তেয়! তুমি যে কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান, ভক্ষণ, হোম, দান ও যে তপ সাধন করিয়া থাক, তাহা আমাকে সমর্পণ করিও। (৯।২৭) তুমি আমাতে মন সমর্পণ করতঃ ভক্তি পরায়ণ হও, সর্ব্বদা আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি এইরূপে আমাতে আত্মসমাহিত হইলে আমাকে পাইবে। (৯।৩৪) যাহারা প্রীতি সহকারে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে বুদ্ধি প্রদান করি। তদ্দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। (১০।১০) আমি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার জন্য ঐ সকল ব্যক্তিদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীল জ্ঞান প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নিরাকরণ করি। (১০।১১) হে পরন্তপ অর্জ্জুন! মদেকনিষ্ঠ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমার এই বিশ্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারে। আমাকে নয়ন গোচর ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। (১১।৫৪) হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্ম করে, যে ব্যক্তি আমার একান্ত ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত, পুত্র কলত্র প্রভৃতির প্রতি অনাসক্ত, যাহার কাহার ও সঙ্গে কোন বিরোধ নাই, আমি যাহার পরম পুরুষার্থ, সে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১১।৫৫) যাহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হয় এবং একান্ত ভক্তির সহিত আমাকেই চিন্তা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। (১২।৬) তুমি আমাতে স্থির চিত্ত ও বুদ্ধি সমাহিত কর—তাহা হইলে দেহান্তে আমাতে বাস করিতে পারিবে। (১২।৮) হে পার্থ! আমি উক্ত ব্যক্তিদিগকে অচিরকালমধ্যে মৃত্যুর আকর সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। (১২।৭) তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, নিতান্ত ভাস্বর ও নিরুপদ্রব। তজ্জন্য এই সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া থাকে। (১৪।৬) তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন না। সকল প্রাণীদিগের সহিত সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং আমার প্রতি ও তাঁহার দৃঢ়ভক্তি জন্মে। (১৮।৪৪) অনন্তর তিনি ভক্তি প্রভাবে আমার স্বরূপ ও আমার সর্ব্বব্যাপিত্বরূপে সম্যক অবগত হইয়া

পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন। (১৮।৫৫) তাহা হইলে তুমি আমারই অনুগ্রহে সমুদয় দুর্গ (দুস্তর সাংসারিক দুঃখ) হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে। কিন্তু যদি অহঙ্কার বশে আমার বাক্য শ্রবণ না কর তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। (১৫।৫৮) তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও আমার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয় পাত্র। আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি, তুমি আমায় প্রাপ্ত হইবে। (১৮।৬৫)

এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে যোগেশ্বর বাসুদেব ও ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন অবস্থান করিতেছেন, তাহাদেরই রাজ্যলক্ষ্মী, জয় তাহাদেরই। এবং তাহাদেরই অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে। (১৮।৭৮)

৭। গীতায় জ্ঞাতব্য

(নামের অর্থ ও তাৎপর্য্য)

(১) কৃষ্ণস্তুতি

(ক) মহতঃ তমসঃ পারে পুরুষং অতিতেজসং,
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুং অত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ।

(খ) যো মোহাতি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ,
সর্গস্থ রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ।

(গ) যঃ তনোতি সতাং সেতু অমৃতনামৃত যোনিনা,
ধর্ম্মার্থ ব্যবহারাঙ্গৈ তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ।

(ঘ) অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্‌,
বৈকুণ্ঠস্য চ তদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ।

(ঙ) যো নিয়ন্ত্রৌ ভবেদ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্টিতঃ,
ইষ্টানিষ্টস্য দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ।

(চ) যোঽসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তাঃ অর্চ্চি বিভাবসু,
সংভক্ষয়তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ।
(মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব—৪৭ অধ্যায়।)

মন্তব্য :—এই হেন কৃষ্ণরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে
চাই মনে প্রাণে ঐক্য। এবং তাহা হয়
একমাত্র জ্ঞান, বিশ্বাস ও ভক্তিতে।

(২) কৃষ্ণ

কৃষ ধাতুর উপর "ণ" প্রত্যয় করে কৃষ্ণ। কৃষি সত্ত্বাবাচক। "ণ" আনন্দবাচক। যিনি নিত্য পুরুষ, নিত্য আনন্দের উৎস, তিনিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই সুখস্বামী।

কৃষ ধাতুর অর্থ দুই প্রকার। কর্ষণ করা এবং আকর্ষণ করা। যিনি জীবহৃদয় কর্ষণ করেন এবং অন্তরে ভক্তির বীজ রোপন করেন—তিনিই কৃষ্ণ।

আবার যিনি মানব হৃদয় আকর্ষণ করেন, ভক্তিপথে নিয়ে যান, তিনিও কৃষ্ণ। 'কৃষি' সত্ত্বাবাচক। "ণ" নির্ব্বাণবাচক। যে নিত্য পুরুষ সমস্ত কামনা ও ক্লেশের অপহারক (অপহরণ করেন) বা নিবারক (নিবারণ করেন) তিনিই কৃষ্ণ।

'কৃষির' আর এক অর্থ উৎকর্ষ। "ণ" এর আর এক অর্থ সম্ভক্তি। উৎকৃষ্ট সম্ভক্তি যিনি দান করেন, অন্তরে অকৃত্রিম ভক্তি জাগান তিনিই কৃষ্ণ। অপর অর্থে যিনি পাপের নিবৃত্তি করেন, ও শত্রুর নিধন করেন, তিনিই কৃষ্ণ।

কৃষ্ণকে পাইতে হইলে, চাই কৃষ্ণে পূর্ণ অনুরক্তি।

কৃষ্ণে পূর্ণ ভক্তি। সদা কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণনাম জপ।

এইখানে কোন বিধি বা নিয়মের প্রশ্ন নাই। এইখানে অধিকারী বা অনধিকারীর ভেদাভেদ নাই। জাতি ধর্ম্মের বিচার নাই। উচ্ছিষ্ট, অনুচ্ছিষ্ট, শুচি, অশুচি, পবিত্র অপবিত্র কোন দ্বিধা থাকেনা।

"নামই নির্নিষেধ।" নামই কামিত কামদ। **শ্রীনাম কীর্তনই শ্রীকৃষ্ণভজন।**

কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণসেবার সাধারণতঃ চারি প্রকার ভাব কথিত হয়। ১। দাস্য ২। সখ্য ৩। বাৎসল্য ও ৪। মধুর। এই মধুর বা কান্তাভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠভাব। এই মধুরই সাধ্যশিরোমণি। ইহার আর একনাম কান্তাপ্রেম। "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই কান্তাপ্রেম হৈতে।" ইহার আর একনাম শৃঙ্গার। "সব রস হইতে শৃঙ্গার অধিক মাধুরী।"

কিন্তু ইহা ঠিক যে সঙ্গম সুখ হইতে সেবাসুখ অত্যন্ত মধুর ও পবিত্র।

"কান্ত সেবা সুখপুর সঙ্গম হইতে সুমধুর"
তা'তে সাখী লক্ষ্মীঠাকুরাণি
"নারায়ণের হৃদেস্থিতি তবু পদসেবায় মতি
সেবা করে দাসী অভিমানী।"

শ্রদ্ধাই সাধনের মূল। কৃষ্ণভক্তিতেই অবিচলিত বিশ্বাস শ্রদ্ধা। কৃষ্ণকে যখন পূজা করিবে তখন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহা মনে রাখিতে হইবে। তিনিই লীলামানুষবিগ্রহ, তিনিই পীতবাস বনমালী, তিনিই বেণুবাদ্য বিশারদ, এইভাবে তাঁহার সান্নিধ্য করিবে। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক স্থাপন করিবে। তাঁহার সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্ত হইবে। তখন শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুভূতি পাইবে।

(৩) মাধব

"মা" শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। যিনি লক্ষ্মীর ধব বা পতি তিনিই মাধব। "মা" শব্দের অপর এক অর্থ বিদ্যা। যিনি বিদ্যা বা সরস্বতীর ধব বা পতি তিনিই মাধব। লক্ষ্মীর মত সরস্বতী ও বিষ্ণুর পত্নী।

শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যার নাম মধুবিদ্যা। যে বিদ্যায় আনন্দ চিন্ময় রক্তের আস্বাদন করা যায় তাহাই মধুবিদ্যা। মধুবিদ্যায় যিনি অবগম্য তিনিই মাধব। "মা" শব্দের আর এক অর্থ ধী (বুদ্ধি)। যিনি মৌনের সাহায্যে বুদ্ধির ধবন বা দূরীকরণ করেন, তিনিই মাধব। অর্থাৎ স্বল্পফলদায়ী কর্ম্ম হইতে যিনি জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন তিনিই মাধব।

'ধব' শব্দের আর এক অর্থ বস্ত্র। বস্ত্র শরীরকে আচ্ছাদন করিয়াই শরীরের শোভাবর্দ্ধন করে। তেমনি যিনি "মা" কে বা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনে বস্ত্রের মত ঢাকিয়া বা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন তিনিই সেই নিত্যলীলাপরায়ণ শ্যামসুন্দর মাধব।

"মা" শব্দের আর এক অর্থ হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি। সেই শক্তিই শ্রীমতী। তাঁহার ধবই মাধব।

মুখে মাধবের নাম করিবে। মনে মাধবের ধ্যান করিবে। আর সকল কাজে, সকল সময়ে মাধবকে স্মরণ রাখিবে। মাধবই পরমানন্দ। তাঁরই কৃপায় মূক বাচাল হয়। পঙ্গু গিরিলঙ্ঘনে যায়। তাই তাঁকে বন্দনা করিবে। চন্দন তুলসী দিয়ে এই দেহ মাধবকে উৎসর্গ করিয়া দাও। আর অন্তরে অন্তরে একান্ত আপনার জনের মত তাঁহাকে বল, "হে মাধব! তোমায় বার বার মিনতি করিতেছি, তোমার দয়া আমায় যেন না ছাড়ে।"

(৪) জনার্দ্দন

অর্দ্দ ধাতুর অর্থ পীড়া দেওয়া। মানুষকে যিনি পীড়া দেন তিনিই জনার্দ্দন। আবার জন নামক অসুরকে বধ করিয়া যিনি ভক্তকে তপোলোকে যাইবার সুযোগ ঘটাইয়া দেন তিনিই জনার্দ্দন।

(৫) হরি

সর্ব্বচিত্তহর বলেই তিনি হরি। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক বলেই তিনি কৃষ্ণ। সর্ব্বচিত্তাভিরাম বলেই তিনি রাম। হরিতেই সমস্ত হরণের

পরিপূরণ, সর্ব্বশূন্যের পূর্ণায়ন। সর্ব্বকালেই হরির নাম সত্য। হরি শব্দের নানা অর্থ। দুইটী মুখ্যতম। এক সর্ব্ব-অমঙ্গল তিনি হরণ করেন। আবার প্রেম দিয়া তিনি মন হরণ করেন। যিনি হরণ করেন, তিনিই হরি।

সর্ব্ব-অমঙ্গলের যাহা কারণ, সেই মায়া বন্ধন হরি হরণ করেন। আর হরণ করেন তিনি আসক্তি। তিনি নিয়া যান আসক্তি, বিলাইয়া যান কৃষ্ণপ্রেম। তাই তিনি হরি।

(৬) নারায়ণ

"নর" হইতে উদ্ভূত বলিয়া "নার"। "নার" শব্দের অর্থ "জীবসমূহ।" আয়ন শব্দের অর্থ "আশ্রয়।" সমগ্র জীব সমূহের আশ্রয় বা আলয় বলিয়া তিনি নারায়ণ। "নর" শব্দের আর এক অর্থ "জল।" জল অর্থাৎ কারনজলে অবস্থান করেন বলিয়াই তিনি নারায়ণ। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস। অখিললোক সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বধাম, জগদ্ধাম। অনাদিরাদি গোবিন্দের ও মূল।

নারায়ণের ও অবতারী নিখিল শক্তির অধিষ্ঠানই শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণ।

(৭) গোবিন্দ

"গো" অর্থ গরু। "গো" অর্থ পৃথিবী। "গো" অর্থ ইন্দ্রিয়। আর "বিন্দ" ধাতুর অর্থ পালন। যিনি 'গো' বা গরুপালন করেন তিনি গোবিন্দ। আবার পৃথিবী বা বিশ্বের পালনকর্ত্তা বলেও তিনি গোবিন্দ। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে তিনি গোবিন্দ। পরিবারবর্গের ইন্দ্রিয়সমূহকে তিনি আনন্দে পালন করেন বা পোষণ করেন বলিয়া তিনি গোবিন্দ। "মন্মনা ভব, মদ্ভক্ত, মদ্‌যাজী, মাং নমস্কুরু।" (১৮।৬৫)। গোবিন্দ বলিতেছেন শুধু আমাতে মন অর্পণ কর। আমার ভক্ত হও। আমার যজন

কর। আর আমাকেই নমস্কার কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—তাহাতেই তুমি আমাকে পাইবে। তুমি যে আমার স্বভাবপ্রিয়।

(৮) মধুসূদন

শ্রীগীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে পাই, "উবাচ মধুসূদন।" অর্থাৎ মধুসূদন কথা বলিলেন।

এই মধুসূদন এর অর্থ কি? "মধু" শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। তাহা যিনি নাশ করেন তিনি মধুসূদন। যাঁহার সন্ধান পাইলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি লালসা থাকে না—সেই অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বস্তুই মধুসূদন। শ্রীভগবানই এই মধুসূদন।

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—এইখান হইতে ভগবদ্গীতা আরম্ভ হইয়াছে। আচার্য্যপাদ মানব সমাজকে ডাকিয়া বলিতেছেন, শুনিতে যদি চাও, আইস। শ্রীমধুসূদন কথা বলিতেছেন। যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ লক্ষ কথা বলা হইয়াছে, বলিয়া বলিয়া যে বলার অন্ত হয় নাই, যাঁহার সম্বন্ধে বাক্য প্রহত হইয়া মনের সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছে, এবার তিনি স্বয়ং আসিয়া নিজ তত্ত্বকথা নিজ শ্রীমুখে ব্যক্ত করিতেছেন। ইহা শুনিবার কথা বটে।

ইহা শুনিলে সংসারাশক্তি লোপ পায়। মধুসূদনকে বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তখনই বুঝি শ্রীভগবানই মধুসূদন।

(৯) ঋষিকেশ

ঋষিকেশ বা হৃষীকেশ। ঋষীক ঈশ। অর্থ বিষ্ণু, নারায়ণ। ঋষীক শব্দ হইতে উৎপত্তি।

ঋষীক শব্দের অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের যিনি ঈশ, প্রভু, কর্ত্তা বা

ঈশ্বর বা নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা তিনিই ঋষীকেশ, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই নারায়ণ।

তিনিই এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়া হৃষীকেশ। তিনিই দুর্য্যোধনের কাছে স্তুত হইয়াছিলেন—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি জানামি অধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

(১০) বিষ্ণু

বিষ ধাতু নূক বিষ্ণু। বিষ ব্যাপক, ব্যাপৃত। সত্ত্বগুণময় ব্যাপক দেব নারায়ণ। ইনি সৃষ্টির পালন কর্ত্তা। মহর্ষি কশ্যপের ঔরষে অদিতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি তপোবলে দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। কমলা ও বীণাপাণি ইঁহার ভার্য্যা। গরুড় ইঁহার বাহন এবং সুদর্শন চক্র ইঁহার আয়ুধ। সর্ব্বলোকের হিতার্থে ইঁনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইঁহার প্রধান দশ অবতারের বিষয় বর্ণিত আছে। যথা—(১) মৎস্য (২) কুর্ম্ম (৩) বরাহ (৪) নৃসিংহ (৫) বামন (৬) পরশুরাম (৭) রামচন্দ্র (৮) বলরাম (মতান্তরে কৃষ্ণ) (৯) বুদ্ধ এবং (১০) কল্কি।

এতন্মধ্যে নয় অবতার হইয়া গিয়াছে। কল্কিঅবতার অবশিষ্ট আছে। কথিত আছে এই অবতারে ইনি কলিযুগ ধ্বংস করিয়া পুনর্ব্বার সত্যযুগ সংস্থাপন করিবেন। ইনি ইন্দ্রের পরে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম উপেন্দ্র।

৮। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

আমি দ্বাপরে শ্যাম, কলিতে গৌর। আমিই প্রকাশ বিশেষে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই তিন নাম ধারণ করি। আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপই "ব্রহ্ম", অন্তর্যামী স্বরূপ "পরমাত্মা", আর বিলাস স্বরূপই "নারায়ণ।" আমার শক্তি, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও

বৈরাগ্য আমার ষড়ৈশ্বর্য্য। আমিই সৎ, চিৎ ও আনন্দ বিগ্রহ। আমার দেহ নিত্যসত্ত্বাযুক্ত, অনশ্বর ও ঘণীভূত আনন্দের প্রতীক। এই আনন্দ চিন্ময় আনন্দ, মায়াময় নহে। এই আনন্দ স্বপ্রকাশ, অপ্রাকৃত এবং আমিই তার ভূমামূর্ত্তি। আমি অনাদি, নিত্য-বিরাজমান। সর্ব্বকারণকারণ। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালয়িতা বলে আমিই গোবিন্দ। সর্ব্বইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে আমিই হৃষীকেশ।

সর্ব্বেশ্বর হওয়া সত্ত্বেও আমি ঐশ্বর্য্যের অনুগত নহি। আমি মাধুর্য্যের অনুগত।

লোকে বলে আমি দ্বারকানাথ। কেহ বলে আমি মথুরানাথ। আমি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রজেন্দ্র নন্দন। মথুরাধিপতি ব্রজের শ্রীকৃষ্ণই আমি। এই ব্রজেন্দ্র নন্দন আর শচীনন্দন দ্বাপরে ছিলেন কৃষ্ণ এবং কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ। উভয় লীলার সেবাতে পূর্ণতা। গীতায় পাই—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
"তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধ্যাম্যহম্॥ ৭।২১
"যে তু সর্ব্বানি কর্ম্মানি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
"অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে॥ ১২।৬
"যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্দ্ধরঃ।
"তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতি মতির্ম্মম॥ ১৮।৭৮

৯। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব

শ্রাবনে শুক্লপক্ষে একাদশ্যাদিপঞ্চকে।
হিন্দোলৎসবং কার্য্যং চতুর্ব্বর্গং অভীপ্সুনা॥

ধর্ম্মপরায়ণ মানব চতুর্ব্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) ফল লাভ করিতে কামনা করিলে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি হইতে পৌর্ণমাসীতক পাঁচদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলউৎসব করিবেন।

এই হিন্দোলউৎসবের অপর নাম ঝুলনোৎসব বা ঝুলনযাত্রা। ইহা শ্রাবণের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমাতক অনুষ্ঠিত হয়।

এই উৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা সহ দোলায় উঠেন এবং এই সময়ে তাঁহাদের পূজা, ভোগ, আরতি ও প্রসাদবিতরণ অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রাবণ মাসান্তে ও ভাদ্রের আদিতে মাতা বসুন্ধরা বরিষণক্লান্ত বর্ষাশেষে রসযুক্ত হয়। পৃথিবীর বক্ষ তখন নানা ঔষধী ও শস্যসম্ভারে ভারাক্রান্ত হয়। এই ঔষধী ও শস্যের দ্বারা ভোগদেহের পুষ্টি সাধিত হয়। সেই ভোগদেহ সংযুক্ত প্রকৃতি ভোগপুষ্টা হইয়া পরম পুরুষের সান্নিধ্য চাহে। পরমপুরুষ ইহাতে আনন্দিত হন। তিনি দেখিতে পান তাহারই অনুগ্রহ ও করুণারসে সিক্ত হইয়া বসুন্ধরা রসযুক্ত হইয়াছে এবং নানা ঔষধী, শস্য ও ফলফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তখন পরমপুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হন। ইহাই হিন্দোলোৎসব।

শ্রীশ্রীগীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে আছে।

"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।"
"পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥"

আমি নিজ শক্তিকে পৃথিবীতে প্রবেশ করাইয়া সকলকে ধারণ করিয়া থাকি। আমি রসময় চন্দ্র হইয়া (রস দিয়া) সকল ঔষধী গাছ পুষ্ট করি। এই "আমি" হইলেন "পরমাত্মা", স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ। পুনঃ এই অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে পাই

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ"
"ক্ষরঃ সর্ব্বানি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে"। ১৫।১৮
"উত্তম পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মাইতি উদাহৃতঃ।
"যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৫।১৭

এই পৃথিবীতে ক্ষর ও অক্ষর নামে দুইটী পুরুষ আছেন। তাহার মধ্যে সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে যিনি এক হইয়া আছেন সেই জীবযুক্ত

পুরুষ হইলেন ক্ষর। আর কুটস্থ, সংসার হইতে পৃথক যেই পুরুষ (যিনি ভোক্তা) তিনিই অক্ষর। এই ক্ষর অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ তিনিই পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। ইনি নিত্য, নির্ব্বিকার। ইনি তিন লোক ব্যাপিয়া আছেন। আবার ইনিই ক্ষর ও অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তম হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।

এখন প্রকৃতির দিক থেকে দেখিলে বুঝি শ্রীকৃষ্ণের তিন শ্রেণীর প্রেয়সী। লক্ষ্মী, মহিষী আর গোপিকা। লক্ষ্মীরা পরব্যোমে, মহিষীরা দ্বারকা মথুরায় আর গোপিকারা ব্রজে। এবং ব্রজাঙ্গণারাই কান্তাশ্রেষ্ঠ। তাদের সর্ব্বঢালা ভালবাসা নিজের অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত বিস্মরণে বিসর্জ্জন দেয়। পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যের প্রতিপত্তি, দ্বারকায়, মথুরায় মাধুর্য্য থাকলে ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সঙ্কুচিত কিন্তু ব্রজে কেবলই মাধুর্য্য।

এই ব্রজরাধাই বহুগোপী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের কল্পলতা। গোপীরা তার পত্রপুষ্প। যদি কৃষ্ণকৃপায়, কৃষ্ণলীলায় এবং কৃষ্ণেরই ভাবরসে লতা রসসিক্ত হয় তাহা হইলে পত্র পুষ্পেরই বেশী সুখ। এই প্রকার গোপীপ্রেমে কামের গন্ধমাত্র নাই। ভগবানেই তাদের কামার্পণ।

"নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার",
"কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার"।

প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণের সকল প্রেয়সীই স্বকীয়। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি। তিনিই কৃষ্ণের নিত্য স্বকান্তা।

"সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।"
"রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা"॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরই রাধিকার ভাবমূর্ত্তি। রাধিকার মত তাঁর ও ভ্রমময় চেষ্টা। তিনি ও কখন কখন বিলাপ করেন।

জ্ঞানেতে রাধিকা ধ্যানেতে রাধিকা
রূপেতে রাধিকাময়।
সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা স্বপ্নে ও রাধিকা
সর্ব্বত্র রাধিকাময় ॥

এই ভাব নিয়া পরম পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিজেরই ধারা শ্রীরাধিকাকেই লইয়া রসসিক্ত পৃথিবীর পরমা প্রকৃতিস্বরূপাকে নিজেরই কাছে আকর্ষণ করেন। তখন আত্মা পরমাত্মাতে লয় হয়। তখন উভয়েরই মিলন সম্ভব হয়।

এই যুক্ত অবস্থায় যে হিন্দোল-তাহা ভারতবর্ষ তার সমস্ত ভাবপ্রবণতা দিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই স্বীকৃতিই হইল হিন্দোলোৎসব বা ঝুলন।

১০। শ্রদ্ধা

অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াণ্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১৭।১

যাহারা শাস্ত্রবিধি না মানিয়া পরন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজাদি করে তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার? সত্ত্ব? অথবা রজঃ? না তামসিক? সকাম কার্য্য করিয়া আমরা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া থাকি। আমরা শাস্ত্র মানিয়া চলি বটে, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত কার্য্যগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে যেরূপ ভাবে করিতে হয় তাহা করি না। তবে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বাহ্য-পূজাদি করিয়া থাকি, যাহা সহজে করা যায় এবং করিতে ও তাদৃশ ক্লেশ পাইতে হয় না। শ্রদ্ধা সহকারে এইরূপ কৃতকর্ম্ম কোন্ প্রকারের বা গুণের তাহাই অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা। এই সপ্তদশ অধ্যায়ের ১৩ ও ১৮ শ্লোক হইতে বুঝি, মন যখন সত্ত্বগুণের স্থানে অবস্থিতি করে, তখন যে শ্রদ্ধা হয় তাহা সাত্ত্বিক। যখন রজো-গুণের স্থানে থাকে, তখন যে শ্রদ্ধা হয় তাহা রাজসিক। এবং যখন

তমোগুণের স্থানে থাকে, তখন যে শ্রদ্ধা হয় তাহা তামসিক। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণ স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রদ্ধা ও স্বভাবতঃ তিন প্রকার।

শ্রদ্ধাই সাধনের মূল। শ্রদ্ধা কাহাকে বলে? শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করাই শ্রদ্ধা। যেমন, কোন কোন উচ্চকোটী সাধক বলেন কৃষ্ণ বা কালীকে ভক্তি করিলেই হইবে। আর কিছুই করিতে হইবে না। এই শাস্ত্রকথায় নির্ব্বিচল বিশ্বাসেরই নাম শ্রদ্ধা। অশ্রদ্ধায় যাহা করা যায় তাহা সব নষ্ট হয়।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন তৎ প্রেত্য নো ইহ। ১৭।২৮

অশ্রদ্ধা সহকারে হুত, দত্ত, কৃত তপস্যা এবং অন্য যাহা কিছু করা যায় সে সকলই অসৎ। হে পার্থঃ, তাহা না পরলোকে না ইহলোকে ফলদায়ক। নিষ্কাম শ্রদ্ধা পাওয়া যায় সাধুসঙ্গে।

যেমন কৃষ্ণরতি, কৃষ্ণভক্তি সাধন। এই সাধনের উপচার নাম কীর্ত্তন। কামনা বাসনাহীন নাম কীর্ত্তন। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। ইহা সকলেরই কাম্য। ইহা শ্রদ্ধা হইতে উপজাত।

শ্রদ্ধাবানেরা বলেন—

কৃষ্ণ নাম হ'তে হবে সংসার মোচন,
কৃষ্ণ নাম হ'তে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ নাম বিনা কলিতে নাই কোন ধর্ম্ম
সর্ব্ব মন্ত্র সার কৃষ্ণ ইহা শাস্ত্র মর্ম্ম॥

১১। ভক্তি

ভজ্ ধাতু হইতে ভক্তির উৎপত্তি। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা। সেবার উদ্দেশ্য, যাহাকে সেবা করিবে তাহার প্রীতিসাধন। সুতরাং ভক্তির অর্থে ইহা বুঝা যায়, নিজের উপাস্য দেবতাকে সুখী করা, তাহার সেবা করা ও তাহার প্রীতি সাধন করাই, হইল ভক্তি। যথা,

যদি উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ হয় তবে সেবকের ইচ্ছা হইবে কৃষ্ণ কিসে সুখী হয়, কিসে প্রীত হয়। ইহা হয় মমত্ববুদ্ধিতে। কৃষ্ণ আমারই একলার। আমি ছাড়া কৃষ্ণের আর কেহ নাই। কৃষ্ণ আমারই লালনীয় এবং পালনীয়। এই ভাবই পরা ভক্তি এবং ইহাই প্রকৃত ভক্তি।

স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" (১৮।৫৫)। পরম ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে জ্ঞাত হয়।

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহং একম্বিধোঽর্জ্জুনঃ।
"জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপঃ॥ ১১।৫৪

হে অর্জ্জুন! আমার প্রতি অনন্যভক্তির দ্বারা এবংবিধ আমাকে জানিতে, দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।

ইহা হইতে বুঝা যায় উপাস্য দেবতার প্রতি অসাধারণ প্রীতি ও অনুরাগ জন্মাইবার নাম ভক্তি। কায়মনোবাক্যে ভগবানের অনুগত হওয়াই ভক্তি।

"মাঞ্চ যেঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।"
"স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ১৪।২৬

যিনি আমাকে একান্ত ভক্তিযোগে সেবা করেন, তিনি গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন।

প্রাণ চঞ্চল বলিয়া মন ও চঞ্চল। প্রাণ বিনাবরোধে স্থির হইলে মন ও বিনাবলম্বনে স্থির হয়। যতদিন মনের চাঞ্চল্য একেবারে দূরে না যায়, মন স্থির হয় না, ততদিন অনন্যাভক্তি হয় না। যে অবস্থায় মন শব্দ, স্পর্শাদির দ্বারা বিচলিত না হয়, তাহাই অনন্যা ভক্তির অবস্থা।

ভক্তির অবস্থা সাধারণতঃ তিন প্রকার। সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। এই তিন প্রকার ভক্তিতে একনিষ্ঠা প্রয়োজন। ভগবান বলিয়াছেন—

"অনেন্যাপনিযুক্ত যো জনঃ মাং পর্য্যুপাসতে,
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং। ৯।২২
যোজপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকং॥ ৯।২৩

এই প্রকার ভক্তির জন্য স্ত্রী পুত্র গৃহাদি ত্যাগ করিতে হয় না। গৃহে অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিলেও যিনি নিজকে গৃহশূন্য মনে করেন, এইরূপ ভাবাপন্নব্যক্তিই বীরসাধক ও প্রকৃত ভক্ত। বাসনাই সংসার। গৃহে থাকিয়া বাসনা ত্যাগ করিলে সংসার ত্যাগ হয়। বাসনা লইয়া বনে গেলে ও নিস্তার নাই। জনকাদি ঋষি উক্তরূপ ভক্ত। অতুল বিত্তবৈভবে থাকিয়াও মুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভরত রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়াও বনে গিয়া শান্তি পান নাই। হরিণ শিশুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া মায়ামুক্ত হইতে পারেন নাই। শ্রীভগবান বলিয়াছেন "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯।২৬

১২। সাধ্য সাধন কি?

যাহা পাইবার জন্য আমরা ভজনা করি তাহার নাম সাধ্য। সাধ্য বস্তু আমার পরম ইষ্ট,'অতি আকাঙ্ক্ষিত ও অন্তরের অন্তরতম। এত সাধনা ভজনা ও আকাঙ্ক্ষা "সাধ্যকে" পাওয়ার জন্য।

সাধ্য বস্তুকে পাওয়ার জন্য যে অনুষ্ঠান ও আচরণ তাহার নাম "সাধন"। আমার সাধ্য (কাম্য) যদি স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে আমার "সাধন" হইবে বেদবিহিত কর্ম্মের উদ্‌যাপন। আমার সাধ্য যদি হয় পরমাত্মার সহিত মিলন, আমার সাধন হইবে জ্ঞান আহরণ। এই পরস্পর সম্পর্কই সাধ্য সাধন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন- তাঁহার জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ট। ধর্ম্মের "সাধন" কি তাহা গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সাধ্য সাধন ব্যাপারে মানুষের কর্ম্ম দ্বিবিধ। বৈদিক কর্ম্মে

নিঃশ্রেয়স্ এবং লৌকিক কর্ম্মে অভ্যুদয়। দুই কর্ম্মই অবশ্য করিতে হইবে। কারণ ইহার একটী গ্রহণ করিয়া অন্যটী গ্রহণ না করিলে মানব জীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

তাই সাধ্য (কাম্য) বস্তু কি ইহা পূর্ণ নির্দ্ধারণ করিয়া সাধন কর্ম্মে বা সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

"কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।" লক্ষ্মীর প্রেমে নারায়ণের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি। তাই তাহা সসঙ্কোচ। গোপীকার প্রেমে কৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধি নাই। তাই তাহা বিশুদ্ধ, অসঙ্কোচ। "নারায়ণে লক্ষ্মীর তদীয়তাবুদ্ধি। কৃষ্ণে গোপীকার মদীয়তাবুদ্ধি। বহুসেবিকার মধ্যে আমিও একজন। এই বুদ্ধিতে প্রীতি দুর্ব্বল। আর কৃষ্ণ একলা আমারই। এই অনুভবে গোপীকার প্রেম দুর্ধর্ষ। লক্ষ্মী নারায়ণের অপেক্ষা করে। গোপীকা কৃষ্ণের অপেক্ষা করেনা। বরঞ্চ কৃষ্ণই তার জন্য অপেক্ষমান্। তাই দেখা যায়, যদিও সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেম তিনই উত্তম, কান্তাপ্রেম "সাধ্যাবধি।" মহাপ্রভু বলেছেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।"

শান্তরসের দুই গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণা ত্যাগ। দাস্যরসে এই দুই গুণ তো আছেই, আরো আছে সেবানিষ্ঠা। যা শান্তিরসে নাই। সখ্যরসে দাস্যের তিনগুণ তো আছেই, আরো আছে একটি চতুর্থগুণ, অভিন্নমননে অসঙ্কোচসেবা, যা দাস্যে নাই। বাৎসল্য রসে সখ্যের চারগুণ তো আছেই, আরো একটি পঞ্চম-গুণ আছে, মমতাধিক্যে তাড়ন গর্জন, যাহা সখ্যে নাই। কান্তা-রতিতে বাৎসল্যের পাঁচগুণ তো আছেই আরো একটি ষষ্ঠগুণ আছে নিজাঙ্গদানে কৃষ্ণ সেবা, যাহা বাৎসল্যে নাই। সুতরাং কান্তাপ্রেমই সাধ্যের সার বা অবধি। (শ্রীযুৎ অচিন্ত্য সেনগুপ্তের "গরীয়সী গৌরী"—১৩৮ পৃষ্ঠা)

এতদিন গুরুগৃহে থেকে যা শিখ্‌লে তার সার বস্তু কি, কিঞ্চিৎ

বলো। প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস্ করলেন হিরণ্যকশিপু। প্রহ্লাদ বল্লে, "বাবা! শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য আর আত্মনিবেদন-এই নব লক্ষণা ভক্তিই সারশিক্ষা।" "যাদের অন্তঃকরণ বিষয়মুগ্ধ তারা জান্‌তে পারে না কৃষ্ণকে। যাদের আত্মাতে পুরুষার্থবুদ্ধি, ভগবান শুধু তাদেরই প্রাপ্য। যে পর্য্যন্ত অনভি-অভিষিক্ত না হচ্ছে সে পর্য্যন্ত ভগবানের পাদস্পর্শ অসম্ভব। সে পাদস্পর্শ না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার নাশ হবেনা। অশান্তেন্দ্রিয় গৃহস্থেরা বারেবারে সংসারে প্রবেশ করে শুধুই চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে যাবে।

১৩। মহাভাব

ভক্তির উপরেই "সাধনের" স্থিতি। সাধন পথে ভক্তির আবশ্যকীয়তা অবিসম্বাদিত। ভক্তি হইতে রতির আবির্ভাব। এই সাধন ভক্তি কি এবং কেন হয়?

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানই সাধন ভক্তির একটি অঙ্গ। এই সব ক্রিয়াকলাপে চিত্ত শুদ্ধি হইলে রতির উদয় হয়। এই রতি গাঢ় হইলেই প্রেম বিকশিত হয় বা প্রকাশ পায়। যাহাতে চিত্ত স্নিগ্ধ হয় পরম কারুণিক সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণে আত্যন্তিকী মমতা জন্মে। রতির এই প্রগাঢ়তাকে প্রেম বলে। প্রেম যখন চিত্তকে দ্রবীভূত করে তখন তাহা স্নেহে পরিণত হয়। এই স্নেহে ক্ষণেকের বিচ্ছেদ ও সহনাতীত। এই অসহনীয়তা হইতে মানের উৎপত্তি।

মাধুরীকে নবীনতর আস্বাদন করিবার জন্য যখন অদাক্ষিণ্য ধারণ করে তখন তাহা হয় মান।

মান যদি বিশ্বাস করে যে প্রিয়জন এই অদাক্ষিণ্য মোচন করিবে এবং তাহাতে কোন রকম সন্দেহ থাকে না তখন তাহা হয় প্রণয়।

প্রণয় হইতে রাগ। মিলনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা যখন দুঃখকে সুখ বলিয়া অনুভূতি দেয়—তখন তাহা হয় "রাগ", রাগের আতিশয্য অনুরাগ।

প্রিয়জনকে যখন নিত্য নূতন বলিয়া মনে হইবে এবং প্রতি-দর্শনেই সেই প্রিয়জন অভূতপূর্ব্ব মনে হইবে, অন্তরের আকুলতা বৃদ্ধি পাইবে, তখনই ইহা অনুরাগ।

অনুরাগে যখন সমস্ত চিত্ত বিভোর, টইটুম্বুর তখনই তাহা ভাবের পরাকাষ্ঠা—মহাভাব (শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত)

১৪। খেচরী অবস্থা

মনঃ স্থিরং যত্র বিনাবলম্বনং
বায়ুঃ স্থিরঃ যত্র বিনাবরোধনং
দৃষ্টিঃ স্থিরাঃ যত্র বিনাবলোকনং
সা এব মুদ্রা কথিতা তু খেচরী।

সাধকের যখন এইরূপ খেচরী অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার ধৃতিঃ রাজসিক। গীঃ ১৮।৩৫

এই অবস্থায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মনের অস্তিত্ব থাকে না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক হইতে উনবিংশ (১৯) শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে শ্রীভগবান যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপ কর্ম্ম করিলেই ভক্ত ভগবানের প্রিয় হয়। প্রিয় হইতে হইলে মনকে স্থির করিতে হইবে। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন। প্রাণ স্থির হইলেই মন আত্মাতেই লয় হয়। তখন প্রাণ ও মনের দ্বন্দ্বভাব থাকে না। যেমন পৌষমাসের মধ্যরজনীতে কাহারও একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলে, তাহার মন পুত্র শোকে মুহ্যমান থাকায়, সেই প্রচণ্ডশীত অনুভব করতে পারে না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানীর মন আত্মাতেই স্থির থাকায়, তিনি শীত, উষ্ণ, বাদ, বিসম্বাদ প্রভৃতি বোধ করেন না। এই অবস্থা খেচরীভাব।

১৫। আকাশবৃত্তি

আমরা যাহাকে বলি "হাল্ ছেড়ে দিয়ে একেবারে বসিয়া থাকা" তাহারই অপর নাম আকাশবৃত্তি।

আকাশবৃত্তির সাধারণতঃ তিনটী ভাব।

১। আমি ভিক্ষা করিব না। কিন্তু কেহ কিছু নিজ হইতে দিলে নিরভিমানে লইব।

২। কাহারও নিকট কিছু চাহিব না।

৩। ঘৃনাক্ষরেও কোন অভাবের অথা কাহাকেও জানাইব না।

এই ত্রিবিধ মার্গ গ্রহণ করার নাম আকাশবৃত্তি।

ইহার অপর নাম "অযাচকবৃত্তি।"

১৬। কৈবল্য

কেবল নামে যে কর্ম্ম আছে তাহা করিলে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। কেবল কর্ম্ম ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে কেহই নিরাশীঃ, যতচিত্তাত্মা ও ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহ হইতে পারে না। এই প্রকার কেবল কর্ম্ম দ্বারা যে পদ লাভ হয় তাহাকেই কৈবল্য বলে।

গীতায় আছে, "শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং" ৪।২১

এই কেবল কর্ম্মকে শ্রীভগবান ১৮।৪৮ শ্লোকে সহজ কর্ম্ম বলিয়া বলিয়াছেন।

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।" (১৮।৪৮)

গ্রন্থযামলে উক্ত আছে—

সহিতঃ কেবলশ্চেতি কুম্ভকো দ্বিবিধো মতঃ।
রেচশ্চাপুর্য্য যঃ কার্য্যঃ স বৈ সহিত কুম্ভকঃ।
রেচকং পুরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্,
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্ত স "কেবল" ইতি স্মৃতঃ।

কুম্ভ, রেচক ও পুরক প্রভৃতি প্রাণায়াম প্রক্রিয়াকে ও কেহ কেহ কেবল বলে। শ্রীধর গোস্বামী "কৈবল্য" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"যথা প্রাণগতে দেহে সুখং দুঃখং ন বিন্দতি
তথা চ জীবিত দেহে স কৈবল্যং অশ্নাতি।"

১৭। সুকৌশলং

গীতায় উক্ত হইয়াছে "যোগঃ কর্ম্মঃ সুকৌশলম্। ২।৫০

অর্থাৎ "সুকৌশলং যৎ কর্ম্ম তদেব যোগঃ।" সুকৌশল কর্ম্মই যোগ। কর্ম্মের কৌশলটী জানিয়া কর্ম্ম কর। তবে একদিন না একদিন শোকশূন্য অবস্থা লাভ করিয়া আপনা আপনি পরমানন্দ ভাব পাইয়া শান্ত হইতে পারিবে।

নিঃশেষে শোকশান্তির জন্য যে কর্ম্মের কৌশল প্রয়োজন, সেই কর্ম্মের কৌশলটী হইতেছে "তুমি প্রসন্ন হও" এই ভাব মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করা। জপ, পূজা, সন্ধ্যা, ধ্যানাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও যেমন তোমার অবশ্য করনীয়, জগৎচক্র পরিচালনার অনুকুলে কর্ম্ম করা ও তোমার সেইরূপ অবশ্য করণীয়। এইভাবে কর্ম্ম করাটাই সুকৌশল কর্ম্ম।

১৮। মন্ত্র কি ?

মন্ত্রশক্তি বড় শক্তি।' এই সম্বন্ধে জপতত্ত্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। তাহা পঠিতব্য।

তবে বর্ত্তমান যুগে, এখনকারদিনে, শক্তিশালী মন্ত্র হইতেছে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে"।

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"।

আদি পুরুষ নারায়ণের নামই কলিকালের সর্ব্বদোষনিবারক, কলিকল্মষনাশক। কলির যাবদীয় পাপ মোচনের মহোষধি। "কলিকালে এই মন্ত্র ধরে মহাশক্তি"। কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য এক-কথায় বলিতে গেলে—

"এত পাপ মানবে নাহি করে"

"যত পাপ কৃষ্ণ নামে হরে"

কৃষ্ণই পতিত পাবন। তাঁহারই কৃপা ও প্রেম পাওয়ার জন্যই কৃষ্ণনাম।

কৃষ্ণনাম, সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে॥

১৯। সাধু কে?

যিনি তিতিক্ষু, দয়ালু, সর্ব্বদেহীর সুহৃদ, শান্ত ও অজাতশত্রু তিনিই সাধু। তিনি সদাচারভূষিত, সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত। তিনি অগ্রগণ্য হইয়া ভগবানের পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তণ করেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে "দেবাঃ স্বার্থাঃ, ন সাধবঃ" দেবতারাও স্বার্থাণ্বেষী, কিন্তু সাধুরা নহেন। কারণ সাধু ব্যক্তির ঈশ্বর ছাড়া অন্য চিন্তা নাই। সঙ্গমাঃ সজ্জনৈঃ সহ। সাধু সমাগমে, সাধু সঙ্গে হৃৎকর্ণে রসায়ণ কথা উঠে। সেই কথাতেই ভগবানে বা শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা হইতে রুচি উৎপন্ন হয়। রুচি হইতে ভক্তি উদ্ভূত হয়। ভক্তি জাগিলে ইন্দ্রিয়সুখসাধে বিরতি ঘটে। এবং এই প্রকার অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তির চরম পরিণাম, সর্ব্বভুতে ব্রহ্মদর্শন।

যিনি এইভাবে অহৈতুকী ভক্তিতে সর্ব্বভুতে সমদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন করেন, তিনিই সাধু।

শঙ্খ

এই শঙ্খ কি? পরমহংস শ্রীঅদ্বৈতানন্দজী বলেন শম্+খ= শঙ্খ। শম্ অর্থে মঙ্গল বা নিবৃত্তি এবং খ অর্থে আকাশ। নিবৃত্তি-মূলক চিদাকাশই জীবের মঙ্গলদায়ক। অসীম চিরন্তনের গোপন আনাগোনা মনকে যখন বাহিরে টানিয়া লইয়া যায়, স্থূলের বন্ধন আপনিই শিথিল হয়। ইহাই নিবৃত্তির আনন্দ। সকল জানার মাঝেই ইহা নিবৃত্তি পক্ষীয় চির অজানার শঙ্খধ্বনি।

২০। শিবলিঙ্গ ও শিবচতুর্দ্দশী

(প্রত্যেকেরই জ্ঞাতব্য)

যথা শিবময় বিষ্ণুঃ বিষ্ণুময়ঃ সদা শিবঃ।
যথা অন্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়সি॥

বিষ্ণু যে প্রকার শিবময়, শিব ও সেই প্রকার বিষ্ণুময়। জীবন আমার এমন হউক-যেন এই উভয়ের মধ্যে আমি ভেদদর্শন না করি।

অনেকে জানিয়া ও জানিতে চাহেন না, শিব কি, শিবলিঙ্গ কি, শিবচতুর্দ্দশী তিথির তাৎপর্য্য কি এবং কেনই বা ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে এই পূজা এবং পূজার পর "পারণাই" বা কেন করা হয়। তাই নানা অশিষ্ট ব্যাখ্যা করেন।

আমাদের পূর্ব্ববর্তী মহাপুরুষেরা আত্মকল্যাণে আত্মসাধনার জন্য শিবপূজার বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা না জানিয়া বা জানিবার চেষ্টা না করিয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই আধুনিক শিক্ষার অহমিকায় এই পূজার একটী বিকৃত বা কদর্থ করিতে প্রয়াসী হন। ইহাআমাদের অজ্ঞানতা প্রসূত ও অন্ধধারণা হইতে উদ্ভূত। ইহা নীতিবর্জ্জিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বস্তুতঃ কামস্থান বা কামচিহ্নকে উপাসনা করিবার শাস্ত্রে কোন বিধি নাই।

শিবপূজা বা লিঙ্গপূজা কি? লিঙ্গমূর্ত্তির নাম শিবই বা কেন? অভিধানে দেখি, শিব শব্দের অর্থ "মঙ্গলময়," "শুভ"। যাহা শুভ তাহাই শিব। শুভ বা মঙ্গলময়ের পূজা সকলেই চাহে বলিয়া সকলেই শুভপূজা বা শিবপূজার অধিকারী।

কামই যত অনর্থের মূল। কামই জীবকে বিষয়াভিমুখী ও খণ্ডখণ্ড করিয়া অখণ্ড একত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। সাধক মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য ভগবৎ সাধনায় নিযুক্ত হইলে কামই প্রধান শত্রুরূপে সাধনা নষ্ট করিবার প্রয়াস পায়। এই কামরূপী শূর্পনখা বা তাড়কা রাক্ষসী কত মুনি ঋষি বা সাধকের "রাম"কে বা "রামপ্রাপ্তিতে" বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। যিনি ইহাকে অতিক্রম করিতে

পারেন, তিনি শিব বা শিবতুল্য। শিবই কামভস্মকারী। পুরাণে একমাত্র শিবকেই কামভস্মকারীরূপে দৃষ্ট হয়।

এখন স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, কামভস্মকারী শিবই একমাত্র উপাস্য, না, কামের পরিণতিরূপক "মাতৃচক্র" বা "পিতৃচিহ্ন" উপাস্য। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি, মাতৃচক্র বা পিতৃচিহ্নের কথা দূরে থাকুক, কামসংশ্লিষ্ঠ কোনরূপ বস্তু যদি উপাস্য হইত, তাহা হইলে দেবাদিদেব মহাদেব কখনও দৃষ্টিপাতেই কামদেবকে ভস্ম বা বিলুপ্ত করিতেন না। গীতায় দেখিতে পাই

"জহি শত্রুং মহাবাহোকামরূপম্ দুরাসদম্ (৩।৪৩)

শুধু কামকে নয়, কামের রূপকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিবার আদেশ ভগবান দিয়াছেন।

শিবপূজা বলিতে সাধারণতঃ, মূর্ত্তি বিশেষের পূজা মনে করিয়া থাকি। আমরা প্রতিমা পূজা করি। প্রতিমার হাত, পা, চক্ষু ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু শিবলিঙ্গ হস্তপদাদিবিহীন। এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট মূর্ত্তি কেন শিব বা মঙ্গলের লিঙ্গ বা প্রতীক হইল?

আমরা সর্ব্বসাধারণ্যে দুই প্রকারের লিঙ্গ বা প্রতীক দেখিতে পাই। স্বয়ম্ভু বা পার্থিবলিঙ্গ ও বাণলিঙ্গ। পার্থিব লিঙ্গের পূজায় আবাহন ও বিসর্জ্জন আছে। কিন্তু বাণলিঙ্গের আবাহন ও নাই বিসর্জ্জন ও নাই।

দর্শন শাস্ত্রমতে এই জগৎ অষ্টতত্ত্ব দ্বারা গঠিত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহংকার, এই অষ্টতত্ত্ব। এই অষ্টতত্ত্বের প্রত্যেকতত্ত্বে শিব বা মঙ্গলশক্তি বর্ত্তমান। এই শিবশক্তি আত্মাতেই বিদ্যমান। আত্মার আর এক নাম শিব।

"সঃ ব্রহ্মঃ স শিবঃ স ইন্দ্র স অক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্ স এব বিষ্ণুঃ সঃ প্রাণঃ।" (উপনিষৎ)।

"শিবশক্তি মমাত্মানৌ পিণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডমেবচ"। (উপনিষৎ।)

অর্থাৎ "আত্মা হরি, আত্মা শিব, আত্মাই ঈশ্বর, আত্মা মোর

অচঞ্চল প্রাণ"। এই নিরাকার আত্মার একমাত্র চিহ্ন বা প্রকাশ হইতেছে "দেহ"। দেহের অভাবে আত্মার কোন চিহ্ন বা আকার নাই। এই কারণে দেহকে আত্মলিঙ্গ বলে। লিঙ্গ অর্থ চিহ্ন, বা প্রতীক বা প্রকাশ। আত্মলিঙ্গ অর্থে আত্মার আদিরূপ বা শিবলিঙ্গ।

পার্থিব তত্ত্বাদি সীমাবদ্ধ। সর্ব্ববিরাজমান নহে। তাই পার্থিবাদি তত্ত্বে শিবপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ব্বত্র বিরাজমান তদধিপতি শিবাত্মার আবাহন করিয়া তথায় আনিতে হয়।

"বাণ" অর্থে পঞ্চ। বানেশ্বর অর্থে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের ঈশ্বর বা অধিপতি। পঞ্চমহাভূত বা তত্ত্ব ছাড়িয়া আত্মা স্বকীয় অবস্থা বা চৈতন্য অবস্থায় বিরাজিত থাকেন। জীব পঞ্চতত্ত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশিতে মিশিতে বদ্ধ হইয়া চৈতন্যহারা হইয়াছে। পঞ্চমহাভূত হইতে পৃথক হইয়া জীবের এই বন্ধন খুলিয়া গেলে বাণেশ্বর বা চৈতন্য অবস্থা প্রাপ্তি হয়। আত্মা তদবস্থায় জীবদেহের যে অংশে বা অবলম্বনে বা আশ্রয়ে প্রকাশ হয় তাহার নাম বাণলিঙ্গ। তাই আমাদের এই দেহই প্রকৃত সাধনার ক্ষেত্র। ভগবৎতত্ত্ব এই দেহের মধ্যেই লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে

"দেহো দেবালয় প্রোক্তঃ জীবঃশিবঃ সদা এব।"

অর্থাৎ দেহই দেবমন্দির। সেখানে শিব বা মঙ্গলময়ের পূজা করিতে হয়। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "Ye are the temple of God and the sprit of God dwelleth in you." অর্থাৎ তোমাদের দেহেই ভগবানের মন্দির। ভগবৎ আত্মা তোমাদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন।" মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থ কোরাণের হদিসে আছে "মন্ আরাফা নক্সাহু, ফাকৎ "আরাফা রব্বাহু"। অর্থাৎ যিনি এই দেহস্থিত নিজকে জানিয়াছেন, তিনি "খোদার খবর পাইয়াছেন।" ভক্ত কবীর বলিয়াছেন,

"হে সাধু ভাই! দুনিয়ার মালিক এই দেহঘটেই আছেন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় আছে :—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে
"এতদ্‌যো বেত্তি স্বং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। ১৩।২
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম।" ১৩।৩

অর্থাৎ এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলা হয়। সর্ব্বক্ষেত্রে আমি ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে বিরাজমান। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যিনি জানেন, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং ইহা মোক্ষের হেতু। যোগসঙ্গীতে আছে, "যত্র যত্র জীব তত্র তত্র শিব, দূরে নহে, আছে আপন ঘটে।"

ইহাতে বুঝা যায়, দেহ দেবালয় এবং দেহাধিষ্ঠিত আত্মপুরুষ শিব। দেহই শিবোপাসনার ক্ষেত্র।

ভগবানকে পাইতে হইলে এই দেহের মধ্যে সন্ধান করুন। এই শিবাত্মা সর্ব্বজীবের মধ্যে আছেন। জীবকে ছাড়িয়া তিনি বাহিরে অবস্থান করেন না।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন "ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে দর্শন করিবারও কোন পথ নিশ্চয় আছে। গুরু পাইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি তাহা পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে দেখিলাম, সেই পথ নিজ শরীরের মধ্যেই রহিয়াছে। আমি তাহা উপলব্ধি করিতেছি"। ইহাতেও বুঝা যায় নিজদেহ বিরাট সাধনক্ষেত্র।

শিবলিঙ্গ কি? অনেকে বিপরীত মনোবৃত্তি লইয়া ইহার কুরুচিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। দেহরূপ শিবক্ষেত্রে এই কুরুচিপূর্ণ কামভাবের সমাবেশ কোথায়? এই বিকৃত উক্তি অজ্ঞতা হেতু। "কামী বুঝে কামতত্ত্ব নিষ্কামী নিষ্কাম। নিষ্কামী হইলে তবে কাম হয় বাম!"

কামীলোক কামবিকারে যাবতীয় বিষয়ে কামতত্ত্ব আবিষ্কার করে। তাই লিঙ্গ বলিতে কেহ মনে করেন শিব, আবার কাহারও মনে জাগিয়া উঠে "উপস্থ।"

অচঞ্চল প্রাণ"। এই নিরাকার আত্মার একমাত্র চিহ্ন বা প্রকাশ হইতেছে "দেহ"। দেহের অভাবে আত্মার কোন চিহ্ন বা আকার নাই। এই কারণে দেহকে আত্মলিঙ্গ বলে। লিঙ্গ অর্থ চিহ্ন, বা প্রতীক বা প্রকাশ। আত্মলিঙ্গ অর্থে আত্মার আদিরূপ বা শিবলিঙ্গ।

পার্থিব তত্ত্বাদি সীমাবদ্ধ। সর্ব্ববিরাজমান নহে। তাই পার্থিবাদি তত্ত্বে শিবপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ব্বত্র বিরাজমান তদধিপতি শিবাত্মার আবাহন করিয়া তথায় আনিতে হয়।

"বাণ" অর্থে পঞ্চ। বানেশ্বর অর্থে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের ঈশ্বর বা অধিপতি। পঞ্চমহাভূত বা তত্ত্ব ছাড়িয়া আত্মা স্বকীয় অবস্থা বা চৈতন্য অবস্থায় বিরাজিত থাকেন। জীব পঞ্চতত্ত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশিতে মিশিতে বদ্ধ হইয়া চৈতন্যহারা হইয়াছে। পঞ্চমহাভূত হইতে পৃথক হইয়া জীবের এই বন্ধন খুলিয়া গেলে বাণেশ্বর বা চৈতন্য অবস্থা প্রাপ্তি হয়। আত্মা তদবস্থায় জীবদেহের যে অংশে বা অবলম্বনে বা আশ্রয়ে প্রকাশ হয় তাহার নাম বাণলিঙ্গ। তাই আমাদের এই দেহই প্রকৃত সাধনার ক্ষেত্র। ভগবৎতত্ত্ব এই দেহের মধ্যেই লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে

"দেহো দেবালয় প্রোক্তঃ জীবঃশিবঃ সদা এব।"

অর্থাৎ দেহই দেবমন্দির। সেখানে শিব বা মঙ্গলময়ের পূজা করিতে হয়। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "Ye are the temple of God and the sprit of God dwelleth in you." অর্থাৎ তোমাদের দেহেই ভগবানের মন্দির। ভগবৎ আত্মা তোমাদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন।" মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থ কোরাণের হদিসে আছে "মন্ আরাফা নক্সাহু, ফাকৎ "আরাফা রব্বাহু"। অর্থাৎ যিনি এই দেহস্থিত নিজকে জানিয়াছেন, তিনি "খোদার খবর পাইয়াছেন।" ভক্ত কবীর বলিয়াছেন,

"হে সাধু ভাই! দুনিয়ার মালিক এই দেহঘটেই আছেন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় আছে :—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে
"এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। ১৩।২
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম।" ১৩।৩

অর্থাৎ এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলা হয়। সর্ব্বক্ষেত্রে আমি ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে বিরাজমান। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যিনি জানেন, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং ইহা মোক্ষের হেতু। যোগসঙ্গীতে আছে, "যত্র যত্র জীব তত্র তত্র শিব, দূরে নহে, আছে আপন ঘটে।"

ইহাতে বুঝা যায়, দেহ দেবালয় এবং দেহাধিষ্ঠিত আত্মপুরুষ শিব। দেহই শিবোপাসনার ক্ষেত্র।

ভগবানকে পাইতে হইলে এই দেহের মধ্যে সন্ধান করুন। এই শিবাত্মা সর্ব্বজীবের মধ্যে আছেন। জীবকে ছাড়িয়া তিনি বাহিরে অবস্থান করেন না।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন "ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে দর্শন করিবারও কোন পথ নিশ্চয় আছে। গুরু পাইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি তাহা পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে দেখিলাম, সেই পথ নিজ শরীরের মধ্যেই রহিয়াছে। আমি তাহা উপলব্ধি করিতেছি"। ইহাতেও বুঝা যায় নিজদেহ বিরাট সাধনক্ষেত্র।

শিবলিঙ্গ কি? অনেকে বিপরীত মনোবৃত্তি লইয়া ইহার কুরুচিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেন। দেহরূপ শিবক্ষেত্রে এই কুরুচিপূর্ণ কামভাবের সমাবেশ কোথায়? এই বিকৃত উক্তি অজ্ঞতা হেতু। "কামী বুঝে কামতত্ত্ব নিষ্কামী নিষ্কাম। নিস্কামী হইলে তবে কাম হয় বাম।"

কামীলোক কামবিকারে যাবতীয় বিষয়ে কামতত্ত্ব আবিষ্কার করে। তাই লিঙ্গ বলিতে কেহ মনে করেন শিব, আবার কাহারও মনে জাগিয়া উঠে "উপস্থ।"

ইহা ঠিক যে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই দেহ সাধনার ক্ষেত্র। ইহাই শিবমন্দির। জীবই যদি শিব হয় তাহা হইলে শাস্ত্রমতে এই দেহই শিবদেহ। শিবলিঙ্গের অপর একনাম আদিলিঙ্গ বা আদিনাথ। শিবলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, আদিলিঙ্গ বা আদিনাথ মূর্ত্তিতে হস্তপদাদি নাই। শিবদেহেও হস্তপদাদি বহিরিন্দ্রিয় নাই।

মাতৃগর্ভে জীবের প্রথম উৎপত্তির সময় বা প্রারম্ভে এই হস্তপদ-বিহীন শিবাকৃতিরই উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহা জীবসৃষ্টির প্রথম রূপ বা আদিরূপ।

স্কন্ধ-গ্রীবা-শিরঃ পৃষ্টোদরানি চ মহামতে
পঞ্চধা অঙ্গানি জায়ন্তে এবং মাসেন চক্রমাৎ।

প্রথম মাসেই জীব স্কন্ধ, গ্রীবা, শির, পৃষ্ঠ ও উদর এই পঞ্চ স্থান লইয়াই গঠিত হয়। ইহা জীবদেহের মূল অবস্থা বা আদিরূপ। এই রূপই শিবরূপ। ইহা ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত বলিয়া শিবদেহ। হস্ত-পদাদি ছাড়া মানুষের জীবনধারণও সম্ভব হয়। হাত কিম্বা পা সাধনার কোন ক্ষেত্র বা স্থান নহে। ইহা জীবের বহির্ম্মুখীন ক্রিয়ার জন্য বিদ্যমান। এই দেহ বৃক্ষের মত। শাস্ত্রে আছে "উর্দ্ধমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং।" অর্থাৎ এই দেহ উর্দ্ধমূল অধঃশাখ বৃক্ষরূপ। হস্ত এবং পদ ইহার শাখা। হস্তপদরূপ শাখা বিহীন কলেবরই মূলবৃক্ষ। শিবোপাসকগণ ইহাকে বিল্ববৃক্ষ বলে। বৈষ্ণবগণ কদম্ব ও তমাল নামে অভিহিত করে। গীতায় ইহাকে অশ্বত্থবৃক্ষ নামে আখ্যাত হইয়াছে। শিবোপাখ্যানে আছে পুণ্যা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই বিল্ববৃক্ষের আশ্রয় লাভ করিয়া মহাপাতকী ব্যাধও বিল্ববৃক্ষমূলস্থিত শিবকৃপা লাভ করিয়াছিল।

উর্দ্ধমূল বৃক্ষবিধায় দেহবৃক্ষের মূল হইতেছে মস্তক। এই দেহরূপ বিল্ববৃক্ষের মূলে বা মস্তকে শিব অধিষ্ঠিত আছেন। এই উর্দ্ধমূল বৃক্ষের গোড়ায় স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ গুরুরূপে অবস্থান করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জীবজন্মের প্রথম মাসেই স্কন্ধ, উদর, পৃষ্ঠ, গ্রীবা ও শির এই পাঁচটি উৎপত্তি হয়; ইহাই শরীরের পঞ্চাঙ্গ। এবং এই পাঁচটি অঙ্গই পঞ্চাঙ্গ বৃষোৎসর্গ ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য। জীবের এই পাঁচটি অঙ্গই পঞ্চাঙ্গ বৃষরূপে শিবাত্মার আদিবাহন হইয়া রহিয়াছে। শিবত্ব প্রাপ্তি বা মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই পঞ্চাঙ্গ বৃষোৎসর্গ করিতে হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির এই স্কন্দোদর-শির-পৃষ্ঠ-গ্রীবা সমন্বিত পঞ্চাঙ্গ বা আদিরূপ উৎসর্গ করিলে জীবাত্মা নিরাকার চিদানন্দরূপে লয় হয়। ইহার পর রূপবিবর্জিত অবস্থা। আদিরূপ উৎসর্গ হইলে রূপ থাকে না। উক্ত অবস্থায় শিবত্বপ্রাপ্তি বা মুক্তি।

হাত পা ছাড়া জীবের অধিষ্ঠান সম্ভব হয়। সাধনার পক্ষে অনাবশ্যক এই দুইটা হাত ও পা বাদ দিলে আর কি থাকে? কেবল গুহ্যদেশ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত শরীর ও মস্তক। এই গুহ্যদেশ হইতে কণ্ঠ ও মস্তক পর্য্যন্ত হস্তপদবিহীন শরীরকে যদি সাধনার বা উপাসনার মন্দিরের মত উপবিষ্ট করাইয়া রাখা হয়, এই হস্ত পদবিহীন মূর্ত্তিটা শিবমূর্ত্তির মত দৃষ্ট হইবে। বস্তুতঃ ইহাই শিবমূর্ত্তি ও শিবস্থান। ইহাই প্রকৃত শিবলিঙ্গ বা শিবচিহ্ন বা শিবপ্রতীক। এই শিবলিঙ্গেই প্রকৃত শিব অধিষ্ঠিত আছেন। জীবের এই অবস্থাই শিবাবস্থা এবং ইহা বুঝিলে শিবলিঙ্গের কদর্থ দূরে পালায়।

"গুরু বলে হীরানাথ, দেহে পূজ শিবনাথ, চেতনে চেতন পূজা করে"
"হাতেতে থাকিতে ধন, ভিক্ষু হলে কি কারণ, যাঁরে খোঁজ সে ত
আছে ঘরে।"

'মূলাধার' হইতে 'সহস্রার' পর্য্যন্ত এই দেহই প্রকৃত বিশ্বনাথ শিবের পূজাস্থান। আপনি চক্ষু বুজিয়া উপলব্ধি করুন যে, আপনার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, পায়ু, উপস্থ কিছুই নাই। তখন মনঃদৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন, বাকী যাহা আছে, তাহা শিবমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই হস্তপদাদি বহিরিন্দ্রিয়-

বিহীন দেহ বা শরীরকে শিবলিঙ্গ বলা হয়। ইহাই ইন্দ্রিয়বিরতি-লব্ধ জীবের বাহিরের প্রাথমিক স্থূল লিঙ্গদেহ। ইহার অভ্যন্তরে আরও সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ আছে। সাধক এই স্থূল লিঙ্গদেহের উপর সংযম ও সাধন করিতে করিতে এতদভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহে আশ্রয়লাভ করেন। ক্রমশঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম মনোময় কোষ অতিক্রম করিয়া চিণ্ময় লিঙ্গ শরীর প্রাপ্ত হইয়া সাধক আনন্দে আত্মহারা হন এবং "চিদানন্দরূপো শিবোঽহং শিবোঽহং" বলিতে থাকেন।

বাণের আকৃতি ডিম্ববৎ। কণ্ঠোপরি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থান ও ঈষৎ ডিম্বাকৃতি। বাণ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচের উপর স্থিত। তাই ইহার নাম বাণেশ্বর। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র আছে অথচ নির্লিপ্ত, আকাশোপরিস্থিত বাণও নির্ব্বিকার। শিবপূজা যাঁহারা করেন, তাঁহারা জানেন পার্থিব শিবপূজায় আবাহন বিসর্জ্জন আছে; কিন্তু বাণলিঙ্গ সর্ব্বব্যাপীরূপে বিরাজমান বলিয়া, তাঁহার আবাহনও নাই বিসর্জ্জনও নাই। তিনি অশুভ-বিধানকারী নহেন। তাঁহার নাম শিব। তিনিই শুভ ও মঙ্গলের জনক।

শিবলিঙ্গ বলিতে যে হস্তপদাদি বহিরিন্দ্রিয়বিহীন জীবদেহ-রূপকে বুঝায়, তাহা আরও এক কারণে জানা যায়। পূজাদির প্রচলিত ব্যবস্থা হইতে দৃষ্ট হয়, সমস্ত প্রতিমাদির পূজা ঘটে সমাপন হইতে পারে ও হয়। যেখানে প্রতিমা তৈয়ার ও গঠন সম্ভবপর হয় না, সেখানে ঘটস্থাপনে উক্ত পূজাদি নির্ব্বাহ করা হয়। কিন্তু বাণলিঙ্গ বা স্বয়ম্ভুলিঙ্গের পরিবর্ত্তে কোন ঘট প্রতিষ্ঠা বা ঘটে শিবপূজা দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? ঘট জিনিষটা কি জানিতে পারলে, ইহার উত্তর পাওয়া যায়। ঘট বলিতে দেহ-ঘটকে বুঝায়। উহা দেহের রূপক। দেহেই সর্ব্বদেবতাদির অধিষ্ঠান আছে। আত্মার অধিষ্ঠান, আত্মার পরিচয় বা প্রকাশ দেহ বা

দেহে ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না। শাস্ত্রে ও আছে

"দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ
দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে"।

"ঘট ঘট বিরাজে রাম"। তাই ঘট বলিতে মূলতঃ দেহ ঘটকে বুঝায়। তন্ত্রে উক্ত আছে—

ঘটজ্ঞানং বিনা দেবি নৈব কিঞ্চিৎ প্রসিধ্যতি,
তজ্জজ্ঞানং সমভ্যস্য যোগাদিকং সমাচরেৎ॥

ঘটজ্ঞান ব্যতীত সাধনে সিদ্ধিলাভ হয় না। কবীর সাহেব বলেন, এই দেহঘটের ভিতরেই সপ্তসমুদ্র কাশী দ্বারকা ইত্যাদি সব বিরাজমান। দেহ পঞ্চভূত-নির্ম্মিত বলিয়া দেহের রূপক বাহিরের মৃত্তিকাঘটকে ও অনুরূপ পঞ্চভূতসমন্বিত করা হয়। ঘট মৃত্তিকা নির্ম্মিত। তাই তাহাতে "ক্ষিতি" আছে। তাহাতে "অপ্" (জল) দেওয়া হয়। তাপ বা তেজ সহজাত বস্তু। তাই ঘটের ও তাপ বা তেজ আছে। ঘটের মধ্যে মরুৎ (বাতাস) রহিয়াছে। ঘটে আকাশ (ব্যোম) ও বিদ্যমান। তাই পঞ্চভূতাত্মক দেহের মত ঘটকে ও পঞ্চভূত সমন্বিত করা হয়। দেহ বৃক্ষাকার কলেবর। দেহের ভিতরে উর্দ্ধমূল অধঃশাখ সৃষ্টিবৃক্ষ বিদ্যমান। ঘট দেহের অনুরূপ বলিয়া, মৃত্তিকার ঘটে ও সৃষ্টিবৃক্ষের অনুযায়ী বৃক্ষ-পল্লবাদি দেওয়া হয়। দেহ ঘটের উর্দ্ধে মস্তক। তাই মৃন্ময় ঘটের উপরও ডিম্বাকৃতি মস্তকের মত নারিকেল দেওয়া হয়। এই সমস্ত হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় মৃত্তিকাঘট দেহঘটের প্রতীক। দেহঘটে সর্ব্বদেবদেবী আছেন বলিয়া মৃত্তিকার ঘটে ও সর্ব্বদেবদেবীর পূজা হয়। কিন্তু বাহিরের গঠিত শিব দেহঘটের প্রতীক বলিয়া তজ্জন্য মৃন্ময় ঘট দরকার হয় না। অর্থাৎ ঘটের পরিবর্ত্তে ঘটের পূজা হয় না। ব্যবস্থাও নাই। শিব অপানিপাদ, ইন্দ্রিয় বিহীন। তিনিই পুরাতন, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই হিরণ্ময় শিবরূপ। শিবলিঙ্গ

কাম মৈথুনের প্রতীক নহে। তাহার বহু উচ্চে। কামগন্ধের লেশ মাত্র ও ইহাতে নাই।

ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে এই শিব পূজা করিতে হয়। বাহিরের পূজা হয় বনফুলে। কিন্তু বনফুলের দ্বারা এই আত্মলিঙ্গের পূজা হয় না। তজ্জন্য প্রয়োজন "মনফুল"। মনফুল কোথায়? এই আত্মলিঙ্গের পূজার জন্য মনফুল অন্তরেই ফোটে। গুরূপদিষ্ট ক্রিয়ার দ্বারা মন যখন অন্তর্ম্মুখীন হয় তখন তাহা কমলের মত উপর দিকে ফুটিয়া উঠে। হংস যেমন শাবক ফুটাইয়া তোলে, তেমনই মনফুল ঊর্দ্ধমুখী ফুটাইতে হয়। যখন এই মনফুল ফুটাইতে পারেন তখনই তপস্যার সিদ্ধি। তাই প্রকৃত পূজার জন্য এই মনফুল প্রয়োজন।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই শিব পূজা করিতে হয়। তিথি বলিতে "কলা" বুঝায়। চন্দ্রের বিভিন্ন কলাই বিভিন্ন তিথি। চন্দ্র যখন ত্রয়োদশ কলা ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে আসেন, তখন শিবপূজা করিতে হয়। প্রকৃত আত্মপূজা মনের দ্বারা হয়। পূজায় মন না থাকিলে পূজা নিষ্ফল হয়। সাধনায় মন না থাকিলে সাধনা ও বিফল হয়। তাই পূজায় মন বসাইতে হইলে মানব "গতকলা" হইতে হইবে। জীবাত্মার মূলাধার হইতে কুটস্থ বা ভ্রূউর্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থান ষট্চক্রে বা ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগেই তিনকলা বা তিন তিথি অবস্থিত। বাণলিঙ্গ বিশুদ্ধ্যাখ্যের উপর ভ্রূ মধ্যে স্থিত। মূলাধার হইতে ভ্রূ নিম্ন অর্থাৎ বানের নিম্ন পর্য্যন্ত স্থান চতুর্দ্দশ কলা বা চতুর্দ্দশ তিথিতে বিভক্ত। মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠান বা লিঙ্গ মূল পর্য্যন্ত স্থান তিন কলা বা তিন তিথি। স্বাধিষ্ঠান হইতে নাভিদেশ বা মণিপুর পর্য্যন্ত তিনকলা বা তিন তিথি! হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত তিন তিথি। কণ্ঠ হইতে কুটস্থ পর্য্যন্ত তিন তিথি। এই রূপে মনের পঞ্চদশ কলা বা তিথি হয়। মনের আদি মূল পূর্ণকলা সহ ষোড়শ কলা হয়। কণ্ঠোর্দ্ধে ত্রয়োদশী

তিথি। ইহাই সংযম স্থান। তাই ত্রয়োদশী তিথিতে সংযম করিতে হয়। অর্থাৎ সংযত হইতে হয়। কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি প্রাপ্ত হইয়া মনের এক এক কলা করিয়া তের কলা গত বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ত্রয়োদশী তিথিতে মন উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ইহাই মনের নিরাহার বা উপবাসী অবস্থা। উপবাসের সাধারণ অর্থ আহারবর্জ্জন। মনের ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি না থাকিলে খাদ্য গ্রহণের ও ইচ্ছা থাকে না। ইহাই প্রকৃত উপবাস। উপনিষদে উক্ত আছে-

"উপসমীপে বাসো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ,
"উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু কায়স্য শোষণম্"।

অর্থাৎ উপবাস অর্থে শরীর শোষণ নহে। পরমাত্মার সমীপে বাসই উপবাস। মন ইন্দ্রিয়াদি ত্রয়োদশ কলা ত্যাগ করিয়া উপরে আজ্ঞাচক্রের নিকটবর্ত্তী কুটস্থ সমীপে বাস করিতেছে বলিয়া ইহার নাম উপবাস।

ত্রয়োদশী তিথির পর মনের দুই কলা অবশিষ্ট থাকে, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা। এই কলায় শিবের পূজা ও সিদ্ধি। চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের পূজা করিয়া মন নিজকে শেষ অঞ্জলি দিয়া বাণদেবের নিকট সমর্পণ করে। তৎপর কলার শেষে চতুর্দ্দশী অমাবস্যার "পারণার" অধিকারী বা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। ইহাই মনের "ভাববন্ধন মোচন অবস্থা"। "পারণা" অর্থে মন চতুর্দ্দশী কলা বা তিথির "পারে" গিয়াছে। চিদানন্দ অবস্থা হইয়া শিবত্বে লয় হইয়াছে। উত্তীর্ণ বা পার হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে বলিয়া, এই সময়ের নাম "পারণা"। তৎপর মনোময় কোষের স্পন্দন স্থির হইলে জীব স্থিরচিত্ত হয়। যথা—

"চঞ্চচ্চিত্তে বসেচ্ছক্তিঃ, স্থিরচিত্তে বসেচ্ছিবঃ,
"স্থিরচিত্তে ভবেদ্দেবি, স দেহস্থোঽপি সিধ্যতি"।
ওঁ শিবঃ। ওঁ শিবঃ।! ওঁ শিবঃ।!!

২১। কীর্ত্তন কি?

একক বসিয়া সম্যক যে কীর্ত্তন—তাহাই সংকীর্ত্তন, 'স্পষ্টস্বরে নামের যথার্থ উচ্চারনই সম্যক কীর্ত্তন। তাই সজনেই হউক বা নির্জ্জনেই হউক, দলবদ্ধ হইয়া হউক বা একাকীই হউক, যখনই নাম করিতে ইচ্ছা করিবে, শব্দ করিয়া করিবে। এই শব্দের মাধ্যমে অভিনিবেশ গাঢ় হইবে। চিত্তবিক্ষেপের যাবদীয় সম্ভাবনা দূরে পলাইবে। বাগেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ সংযত হইবে।

যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সরবে বলেন, "হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ" আর বলেন "গোপাল গোবিন্দ শ্রীমধুসুদন।"

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে কৃষ্ণকৃপাছাড়া কিছুই হইতে পারেনা। দৈন্যহীন জীবন ও কষ্টহীন মৃত্যু, তাহাও একমাত্র কৃষ্ণকৃপায় সম্ভব। যদি কৃষ্ণ আজ্ঞা, কৃষ্ণইচ্ছা না থাকে, ধনে পুত্রেই বা কি হবে? অযথা চিন্তা না করিয়া সেই সর্ব্বচিন্তাহরণ কৃষ্ণকে ডাকো, তাঁহার নাম সরবে বা নীরবে কীর্ত্তন কর, তিনি নিশ্চয় দূর করিবেন যাবদীয় ভাবনা ও চিন্তা এবং আনিয়া দিবেন, পরম শান্তি।

এই ভাবেই যিনি কীর্ত্তন করেন তিনিই সাধু এবং তিনিই সংকীর্ত্তনের অধিকারী।

প্রণব

প্রণবের অর্থ কি? অদ্বৈতানন্দ পরমহংসজী বলেন, প্র (প্রকৃষ্টেন) নূয়তে বা স্তুয়তে অনেন ইতি প্রণবঃ। অর্থাৎ ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের স্তব করা যায়। এই কারণে ইহাকে প্রণব বলা হয়। ইহা ওঁকারের অপর নাম। এই নাম শাস্ত্রসম্মত ও যথার্থ। স্বামীজী বলেন, আমাদের অন্তরে যে ধ্বনি নিরন্তর অনাহত ভাবে উত্থিত হইতেছে ঋষিরা তাহাকে বলিয়াছেন নাদব্রহ্ম ওঁ। এই ওঁ নিত্য নব নব আকারে দৃশ্যমান অনন্ত বিশ্বে রূপায়িত হইতেছে। তাই চেতনাময়

প্রতি বস্তুর অন্তরে রহিয়াছে এক ধ্বনিময় ওঁ প্রকাশক চিদাকাশ, আর বাহিরে রহিয়াছে বহু ধ্বনিময় ব্যোম, এই মহাকাশ। "ব্যোম" ওঁ এরই বিশিষ্টরূপ অর্থাৎ বহুবিধ শরীর রচনার ক্ষেত্র। কৃমিকীট হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবদেহ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনন্ত আকার অনন্তগুণে প্রকৃষ্টভাবে আকারিত হয়। এই জন্যই ওঁকারের অপর নাম প্রণব।

২২। ত্যাগ ও শান্তি।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে আমরা পাই

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।" ১৮।২

কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করাকে সন্ন্যাস এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম করাকে 'ত্যাগ' কহে। এই শেষোক্তরূপ ত্যাগের অবস্থা তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে "নৈষ্কর্ম্ম্য" উক্ত হইয়াছে। ইচ্ছারহিত অর্থাৎ নিষ্কাম না হইলে "নৈষ্কর্ম্ম্য" হইতে পারে না। বাসনা সত্ত্বে কেবল হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কার্য্য না করিলে ও ত্যাগ হয়না। "এই কর্ম্মটী করিব" বা "এই কর্ম্মটী করিবনা" এই দুয়েই ইচ্ছা আছে। একটিতে করনেচ্ছা, অপরটীতে অকরণেচ্ছা। যিনি ইহাকে ত্যাগ বলেন তাঁহাকে "মিথ্যাচার" বলিয়া বলা হয়।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্,
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৩।৬

সংগুরুর উপদেশে নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ "ইচ্ছারহিত" অবস্থা হয়, সেই অবস্থাতেই একমাত্র সকল কর্ম্মের ফলভোগ হইতে পারে। ইহাই প্রকৃত ত্যাগ। তদ্ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ত্যাগ হইতে পারেনা। সুতরাং এই অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থায় শান্তি ও নাই।

"ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ ত্যাগাৎ শান্তিঃ অনন্তরং" ১২।১২

অর্থাৎ প্রকৃত ত্যাগের পরই শান্তি।

এই নিমিত্ত সংসারে কাহারও শান্তি দেখিতে পাওয়া যায়না। যিনি যতবড় বিদ্বান বা ধনবান হউন না কেন, শান্তিসুখে সকলেই বঞ্চিত। ইচ্ছার দাসত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে না পারিলে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেও শান্তি পাওয়া যায় না। এবং যে জীবনে প্রকৃত ত্যাগ ও শান্তি নাই, সে জীবনই বৃথা।

সাংখ্যেরা কর্ম্মত্যাগ করিতে এবং মীমাংসকেরা কর্ম্ম করিতে বলেন। এই স্থলে আমরা কাহাদের কথা শুনিব? যোগীরাই ইহার যথার্থ মীমাংসা করিতে সমর্থ। কারণ ইহার একমাত্র মীমাংসা নিজবোধ রূপ। তাঁহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া থাকেন। সেই তাৎপর্য্য এই যে সাংখ্যেরা অর্থাৎ জ্ঞানীরা কর্ম্মের আসক্তিই সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য বলিয়া থাকেন। সকাম কর্ম্মই দোষযুক্ত। তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিতে বলেন না। তাঁহারা সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া সকল কর্ম্ম করিতে বলেন। তাহা হইলে ইহাই ত্যাগ বলিয়া গণ্য হইবে। এবং এই প্রকার কর্ম্মে, ত্যাগের পর শান্তি লাভ করিবে।

২৩। জপতত্ত্ব।

জপ যোগের একটী প্রধান অঙ্গ। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন

"যজ্ঞানাম্ জপযজ্ঞোঽস্মি" (১০।২৫)

যজ্ঞের মধ্যে জপ-যজ্ঞই প্রধান। কলিতে জপের দ্বারা শান্তি, আনন্দ, অমৃতত্ব লাভ হয়। জপের দ্বারা সমাধি প্রাপ্তি হয়।

জপকে অভ্যাসের দ্বারা স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হয়। এবং ইহা সর্ব্বদা প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত করিতে হইবে। তাহা হইলে ইষ্টদর্শন সম্ভব হইবে।

নাম ও নামী অভেদ। যখনই আমি আমার ছেলের নাম করি, তখনই তাহার রূপ, অবয়ব বা "চেহারা" আমার সম্মুখে ফুটিয়া

উঠে। যখনই আপনি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম বা শ্রীদুর্গা নাম জপ করেন, তখনই তাঁহার মূর্ত্তি আপনার সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। ইহা হইতে বুঝিবেন, জপ ও ধ্যান এই দুইই এক সঙ্গে হয়। এই দুই অবস্থা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন।

এই কলিযুগে সাধারণ মানুষ মাত্রেরই শরীর দুর্ব্বল। সাধারণতঃ বর্ত্তমান যুগে মানব মনের কঠোর সাধনা করিতে অক্ষম। এই অবস্থায় রূপই ঈশ্বরানুলব্ধির সহজ উপায়। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বাল্মীকি, তুকারাম, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়াই মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন।

যখন কোন জপ করিবেন, তখন আত্মস্থির হইয়া ভাবিবেন "আমার ইষ্টদেবতা, আমার সম্মুখে উপস্থিত। আমি যেন এই নাম তাঁহাকে শুনাইতেছি। আর তিনি যেন উৎকর্ণ হইয়া আমার এই নাম শুনিতেছেন। তিনি যেন আমার দিকে তাঁহার দিব্যকান্তি, সুন্দর আনন, বরাভয় হস্ত ও করুণাভরা আঁখি লইয়া চাহিয়া আছেন। তাঁহার সুঠাম উত্তোলিত হস্ত দ্বারা আমাকে বরাভয় দান করিতেছেন।" জপের সময় সর্ব্বদা মনে মনে এই ভাব জাগাইয়া রাখিবেন। তাহা হইলে আপনি অত্যন্ত শান্তি পাইবেন, সন্দেহ নাই।

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥" (৫।২৯)

জপ আন্তরিকতার সহিত করিবেন। মন্ত্রের অর্থটী জানিয়া লইবেন। সর্ব্বত্র তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিবেন। যতই মন্ত্র জপ করিবেন ততই তাঁহার (ভগবানের) সান্নিধ্যে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবেন। সর্ব্বদা মনে রাখিবেন তিনি যে আপনার হৃদয়ের মধ্যে, মধ্যস্থলে সমুদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যেমন আপনার জপ করা দেখিতেছেন, তেমনি তিনি আপনার অন্তরের অন্তঃস্থল ও লক্ষ্য করিতেছেন।

জপ সাধনা করিতে গেলে পূর্ণ বিশ্বাস, পরিপূর্ণ ভক্তি ও গভীর আন্তরিকতা প্রয়োজন। তাঁর নাম স্মরণই তাঁর সেবা। ভগবান যদি আজ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হন, তবে আপনি তাঁকে যেমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবেন তাঁর নাম জপের সময় ও সর্ব্বদা সেইভাব জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

মন্ত্রের অর্থ না জানিয়া ও জপ করিলে ইষ্ট দর্শন হইতে পারে। বাল্মীকী "মরা, মরা" জপ করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের নামে বা মন্ত্রে একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে। তাই মনঃ-সংযোগ পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে মন্ত্র জপ করিলে অতি শীঘ্রই ঈশ্বরানুভূতি হয়। নিয়ত মন্ত্র জপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি তিরোহিত হয়।

দর্পণ পরিষ্কৃত হইলেই তাহাতে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, মন ও তদ্রূপ নির্ম্মল হইলে তাহাতে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সত্য প্রতিভাসিত হয়। সাবানে যেমন বস্ত্রের ময়লা বিদূরিত করে, মন্ত্রও তেমনি আমাদের মনের ময়লা বিদূরিত করে। তাই জপ নিত্য নিয়মিত ভাবে করা একান্ত প্রয়োজন।

শব্দই ব্রহ্ম। প্রত্যেক শব্দই একটী বিশেষ রূপ ফুটাইয়া তোলে। পুনঃ পুনঃ ভগবানের কোন বিশেষ নাম উচ্চারণে তাঁর একটি বিশেষ মূর্ত্তি মনের মধ্যে জাগাইয়া তোলে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া মন স্থির করিলে সেই দিব্যমূর্ত্তি হইতে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবধারা আপনাকে সেই জ্যোতির্ম্ময় অন্তঃস্থলে লইয়া যাইবে এবং আপনাকে সেই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান করিয়া তুলিবে। তখন আপনার মধ্যে এক অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়া চলিবে এবং আপনাকে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিবে।

নামের মহিমা অবর্ণনীয়। কি বিপুল আনন্দ, কি অসীম শক্তি এই নামের মধ্যে লুক্কায়িত আছে ভাষায় বুঝান যায় না। নামে মানুষকে দেবত্বে পরিণত করে। সাত্বিক ভাবে নাম উচ্চারণ করিতে

পারিলে আপনার সঙ্গে এই নামই ভগবানের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিবে। ভুলভাবে বা নির্ভুল ভাবে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে নিশ্চয় সুফল পাইবেন।

জপ বর্হিমুখী চিন্তা প্রবাহের শক্তি ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করে। মন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রচৈতন্য লুক্কায়িত আছে। সাধক যখন সাধনায় শৈথিল্য প্রকাশ করে, মন্ত্রশক্তি তখন তাহার সাধনাকে উদ্দীপিত করে। কিছুকাল নিয়মিত জপের দ্বারা মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন নূতন রেখাপাত হইয়া যায়।

জপের সময় তৈলধারাবৎ ইষ্টদেবের নিকট হইতে সাত্ত্বিক বৃত্তি-গুলির ধারা জাপকের মনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। ইহাতে মনের ও স্বভাবের বহু পরিবর্ত্তন ঘটে। মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া অনন্ত আনন্দলাভে সহায়তা করে। মন ও সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হয়। যে যাহা ভাবে, সে তাহা হয় ইহা মনস্তত্ত্বের নিয়ম বা রীতি। যে সর্ব্বদা ভগবানের চিন্তায় বিভোর থাকে, সে ধীরে ধীরে দৈবী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তার ভাব ও স্বভাব উজ্জ্বল হয়। ধ্যেয় ও ধ্যাতা, পূজক ও পূজিতা, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এক হইয়া যায়। ইহাই জপের সুফল। ইহাই জপযজ্ঞের সমাপ্তি বা সমাধি।

প্রত্যহ এবং যদি সম্ভব হয় সদা সর্ব্বদা ভগবানের নাম স্মরণ একটি মানসিক সর্ব্বরোগহারী বলকারী মহৌষধি। জপ ক্ষুধিত আত্মার একটি পরম উপকারী আধ্যাত্মিক খাদ্য। সর্ব্বশক্তির আকর ভগবানের নাম অত্যন্ত শক্তি ধরে। আসুরিক স্বভাব সম্পন্ন, হীন পাষণ্ডকেও শ্রেষ্ঠ ভক্ত করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ করায়। দস্যু রত্নাকরকে রাম নাম জপে মহর্ষি বাল্মিকীতে পরিণত করিয়াছিল।

যখনই নাম জপ করিবে তখনই তাহা হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে অব্যভিচারিণী ভক্তি (গীঃ ১৩.১০) সহকারে করিবে। মনকে প্রতিনিয়ত ঈশ্বর ভাবনায় পূর্ণ রাখিবে। ইহা মনে রাখিবে ইহার জন্য একান্ত প্রয়োজন অনন্যা ভক্তি।

যদি শ্রীশ্রীকৃষ্ণকেই ভালবাস, তবে তাঁহারই প্রেমে, তাঁহারই ভাবে ডুবিয়া যাও এবং শেষ অবধি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাক। তিনিই সর্ব্বপাপতাপহারী ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীহরি মনে রাখিয়া তাঁহাতেই লক্ষ্য স্থির রাখ। ধরাধামে যে তিনিই শেষ সাক্ষী ইহা যেন কভু ভূল না হয়। তাহা হইলে নিশ্চয় অভীষ্ট লাভ হইবে। জপযজ্ঞের সিদ্ধি পাইবে।

তিন মাস রাম নাম, তিন মাস কালী নাম এবং তিন মাস কৃষ্ণ নাম জপ করিলাম ইহা ঠিক নহে। একনিষ্ঠ হইয়া যে কোন দেবতার উপর নির্ভর করিয়া সেই নাম জপ করা উচিৎ। যদি তোমার কৃষ্ণ সাধনায় মতি হয়, সেই অন্তরাত্মা অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ফলে ফুলে আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থে অনুভব কর, দর্শন পাও। ইহাই অনন্যাভক্তি, ইহাই পরাভক্তি।

যখন মন্ত্র জপ করিবে তখন মনকে সাত্ত্বিক শুদ্ধভাবে পূর্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে। গতানুগতিকভাবে ও জপ করিলে কিছু কিছু উপকার হয়। কারণ, জপের দ্বারা অজ্ঞাতভাবে ভিতরে ভিতরে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে।

জপের প্রথমাবস্থায় একটি জপের মালা আবশ্যক। পরে মানসিক জপ করা চলে। মন্ত্র যত ছোট হয়, সেই মন্ত্রের ক্ষমতা ও তত অধিক হয়। সকল মন্ত্রের মধ্যে "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" বা "হরি" "হরি" "হরি" বা "রাম", "রাম", "রাম" অতি সহজ।

জপের জন্য একটি পৃথক ঘর থাকা একান্ত আবশ্যক। সেখানে নিজের অন্তরঙ্গ ব্যতীত অপর কাহারও প্রবেশ করা উচিৎ নহে। প্রত্যহ প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় সেই ঘরে ধূপ ধুনা দিবে। সেই ঘরে ভাল ভাল ঠাকুর দেবতার ছবি টাঙ্গাইয়া রাখিবে। ছবির সম্মুখে আসন করিয়া ভক্তিভরে জপ করিবে। সেই ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই প্রত্যহ অনুভব করিবে যে মন দৈবভাবাপন্ন হইয়া উপাস্য

দেবতার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং এক অভূতপূর্ব্ব, প্রাণমুগ্ধকর শান্তিতে পূর্ণ হইয়াছে।

ভগবান অন্য কিছু চাহেন না। তিনি তোমার মনের ভিতরটা দেখিতে চাহেন। নিজ অন্তরের নিভৃত কোণে অন্তরতম অন্তর্যামীকে আন্তরিকতা দিয়া নাম করিতেছ বুঝিতে পারিলে তাঁহার করুণাময় বেশে তিনি উপস্থিত হন। তিনি জপগম্য।

সাধারণতঃ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে (অর্থাৎ প্রত্যুষে ৪টার সময়) উঠিয়া জপে বসিবে। তখন মন স্থির, অচঞ্চল ও বিশুদ্ধ থাকে। সাধনভজনের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট সময়। এই সময়ে কোন প্রকার চিত্তক্ষোভ থাকে না।

গুরুর নির্দ্দেশ মত শিব, কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ বা গায়ত্রী স্থির করিয়া লইবে। অভাবে নিজের পছন্দ মত নাম ঠিক করিবে। পূর্ব্বজন্মে যদি তুমি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাক এ জন্মে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক হইবে। যে দেবতার কথা তোমার মনে হয় তাহাই তোমার নিজের ইষ্টদেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট মনে করিবে।

পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, বা সুখাসনে অন্ততঃ আধঘণ্টা স্থিরভাবে বসিয়া জপ করিবে। চেষ্টা করিলে ভক্ত একবৎসরের মধ্যে আসনসিদ্ধ হইতে পারে। স্থির, শান্ত ও সুস্থভাবে বসাকেই আসন বলে। মেরুদণ্ড, ঘাড় ও মস্তক সমভাবে সোজা রাখিতে হইবে। কম্বল চার পাট্টা করিয়া তাহার উপর একটা পাতলা কাপড় পাতিয়া বসার জন্য ব্যবহার করিবে। কারণ ইহাতে শরীরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক শক্তি অতিশীঘ্র উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া আসন করা প্রশস্ত। আস্তে আস্তে মনকে হৃদয়পদ্ম (অনাহতচক্র) বা 'ভ্রূ' মধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) স্থাপন বা স্থির করিবে। কারণ এই দুই প্রকার আসনে মন অত্যন্ত শীঘ্র স্থির হয়। আসনে স্থির হইয়া বসিয়া 'ভ্রূ' মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জপ ও ধ্যান

করিবে। যতটা প্রথমাবস্থায় সহ্য হয় ততটা করিবে। এবং ধীরে ধীরে তাহা বাড়াইবে। এই যৌগিক ক্রিয়ায় মনের বিক্ষেপ চলিয়া যাইবে। আসনে স্থির হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করিয়া মনে মনে বা নিম্নস্বরে জপ করিতে থাকিবে।

কোন কোন জাপক চোখ খোলা রাখিয়া জপ করে। কেহ কেহ বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ করে। কেহ বা চোখ অর্দ্ধখোলা রাখিয়া জপ করে। কেহ কেহ ইষ্টদেবতার বা উপাস্য দেবতার ছবি সম্মুখে রাখিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া জপ করিতে থাকে। প্রকৃত কথা, যাহার যেমন সহজ মনে হইবে, তাঁহার সেইভাবে জপ করা উচিৎ।

সন্ধিক্ষণে বা অতি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যার সময়, আধ্যাত্মিক সাধনের সহায়ক একটী প্রাকৃতিক শক্তি আছে। সেই সময়ে মন স্বতঃই সাত্বিক ভাবে পূর্ণ থাকে। তখন মন সহজেই স্থির হয়। তাই এই উভয় সন্ধিক্ষণে জপ প্রশস্ত। এই সময়ে আসনে স্থির হইয়া বসিয়া মন সাত্বিক ভাবে পূর্ণ করতঃ জপ করিবে। যদি তন্দ্রা বা নিদ্রার ভাব আসে, তবে প্রথম দিকটা কিছুক্ষণ "প্রাণায়াম" করিবে। তন্দ্রা থাকিবে না। হ্রদ বা নদীর তীরে, মন্দিরের মধ্যে, দেব-বিগ্রহের সম্মুখে বা নিভৃত গৃহমধ্যে জপ করার সুবিধা। জপে বসিবার পুর্ব্বে যে কোন একটী স্তব পাঠ বা নামগান বা প্রার্থনা করিয়া জপ আরম্ভ করিবে।

জপের নিয়ম হইতেছে অতিদ্রুত ও নয় এবং অতিধীরেও নয়। মন্ত্রটা পরিষ্কার শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের অর্থ লক্ষ্য করিয়া জপ করিতে হয়। কতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে জপের মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। কর্ণেও যেন মন্ত্র প্রবেশ করে। তখন সহসা মন স্থির হইবে।

সর্ব্বদা একটী জপের মালা সঙ্গে রাখিবে। মনের আবিলতা দূর করিবার জন্য মালা একটী মহৎ অস্ত্র। তুলসী বা রুদ্রাক্ষের ১০৮ সংখ্যক মালা ব্যবহার করিবে। মালা দেখিলেই

ভগবানের দয়া, করুণা, বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের কথা স্বীয় মনে উদিত হইবে।

মালার "থোপকে" "মেরু" বলে। অনুলোম (সোজা) ও পুনরায় বিলোম (বিপরীত) ক্রমে মালা জপ করিবে। মালায় তর্জ্জনী স্পর্শ করাইবেনা। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার সাহায্যে গুটিকার মধ্যভাগ ধরিয়া জপ করিবে।

জপ তিন প্রকার। মানসিক, উপাংশু ও বৈখরী। সুস্পষ্ট বর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক জপকে বাচনিক বা বৈখরী জপ বলে। কেবল নিজে শুনিতে পাও, এমন জপকে উপাংশু জপ বলে। জিহ্বা বা ওষ্ঠ চালনা না করিয়া মনে মনে মন্ত্রস্থ বর্ণের চিন্তাকে মানসিক জপ বলে। ইহা ব্যতীত 'অজপা' জপ ও আছে। ইহা শ্বাসে প্রশ্বাসে অভ্যাস করিতে হয়। যেমন "সোহং" মন্ত্র শ্বাস লইবার সময় "সো" মানসিক উচ্চারণ করিতে হয় এবং শ্বাস ত্যাগের সহিত "হং" মানসিক উচ্চারণ করিতে হয়। কাজেই যতবার নিঃশ্বাস লওয়া ও ত্যাগ করা হয় ততবার সোহহং মন্ত্র জপ করা হয়।

আসনে বসিয়া বাম পায়ের গোড়ালি দ্বারা যোনি টিপিয়া রাখিয়া গুহ্য উর্দ্ধে টানিয়া রাখাকে "মূলবন্ধ" বলে। ইহা হঠযোগের একটী ক্রিয়া। ইহাতে মনঃসংযোগ হয়। ইহার দ্বারা অপাণ বায়ুর নিম্নগতি বন্ধ থাকে।

যতক্ষণ সুস্থভাবে শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিতে পার ততক্ষণ শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখাকে "কুম্ভক" বলে। কুম্ভক করিলে মন স্থির হয়। এই প্রক্রিয়া মনকে কেন্দ্রীভূত করে। কেহ কেহ লিখিত জপও করে। একটী খাতায় নিজ ইষ্টমন্ত্র আধঘণ্টা কাল কেহ কেহ লিখেন। তাহাতেও মন স্থির হয়।

"ওঁ হরি ওঁ", "শ্রীরাম", "ওঁ নমঃ শিবায়", "ওঁ নমঃ নারায়ণায়", ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়, গায়ত্রী মন্ত্র (ওঁভূর্ভুবস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ) প্রভৃতি জপের মন্ত্র।

মহামন্ত্র ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। (ওঁ হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।) ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ, ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, গোপীজন বল্লভায় স্বাহা। ওঁ শ্রীরাম, জয় রাম, জয় জয় রাম, ওঁ দুং দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং লক্ষ্মৈ নমঃ ইত্যাদি। তৎপর জপ বিসর্জ্জন (গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তৃ্ত্বং···) দিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে।

১। গুরুস্তোত্র ঃ—অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

২। শিবস্তোত্র ঃ—নমো বিশ্বেশ্বরায় নরকার্নবতারণায়।
জ্ঞান প্রদায়, করুণাময় সাগরায়।
কর্পূরকান্তিধবলায় জটাধরায়,
দারিদ্র্যদুঃখদহনায়, নমঃ শিবায়।
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বরঃ।

৩। বিষ্ণুস্তোত্র ঃ—ওঁ শান্তাকারং ভূজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গং।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগীভিঃ ধ্যানগম্যং,
বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হরং সমলোকৈক নাথম্॥

৪। দুর্গাস্তোত্র ঃ—নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে,
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্‌বন্দ্যপাদার-বিন্দে,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে এ্যম্বকে গৌরি নারায়নি নমোহস্তুতে॥

৫। গঙ্গাস্তোত্র ঃ—নমো বিষ্ণু পাদ্যার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনী,
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবী।

৬। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র :—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং,
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোমুক্ষীয় মামৃতাৎ।

৭। শান্তিপাঠ :—ওঁ পূর্ণসদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমিদমুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি !! ওঁ শান্তি !!!

(শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী)

২৫। কাল অনন্ত।

গীতায় আছে—

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত মহর্যদ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ। ৮।১৭
অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥ ৮।১৮

কাল অনন্ত। দেবতাদিগের সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐরূপে সহস্রযুগে একরাত্রি হয়। যাঁহারা ইহা অবগত হইয়াছেন সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অহোরাত্রবেত্তা বলিয়া খ্যাত। (৮।১৭) ব্রহ্মার দিবস আগত হইলে অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণ স্বরূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া যায়। (৮।১৮)

তাই কাল অনন্ত বলিয়া বলা হয়। কালঘটস্থ হাওয়ায় তাহার সংখ্যা হয়। এই ঘটস্থ জীব দিবারাত্রে ২১,৬০০ বার অজপারূপ বহিঃপ্রাণায়াম করিয়া থাকে। ইহাই জীবের কাল বা আয়ু। চন্দ্র ও সূর্য্য এই দেহের মধ্যেই আছে। চন্দ্র অর্থ ঈড়া এবং সূর্য্য অর্থ পিঙ্গলা। যিনি যোগ বলে ২১,৬০০ বার অজপারূপ কমাইয়া ২০০০ বারে আনিতে পারেন, অর্থাৎ প্রায় প্রতি ৪৩ সেকেণ্ডে একবার করিয়া প্রাণায়াম করেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ। এই ২০০০ বারের মধ্যে ঈড়া অর্থাৎ বাম নাসিকা দ্বারা ১০০০ বার এবং

পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ১০০০ বার প্রাণায়াম করেন, তাহার দিবারাত্রে ২০০০ বার প্রাণায়াম হয়। ইহাই ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি। যুগ শব্দের অর্থ যুগ্ম।

ঈড়াতেই একহাজার বার প্রাণায়াম করিলেই প্রতিবারেই সুষুম্না মার্গে প্রাণের স্থিতি হয়। এই স্থিতিই ঈড়া ও পিঙ্গলার যুগ্মরূপ। অর্থাৎ এই অবস্থায় ঈড়া ও পিঙ্গলা মিলিয়া যুগ (অর্থাৎ যুগ্ম বা যোড়া) হইয়া যায়। ইহাই যুগ। পিঙ্গলাতে ও এইরূপ। এবং উভয় মিলিয়া ব্রহ্মার দিবারাত্র।

২৪। উপাসনা।

উপাসনা শব্দের অর্থ নিকটে অবস্থান করা। (উপপূর্ব্বক আস্ ধাতু অন+আপ্=উপাসনা। অর্থাৎ সেবা, পূজা, আরাধনা, অর্চ্চনা।) যখন আমরা ঈশ্বরের চিন্তা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করি। আমাদের মন পবিত্র হয়। দেবভাবে পূর্ণ হয় এবং মনে হয় আমরা ঈশ্বরের নিকটেই অবস্থান করিতেছি। তাই ভগবানকে এক মনে ভক্তিভাবে ডাকার নামই উপাসনা।

জগতের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে। উপাসনার কথা মনে পড়িলেই স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন উঠে, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। সাকার অর্থে যাহার আকার বা মূর্ত্তি আছে অর্থাৎ যিনি মনুষ্যাদির মত দেহ ধারণ করেন। নিরাকার অর্থে যাঁহার আকার বা মূর্ত্তি নাই অর্থাৎ যিনি মনুষ্যাদির মত দেহ ধারণ করেন না।

আর্য্য শাস্ত্রে আছে, ভগবানকে যে যেভাবে ডাকে তাহাকে তিনি সেইভাবে সন্তুষ্ট করেন। (গীতা ৪।১১)। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার সকল শক্তিই আছে। তিনি নিরাকার হইলে ও ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিতে যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারেন। তাঁহার জন্ম

মৃত্যু নাই। তবুও জগতে যখন অধর্ম্ম উপস্থিত হয় তখন তিনি দেহধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। এবং অধর্ম্মের কবল হইতে জগতকে রক্ষা করেন। (গীঃ ৪।৭, ৪।৮)

বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার ধ্যান করেন। শাক্তগণ মাতৃরূপে তাঁহার উপাসনা করেন। শৈবগণ শিবরূপে তাঁহার পূজা করেন। ব্রাহ্মগণ নিরাকার ব্রহ্মরূপে তাঁহার চিন্তা করেন। যে যে ভাবে তাঁহাকে ডাকে তিনি সেইভাবে তাহাকে অনুগ্রহ করেন। কত ভক্ত কত ভাবে তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। যিনি যে ভাবে ডাকিয়াছেন, তিনি ঠিক সেইভাবেই তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন বা অনুভব করিয়াছেন। তিনি মূলতঃ এক। তিনি অদ্বিতীয় পরমেশ্বর।

সাকার বা নিরাকার হউক, উপাসনার সময় মনে করিতে হইবে আমি তাঁহারই সন্নিকটে আছি। তিনি আমারই সম্মুখে তাঁহার করুণাভরা আঁখি লইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছেন এবং আমার প্রত্যেক প্রার্থনাবাক্য তিনি শুনিতেছেন এবং আমার উপর তাঁহার মঙ্গলময় হস্তের বরাভয় অর্পিত হইতেছে। এইভাবেই মনঃ-সংযোগ করিয়া ভগবানের স্তুতি করাই উপাসনা।

২৬। শোক কি?

শ্রীভগবান বলিতেছেন "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" (২।১১)। যাহার জন্য শোক করা উচিৎ নহে তাহার জন্য শোক করিও না। বিবেকী পণ্ডিতগণ, কি মৃত ব্যক্তি, কি জীবিত ব্যক্তি কাহারও জন্য অনুশোচনা করেন না।

ইহাই গীতার প্রথম উপদেশ। গীতায় শ্রীভগবানের এই প্রথম উপদেশটির মধ্যে সমস্ত গীতা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বীজটী নিহিত রহিয়াছে। শ্রীভগবানের এই প্রথম, প্রধান ও সর্ব্বোপদেশের বীজস্বরূপ এই বাক্যটী সকলের স্মরণ রাখা উচিৎ।

"অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ," এই ভগবৎ উক্তিটী যখনই

মনে হইবে, তখনই মন শান্ত ভাব ধারণ করিবে। তোমার মন শোকে যতই আচ্ছন্ন হউক না কেন, শ্রীভগবানের এই বাণী (উপদেশ) মনে হইলে ক্ষণকালের জন্য হইলেও মন স্থির হইবে। নিতান্ত শোকের সময়ও তোমার মন বলিবে, "আমার এই নিদারুণ শোক তথাপি কি কারণে শ্রীভগবান বলিতেছেন "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্।"

যে কারণে শ্রীভগবান বলিতেছেন, তুমি অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ, তুমি যদি সেই কারণটী বুঝিতে পার, যদি তুমি সেই কারণটি নিজে অনুভব করিতে পার, তখন তোমার শোক থাকিবে না। মনের চঞ্চলতা দূর হইবে। তুমি জ্ঞানী হইয়া যাইবে। জ্ঞানী হইলে শোক উপলব্ধি হইবে না, শোক থাকিবে না।

যদি একেবারেই অশোচ্য বিষয়ে শোক কেন করিতেছ ইহা বুঝিতে না পার, তবে শোক যথাসাধ্য সহ্য করিতে অভ্যাস কর। শোক অগ্রাহ্য করিয়া নিজ কর্ম্ম করিয়া যাইতে প্রাণপণ চেষ্টা কর। ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইবে। জ্ঞানলাভ হইবে। তখন বুঝিবে শোক করিবার কিছুই নাই।

আত্মজ্ঞানী না হওয়া পর্য্যন্ত শোকের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নাই। এবং তাহা হইতেও পারে না। সম্ভবও নহে। যতদিন সংসার আশ্রমে আছ ততদিন কর্ম্ম করিতেই হইবে। শোকও পাইতেই হইবে।

তাই শোক অগ্রাহ্য করিয়া বা শোক সহ্য করিয়া কর্ম্মযোগে লিপ্ত হইতে হইবে। শোক তখন তোমায় কাতর করিতে পারিবে না। মনে হইবে অশোচ্য বিষয়ে তুমি অযথা শোক করিতেছ। তাই শোক মনের বিকারাবস্থা বলিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য।

শোক।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৮—১০ শ্লোক) পাই, অর্জুন "আপনার" এবং "পর" এই ভেদ করিয়া শোক করিতেছিলেন। যে

উপস্থিত হইলে মৃত্যুকে আর শোকাবহ মনে হয় না, সেই বুদ্ধি শ্রীভগবান মানুষকে দিতেছেন। সেই বুদ্ধি হইল যে দেহ ও আত্মা ভিন্ন বস্তু।

শোক একটা ব্যাধি, একটা মানসিক বিকার মাত্র। উহার মূলে অজ্ঞান রহিয়াছে। ঈশ্বর সত্য, জ্ঞানও আনন্দের আধার। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ বা সচ্চিদানন্দ। যেখানে পূর্ণ জ্ঞান সেখানে পূর্ণ আনন্দ এবং সেখানে শোকের পূর্ণ অবসান।

অর্জুনের শোক উপস্থিত হইয়াছে। যে শোকই হউক, মৃত্যুর জন্য শোক হউক, বস্তু নাশের জন্য শোক হউক, শোক মাত্রেরই মূলে রহিয়াছে অজ্ঞান। জ্ঞান উদয় হইলে শোক দূর হইবে। জ্ঞানই আনন্দ, অজ্ঞানই শোক। জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানের মহামন্ত্র শ্রীভগবান গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্লোক পরম্পরায় দিতেছেন। ইহা কেবল অর্জুনের আত্মীয়বধজনিত শোক দূর করার মন্ত্রই নয়, পরন্তু সর্ব্বকালের সর্ব্বলোকের, সর্ব্বশোক দূর করার মহামন্ত্র।

এই মহামন্ত্র অনুসরণে শোক দূর হইবে ও কোন শোক থাকিবে না।

২৭। মৃত্যু কি?

গীতায় পাই :—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃর্ত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ (২।২৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তির জন্ম হয় তাহার মৃত্যুও ধ্রুব। মৃত ব্যক্তির দেহ-কৃতকর্ম্মদ্বারা জন্ম ও ধ্রুব। ঈদৃশ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। এই জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য বিষয়ে শোকাকুল হওয়া উচিৎ নহে।

শ্বাস বাহির হইয়া এই দেহে পুনঃ প্রবেশ না করাকে মৃত্যু এবং দেহান্তরে পুনঃ প্রবেশ করাকে জন্ম বলা যায়। সুতরাং প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের জন্ম মৃত্যু প্রতিক্ষণেই হইতেছে।

প্রথমোক্তরূপ মৃত্যুকে মহাপ্রলয় এবং শেষোক্তরূপ মৃত্যুকে খণ্ডপ্রলয় বলে। এই দুইএর প্রভেদ এই যে, মহাপ্রলয়ে দেহত্যাগ হয় এবং খণ্ডপ্রলয় এই দেহেই হয় বলিয়া জীব তাহা বুঝিতে পারে না। যিনি শ্বাসের আগম নিগম রহিত করিতে পারেন তাঁহার মৃত্যু হয় না। তিনিই কেবল জন্মমৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পান।

যেমন দিন যায় ও রাত্রি আসে, জন্মের পরও তেমনি মৃত্যু আসেই। পৃথিবীর মাটিকে একদিন সকলকে ছাড়িতেই হইবে। মাতাপিতার আর্ত্তনাদ, সন্তানের কাতর ক্রন্দন, বিধবার অশ্রুপাত, অর্থের প্রলোভন—এই কোনটার দিকে নির্ম্মম মৃত্যু কখনও ভ্রূক্ষেপ করে না।

তাই মৃত্যু মানবজীবনে বড়ই রহস্যময় বিষয়। মরণের পর কি হইবে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আমরা কাতর হই। আমরা বেশ বুঝি, মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এই পৃথিবীব্যাপী ২০০ (দুইশত) কোটি মানবের মধ্যে অন্ততঃ চারি কোটি লোক প্রতি বৎসর মারা যাইতেছে। ফলে প্রায় দশ লক্ষ টন মানুষের মাংস, হাড় ও রক্ত পরিত্যক্ত বস্তু হিসাবে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। হয়ত ইহা পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধে অসংখ্য লোক মারা গিয়াছে। এসব কিন্তু আমাদের বিচলিত করে না। আমরা যে মরিব ইহা ভাবি না এমন কি ভাবনায়ও আসে না।

এই সম্বন্ধে মহাভারতে একটি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন আছে। তাহা— অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম ॥

প্রতিদিনই মানুষ ও জীবজন্তু মারা যাইতেছে। কিন্তু তবুও মানুষ যে মরিবে এই কথা ভাবে না। তার ধারণা, যদিও অপরেরা মরিতেছে, তাহার কখনও মৃত্যু হইবে না। ইহার চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর

পুর্ব্বে এই উত্তরটি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দিয়াছিলেন। ইহার সত্য আজও অটুট রহিয়াছে।

মৃত্যু অর্থে জীবনের সমাপ্তি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন দেহযন্ত্রের বিশেষ দরকারী অংশগুলি ক্ষয় হইলে সমস্ত যন্ত্রটি বিকল হয়। হৃদযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, মস্তিস্ক—এইগুলি দেহের প্রধান অংশ। কোন রোগে বা আকস্মিক ব্যাপারে এই প্রধান যন্ত্রের কোন একটির বিরতি হইলে সমগ্র শরীরের যন্ত্রটি বন্ধ হয়।

৺স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন,—"মৃত্যু জীবাত্মার বিশ্রাম।" মরণের পরে জীবাত্মা যায় সূক্ষ্মদেহ নিয়ে, পরলোকের দেশে, বিশ্রাম পাবে বলে। কিন্তু বাসনার বৃশ্চিক দংশনে সে এতটুকুও শান্তি পায় না। শান্তির আশায় পুনঃ পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসে। কিন্তু সেখানেও শান্তির কণা তার জীবনে মিলে না। আবার যায় সে চলে পরলোকের দেশে। অবিশ্রান্ত যাতায়াতের খেলা চলিতে থাকে তার জীবনে।

স্বামিজী বলেন পৃথিবীতে যাঁরা আপনার জন আছেন, তাঁরা মৃতের কল্যাণ কামনা করুন। কল্যাণ কামনার সূক্ষ্ম কম্পনগুলি সহজেই প্রেতাত্মাদের সীমানায় পৌছায়। শোক, দুঃখ, বা অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া বিদেহীর উদ্দেশে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলে বা জানাইলে তাহার সদগতি হয়। অজ্ঞান অন্ধকারে তাহারা পায় আলোকদীপ্ত পথ ও নিরাশার মাঝে পায় আশার দীপশিখা।

আমাদের মনে করা উচিৎ, জন্ম মৃত্যু আছে বলিয়াই আমাদের জীবনে একটি ছন্দোবন্দ কবিতা আছে। তাহা সমমাত্রার কবিতা। কবিতা যদি আমাদের জীবনে আছে বলিয়া মনে হয়, তবে তাহার রচয়িতাও একজন নিশ্চয়ই আছেন। মৃত্যু তাঁহারই কার্য্য।

একটু চিন্তা করিলে মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা বুঝি যে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিগন্ত রেখা যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার বাহিরে আর

একটা জগৎ আছে। তাহা 'অজানার' জগৎ। সেই জগৎ দিগন্ত-হীন। আমাদের জানার সংসাররঙ্গমঞ্চে যেইখানে শেষপর্দ্দা পড়িয়াছে, মৃত্যু আসিয়া সেই পর্দ্দা একটু সরাইয়া দিল। পরিচয় দিয়া দেখা দিল, অজানার নেপথ্যলোক। সেখানে অনন্ত জগৎ, অনন্ত তমসাপারে অনন্ত যাত্রা।

মৃত্যু সর্ব্বদা মনে আনিয়া দেয়, কত নিকটতম প্রতিবেশী সে। সুদূরতমও নয়। অত্যন্ত নিকটতম। তোমার ওজর আপত্তির অপেক্ষা রাখেনা। দুয়ারে আসিয়া হঠাৎ হানা দেয়, অপ্রত্যাশিত অতিথির মত। ঈপ্সিত ধন আদায় করিয়া তখনই চলিয়া যায়। কোন কৈফিয়ত ও শোনে না। কোন কৈফিয়ত ও দেয় না। প্রস্তুত নাই বলিলেও শোনেনা। কোন কাকুতি মিনতি গ্রাহ্যও করেনা। কালাকালের ধার ধারেনা। হঠাৎ ছোঁ মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যায় প্রাণশক্তি। কোথায়, কোন গাঢ় তমসাচ্ছন্ন অজানার দেশে, জানিবার কোন উপায় নাই। তাই ভাবি,

মৃত্যু! কত কাছে তুমি তবু দূরে ভাবি
কেন তাহা বুঝিনা,
ধরাধামে মম শেষ সাথী তুমি
ইহা যেন ভুলিনা।
মরণ রে! যতদিন যায়
তত কাছে তুমি
তহুঁ মম শ্যাম সমান।

গ। শ্রীশ্রীচণ্ডী।

মৎস্য সূক্তে আছে,

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ দেবানাঞ্চ যথাহরিঃ।
স্তবানাং অপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ।

যেরূপ যজ্ঞমধ্যে অশ্বমেধ ও দেবগণের মধ্যে হরি সর্ব্বপ্রধান, সেইরূপ সপ্তশতী (চণ্ডী)। সকল স্তবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

চণ্ডী একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশবিশেষ। মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের ৮১ তম্ হইতে ৯৩ তম্, এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই অংশই সাধারণ্যে চণ্ডী নামে পরিচিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই অংশের নাম দেওয়া হইয়াছে "দেবী মাহাত্ম্য"। সপ্তশত মন্ত্র স্বরূপ বলিয়া "চণ্ডী" বা "দেবীমাহাত্ম্যের" অপর নাম "সপ্তশতী" বা সপ্তশতী স্তব।

ইহাতে মনে হয় চণ্ডীতে সাতশত শ্লোক আছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। চণ্ডী গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা মাত্র ৫৭৮। তাহাই সাতশত মন্ত্রে বিভক্ত। তন্মধ্যে

১।	শ্লোকাত্মক মন্ত্র—		৫৩৭
২।	অর্দ্ধশ্লোকাত্মক মন্ত্র—		৩৮
৩।	ত্রিপাৎ	"	৬৬
৪।	উবাচ অঙ্কিত	"	৫৭
৫।	পুনরুক্ত	"	২
		মোট—	৭০০ শ্লোক।

চণ্ডী গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও উত্তর চরিত। চণ্ডীর প্রথম চরিত, প্রথম অধ্যায়,—মহাকালী।

মধ্যম চরিত, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়—মহালক্ষ্মী।

উত্তর চরিত, পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায়—মহাসরস্বতী।

মহাপ্রলয় কালে ভগবান নারায়ণ যখন মহাকালী (যোগনিদ্রা)র প্রভাবে নিদ্রাভিভূত ছিলেন, তখন নারায়ণের নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে মধু ও কৈটভনামক দৈত্যদ্বয় হত্যা করিতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মা একান্ত ভীত হইয়া মহাকালীর স্তব করিলে দেবী মহাকালী (যোগনিদ্রা) নারায়ণের নেত্র ত্যাগ করেন এবং নিদ্রোত্থিত নারায়ণ মধু কৈটভকে নিহত করতঃ ব্রহ্মাকে রক্ষা করেন।

মহাকালী দশবদনা, দশভুজা, দশপাদা, অঞ্জনের ন্যায় প্রভাযুক্ত, বিশাল ত্রিংশৎ নয়নমালায় শোভমানা। ইঁহার দশনাগ্র মুখ-বহির্ভাগে স্ফুরিত। ইনি ভীমরূপা, ভয়ঙ্করী। আবার রূপ, কান্তি ও মহতী শ্রীর প্রতিষ্ঠা স্বরূপা। ইনি খড়্গ, বান, গদা, শূল, শঙ্খ, চক্র, ভূষণ্ডী, পরিঘ, ধনু ও গলিত রুধিরাপ্লুত নরমুণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। মহাকালী তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীর তামসী মূর্ত্তি। ইঁহার আরাধনার দ্বারা সাধক স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল ব্রহ্মাণ্ড বশীভূত করিতে পারেন। বৈকৃতিক রহস্যে আছে, "আরাধিতা বশীকুর্য্যাৎ পূজাকর্ত্তুশ্চরাচরম।"

মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য সর্ব্বদেবতার শরীরের তেজ হইতে "মহালক্ষ্মী"র আবির্ভাব হইয়াছিল। বিভিন্ন দেবতার তেজে সমুদ্ভূতা বলিয়া ইহাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্নবর্ণযুক্ত। মহালক্ষ্মী শ্রীশ্রীচণ্ডীর রাজসী মূর্ত্তি।

মহালক্ষ্মী শ্বেতাননা, নীলভূজা, সুশ্বেত স্তনযুক্তা, রক্তমধ্যা, রক্তচরণা, নীলবর্ণ জঙ্ঘা ও উরুসমন্বিতা। ইনি উন্মাদা, (সুরাদি-পানহেতু প্রমত্তা)। বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও ভূষণধারিণী। বিবিধ অনুলেপনযুক্তা এবং কান্তি, রূপ ও সৌভাগ্যশালিনী। ইনি সহস্রভুজা হইলেও অষ্টাদশভূজা রূপেই পূজিতা হন। ইহাঁর অষ্টাদশভূজে অক্ষমালা, পদ্ম, বাণ, অসি, বজ্র, গদা, চক্র, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, বর্ম্ম, চাপ, পানপাত্র ও কমণ্ডলু বিরাজিত। ইনি পদ্মাসনা সর্ব্বদেবময়ী ঈশ্বরী। ইঁহাকে যিনি পূজা করেন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বলোকে ও দেবগণের প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

"সর্ব্বলোকানাং স দেবানাং প্রভুঃ ভবেৎ।

শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুর ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করিবার জন্য গৌরীদেহ হইতে মহাসরস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি মহাসরস্বতী। ইনি শ্রীশ্রীচণ্ডীর সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি। ইনি অষ্টভূজা। ইনি এই অষ্টভূজে

বাণ, মুষল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, হল ও ধনু ধারণ করিয়া আছেন।

"এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি।

ইনি ভক্তিপূর্ব্বক পূজিতা হইলে সাধককে সর্ব্বজ্ঞতা প্রদান করেন।

চণ্ডীতে জগন্মাতার বহুরূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কার্য্যসিদ্ধির জন্য বহুরূপে প্রকাশিতা হইলেও বস্তুতঃপক্ষে তিনি একৈবা অদ্বিতীয়া।

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

(চণ্ডী-দশম অধ্যায়)

স্বকীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে তিনি বহুরূপে অবস্থিতা।

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা।

(চণ্ডী ১০ম অধ্যায়)

চণ্ডী পাঠে ভুক্তি-মুক্তি, অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স্, ভোগ-অপবর্গ; উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরাধনা করিয়া মহারাজ সুরথ, অস্খলিত সাম্রাজ্য ও বৈশ্য সমাধি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"আরাধিতা সৈব নৃনাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা"

(চণ্ডী ১৩শ অধ্যায়)

এই পরম স্বস্ত্যয়ন দেবীমাহাত্ম্য নিত্যপাঠ ও শ্রবণের দ্বারা এই হতশ্রী ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশের নরনারীর মধ্যে আবার মহাশক্তি জাগ্রতা হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ষোড়শমূর্ত্তি।

১। শ্রীশ্রীদুর্গা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে, দেব্যাস্তুতিঃ, পঞ্চান্ন শ্লোকে দেখিতে পাই,

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি"
"তদা তদা অবতীর্য্যাহং করিষ্যামি অরিসংক্ষয়ম্"।
(১১।৫৫)

যখন যখন এইরূপ দানবজনিত পীড়া হইবে, তখন তখন আমি অবতীর্ণা হইয়া শত্রুনাশ করিব। (গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ম্ ও ৮ম্ শ্লোকে ও অনুরূপ ভাব দেখা যায়)।

এই শত্রুনিধনকল্পে আবির্ভূতা চণ্ডী ষোড়শরূপিণী। প্রথমতঃ শ্রীদুর্গা। তিনি দুর্গা, কারণ তিনি নানা দুঃখ হইতে, নানা সঙ্কট হইতে, নানা দুর্গতি হইতে ও নানা দুর্গ হইতে আর্ত্তজনকে ত্রাণ করেন বলিয়া তিনি দুর্গা। এই দুর্গা নামে বিশ্বজননী আদিজননীর পূজা আমরা করি।

রাজ্যহারা সুরথরাজা নানা দুর্গতি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আদিকালে মা দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। সর্ব্বস্ব হারাইয়া সমাধি নামক বৈশ্য ও গঙ্গা পুলিনে মৃন্ময় মূর্ত্তিতে শ্রীদুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। যাহা কিছু তাঁহারা হারাইয়াছিলেন, এই পূজার ফলে সমস্তই তাঁহারা ফিরিয়া পান।

তারপর দেখি, চরম সঙ্কটে পড়িয়া শ্রীরামচন্দ্রও যখন দেবতারা নিদ্রিত থাকেন, সেই অকালে বোধন করিয়া মা দুর্গাকে জাগাইয়া তোলেন এবং নীল পদ্ম দিয়া মায়ের পূজা করেন।

তাই অদ্যাপি আমরা শরৎকালে দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার পূজা পদ্মফুল দিয়ে করিয়া থাকি।

সেই কারণে, তিনিই বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দুর্গতিনাশিনী অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা দুর্গা।

২। মহিষমর্দ্দিনী।

মায়াবী দুর্দ্দান্ত অসুর মায়াবলে মহিষের রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত ও অত্যাচার করিত বলিয়া তাহাকে

মহিষাসুর নামে অভিহিত করিত। এই মহিষাসুর নিজের প্রচণ্ড বিক্রমে স্বর্গ হইতে দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গরাজ্য দখল করিয়া বসিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ মানুষের ছদ্মবেশে লুকাইয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা করিলেন। এই সুযোগে পৃথিবীর যাবদীয় যজ্ঞের "হবি" এই অসুর গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিদানে পৃথিবীকে কিছুই দিলনা। সমস্ত সৃষ্টি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তখন দেবতারা সকলে মিলিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের উপদেশে দেবতারা সকলে মিলিয়া আদ্যাশক্তির উপাসনা করিতে লাগিলেন।

সেই উপাসনার ফলে প্রত্যেক দেবতার দেহ হইতে বিদ্যুন্ময় খণ্ড খণ্ড শক্তি বা তেজ বাহির হইতে লাগিল। সেই খণ্ড খণ্ড শক্তি একত্রিত হইয়া এক দিব্য তেজোময় দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। তখন প্রত্যেক দেবতা তাঁহাদের নিজ নিজ অস্ত্র দিয়া সেই দেবীমূর্ত্তিকে ভুষিত করিতে লাগিলেন। দেবীর দশভূজে দশপ্রহরণ শোভা পাইল। হিমালয় তাঁর নিজের বাহন সিংহকে দেবী সন্নিধানে পাঠাইলেন। সিংহের উপর আরূঢ়া হইয়া দশপ্রহরণধারিণী দশভূজা দেবী অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। সেই অট্টহাস্যে মহিষাসুরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। মায়াবী সেই দুর্দ্দান্ত অসুর নানা রূপ ধরিয়া দেবীর আক্রমণ ব্যাহত করিতে লাগিল। অবশেষে ক্লান্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ মহিষরূপ ধারণ করিয়া দেবীর সিংহকে আক্রমণ করিল। তখন দেবী প্রচণ্ড বর্শাঘাতে মহিষাসুরের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। মহিষাসুর ধরাশায়ী হইল। আনন্দে দেবতারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

মহাদেবী মহিষমর্দ্দিনীরূপে সৃষ্টিকে পুনরায় অসুরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিলেন। তাই তিনি মহিষমর্দ্দিনী।

৩। মহামায়া।

ক্ষীরোদ সাগরের তীরে সহস্রশীর্ষ অনন্তনাগের শয্যায় ভগবান বিষ্ণু শয়ন করিয়া আছেন। যোগনিদ্রায় তিনি অভিভূত, নিদ্রিত। তাই নিষ্ক্রিয়। এক মৃণালদণ্ড তাঁহার নাভিকমল হইতে উঠিয়াছে। সেই মৃণাল দণ্ডের উপর প্রস্ফুটিত শতদলের আসনে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বসিয়া আছেন। চতুর্মুখ হইতে অনর্গল বাহির হইতেছে, "আদিবাণি", "বেদবাণি"। কিন্তু সেই বেদবাণী শুনিবে কে? সৃষ্টি কোথায়? প্রলয়পয়োধিজলে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় মগ্ন আছেন, একেবারেই নির্ব্বিকল্প, ক্রিয়াহীন।

যুগযুগান্ত পরে নিদ্রিত বিষ্ণুর দুই কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে ভয়ঙ্কর দুই অসুর সহসা জাগিয়া উঠিল। চক্ষু উন্মীলন করিয়াই তাহারা সম্মুখে ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল। তখনই ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা ভীত হইলেন। ব্রহ্মা জানিতেন এই দুই অসুর বিষ্ণুর শক্তি হইতে উদ্ভূত। বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহ এই দুই অসুরকে বধ করিতে পারিবেনা। কিন্তু বিষ্ণু তখন ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যে মহাদেবী এই ঘোর নিদ্রায় বিষ্ণুকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কেহ বিষ্ণুকে জাগাইতে পারিবেন না। সেই মহাদেবী হইলেন মহামায়া। তাঁহারই মায়ার প্রভাবে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় লীন। ব্রহ্মা তখন মহামায়ার স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার স্তবে তুষ্টা হইয়া মহামায়া বিষ্ণুর শরীর হইতে তাঁহার শক্তি সরাইয়া নিলেন। বিষ্ণু জাগিয়া উঠিলেন। তখন মধু কৈটভের সঙ্গে তাঁহার প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কল্প কল্পান্ত চলিয়া যায়, কিন্তু এই মহাসমরের কোন মীমাংসা হয় না। তখন মহামায়া তাঁহার মায়া বিস্তার করিয়া মধু কৈটভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন। মহামায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন অসুরদের বিষ্ণু তখন বধ করিলেন।

ইহাই সৃষ্টির লীলা। সমস্ত সৃষ্টির লীলা যে মায়ায় চলিয়াছে তিনিই মহামায়া।

৪। ধূমাবতী।

অন্ন যিনি আমাদিগকে দিয়াছেন, তিনি আমাদের ক্ষুধাও দিয়াছেন। অন্নে জগন্মাতা চিরশ্যামলা, আন্নদা, ধাত্রী ও পালয়িত্রী।

কিন্তু ক্ষুধায় তিনি ধূমাবতী। এই ধূমাবতী কে এবং এই নাম কেন হইল?

একদা পার্ব্বতী কৈলাসে প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন। ঘরে একমুষ্টি তণ্ডুলও নাই। তিনি শিবের কাছে গেলেন। কিন্তু শিব নির্ব্বিকার। ক্ষুধায় একান্ত আর্ত্ত ও পীড়িত হইয়া পার্ব্বতী বার বার নিজ পতি শিবের কাছে যাইতেছেন এবং ক্ষুধা নিবারণার্থে বারবার শিবের কাছে অন্ন চাহেন। কিন্তু পরম আশ্চর্য্য, শিবের সেই নির্ব্বিকার ভাবের কোন বিকার নাই। অপরদিকে ক্ষুধার জ্বালায় দেবী জর্জরিতা। কোথায়ও কোন প্রতিকার না পাইয়া দেবী ক্ষিপ্তা হইলেন এবং অবশেষে দেবী স্বয়ং শিবকেই গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। ইহার পরিণাম ভীষণ হইল।

সঙ্গে সঙ্গেই দেবী দেখিলেন, দেবীর সমস্ত অঙ্গ হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। সেই ধূমে দেবী আচ্ছন্ন ও আবৃত হইয়া গেলেন। তখন দেবীর দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শিব বলিলেন, "তুমি যখন ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং পতিকেই গ্রাস করিয়াছ, তুমি বিধবা হইয়াছ।

এই বিধবার বেশে ধূমাবতীরূপে পৃথিবীতে সর্ব্বত্র তুমি পূজিতা হইবে।

তাই দেবী শিবহীন বিধবা। ক্ষুধাতুরা ভীমা ভয়ঙ্করী ধূমাবতী।

৫। উমা।

জগদম্বা আমাদের উমা, গৌরী ও পার্ব্বতী নামেও অভিহিতা। গত জন্মে তিনি সতীরূপে দক্ষরাজার ঘরে জন্ম নিয়াছিলেন। তিনি দক্ষরাজকন্যা হইয়াও দক্ষরাজের অসম্মতিতে ভিখারী শিবকে স্বামীরূপে বরণ করিলেন। এই আক্রোশে দক্ষরাজা শিবকে অপমান করিলেন। দক্ষযজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। সতী স্ত্রী স্বামীর অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার চিরস্বামীকে ভুলিতে পারিলেন না। তাই পরজন্মে গৌরীরূপে গিরিরাজের-ঘরে জন্ম নিলেন। তিনি গিরি-রাজের দুহিতা, তাই পার্ব্বতী।

যৌবনে পার্ব্বতীর স্মরণ হইল গত জন্মের কথা। স্মৃতিতে তাঁহার চিরস্বামী দেবাদিদেবের কথা উদয় হওয়ায়, সেই শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প এবং কঠোর তপস্যায় বসিলেন।

মেয়ের এই দৃঢ়সংকল্প, এই কঠোর তপস্যার কথা শুনিয়া জননী মেনকা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন

উঃ মা।

মেনকা বলিলেন, না, মা, কাজ নাই, এই কঠোর তপস্যায়। কিন্তু পার্ব্বতী কর্ণপাত করিলেন না। মাতার নিষেধ শুনিলেন না। দুশ্চর তপস্যায় মগ্না রহিলেন এবং অবশেষে শিবকে পতিরূপে পাইলেন।

সেই হইতে মায়ের আর এক নাম উমা।

৬। কৌষিকী।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুশ্চর তপস্যা করিয়া বরপ্রাপ্ত হইলেন যে, কোন গর্ভজাত প্রাণী তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না।

সেই বর পাইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভ কাহাকেও গ্রাহ্য করিল না এবং নানা অত্যাচারে সমস্ত চরাচরকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

দেবতারা ও সন্ত্রাসিত হইল। নিরুপায় হইয়া তখন দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার উপদেশে তাঁহারা শিবের নিকট গেলেন। দেবতারা শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "হে শিব! আপনি দেবীকে এমনভাবে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলুন, যাহাতে দেবীর মধ্যে নব শক্তি জাগ্রত হয়।

শিব রহস্যচ্ছলে গৌরবর্ণা দেবীকে কালী বলিয়া উপহাস করিলেন। দেবী তাহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া নিজের বর্ণকোষ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তপস্যা করেন।

তপস্যার প্রভাবে তাঁহার দেহ হইতে অপরূপা আর এক নারী-মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। সেই দেবীরই নাম কৌষিকী।

অযোনী সম্ভবা সেই কৌষিকী দেবীর হস্তেই শুম্ভ নিশুম্ভ নিহত হইয়াছিলেন।

সেই থেকে গৌরীর অপর নাম কৌষিকী।

৭। হৈমবতী।

স্বর্গের দেবতারা নিজের অপার শক্তির ঐশ্বর্য্যে ভাবিতেন, তাঁহারাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তির অধীশ্বর। এই অবস্থায় তাঁহারা একদা দেখিতে পাইলেন, মহাশূন্যকে এক দিব্য আলোর ছটায় বিচ্ছুরিত করিয়া এক রহস্যময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিল। দেবীর এই আলোকচ্ছটায় দেবতারা পর্য্যন্ত মোহিত হইলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার কাছে করজোড়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি জানিতে চাহিলেন, তিনি কে? ইন্দ্র বলিলেন যে তিনি দেবতাদিগের অধীশ্বর। বজ্র তাঁহার অস্ত্র। দেবী বলিলেন, "তোমার এই বজ্র দিয়া এই তৃণখণ্ডকে শাসন করিতে পার কি?" ইন্দ্র বজ্র তুলিতে গিয়া বুঝিলেন, বজ্রের সেই শক্তি নাই। লজ্জায় ইন্দ্র ফিরিয়া গেলেন। তারপর আসিলেন পবনদেব

তাঁহার প্রভঞ্জন শক্তি নিয়া। বরুণদেব আসিলেন তাঁহার প্লাবনশক্তি লইয়া। একে একে অপর দেবতারা ও আসিলেন। কিন্তু কেহ সেই তৃণখণ্ডকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। দেবতারা তখন লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিলেন।

অতঃপর ব্রহ্মা আসিলেন। তিনি বলিলেন—হে দেবগণ! তোমাদের শক্তির দম্ভ চূর্ণ করিবার জন্যই বিশ্বজননী হৈমবতী মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছেন। তিনিই জগতের ধাত্রী, সকল শক্তির অধীশ্বরী। তাঁহারই শক্তিতে এই নিখিল নরনারী কীটপতঙ্গ এমন কি তোমরা দেবতারা পর্যন্ত শক্তিশালী। তাই তিনি হৈমবতী।

৮। শ্যামা।

জগজ্জননী গৌরী। কিন্তু প্রয়োজনবোধে সেই কষিতকাঞ্চন-বর্ণাও শ্যামা হন।

যাঁকে পাওয়ার জন্য মাকে দুশ্চর তপস্যা করিতে হইয়াছিল, মায়ের এই শ্যামারূপ সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকেই দেখান হয়।

সতীজন্মের পিতা দক্ষরাজ এক বিরাট যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে ত্রিভুবনের দেবতা, ঋষি, তপস্বী সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। বাদ পড়িলেন মহাদেব। শ্মশানচারী ভিখারী শিবকে দক্ষরাজ অবজ্ঞা করিলেন।

যজ্ঞের কথা শুনিয়া বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য দেবীর অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু দেবাদিদেব কিছুতেই দেবীকে বাপের বাড়ী যাইতে সম্মতি দিলেন না। দেবী বহু অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু মহাদেব অচল, অটল। তখন দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার ভিতর হইতে ভীষণা এক শ্যামামূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া মহাদেবের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন।

সেই মহাভয়ঙ্করী, রাত্রিরূপিণী শ্যামা মূর্ত্তি দেখিয়া মহাদেব পর্য্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি যেদিকে চাহেন, সেইদিকেই দেখিতে

পান, সেই ভীষণা ক্রুদ্ধা শ্যামা মূর্ত্তি আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া মহাদেবের দিকে তাকাইয়া অট্টহাস্য করিতেছেন।

ভীত হইয়া মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি চাও? দেবী তখন নিজের পরিচয় দিলেন এবং পিতৃগৃহে যাওয়ার অনুমতি আদায় করিয়া লইলেন।

সেই হইতে দেবী আমাদের অপর নাম ধরেন মা শ্যামা।

৯। শিবদূতী।

চণ্ডাসুরকে নিধন করিবার পর মহাদেবী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করিতে পারিলেন না। কারণ, অসুররাজ শুম্ভ আর নিশুম্ভ চণ্ডাসুরের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন। নিজেরাই তৎক্ষণাৎ মহাদেবীর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আগাইয়া আসিলেন।

শুম্ভ মায়াবলে শত সহস্র অসুর সৃজন করিয়া মহাদেবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইল। দেবতারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন মহাদেবী শিবকে ডাকিয়া বলিলেনঃ—

"হে শিব! তুমি আমার দূত হইয়া শুম্ভের কাছে যাও। আমি এখনও তাহাকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিতেছি। সে পাতালে যাইয়া বাস করুক।"

শিব মহাদেবীর এই বার্ত্তা লইয়া শুম্ভের কাছে গেলেন। সেই হইতে মহাদেবীর অপর নাম শিবদূতী।

কিন্তু প্রচণ্ড দম্ভে শুম্ভ শিব-দূতকে অবজ্ঞা করিলেন ও ফিরাইয়া দিলেন। শিব যে স্বয়ং দূত হইয়া তাহার নিকট গেলেন, তাহাও খেয়াল করিলেন না।

শুম্ভ নিজেই শিবদূতীর হাতে নিজের নিধন আগাইয়া আনিল। সেই হইতে মহাদেবী শিবদূতী।

১০। গণেশ জননী।

পার্ব্বতী তপস্যা করিয়া মহাদেবের অন্তর জয় করিলেন এবং তাঁর ঘরণী হইলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল অতীত হইল, তাঁহাদের কোন পুত্র সন্তান হইল না। এদিকে দেবীর অন্তরে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। পুত্রলাভের আশায় তিনি ভগবান নারায়ণের আরাধনা আরম্ভ করিলেন। তখন দেবীকে মাতৃরূপে পাওয়ার জন্য স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। পুত্রমুখ দর্শনে পার্ব্বতীর অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সুন্দর কুসুমোপম পুত্রের মুখ দর্শন করিতে স্বয়ং মহাদেব সমস্ত দেবতা-দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকল দেবতারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। কিন্তু শনি আসিলেন না।

মহাদেবের আশ্বাস বাণীতে অবশেষে শনি নবজাতককে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু এই সুন্দর সুকোমল নবজাতকের উপর শনির দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মস্তক ভস্মীভূত হইল। পার্ব্বতীর মাতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। পার্ব্বতীর নিদারুণ শোক দেখিয়া স্বয়ং মহাদেবও বিচলিত হইলেন। তখন নারায়ণ ব্যস্ত হইলেন এবং চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইলেন, পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে এক গজেন্দ্র ঘুমাইয়া আছে। তখনই সুদর্শন চক্র দ্বারা নারায়ণ সেই গজেন্দ্রের মস্তক ছিন্ন করতঃ পার্ব্বতীপুত্রের স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিলেন। নবজাতক আবার জীবিত হইয়া উঠিল।

গজমুণ্ডধারী সেই শিশুকে পার্ব্বতী আনন্দে কোলে তুলিয়া লইলেন। এবং তাঁহারই ইচ্ছায় ও আশীর্ব্বাদে সেই পুত্রের নাম হইল গণেশ। সকল পূজার আগেই তাঁহার পূজা করিতে হইবে। কারণ, তিনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ।

আর পুত্রের গৌরবে গৌরবান্বিতা মাতা জগৎ সংসারে পরিচিতা হইলেন, গণেশ জননী।

১১। ছিন্নমস্তা।

বিশ্বের একদিকে শস্যশ্যামলা শোভা এবং স্নেহ মমতা ভালবাসায় ভরপুর গৃহাঙ্গন। আর অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ব্যাধি ও আর্ত্তবেদনায় বিশুষ্ক ভয়ঙ্করতা। দেবী নিজের সৃষ্টিকে নিজেই ধ্বংস করিতেছেন। নিজেই নিজের রুধির পান করিতেছেন। এই বেশে দেবী ছিন্নমস্তারূপে পরিচিতা।

এই অবস্থায় মহাদেবীর সহচরী জয়া ও বিজয়া নহে। তাঁহার সহচরী হইলেন ডাকিনী ও যোগিনী।

ডাকিনী ও যোগিনীকে লইয়া মহাদেবী একদিন যখন জলকেলি শেষ করিয়া উঠিলেন, সহচরীদ্বয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বলিল, "আমরা ক্ষুধার্ত্ত, আমাদের খাদ্য দাও।" মহাদেবী নানা প্রকার খাদ্য আনিয়া দিলেন, কিন্তু ডাকিনী ও যোগিনী সেই সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,"আমরা রক্ত পান করিব, রক্ত চাই।"

তখন মহাদেবী অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। নিজের নখাগ্র দিয়া নিজের কণ্ঠ ছিন্ন করিলেন। ছিন্নকণ্ঠ শির তাঁহার বামহস্তে আসিয়া পড়িল। মুক্তকণ্ঠ হইতে তখন রক্তস্রোত ত্রিধারায় উৎসের মত নির্গত হইতে লাগিল। মহাদেবীর দুই পাশে দাঁড়াইয়া ডাকিনী যোগিনী দুই সহচরী "হাক্" করিয়া দুই মুখে দুই রক্তধারা পান করিতে লাগিলেন। তৃতীয় ধারা দেবী স্বয়ং ছিন্ন মুণ্ড দিয়া পান করিতে লাগিলেন।

যদিও দেবী কৃপাসাগরী এইরূপে তিনি মহাভয়ঙ্করী ছিন্নমস্তা।

১২। অন্নপূর্ণা।

যদিও ভিখারী শিবের ঘরণী তবুও জগন্মাতা অন্নপূর্ণা। রাজরাণী মা মেনকার সমস্ত নিষেধ উপেক্ষা করিয়া পার্ব্বতী স্বেচ্ছায় শ্মশানচারী নিঃসম্বল শিবকেই পতিরূপে বরণ করিয়া লইলেন। দেবী শ্মশানে সংসার পাতিলেন।

শিব সিদ্ধির নেশায় মশগুল্। সংসারের দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। সেই কারণে উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য কলহ নিয়মিত-ভাবে আরম্ভ হইল। নিশ্চেতন শিবকে জাগাইবার জন্য দেবী চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন।

ঘরে অন্ন নাই, খাদ্য নাই, দারুণ অনাটন ইত্যাদি দেবীর নানা-প্রকার গঞ্জনায় ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া শিব অন্নের সংস্থানে বাহির হইলেন। এমনই দুর্ভাগ্য, শিব যেখানেই যান, সেখানেই শোনেন, হা অন্ন, হা অন্ন, সেখানেই দেখেন দারুণ অন্নাভাব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়াও কোথাও একমুষ্টি অন্ন পাইলেন না। কি করিয়াই বা পাইবেন?

দেবী সমস্ত অন্ন আত্মসাৎ করিয়া কাশীতে করিয়াছেন "অন্নকুট"। সেই সংবাদ পাইয়া ভিখারী শিব ছুটিয়া কাশীতে আসিলেন। দেখিতে পাইলেন জগতের সমস্ত অন্ন সংগ্রহ করিয়া দেবী অন্নপূর্ণামূর্ত্তিতে কাশীতে অন্ন বিতরণ করিতেছেন।

ভিখারী শিব অন্নপূর্ণা মায়ের সম্মুখে ভিক্ষার ঝুলি বাড়াইয়া দিলেন।

সেইদিন হইতে বিশ্বের অন্নদাতাকে অন্ন দান করিয়া জগন্মাতা হইলেন অন্নপূর্ণা।

১৩। শাকম্ভরী।

একবার এই পৃথিবীতে শতবর্ষ ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বুক হইতে নিত্য হাহাকার উঠিতে থাকে। লোকে প্রথম প্রথম গাছের পাতা খাইয়া বাঁচিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অনাবৃষ্টি হেতু "খরা"র এমনই প্রভাব হইল যে দেখিতে দেখিতে গাছের পাতা ও জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল। পৃথিবী হইতে সবুজ শ্যামলিমা মুছিয়া গেল। যাবতীয় তৃণ পুড়িয়া গেল।

সেই ভয়াবহ ব্যাপারে পৃথিবী জনহীন হইতে লাগিল। তবুও

যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা অন্তর হইতে বিশ্বজননীকে আহ্বান জানাইল। তখন দেবী জনগণের আহ্বানে চুপ থাকিতে পারিলেন না।

তিনি নিজের দেহ মধ্য হইতে সবুজ শাক উৎপন্ন করিয়া জীবের প্রাণরক্ষা করিলেন।

এইভাবে শাকের দ্বারা দেবী তাঁহার ভক্তদের ভরণপোষণ প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম শাকম্ভরী।

তৃণে, লতায়, সবুজে, শাকে যে প্রাণ সে প্রাণ অনন্ত প্রাণশক্তির আধারভূতা শাকম্ভরী।

১৪। ভদ্রকালী।

যজ্ঞকালে দক্ষরাজা নিজের জামাতা শ্মশানচারী শিবকে বড়ই রূঢ়ভাবে অপমান করেন। শিবকে বাদ দিয়া অপর সমস্ত দেবতাকে নিমন্ত্রণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া শিব মহাক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন।

তিনি তাঁহার প্রধান প্রমথ অনুচর বীরভদ্রকে আদেশ করিলেন, যজ্ঞস্থলে গিয়া যেন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে। শিবানীর ও শিবহীন যজ্ঞের ধ্বংস দেখিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল। কিন্তু সশরীরে তিনি যাইতে চাহিলেন না।

তখন শিব তাঁহার প্রমত্ত ক্রোধের শিখা হইতে দেবীর শক্তিকে নবমূর্ত্তিতে জাগাইয়া তুলিলেন। সেই নবমূর্ত্তিই হইল ভদ্রকালী। এই ভদ্রকালীরূপে শিবানী বীরভদ্রের সঙ্গে দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস দেখিতে আসিলেন।

বীরভদ্রের তাণ্ডবে দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। শিবের প্রমত্ত ক্রোধের প্রতীক বীরভদ্র দক্ষকে বধ করিলেন। খড়্গ দিয়া দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন করতঃ ভদ্রকালীকে উপহার দিলেন। দক্ষের সেই ছিন্নমুণ্ড লইয়া ভদ্রকালী শিবের কাছে ফিরিয়া আসিলেন।

তাই শিবের প্রমত্ত ক্রোধের শিখা হইতে যাহার জন্ম, তিনি মহাভয়ঙ্করী ভদ্রকালীরূপে খ্যাতা।

১৫। সাবিত্রী।

প্রলয়ের মহাসাগরে অনন্ত নাগের শয্যায় ভগবান নারায়ণ অভিভূত হইয়া আছেন। এইভাবে কল্পকল্পান্তকাল চলিয়া গেল। তখন নারায়ণের নাভিদেশ হইতে উত্থিত এক মৃণালদণ্ডের উপর পদ্মাসনে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। আর কোথাও কোন জীবনের সাড়া নাই। এই সময়ে নারায়ণের কর্ণমূল হইতে দুই মহাবলশালী অসুর, মধু ও কৈটভের উৎপত্তি হইল।

মধু ও কৈটভ সম্মুখেই পদ্মের আসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিলেন। ব্রহ্মা মহা বিপন্ন হইলেন। কারণ তখনও নারায়ণ যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন। ব্রহ্মা ভাবিতেছেন তিনি কি করিবেন।

এমন সময় ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন নিদ্রিত নারায়ণের দেহ হইতে বিষ্ণু ও জিষ্ণু নামক দুই মহাশক্তিশালী পুরুষ তাঁহাকে রক্ষা করিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ইহা দেখিয়া মধু ও কৈটভ মায়াবলে নিজেদের চেহারা ঠিক বিষ্ণু আর জিষ্ণুর মত করিয়া ফেলিলেন। তখন কে কোন্ ব্যক্তি ঠিক করিতে না পারিয়া উভয়পক্ষ ব্রহ্মাকে সাক্ষী মানিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা তখন মহাবিপদে পড়িলেন। প্রকৃত বিষ্ণু ও জিষ্ণুকে তিনি কি করিয়া চিনিবেন? উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি আদ্যাশক্তির ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ধ্যানে তুষ্টা হইয়া আদ্যাশক্তি ব্রহ্মার শিরোদেশ ভেদ করতঃ এক অপরূপ লাবণ্যময়ী দেবীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। তিনিই প্রকৃত বিষ্ণু ও জিষ্ণুকে চিনাইয়া দিলেন। তাঁহার জ্ঞানদায়িনী শক্তিতে সত্য পরিস্ফুট হইয়া গেল।

নিখিল নরনারীর অন্তরে যিনি জ্ঞানের অম্লানশিখা জ্বালাইয়া দিলেন, তিনিই জ্ঞানরূপিনী সাবিত্রী।

১৬। বরদা।

সোমদেব দক্ষরাজের ২৬টি কন্যাকে বিবাহ করেন। কোন কারণে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া সেই ছাব্বিশটি পত্নীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। স্বামী পরিত্যক্তা দক্ষকন্যারা প্রভাস তীর্থে আসিয়া মাতৃদেবীর তপস্যায় বসিয়া গেলেন। দীর্ঘকাল তপস্যা হেতু তাঁহাদের দেহ ক্ষীণ ও অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা তপস্যার আসন ত্যাগ করিলেন না। তখন দেবী সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কি চাহে? কিসের জন্য এমন দুশ্চর তপস্যা করিয়া দেহপাত করিতেছে?

তখন দক্ষকন্যারা নিজেদের স্বামী পরিত্যক্তা হওয়ার সমস্ত কাহিনী দেবীকে জানাইয়া বলিলেন, "হে দেবি! যদি সন্তুষ্টা হইয়া আমাদের দর্শন দিয়াছেন তবে আমাদিগকে রূপ, লাবণ্য ও অক্ষয় সৌভাগ্য দিন। দুর্ভাগিনী বলিয়া স্বামী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অক্ষয় সৌভাগ্য নিয়া আবার যেন স্বামীর প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারি।"

মহাদেবী প্রীতা হইলেন এবং সেইরূপ বর দিয়া গেলেন। দেবীর বরেই সোমদেব অচিরকালের মধ্যেই তাহাদিগকে আনন্দে আবার ঘরে লইয়া গেলেন।

সেই থেকে সেই বরদায়িনী দেবী জগতে পূজিতা হইতেছেন। তিনিই সেই দেবী বরদা।

(ঘ) ধর্ম্মাত্মাদের বাণী।

১। শ্রীগৌতম বুদ্ধদেবের বাণী।

(ক) সুখের নির্ব্বাণ, দুঃখের নির্ব্বাণ, ইন্দ্রিয়ের নির্ব্বাণ এবং ইচ্ছার নির্ব্বাণ হইলে বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়।

(খ) ভগবান বুদ্ধদেব, তাঁহাকে জিজ্ঞাসারত বণিকের কথা শ্রবণ করিয়া বলেন, "আপনার কথা সত্য। আমিও ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকি। তবে আমার কর্ষণোপযোগী ভূমি ও বীজ স্বতন্ত্র। মানবের হৃদয় আমার ভূমি, জ্ঞান আমার হল্, বিনয় তাহার ফাল এবং উৎসাহ ও উদ্যম আমার বলদ।

হৃদয়রূপ ভূমি কর্ষিত হইলে, বিশ্বাসরূপ বীজ তাহাতে বপন করিয়া দেই। ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া নির্ব্বাণরূপ ফসল উৎপন্ন হয়। ঐ ফসলই আমি তৃপ্তির সহিত আহার করি।"

(গ) শ্রীবুদ্ধদেব অন্তিম সময়ে তাঁহার শিষ্যদের চারিটি উপদেশ দেন।

১। হে শিষ্যগণ! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং জিহ্বাকে সংযত রাখিবে। ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিলে নির্ব্বাণ রাজ্যে শীঘ্রই পৌঁছিতে পারিবে।

২। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা আপনাকে আপনি জাগ্রত রাখিবে। আপনাকে আপনি পরীক্ষা করিবে। এইরূপ সতর্কতার সহিত নিজকে রক্ষা করিলে তোমরা শান্তি পাইবে। পাপ করিও না। সৎকার্য্যে সদা রত থাকিবে। অন্যের হৃদয়কে সংশোধন করিবে।

৩। জলের দ্বারা কর্দ্দম উৎপন্ন হইলে তাহা যেমন জলের দ্বারাই ধৌত হইয়া যায়, সেইরূপ মন কর্ত্তৃক পাপ অনুষ্ঠিত হইলে, মনের দ্বারাই তাহা বিনষ্ট করা যায়।

৪। ছায়া যেমন মনুষ্যকে ত্যাগ করে না, সেইরূপ যাঁহাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য পবিত্রতাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে, সুখ ও শান্তি কদাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না।

২। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী।

শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন,

"আপনি যে বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে ভূষিত, তাহাতে ঐশ্বরিক কোন বিষয় জানিতে সমর্থ হইবেন না। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে তাঁহাকে বিশ্বাস ব্যতীত পাওয়া যায় না। ভগবানের সহিত আমাদের চির সম্বন্ধ। ভক্তিযোগ মার্গে এই সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে ভগবানে প্রেম ও ভক্তি। আত্মারাম ধর্ম্মাত্মারাও ভগবানে ভক্তি লইয়া থাকেন।"

আর একদিন সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন,

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুণা,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অভিমান শূণ্য হইয়া সদা হরি নাম কীর্ত্তন করিবে।

"তৃণ হইতে নীচ হইয়া সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান।
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে
ভর্ৎসনে তাড়নে কা'রে কিছু না বলিবে।
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়,
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়।

এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব,
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব।
সদা নাম লইব যাহা লাভেতে সন্তোষ;
এই ত আচার করে ভক্তি ধর্ম্ম পোষ।"

"নামরূপে অবতার কৃষ্ণ কলিকালে"। এই কলিকালে আর কিছুই করিবার নাই। শুধু নাম শুনিবার জন্য একটু কান পাতিয়া থাকিও। ততটুকু ঔৎসুক্য ও যখন নাই তখন শ্রীভগবান নিজেই কাঙ্গাল সাজিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে নাম বিলাইতে বাহির হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে চাহি না। কিন্তু তাঁর ভীষণ দায়। তিনি আমাদের চাহেন। তিনি নিজে শুনিবেন বলিয়া আমাদিগকে নাম শিখাইতেছেন, নাম শুনাইতেছেন, যদি অভ্যাসবশতঃ নাম আমাদের মনে আসে।

"পড়িলাম, শুনিলাম এতদিন ধরি,
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি"!
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।

বৈষ্ণবতত্ত্ব কি, জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম বৈষ্ণব উত্তর দিয়াছিলেন,

১। উপাস্য দেবতার প্রতি অসাধারণ প্রীতি ও অনুরাগ জন্মাইবার নাম ভক্তি। কায়মনোবাক্যে ভগবানের অনুগত হওয়াই

২। নাস্তিক সঙ্গগ্রহণ, কুশিষ্য ও কুবন্ধুগ্রহণ, বৈষ্ণব সম্ভাষণে ও সদ্ব্যবহারে ত্রুটি করা, আলস্য করা, কুসংস্কার রক্ষা করা, পরনিন্দা করা ও জীবহিংসা করা ও কলহ করা ও পরস্ত্রী কামনা করা, সেবায় অযত্ন করা, অহংকার করা, হরিনামের অপব্যবহার করা, কোন শ্রেষ্ঠ বিষয়ের সহিত হরিনামের তুলনা করা ও ভগবানের নিন্দা শ্রবণ করা, এইগুলি আত্মসর্ব্বনাশকারী অপরাধ বলিয়া সতত স্মরণ রাখিবে।

৩। "হরি" এই দুইটি অক্ষর যাঁহার জিহ্বাগ্রে সতত বর্ত্তমান তাঁহার তীর্থে প্রয়োজন কি?

বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্,
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

৩। সাধু তুলসীদাসের বাণী।

সাধু তুলসীদাস প্রথম জীবনে অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। স্ত্রীকে এক মুহূর্ত্তও না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। পত্নীর সঙ্গে তাহার বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিলেন। পতির এই স্ত্রৈণ ভাব পত্নী সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন,

"লাজ না লাগত আপুকো, ধৌরে আয়েহু সাথ,
ধিক্ ধিক্ আয়সে প্রেম্‌কো, কহা কহোঁ মৈ নাথ।
অস্থিচর্ম্মময় দেহমম, তামো জৈসী প্রীতি,
তৈসি জো শ্রীরামমহ, হোত ন তব্ব ভবভীতি॥"

স্বামিন! এই অস্থি চর্ম্ম মাংস শোণিত নির্ম্মিত আমার অনিত্য শরীরের জন্য, যে পরিমাণ তোমার স্নেহ ও প্রেম বিরাজিত আছে, যদি সেই পরিমাণ স্নেহ ও প্রেম ভূতভাবন ত্রিলোক প্রকাশক শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি ইহলোকে ও পরলোকে বিমল আনন্দের অধিকারী হইতে পারিতে।

তুলসীদাস শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। তিনি এই মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে আসিলে, এক ব্যক্তি তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্র দর্শন করাইবেন বলিয়া প্রতারণা করতঃ মদনগোপালের মন্দিরে লইয়া যায়। তুলসীদাস মদনমোহনের হস্তে বংশীদর্শনে বলিয়াছিলেন,

কাঁহা কহোঁ ছবি আজকী ভালেব নেহো নাথ,
তুলসী মস্তক তব নোয়ে ধনুষবান লেও হাত।

ভক্তবছল ভগবানকী, বেদবিদিত ইহ গাথ।
মুরলী মুকুট ছরাউকে নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥

হে নাথ। আজি যে অপূৰ্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছেন, তাহা আর কি কহিব? কিন্তু ধনুর্ব্বাণ হস্তে গ্রহণ না করিলে, তুলসী মস্তক নত করিবে না। এই কথা শুনিয়া বেদগাথা ভক্তবৎসল শ্রীহরি চূড়া ও বাঁশী লুকাইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়াছিলেন।

৪। সাধক কমলাকান্তের বাণী।

সাধক কমলাকান্ত বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের গুরু ছিলেন। মহারাজের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সাধক কমলাকান্তকে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কামিনী কাঞ্চন লইয়া কিরূপে ভজনা করেন"? উত্তরে সাধক কমলাকান্ত বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর সতী নারীগণ সেই আদর্শ সতী ভগবতীর অংশরূপিনী।" চণ্ডীতে আছে "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকল জগৎসু"। জগতে সমস্ত স্ত্রীই সাধারণতঃ জগদম্বার অংশভূতা। বিশেষতঃ সতীগণই সেই মহাশক্তি সতীর শক্ত্যংশ স্বরূপিনী সন্দেহ নাই। এতএব স্ত্রী কদাচ সাধন ভজনের বিঘ্নকারী নহে, বরং সহায়স্বরূপিনী। সাধ্বী স্ত্রী সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে:—

নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধু নাস্তি ভার্য্যাসমাগতি
নাস্তি ভার্য্যাসমোলোকে সহায়ো ধৰ্ম্ম সংজ্ঞকে॥

এইরূপ রমণী কদাচ "কামিনী কাঞ্চনের" কামিনী নহেন। ইঁহারাই সাধনে সমধিক সহায়।

এহেন স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাধক কমলাকান্ত স্ত্রীকে চিতাশয্যায় শয়ন করাইয়া অগ্নি প্রদানান্তে নিম্নলিখিত গানটী নিজে রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন।

কালি! মা! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন যেমন, তেমন রাখছি সদা সেটা।

তোমার যারে কৃপা হয় তার সৃষ্টিছাড়া রূপের ছটা,
তার কটিতে কৌপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি কৌটা,
তুমি যেমন ঠাকুর ও তেমন, ঘুচলনা তার সিদ্ধি ঘোঁটা।
দুঃখে রাখ সুখে রাখ করব কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর পুছতে নারি সাধের ফোটা।
জগৎ জুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এমন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যভার, ইহার মর্ম্ম জানবে কেটা।

সাধক গাহিতেন :—

জ্ঞাতি বন্ধু সুতদারা সুখের সময় সবাই তারা।
বিপদকালে কেও কোথাও নাই, হই কেন আমি মন মরা।
এই অধম সেবক সদা মাগে স্থান তব রাঙ্গা চরণে।

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী।

(ক) "তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা? যে সংসারত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। তাতে আর বাহাদুরী কি? সংসারে থেকে যে ডাকে সেই ধন্য। সে বিশমন পাথর সরিয়ে তবে দেখে।"

(খ) একদিন কেশব সেন সখেদে ঠাকুরকে কহিলেন, "মশাই বলুন, আমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে না কেন?" ঠাকুর ঈশ্বরময়। তিনি মনরাখা বা খাতির করিয়া কথা বলেন না। সোজা বলিয়া দিলেন, "লোকমাণ্য, বিদ্যা এই সব নিয়ে তুমি আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ মুখে চোষে ততক্ষণ মা আসে না। খানিক পরে চুষি ফেলে দিয়ে যখন চীৎকার করে কেঁদে উঠে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে, দৌড়ে আসে। তুমি মোড়লী করছো। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো তাই থাক্।"

(গ) অনেক সময় ঠাকুর বল্‌তেন,

"ওরে! ভগবৎ দর্শন না হলে, কাম একেবারে যায় না। কি জানিস্, তোদের এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস্ না। বন্যা এলে কি বাঁধ মানে? কলিতে মনের পাপ, পাপ নহে। মনে কুভাব এলো বলে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসিস্ না। মায়ের নিকট খুব প্রার্থনা কর্‌বি ও তাঁর কথাই ভাববি। ওগুলো ক্রমে ক্রমে বিলীন হবে, নাশ হয়ে যাবে।"

(ঘ) ঠাকুরের এক ভক্ত একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার?"

ঠাকুর বলিলেন "ওরে! ঈশ্বর সাকার ও বটে আবার নিরাকার ও বটে। যেমন জল আর বরফ। বরফ জল ছাড়া আর কিছুই নহে। বরফের আকার আছে, জলের নেই। ভক্তি হিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের জল জমে বরফের মত নানা আকার ধারণ করে।"

৬। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের প্রশ্নোত্তর মালিকা।

পথ কি?	যতমত ততপথ।
দেবতা হইতে বড় কে?	মানুষ।
মানুষ কে?	যে মান্ হুঁস্—সে।
আমি কে?	তুমি।
দয়া কি?	সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া।
চাতুরী কি?	যে চাতুরীতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।
সিদ্ধ কে?	যে পরের দুঃখে কাঁদে।
তত্ত্বজ্ঞান কি?	আত্মজ্ঞান।
লাভ কেমন?	ভাব যেমন।

দেহের যত্ন করবে কেন ?	ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করবে বলে।
ঈশ্বর কে ?	মানুষ।
কোথায় ?	ভক্তের হৃদয়ে।
জ্ঞান কি ?	এক জানার নাম জ্ঞান।
অজ্ঞান কি ?	অনেক জানার নাম অজ্ঞান।
যখন হোথা ?	তখন অজ্ঞান।
যখন হেথা ?	তখন জ্ঞান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম

সংসারার্ণব ঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
স্থাপকায় ধর্ম্মস্য, সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে,
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।
অদ্বৈত নিত্যবিগুণং পরমাত্মতত্ত্বং
শ্রীভক্তিচিত্ত সগুণং ভজনানুরূপং,
কারুণ্যপুণ্যনিলয়ং যুগধর্ম্মনিষ্ঠং
দীনার্ত্ত দুঃখশরনং ভজ রামকৃষ্ণং।

(সন্ন্যাসিনী দুর্গাপুরী।)

৭। স্বামী বীবেকানন্দের বাণী।

(ক) যস্য বীর্য্যেন কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ,
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শিবং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥

যাঁর শক্তিতে আমরা ও সমুদয় জগৎ কৃতার্থ, সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।

(খ) বীর্য্যই সাধুত্ব, দুর্ব্বলতাই পাপ, বীর্য্যবান হইবার চেষ্টা কর। আমাদিগকে সম্মুখেই অগ্রসর হইতে হইবে।

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্ম্মচিন্তার সাকার বিগ্রহ স্বরূপ। যে তাঁকে নমস্কার করে, সে সেই মুহূর্ত্তে সোনা হইয়া যাইবে।

(ঘ) আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র ভারতমাতার সেবা। আপাততঃ অন্য সকল মূর্ত্তি আমাদের মন থেকে মুছে যাক্। ইনিই একমাত্র জাগ্রত দেবতা। আমাদের জাতিও আমাদের সমাজের মধ্যে ইনি বিরাজিতা, সর্ব্বত্র এঁর পাণিপাদ, সর্ব্বত্র এঁর চক্ষু। সর্ব্ব সমাজের শরীর ইনি আবৃত করে রয়েছেন। আর যত দেবতা তাঁরা এখন নিদ্রিত। যে বিরাট দেবতা আমাদিগকে চারিদিকে ঘিরে রয়েছেন, তাঁকে ছেড়ে অপর দেবতার অন্বেষণে কেন বৃথা আমরা ঘুরে বেড়ায়?

(ঙ) কোন ভয় নাই। অভয়ের মন্ত্র পেয়েছি আমরা। ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, মানে দৈন্যভয়, বিত্তে রাজভয়, বলে শত্রুভয়, রূপে জরাভয়, শাস্ত্রে তর্কভয়, গুণে নিন্দাভয়, দেহে যমভয়। এ জগতে সর্ব্ববস্তুই ভয়ান্বিত। শুধু বৈরাগ্যই অভয়।

(চ) চিত্তশুদ্ধি না হ'লে সেবা কর্ব্বে কি করে? পীড়িতকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষিতকে পানীয়, ক্ষুধিতকে ভোজন, অভ্যাগতকে আবাহন করাই সেবা।

(ছ) কোথায় ঈশ্বর?

বিবেকানন্দ বলেন,—আত্মঘটে, হৃদ্দেশে, তোমার নিজের বুকের মধ্যে।

(জ) আত্মদীপ হও। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্। নিজকে নিজেই উদ্ধার কর। নিজেই নিজের ধাতা। নিজেই নিজের ত্রাতা।

৮। যুধিষ্ঠিরের প্রতি যক্ষের প্রশ্ন ও উত্তর।

১। সূর্য্যকে কে উর্দ্ধে রেখেছে? — ব্রহ্ম।
২। কে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান? — দেবগণ।
৩। কে তাঁকে অস্তে পাঠায়? — ধর্ম্ম।
৪। কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত? — সত্যে।
৫। ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি কারণে? — বেদপাঠ হেতু।
৬। তাদের কোন্ ধর্ম্ম সাধু-ধর্ম্ম? — তপস্যা।
৭। কিসে তাদের মানুষ ভাব? — মৃত্যুতে।
৮। অসাধু ভাব কি? — পরনিন্দা।
৯। ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব কি? — অস্ত্রনৈপুণ্য।
১০। ক্ষত্রিয়গণের সাধুভাব কি? — যজ্ঞ।
১১। ক্ষত্রিয়গণের মনুষ্যভাব কি? — ভয়।
১২। ক্ষত্রিয়গণের অসাধুভাব কি? — শরণাগতকে পরিত্যাগ।
১৩। পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর কে? — মাতা।
১৪। আকাশের চেয়ে উচ্চতর কে? — পিতা।
১৫। বায়ুর চেয়ে শীঘ্রতর কে? — মন।
১৬। তৃণের চেয়ে বহুতর কে? — চিন্তা।
১৭। কি ত্যাগ করলে প্রিয় হয়? — অভিমান।
১৮। কি ত্যাগ করলে শোক যায়? — ক্রোধ।
১৯। কি ত্যাগ করলে ধনী হয়? — কামনা।
২০। কি ত্যাগ করলে সুখী হয়? — লোভ।
২১। সুখী কে? — অঋণী, অপ্রবাসী, শাকান্নভোজী।
২২। আশ্চর্য্য কি? — লোক অহরহঃ মরে। তবুও, বাঁচতে চাহে। ইহাই আশ্চর্য্য।

২৩। পথ কি? নানা মুনির নানা মত। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। অতএব মহাজনের পথই পথ।

২৪। বার্ত্তা কি? মানুষ দিন রাত সংসার কটাহে পাক হচ্ছে। সূর্য্য তার আগুন। দিবারাত্রি তার ইন্ধন। মাস ঋতু তার দরী।

৯। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাণী।

১। মহাপুরুষের লক্ষণ :—

(ক) মহাপুরুষেরা কখনও আত্ম প্রশংসা করেন না। কোন প্রকারে নিজকে বড় বলে জানাইতে চাহেন না বা জানান না।

(খ) মহাপুরুষেরা কখনও পরনিন্দা করেন না। পরনিন্দা সহ্য করেন না।

(গ) মহাপুরুষেরা বৃথা সময় নষ্ট করেন না। আত্মকল্যাণকর যে কোন অনুষ্ঠানে সতত নিযুক্ত থাকেন।

(ঘ) মহাপুরুষেরা সর্ব্বজীবে দয়া করেন।

(ঙ) মহাপুরুষেরা সর্ব্বদা শান্ত, সন্তুষ্ট ও সমাহিত থাকেন। কোন অবস্থায় চঞ্চল হন না।

২। আত্মোন্নতির উপায় :—

(ক) নিজের বিস্ত্রাদি, বিছানা ও আসন সর্ব্বদা পৃথক রাখবে। অপরে যেন ব্যবহার না করে। নিজেও অপরের শয্যা, বস্ত্র ও আসন ব্যবহার করবে না।

(খ) আহার খুব নির্জ্জনে করবে। আহারের বস্তু আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যতীত অপরে যেন না দেখে। অধিক ঝাল, নুন বা টক খাবে না। শুদ্ধ সাত্ত্বিক বস্তু মাত্র আহার করবে।

(গ) খুব কম কথা বলবে। পৃষ্ট বা জিজ্ঞাসিত না হলে আপনা আপনি কথা বলবেনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা ভীষণ দোষ।

(ঘ) যজ্ঞাদি প্রত্যহ করবে, যথা :—

ব্রহ্মযজ্ঞ—ঋষি প্রণীত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, জপ ইত্যাদি।

পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ তর্পণাদি।

দেবযজ্ঞ—হোম, পূজা, যাগ।

ভূতযজ্ঞ—জীবসেবা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সর্ব্বজীবের সেবা।

নৃযজ্ঞ—অতিথি সেবা।

(ঙ) ক্রোধ, দ্বেষ, মান ছাড়িবে। সমস্ত শ্রীভগবৎ চরনে সমর্পণ করিবে। শ্বাস প্রশ্বাসে ভগবানের নাম জপ করিবে।

১০। পরম পণ্ডিত শ্রীঅচিন্ত্য সেন গুপ্তের বাণী।

প্রশ্ন :—চিত্তশুদ্ধি কেমনে হয়?

উত্তর :—ফলকামনা না করে নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করবে। প্রতিমাকে দর্শন, স্পর্শন, স্তব, বন্দনা করবে। সকল প্রাণীতে চিন্তা কর্ব্বে ভগদ্ভাব। মহতে সম্মান, দীনে দয়া, আত্মসদৃশ ব্যক্তিতে মিত্রতা, বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, ভগবানের নামকীর্ত্তন ও সরলতাচরণ করবে। সতের সঙ্গ করবে, আর নিরহঙ্কার থাকবে। গন্ধ যেমন বায়ুযোগে ঘ্রাণকে আশ্রয় করে তেমনি অধিকারীচিত্ত ভক্তি যোগে পরমাত্মাতে আশ্রিত হবে। ভগবানই সর্ব্বভূতের আবাস, সর্ব্বলোকের সাক্ষী।

প্রশ্ন :—সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডী কেন ?

উত্তর :—বাক্য, দেহ আর চিত্ত, এই তিনকে যে দণ্ড দিয়ে শাসন করে বশীভূত করেছে, সেই যতি, ত্রিদণ্ডী। মৌন হচ্ছে বাক্যের দণ্ড, কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ দেহের দণ্ড, আর প্রাণায়ামই চিত্তের দণ্ড। দণ্ড স্মারক চিহ্ন। সর্ব্বদা সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তুমি কায়মনোবাক্‌কে সংযত করেছ। তুমি নিজেই নিজের দণ্ডদাতা।

দৃষ্টিপূত পদন্যাস কর্ব্বে, বস্ত্রপূত জল পান কর্ব্বে, সত্যপূত বাক্য বলবে ও মনঃপূত আচরণ কর্ব্বে।

(অখণ্ড শ্রীঅমিয় গৌরাঙ্গ—২য় ভাগ। ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা।)

১১। শ্রীকালিকানন্দ অবধূতের বাণী।

"আমি" নামক লোকটা এই জীবন-নাটকটার নামভূমিকার অভিনেতা। কিন্তু নাটকটা যার লেখা, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জ্জির বাহিরে একপা ফেলবার ক্ষমতা আমার নাই। সব চেয়ে বড় মজা এখনও যে অঙ্কটা বাকি আছে তা'তে যে আমায় কি অভিনয় করতে হবে তাও জানবার উপায় নাই।

১২। পরম বৈষ্ণব গোপীবন্ধুর বাণী।

(ক) বিশ্বাস ও সাধুসঙ্গ কাংস্যপাত্র পতনবৎ। অর্থাৎ কাংস্য-পাত্র পতন ও শব্দ যেমন সঙ্গে সঙ্গে হয়, অর্থাৎ পতন আগে না শব্দ আগে যেমন ধরা যায় না, তেমনি বিশ্বাস ও সাধুসঙ্গ পরস্পর নিকট সম্বন্ধ। সাধুসঙ্গ ভগবানে বিশ্বাস আনিয়ে দেয়। বিশ্বাস সাধুসঙ্গ করায়।

(খ) ভগবানে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা অর্থ বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকিলে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না।

(গ) ভগবানে বিশ্বাস আনিতে হইলে সাধন, ভজন ও কীর্ত্তন চাই।

(ঘ) সাধনে তিন প্রকার অনর্থ বা বিঘ্ন রহিয়াছে :—

পারিপার্শ্বিক :—অর্থাৎ সাধনকালে বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের গোলমাল।

দৈহিক :—শরীরের শ্রান্তি। তজ্জন্য আসন, মনন্ ও ধেয়ন দরকার।

মানসিক:—যেমন ভজন সময়ে নানা রূপ, রস, গন্ধ মনে জাগে। মন সঙ্কল্প ও বিকল্প নিয়ে গড়া। এই সব স্থির হলে সাধন সহজ হয়। সাধনে হয় ভালবাসা। ভালবাসায় হয় প্রেম। প্রেমে হয় উল্লাস। উল্লাসে হয় আনন্দ। আনন্দে হয় লয় প্রাপ্তি। তখন সমাপ্তি।

১৩। দেবী বিন্দুবাসিনীর কথা।

(ক) সব সময়, সকল কাজের মধ্যে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে পার মত শক্তি সঞ্চয় কর। তাহাই তোমার পরকালের পাথেয়রূপে সঞ্চিত থাকিবে। মহাযাত্রাপথে সহায় হইবে।

খ) মনে, প্রাণে, সুখে, দুঃখে, শান্তি ও অশান্তিতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীনারায়ণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তাঁহার দয়া পাওয়া যায়। তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। আমার জীবনে আমি বহুবার ইহা উপলব্ধি করিয়াছি।

(গ) প্রাণে কষ্ট হইলে প্রাণারামকে ডাকিবে। নির্ম্মল শান্তি পাইবে।

১৪। শ্রীঅরবিন্দের বাণী।

(ক) আমাদের এই জাতীয়তা একটা ধর্ম্ম, যাকে আশ্রয় করে আমরা বাঁচবো। এ একটা ধৃতি, যার সাহায্যে আমরা

জাতির মধ্যে, দেশবাসীর মধ্যে, ভগবানকে প্রত্যক্ষ কর্ব্ব। ভারতের ত্রিশ কোটী মানুষের মধ্যে আমরা তাঁকে পাব।

(খ) নব-জাতীয়তার ইহা এক অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। দেশ মাতৃকার মধ্যে ভগবৎসত্তার আরোপ। মুক্তি যজ্ঞের এই ঋত্বিক দেশকে এক নূতন মন্ত্র ও মন্ত্রচৈতন্য দিয়াছেন। (চারু দত্ত)

(গ) যে কোন মতেই আমায় ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন করিতেই হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে দর্শন করিবার কোন পথ নিশ্চয় আছে।

(ঘ) হিন্দু ধর্ম্ম বলে নিজের শরীরের, নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। সেইপথে যাইবার বা অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে। আমি তাহা পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে বুঝিলাম হিন্দু ধর্ম্মের কথাই সত্য। যে যে চিহ্নের কথা বলিতেছে, আমি নিজেই সেই সব উপলব্ধি করিতেছি।

(ঙ) আলিপুরের নির্জ্জন কারাবাসের মধ্যে আমি অপূর্ব্ব প্রেমশিক্ষা পাইলাম। কারাগারের পরিবেশ আমার কাছে জীবন্ত ও চৈতন্যময় হইয়া উঠিল। তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করিল। গীতার সাধনা আমি অনুধাবন করিতে সক্ষম হইলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝ্তে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি ও উপলব্ধির ভিতর দিয়ে জান্তে হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে কি চেয়েছিলেন। যখন আমি পদচারণা করতাম, সেই সময়ে তাঁর শক্তি পুনঃ প্রবেশ করিল। যে জেল আমাকে মানবজগত হইতে আড়াল করে রেখেছে, সেই দিকে আমি তাকালাম। কিন্তু স্পষ্ট দেখ্লাম, আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালগুলির মধ্যে বন্দী নহি। আমাকে ঘিরে রয়েছেন স্বয়ং বাসুদেব।

১৪। তুলসীদাসের দোঁহা।

(বঙ্গানুবাদ সহ)।

(১)

দয়া ধরমকি মূল হৈঁয়, নরক মূল অভিমান্
তুলসী। দয়া নে ছাড়িয়ে, যবলগ্ ঘট্‌মে প্রাণ।

(ধর্ম্মের মূল দয়া, এবং নরকের মূল অভিমান বা অহংকার। হে তুলসীদাস, তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও দয়া প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিবে না।)

(২)

এক রাহমে হোতে হৈঁয়, তুলসী! মুত্ আর পুত্,
রাম ভজতো পুতহিঁ নহিতো মুত্‌কা মুত।

(হে তুলসীদাস! পুত্র ও মূত্র এক পথেই নির্গত হয়। যে ভগবান রামচন্দ্রের ভজনা করে, সে পুত্র। অধার্ম্মিক পুত্র মূত্র হইতেও নিকৃষ্ট।)

(৩)

রাম রাম সব কোই কহে, ঠক, ঠাকুর ক্যা চোর,
বিনা প্রেমসে রীঝাৎ নহি, তুলসী নন্দকিশোর।

(হে তুলসীদাস, কি দুষ্ট, কি শিষ্ট, কি চোর সকলেই রাম নাম করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি বিনা নন্দকিশোর শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রসন্ন হন না।)

(৪)

তুলসী। ইয়ে সংসার মে, কাঁহা সে ভক্তি ভেট,
তিন বাত্‌সে লটপটি হৈঁয়, দামড়ি, চামড়ি, পেট॥

(হে তুলসীদাস! যখন অর্থ, শিশ্ন ও উদর লইয়া সকলেই ব্যস্ত, তখন এই সংসারে কিরূপে ভক্তিদেবীর সাক্ষাৎ পাইবে?)

(৫)

সব্ ঘট্‌মে হরি বসে, যেঁও গিরিস্থতমে জ্যোতি।
জ্ঞানগুরু চকমক্ বিনা, কৈসে প্রকট হোতি॥

(সকল জীবের দেহেতেই হরি আত্মারূপে বাস করিতেছেন। যেমন প্রস্তর খণ্ডেই অগ্নি বাস করে। কিন্তু লৌহার ঘর্ষণ বিনা অগ্নি বাহির হয় না। তেমনি জ্ঞান ও গুরুর উপদেশ ব্যতীত আত্মা প্রকাশ পাইতে পারে না।)

(৬)

এক ঘড়ি, আধি ঘড়ি, আধিছমে আধ্।
তুলসী সঙ্গৎসন্তকী, হরে কোটী অপরাধ্॥

(হে তুলসীদাস! এক মুহূর্ত্ত, কিম্বা অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত, অথবা অর্দ্ধার্দ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য যিনি সাধুসঙ্গ করেন, তিনি কোটী কোটী অপরাধ হরণ করেন।)

(৭)

শোতে শোতে ক্যা করো ভাই ওঠ ভজ মুরার।
অ্যাসে দিন আতে হেঁয় লম্বা পা সার॥

(হে ভাই! শয়ণ করিয়া কি কর? উঠ! কৃষ্ণ ভজনা কর। শীঘ্র এমন দিন আসিতেছে যে পাদদ্বয় প্রসারণ করিয়া শয়ন করিতে হইবে।)

(৮)

তুলসী! ইয়ে সংসারমে পাঁচ রতন হেয় সার,
সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীন, উপকার।

(হে তুলসীদাস! এই জগৎ সংসারে সাধুসঙ্গ, হরি গুণগান, সর্ব্বজীবে দয়া, দীনভাব ও পরোপকার—এই পাঁচ রত্নই সার।)

(৯)

সব বন তুলসী ভেয়ো, সব পাহাড় শালগেরাম।
সব পানি গঙ্গা ভেয়ো যেস্ ঘটমে বিরাজে রাম॥

(যাহার হৃদয়ে রাম বিরাজিত আছেন, তাহার নিকট সকল বনই তুলসীবন। সকল প্রস্তরই শালগ্রাম ও সকল জলই গঙ্গা জল।)

(১০)

তুলসী মিঠে বচন সোঁ সুখ উপজত চঁহুতর।
বশীকরনমন্ত্র হেঁয়, পরিহর বচন কঠোর॥

(হে তুলসীদাস। সুমিষ্ট বচন হইতেই সুখ উৎপন্ন হয়। এবং এইরূপ বচনই বশীকরণ মন্ত্র। অতএব কঠোর বচন পরিহার করা একান্ত বিধেয়।)

(১১)

তোম জ্যায়সা রাম পর, তোম্‌সে ত্যায়সা রাম
ডাহিনে যাওতো ডাহিনে যায়, বামে যাওতো বাম।

(অর্থাৎ তুমি যদি অনুকুল ভাবে ভজনা কর, তিনি তোমার প্রতি অনুকুল। প্রতিকুলভাবে ভজনা কর, তিনি তোমার প্রতিকুল হইবেন।)

(১২)

যো যাকো শরণ লিয়ে, সো রাখে তাকো লাজ,
উলট্‌ জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায় গজরাজ॥

(যে ব্যক্তি যাহার শরণাপন্ন হয়, তিনিই তাহার মান রক্ষা করেন। জল-শরণাগত মীন উজান চলে। কিন্তু বৃহদাকার গজরাজ ভাসিয়া যায়।)

(১৩)

তুলসী জগৎমে আইয়ে, সব্‌ সে মিলিয়া ধায়,
না জানি কোন ভেক্‌সে নারায়ণ মিল যায়॥

(তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া চলিতেছেন। তিনি জানেন না নারায়ণ কোন্ ভেকে অর্থাৎ কিরূপে দর্শন দেন।)

(১৪)

নির্গুণ হৈঁয় সো পিতা হামারা, সগুণ হৈঁয় মাহতারি,
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো ছুনো পাল্লা ভারি।

(যিনি নির্গুণ তিনি আমার পিতা। যিনি সগুণ তিনি আমার মাতা। কাহাকেই বা নিন্দা করি, কাহাকেই বা বন্দনা করি, উভয় পাল্লা যে ভারী।)

(১৫)

দিন্‌কা মোহিণী রাত্‌কা বাঘিনী পলক পলক লহু চোষে.
ছুনিয়া সব বাউরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

(দিবসে মোহিনী ও রাত্রে বাঘিনী হইয়া যাহারা প্রতি পলে পলে রক্ত চোষণ করে, জগতের লোক সকল পাগল হইয়া ঘর ঘর সেই বাঘিনী পোষণ করে।)

(১৬)

শ্রীমন্তকো কণ্টক ফুঁকে দরদ পুছে সব কোই,
ছুখিয়া পাহাড়ছে গিরে, বাৎ না পুছে কোই।

(ধনবান ব্যক্তি যদি একটা কাঁটা ফুটে, সকলেই জিজ্ঞাসা করে। ছুঃখী পাহাড় থেকে পড়িয়া গেলেও কেহ কোন খবর নেয় না।)

(১৭)

তুলসী জগৎ মে আ'কর কর্‌লে:দোনো কাম্‌,
দেনেকো টুক্‌রা ভালা, লেনেকো হরি নাম॥

(হে তুলসীদাস। জগতে ছুইটী কাজ ভাল। দানের সময় এক টুক্‌রা রুটি হলেও দিও। গ্রহণ কালে শুধু হরি নাম লইও। এই ছুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।)

(১৮)

তুলসী। ইয়ে জগ্‌মে আয়েকে কোন্‌ ভজো সোমরৎ,
এক কাঞ্চন ও কুচন্‌কে কিনন পসারা হৎ।

(হে তুলসীদাস। এই জগতে আসিয়া এবম্বিধ কেহ দেখিয়াছ কি, যে কাঞ্চন ও স্ত্রীলোকের কুচের জন্য হস্ত প্রসারণ করে নাই ?)

(১৯)

কৈ কহে হরি দূর হেঁয়, হরি হেঁয় হৃদয় মে,
অন্তরটাটী কপটকে, তাসো সো না সুঝে ॥

(কেহ কেহ বলেন, হরি দূরে আছেন। কিন্তু হরি আমার হৃদয়েই আছেন। অন্তর আমার কপটতার আবরণে আছে বলে তাঁহাকে জানা যাইতেছে না।)

(২০)

জেয়সে পুতলী কাঠকো, পুতলী মাসময় নারী,
অস্থি-নাড়ী-মল-মূত্রময়, যন্ত্রিত নিন্দিত ভারী ॥

(যেমন কাষ্ঠ নির্ম্মিত পুতলী, সেইরূপ মাংস, অস্থি, মলমূত্রময় নারী অভিনিন্দিত যন্ত্রের ন্যায় কোন শোভা ধারণ করে না। তাহা অবিবেকীদের মোহিত করে মাত্র।)

১৬। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর।

(বঙ্গানুবাদ সহ।)

(১)

মূঢ়! জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং,
কুরু তনুবুদ্ধি মনঃসু বিতৃষ্ণাং,
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং,
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং।

(১)

মূঢ়! ধনলাভতৃষ্ণা কর পরিহার,
অল্পমতি মনে কর বৈরাগ্য সঞ্চার,
আপনার কর্ম্মফলে লভিবে যে ধন,
তাহাতেই কর নিজ চিত্ত বিনোদন ॥

(২)

কা তব কান্তা? কস্তে পুত্রঃ?
সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুতো আয়াতঃ,
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।

(২)

কে তব কান্তা, কে তব কুমার?
অতীব বিচিত্র এই মায়ার সংসার।
কোথা হইতে আসিয়াছ, তুমি বা কাহার?
ভাবনা করহ ভাই, এইতত্ত্ব সার॥

(৩)

নলিনীদলগত-জলমতিতরলম্‌,
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্‌,
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং।
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তং॥

(৩)

পদ্মপত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল,
জীবন তেমন হয় অতীব চপল,
জানিও করেছে গ্রাস ব্যাধি-বিষধর।
সমস্ত সংসার তাই শোকে জরজর॥

(৪)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং,
করধৃত-কম্পিত-শোভিতদণ্ডম,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্‌।

(৪)

ধবলবরণ কেশ, শরীর গলিত,
বদন দশনহীন দেখিতে ঘৃণিত,
হাঁটিতে লাগিলে যষ্ঠী সদা কাঁপে করে,
তবুও আশাভাণ্ড, নরে নাহি ছাড়ে।

(৫)

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নং,
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ?

(৫)

যাবৎ জনম হয় তাবৎ মরণ,
জননীর জঠরেতে আবার শয়ন,
এই সংসার এইরূপ দুঃখের আগার,
তবে কেন হে মানব ! সন্তোষ তোমার ?

(৬)

দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ,
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ,
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥

(৬)

দিবস, যামিনী আর সায়াহ্ন, প্রভাত,
শিশির, বসন্ত পুনঃ করে যাতায়াত,
এইরূপ খেলে কাল ক্ষয় পায় আয়ু ;
তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশা বায়ু।

(৭)

সুরবরমন্দির-তরুতলবাসঃ ;
শয্যা-ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ।

(৭)

দেবের মন্দিরে কিম্বা তরুতলে বাস,
ভূতলে শয়ন আর মৃগচর্ম্ম বাস ;
সমুদয় পরিজন ভোগ পরিহার,
এহেন বিরাগে সুখ নাহি হয় কার ?

(৮)

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ,
ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।
নত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ।

(৮)

অষ্টকুলাচল আর সপ্তরত্নাকর,
ব্রহ্মা, পুরন্দর কিম্বা রুদ্র, দিনকর,
তুমি, আমি, এই বিশ্ব সকলি স্বপন,
তবে কেন শোকে তুমি হও নিমগণ ?

(৯)

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ,
পরমব্রহ্মণি ন কোঽপিলগ্নঃ

(৯)

খেলায় আসক্ত যত বালকের দল,
তরুণীতে অনুরক্ত তরুণ সকল,
সংসার চিন্তায় মগ্ন বৃদ্ধ সমুদয়,
পরমব্রহ্মেতে মগ্ন কেহই ত নয়।

(১০)

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত—
তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ,
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর দেহে,
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে।

(১০)

যতদিন করে নর ধন উপার্জ্জন,
ততদিন থাকে বশে নিজ পরিজন,
পরে যবে বৃদ্ধকালে জীর্ণ হয় দেহ,
ডেকেও জিজ্ঞাসে ঘরে নাহি কেহ।

(১১)

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং,
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং,
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ।

(১১)

অর্থ অনর্থের মূল ভাব সদা মনে,
যথার্থই লেশমাত্র সুখ নাহি ধনে,
তনয় হ'তেও হয় ধনশালী ভীত,
সর্ব্বত্রই এই রীতি আছয়ে বিহিত।

(১৭)

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ,
শিষ্যানাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ,
যেষাং করোতি নৈব বিবেকং,
তেষাং কঃ কুরুতঃ মতিরেকং।

(১৭)

পজ্ঝটিকা ছন্দে শ্লোক ষোড়শ রচিত,
শিষ্য উপদেশ তরে হইল কথিত,
ইহাতেও না হইবে বিবেক যাহার,
কে আর উপদেশে কি করিবে তা'র ?

শেষ ইচ্ছা।

"আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার এই নশ্বর দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দিও। যদি বিদেশে কোথাও মরি, আমার দেহ সেখানে দাহ করো, এবং সেই ছাই পাঠিয়ে দিও প্রয়াগে।......সেই ছাই এক মুঠো ছড়িয়ে দিও প্রয়াগের গঙ্গায়,...সেই ভস্মরাশির এক কণিকাও সঞ্চয় করে রেখো না, ছড়িয়ে দিও নিঃশেষে।"

"প্রয়াগে গঙ্গার বুকে এই যে এক মুঠো চিতাভস্ম বিসর্জ্জনের কথা বললাম, তার পেছনে অন্ততঃ আমার তরফ থেকে কোন আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য্য নাই। এ ব্যাপারে আমার কোন ধর্ম্মীয় ভাবাবেশও নাই। সুদূর শৈশবকাল থেকেই প্রয়াগের জাহ্নবী যমুনার সঙ্গে একটি মানসিক একাত্মতা বোধ করেছি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই ভাব ও বৃদ্ধি পেয়েছে।"

"ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমি এই দুই স্রোতস্বিনীর রূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছি। এবং প্রায় ভেবেছি, যুগ যুগান্ত ধরে কত ঐতিহ্য, ইতিহাস আর পুরাণ কথা, কত গান আর গল্প জাহ্নবী—যমুনার তীরে তীরে রচিত হয়েছে, তাদের প্রবহমান জলধারার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গিয়েছে।"

—জওহরলাল নেহরু—

মন্তব্য :—শম্ভু মহারাজের "পঞ্চপ্রয়াগ" প্রথম প্রকাশ—সূচনা হইতে উদ্ধৃত।

প্রশস্তি বাক্য।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
যন্ত্রস্য গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুসূদন
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে।
প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং, সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগৎপিতস্তদেব তব পূজনম্॥
মৎসম পাতকী নাস্তি পাপঘ্নঃ ত্বৎসম ন হি
এবং বুদ্ধ্বা হে প্রাণেশ অপরাধং ক্ষমস্ব মে।
(অথবা) এবং জ্ঞাত্বা হে দেবেশ যথাযোগ্যং তথা কুরু॥

আমি

এই জগতে "আমি ও আমার" এই ভাবই যত অনর্থের মূল। যতদিন "আমি" আছে, ততদিন দুঃখ ও অশান্তির অবধি নাই। "আমি কে?" কত মহাপুরুষ, কত জ্ঞানী, কত গুণী, কতভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই "আমিকে" প্রকৃতভাবে চেনা বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

আমরা সাধারণ কথায় সর্ব্বদা বলি "আত্মানং বিদ্ধি।" নিজেকে জানো। কিন্তু সহজে কি "নিজকে" জানা যায়? এই জানার যে আর শেষ হয় না। কবি তাই বলিয়াছেন, "আপনাকে' এই জানা আমার ফুরাবে না।" আবার জানিয়াও ইহার অন্ত করা যায় না। ইহার শেষ যে নাই।

"শেষ নাহি যে, শেষ বলিবে কে?"

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিয়াছেন "দুটি আমি" আছে। একটি "কাঁচা আমি" আর একটি "পাকা আমি।" "কাঁচা আমি"কে সরিয়ে দিয়ে

"পাকা আমি"কে জানতে হবে। তারপর সেই "পাকা আমি"কেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু মজা এমনি যে "কাঁচা আমি" আমাদের মনের মধ্যে এমন একটি নিরাপদ দুর্গ রচনা ক'রে বসে থাকে যে, সহজে তাহাকে পরাস্ত করা যায় না। কখনো মনে হয় শত্রু বুঝি পালিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায়, কোন সময়ে সুযোগ বুঝে আবার এসে কায়েমী হয়েই বসে আছে। কেবলই সে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে রাজী হয় না।" তাই পরমহংসদেব "কাঁচা আমি" শত্রুকে জব্দ করার উপায় বলিয়াছেন, "থাক শালা 'দাস আমি' হ'য়ে"। এই "দাস আমি" নিজকে জাহির করিতে পারে না। সে তখন বলে,—

"তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র
যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি।"

এইখানেই নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব শ্রীভগবানের শ্রীচরণে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল। অতঃপর জীবনে নিজের ইচ্ছার কোন মূল্য রহিল না। যাহা কিছু ঘটিতেছে সবই শ্রীভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছায় সম্পাদিত হইতেছে। ভক্ত তখন গাহেন :—

"সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মাগো লোকে বলে করি আমি"।

মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় অসাধ্য সাধন ও সম্ভব। মূক বাচাল হয়। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। ইহাই বিস্ময়কর। এই অবস্থায় "পাকা আমি" আত্মস্বরূপে মিলিত হয়। তখনই সব রহস্যময় মনে হয়। কে এই রহস্য ভেদ করিবে?

ভক্ত বলেন, এই রহস্য উদ্ঘাটনের কি প্রয়োজন আছে? যাঁহার ইচ্ছায় ত্রিভুবন পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন মানুষের একটি অঙ্গুলি সঞ্চালনের ও ক্ষমতা নাই। এই অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া সেই ইচ্ছাস্রোতেই নিজকে ভাসাইয়া দেওয়াই ভাবনাহীন নির্ম্মল আনন্দ। একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে

জীবনে কোন ক্ষতি হইবে না। কোন রকম ক্ষোভ ও থাকিবে না। সকল তাপ দূরে যাইবে। সকল কলঙ্ক অলঙ্কার হইয়া দেখা দিবে।

যে "কাঁচা আমি"তে মানুষের এত অহঙ্কার, তাহার কোন ক্ষমতাই থাকিবেনা। "পাকা আমি"র সন্ধান পাইলে "কাঁচা আমি" দূরে পলাইবে। যাহা সত্য, শাশ্বত, সনাতন ও ধ্রুব তাহারই সঙ্গে আমরা যুক্ত হইতে পারিব। অনন্ত শক্তির সঙ্গে তখন আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অপূর্ব্ব মিলন ঘটিবে।

আমাদের শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহার মধ্যে তখন একটি ঐশী শক্তি বিরাজিত হইবে। মন বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলে অন্তরে সত্যের আবির্ভাব হয়। অন্তরে সত্যের আবির্ভাব হইলে মানুষের অনায়ত্ত বা অসাধ্য কিছুই থাকে না।

এই অবস্থায় জীব ক্ষুদ্র নহে। শিবত্ব লাভ করিয়া সে অমৃতের অধিকারী হয়। যে "আমি" জীবনের চরম দুঃখের কারণ হয়, সেই "আমি"রই রূপান্তর ঘটিলে ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদন হয়। তাই পরমহংসদেব বলিয়াছেনঃ—

"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল"।

তুমি কে ?

"তুমি কে", কতজনে কত রকমের কথা বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু তুমি যে কেমন, কেহ কখনও বুঝাইতে পারে নাই। শুষ্ক ফুলের বোঝার মত সেই বোধ শুধু কথার মালা হইয়া পাশে পড়িয়া থাকে।

তুমি যে কেমন, যে বুঝিয়াছে, তাহার মুখে ভাষা নাই। তাহার চক্ষু বুজিয়া গিয়াছে। সে আর কিছুই দেখে না। যে কান ঐ মধুর ধ্বনি শুনিয়াছে, তাহার সব শোনা শেষ হইয়াছে। তোমারই রূপ, রস ও গানে সে ডুবিয়াছে, মজিয়াছে ও হারাইয়া গিয়াছে।

তুমি কে, কথা দিয়া বোঝান যায় না। তোমাকে চোখে দেখানো যায় না। যদি কভু কান নাহি শোনে, তোমার বাঁশী শোনানো যায় না। তুমি আছ এধারে, তুমি আছ ওধারে,তুমি আছ সর্ব্বত্র। তোমাকে দেখিতে হইলে, দেখার মত চোখ চাই, আর দরকার তেমনই মন প্রাণ। সেবক জ্ঞান বলেন :—

কত কাছে, হরি ! তবু নাহি হেরি,
কেন দূরে থাক বুঝিনা,
ধরা ধামে, মোর শেষ সাথী তুমি
ইহা যেন কভু ভুলি না।

"তুমি কে" সত্যই কি জানিতে চাই ? সত্যই কি তোমার জন্য প্রাণ কাঁদে ? সত্যই কি তোমায় ভালবাসি ? ইহার উত্তর কি দিতে পারিবে ? উত্তর দিতে হয় যদি, দিও চোখের জলে—আকুল ক্রন্দনের মাঝে।

তখন সব সমাধান সহজ সরল হইয়া ধরা দিবে। সে দূরের কেহ নহে। সে কাছেই আছে। তোমার ডাকার অপেক্ষায় সে পাশেই রহিয়াছে। সেই ডাক দিও প্রাণের টানে, অন্তরের আকুলতা দিয়ে। তখনই আমার হৃদয়ঙ্গম হবে "তুমি কে ;"

সকল কথার অবসানে সে দেখা দিবে হাসিমুখে। অপরূপ রূপ ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে সে মোহন মুরলীধররূপে। তখন চোখ, কান, মন, সব আনন্দে উদ্বেলিত হইবে। সব চাওয়া, সব পাওয়া. সব আনাগোনা শেষ হইবে। তখনই দেখিব, বুঝিব ও জানিব "তুমি কে" ?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মাত্মা।

(দ্বিতীয় খণ্ড।)

ধৰ্ম্মাত্মাদের জীবনী।

১। গৌতম বুদ্ধ।

(৫৬৪ খৃঃ পূঃ)

প্রায় ৫৬৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান নেপালের দক্ষিণে হিমালয়ে কপিলাবস্তু নামে এক নগর ছিল। তথায় শাক্যবংশের গৌতম গোত্রীয় ক্ষত্রিয়গণ বাস করিতেন। শুদ্ধোদন ইঁহাদের অধিপতি ছিলেন। শুদ্ধ ওদন বা পবিত্র ধান্য গ্রহণকারী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে শুদ্ধোদন বলা হইত। প্রচুর ধান্যের ফলন এবং তজ্জন্য হলকর্ষণ শাক্যবংশীয়দের একটি বড় উৎসব ছিল। এই হলোৎসবের সময় শাক্যবংশীয়েরা সকলেই শস্যক্ষেত্রে সমবেত হইতেন ও ফসল উৎপাদনে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদর্শিত হইত।

রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত ন্যায়বান ও ধৰ্ম্মাত্মা ছিলেন। শাক্যদের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি ও যশ সুদূরপ্রসারী ছিল।

তাঁহার দুই রানী। মায়াবতী ও মহাপ্রজাবতী। অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সন্তানের জন্ম না হওয়ায় রাজা শুদ্ধোদনের অন্তর বিক্ষুব্ধ ছিল।

তখন ৫৬৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। শুদ্ধোদনের রানী মায়াদেবী সন্তান-সম্ভাবিতা। এই অব্দের বৈশাখী পূর্ণিমার রজনীতে রানী মায়াদেবী রোহিনী নদী পরিবেষ্টিতা লুম্বিনী কাননে সহচরী পরিবৃতা হইয়া ভ্রমণে আসেন। স্থান, কাল ও স্বভাবস্নিগ্ধতায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিতা হন। এই আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে তাঁহার প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। সেইদিনই বৈশাখী পূর্ণিমার শুভরাত্রে শুভলগ্নে

তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই নবজাত শিশু অত্যন্ত সুন্দর, সুকান্তি ও সুগঠন ছিল। এইরূপ পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়ায় রাজা শুদ্ধোদনের আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন তিনি, সিদ্ধার্থ। তিনি গৌতম গোত্র সম্ভূত বলিয়া পরকালে তাঁহাকে গৌতম নামে ও অভিহিত করা হয়।

রাজজ্যোতিষীরা গণনা করিয়া দেখিলেন, নবজাতক গৃহী হইবেন না। তাঁহার যোগাযোগে দেখা যায় তিনি সংসারত্যাগী এক অসামান্য ধর্ম্মাত্মা ও যুগাবতার হইবেন। তিনি পূর্ণ মাতৃঋষ্টিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল। এই নব জাতক সিদ্ধার্থ তাঁহার জন্মের সপ্তম দিবসে গর্ভধারিণী জননী মায়াদেবীকে হারাইলেন। ইহাতে রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত শোকার্ত্ত এবং এই নব জাতকের দায়িত্ব কাহাকে দিবেন ও কে গ্রহণ করিবেন ইহা ভাবিয়া চিন্তাকুল হইলেন। রাজার মানসিক অবস্থা দেখিয়া রাজমহিষী গৌতমী আগাইয়া আসিলেন এবং বলিলেন "মহারাজ! কোন চিন্তা করিবেন না। অদ্য হইতে শিশু সিদ্ধার্থের যাবদীয় দায়িত্ব আমিই লইলাম এবং তাহার জননীরূপে আমিই সিদ্ধার্থকে লালন পালন করিব।" ইহাতে রাজা কতকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার মন হইতে এক গুরুভার অন্তর্হিত হইল। শিশু সিদ্ধার্থ বিমাতা গৌতমীর অকৃত্রিম স্নেহে ও যত্নে শুক্লপক্ষের শশিকলার মত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

হিমালয়ের নির্জ্জন গুহায় অসিত নামক এক মুনি এই সময়ে কঠোর তপস্যা করিতেন। সকলেই তাঁহাকে অসীম শক্তিধর যোগী বলিয়া জানিত। তিনি একদা রাজা শুদ্ধোদনের কোলে শিশু সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইলেন। সিদ্ধার্থের দেহচিহ্নাদি দেখিয়া তিনি ও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে এই শিশু উত্তর কালে এক মহান ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইবেন।

রাজ আচার্য্য অভিজ্ঞ পণ্ডিত বিশ্বামিত্রের উপর সিদ্ধার্থের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করা হয়। এই বালকের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি, মেধা ও বহুতর বিদ্যা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা দেখিয়া আচার্য বিশ্বামিত্র ও বিস্মিত হন।

শৈশবাবস্থা হইতেই এই রাজপরিবারে বালক সিদ্ধার্থ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। রাজপরিবারের পরিবেশের সহিত বালক সিদ্ধার্থের চিন্তাধারার কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় নাই। সিদ্ধার্থের অন্তর কোমলতা, সমবেদনা ও করুণায় ভরপুর। সর্ব্বদা তিনি এক অজ্ঞাত উদাসভাব লইয়া চিন্তামগ্ন থাকিতেন। বালক বয়স হইতেই তিনি নিঃসঙ্গ থাকিতে ভালবাসিতেন। একদা তিনি একাকী নির্জ্জন উদ্যানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার পায়ের কাছে এক শরবিদ্ধ পক্ষী পতিত হয়। তিনি দেখিলেন, পাখীর শরবিদ্ধ ডানা হইতে অবিরাম রক্তক্ষয় হইতেছে। করুণায় কুমারের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ছুটিয়া গিয়া তিনি সযত্নে পাখীটিকে তুলিয়া লইলেন এবং সন্নিকটস্থ ঝরণার জলে রক্তপাত বন্ধ করিয়া ক্ষত স্থানে ঔষধী প্রলেপ করিলেন। তাঁহার যত্নে অল্পদিন মধ্যে পাখীর ক্ষত স্থান শুকাইয়া গেল। তৎপর তিনি পক্ষীটিকে ছাড়িয়া দিলেন। মুক্ত আকাশে মুক্ত পক্ষী দিগন্তে মিশিয়া গেল।

এই সময়ে প্রায়শঃই সিদ্ধার্থ ধ্যানাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। বৈরাগ্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাইয়া বসে। তিনি সর্ব্বদা অধীর ও উন্মনা থাকিতেন। এই সব দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন শঙ্কিত ও চিন্তাকুল হইলেন। জ্যোতিষীর গণনা এবং অসিত মুনির ভবিষ্যৎ বাণী তাঁহার মনে পড়িল। রাজা নানা বিষয় চিন্তা করিয়া কুমারের বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। তিনি নিজে উপযাচক হইয়া কোলবংশীয় নাগরিক দণ্ডপাণির সুলক্ষণা পরমরূপলাবণ্য-শালিনী কন্যা যশোধারার সহিত কুমারের বিবাহ দিলেন। সিদ্ধার্থের নবজীবনে প্রেমের জোয়ার আসিল। দাম্পত্যজীবনের সুখ ও

আনন্দ এই ভাবে কয়েক বৎসর স্থায়ী হইল। বিবাহের দশম বৎসরে তাঁহার পুত্র রাহুলের জন্ম হয়। সারা কপিলাবস্তুতে আনন্দের স্রোত বহিল।

কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। সিদ্ধার্থের অন্তরের সুখ ও শান্তি তিরোহিত হইল। তিনি মনে করিলেন এই নবজাত পুত্র তাঁহার নূতন বন্ধনরূপে উপস্থিত হইয়াছে। স্থির করিলেন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অপর পারে যে অমৃতের পথ রহিয়াছে তাহা তিনি খুঁজিয়া দেখিবেন। তাঁহার সঙ্কল্প, তিনি যদি এই অমৃত ও নির্ব্বাণের সন্ধান পান, তাহা বিশ্বমানবের কল্যাণে জগতে বিলাইয়া দিবেন। মানুষের দুঃখ ও অশান্তি, জরা ও মৃত্যু তাঁহার জীবনে যে মনস্তাপ দিতেছে তাহা তিনি ঘুচাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পিতা রাজা শুদ্ধোদনকে অন্তরের কথা জানাইলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে নির্জ্জন নিশীথে স্ত্রীপুত্রের মায়াবন্ধন চিরতরে ত্যাগ করিয়া কপিলাবস্তু ছাড়িলেন। অকিঞ্চন পরিব্রাজকের বেশে, চির অজানার পথে, তাঁহার সন্ন্যাস যাত্রা আরম্ভ হইল।

কালাম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আচার্য্য আলাঢ় বৈশালীর নিকট থাকিয়া সিদ্ধার্থ সাধন প্রণালী শিক্ষা করেন। ধ্যানের প্রক্রিয়াগুলি একে একে আয়ত্ত হইল, কিন্তু তাহাতে পিপাসা মিটিল না। তিনি তখনও মুক্তির পথ খুঁজিয়া পান নাই। তিনি পুনঃ বাহির হইয়া পড়িলেন। সম্রাট বিম্বিসার তাঁহার সুকোমল দেহ দেখিয়া এবং কঠোর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে আচার্য্যরূপে রাখিতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে আমি নিরস্ত হইব না। নির্ব্বাণ লাভের পর আপনার সঙ্গে দেখা করিব।"

সাধন জীবনে সিদ্ধার্থের ধ্যানপরতা অত্যন্ত অসাধারণ ছিল। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হইত। ধ্যানের সময়ে বাহিরের

জগতে কি হইতেছে, না হইতেছে, তিনি নিজে কিছুই ধারণা করিতে পারিতেন না।

অতঃপর পাণ্ডব পাহাড়ের নির্জ্জন গুহায় তাঁহার কঠোর সাধনা আরম্ভ হয়। আত্মবিশ্বাস ও একনিষ্ঠ সাধনা সম্বল করিয়া তিনি সাধন মার্গে অগ্রসর হন। কিন্তু ইহাতেও এই প্রতিভাধর সাধকের তৃপ্তি হইল না। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় লইয়া তিনি সত্যসন্ধানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। ইহার পর তপস্যার জন্য সিদ্ধার্থ গয়া অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার পাঁচজন অনুগামী সাধক। তিনি পবিত্র নৈরঞ্জনা নদীর তীরে নিভৃত উরুবিল্ব বনে আসন পাতিলেন। সম্বোধিলাভের জন্য তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধন চলিল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। এবং চরম দুর্ব্বলতার ফলে তিনি একদিন সংজ্ঞা হারাইয়া মৃতের মত পড়িয়া থাকেন। এক রাখাল বালক ঘটনা চক্রে সেইখানে উপস্থিত হয় ও কিছু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া পান করায়। সেবা যত্নে সেইবার সিদ্ধার্থ বাঁচিয়া উঠিলেন।

একদিন নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করিয়া সির্দ্ধার্থ এক বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। এই সময়ে পল্লীবধূ সুজাতা পূজার উপচার ও পরমান্নের থালা লইয়া বনদেবতার পূজা দিতে যাইতে-ছিলেন। তিনি ধ্যানরত সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইলেন। সিদ্ধার্থ নীরব নিস্পন্দ বাহ্যজ্ঞানশূন্য এবং ধ্যানমগ্ন। এই দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া সুজাতা বিস্মিতা হইলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, যে বনদেবতার পূজা তিনি দিতে আসিয়াছেন, এই ধ্যানরত-দিব্যমূর্ত্তিই যেন তাহারই শক্তিমান বিগ্রহ। তিনি পূজার ফুলচন্দন ও পরমান্নের থালা ভক্তিভরে সিদ্ধার্থের নিকট নিবেদন করিলেন। সাধ্বী পল্লীবধূর উপর এই মহাসাধকের আশীর্ব্বাদ সেদিন বর্ষিত হইল। তৎপর হইতে সিদ্ধার্থকে নিয়মিত আহার যোগান সুজাতার এক পবিত্র ব্রত হইল। সিদ্ধার্থ ক্রমে ক্রমে ধ্যান ও সমাধির উচ্চস্তরে উন্নীত হইতে লাগিলেন।

একদা সিদ্ধার্থ একাকী বনমধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন। সে সময়ে "ভল্লিক" ও "তপুসস্" নামে দুইটী বণিক পণ্যবোঝাই গাড়ী নিয়া যাইতেছিল। গাড়ীর চাকা হঠাৎ মাটীতে বসিয়া যাওয়ায় তাহারা বনমাঝে বিপদগ্রস্ত হয়। সিদ্ধার্থের নির্দ্দেশে ও সাহায্যে তাহাদের অচল গাড়ী সচল হইল। ইহাতে বণিকদ্বয় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া এই তাপসের চরণতলে বসিয়া পড়িল। ইহাদের নিবেদিত আহার্য্য গ্রহণের পর বুদ্ধদেব ইহাদের কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। এই দুই বণিকই সর্ব্বপ্রথমে সম্বোধিপ্রাপ্ত মহাসাধকের উপদেশ প্রাপ্ত হন।

ভগবান তথাগত অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, নিজ সাধনার্থে। তাহা হইল (১) সম্যকদৃষ্টি, (২) সঙ্কল্প, (৩) বাক্, (৪) কর্ম্মান্ত, (৫) আজিব (৬) ব্যায়াম (৭) স্মৃতি ও (৮) সমাধি। তিনি তাঁহার ভিক্ষু শিষ্যগণকে এই উপদেশই দান করেন।

তৎপর "মৃগদাব" কে কেন্দ্র করিয়া প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। বারানসীতে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্টীর পুত্র "যশ" কে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে চলিতে উপদেশ দেন। উপদেশ শুনিয়া শ্রেষ্টীপুত্র যশ যাবদীয় বিভব ও আসক্তি ত্যাগ পাইয়া বুদ্ধচরণে আত্মনিবেদন করিলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্টীপুত্র "যশ" এর আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব সকলেই এই মহান্ ধর্ম্মাত্মার শরণাগত হইল।

তৎপর বুদ্ধদেব উরুবিল্ব ও রাজগৃহে আসিলেন। এই তরুণ তাপসের চোখে সম্বোধির দ্যুতি ও কণ্ঠে পরম আশ্বাসের বাণী শুনিয়া অনেকেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। সম্রাট বিম্বিসার ও তাঁহার চরণে নতি জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাটের এই আনুগত্য ও সহযোগিতা বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে এবং এই প্রচারকার্য্য অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে।

বেণুবনে একবৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি বহু মুমুক্ষুকে উপদেশ দান করেন। মগধের বড় দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্যপ, আচার্য্য

সঞ্জয়ের শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ও তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। এই নবধর্ম্ম প্রচারণে ইঁহাদের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি কপিলাবস্তুতেও প্রচারকার্য্য চালান। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন, বিমাতা গৌতমী, তাঁহার পুত্র নন্দ, পত্নী যশোধারা এবং পুত্র রাহুল বুদ্ধের ধর্ম্মের সত্যের মহিমা উপলব্ধি করিয়া অমৃত জীবন লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের এই নবধর্ম্মের মাহাত্ম্য তাঁহার বিমাতা গৌতমী, স্ত্রী যশোধারা ও আরও বহু শাক্যবংশীয় মহিলাকে প্রভাবিত করে। তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঋদ্ধি ও সিদ্ধির কাহিনী শাক্যযুবকদের মনে আলোড়ন সৃজন করে। পিতৃব্যপুত্র দেবদত্ত ও আনন্দ, ক্ষৌরকার পুত্র উপালী ও তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করে। এই ভিক্ষু উপালী পরে বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্যরূপে খ্যাত হন। তিনিই বুদ্ধের সংঙ্ঘের নিয়মাবলী গঠন করেন। "উপালী" ই বুদ্ধ সঙ্গীতাদির জন্য "বিনয়ধর" নামে মর্য্যাদা লাভ করেন।

শ্রীবস্তীর স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠী সুদত্ত ও পরম কারুণিক বুদ্ধের দিব্যস্পর্শে এক নূতন মানুষে পরিণত হন। বৌদ্ধসঙ্ঘ ও ধর্ম্মের জন্য তিনি অজস্র অর্থ দান করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাই তাঁহার অপর এক নাম "অনাথ পিণ্ডদ"। ইহার অবস্থা দেখিয়া রাজকুমার "জেত" ও তাঁহার শিষ্য হন। শ্রীবস্তীর ভক্ত-শিষ্যা বিশাখা ও এইখানে দীক্ষা লাভ করে।

বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও সংঘটন কার্য্যের মধ্যে দুইটা বিশিষ্ট ধারা দৃষ্ট হয়। একটি ব্রাহ্মণের এবং অপরটি ক্ষত্রিয়ের। ব্রাহ্মণের তিতিক্ষা, ত্যাগ ও পবিত্রতার সহিত ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, কর্ম্মনৈপুণ্য ও কুশলতা মিলিত হয়।

এই নবধর্ম্মকে সাধারণ লোকের নিকট সহজবোধ্য করার জন্য ইহা পালি ভাষায় প্রচারিত হয়। তিনি জনসাধারণের সহিত কথিত ভাষায় তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। নিজের উপদেশ-

গুলি অনেক সময় "গাথার" আকারে লিখিতেন। লোকের মুখে মুখে এইগুলি প্রচারিত হইত। এইভাবে সমাজ জীবনের প্রত্যেক স্তরে এই "গাথা" প্রবেশ করিত। পরবর্ত্তীকালে এই "গাথাই" প্রসিদ্ধ "ধৰ্ম্মপদ" নামে অভিহিত হয়।

বুদ্ধদেবের এই নিজস্ব কর্ম্মনিষ্ঠার সহিত মিলিত হয় তাঁহার সঙ্ঘের শক্তি। ত্যাগব্রতী শতসহস্র ভিক্ষুর পরিক্রমায় ও প্রচার কার্য্যের দরুণ এই নবধৰ্ম্ম প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। প্রচার ও সংগঠনের এই প্রতিভা ও কর্ম্মনিষ্ঠা শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে ও বিরল।

বুদ্ধদেবের সাধনার মূল লক্ষ্য মানবীয় দুঃখের নিবৃত্তি। তাঁহার পদ্ধতি ও সহজ, সরল, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক এবং সর্ব্বতোভাবে মানবীয়।

ইহার পর তিনি বারাণসী, উরুবিল্ব ও রাজগৃহে ধৰ্ম্ম প্রচার করিতে যান। সম্বোধিলাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিস বৎসর বুদ্ধদেব তাঁহার নবধৰ্ম্ম প্রচার করেন। শ্রাবস্তী, বৈশালী, কুশীনগর, বারাণসী, রাজগৃহ ও দূরদিগন্তের নানাদেশ, নানা গ্রামাঞ্চলে ও এই নবধর্ম্মের বার্ত্তা তিনি বহন করিয়া নিয়াছেন।

বুদ্ধের এই নিজস্ব কর্ম্মনিষ্ঠার সহিত তাঁহার সঙ্ঘের শক্তি মিলিত হয়। ত্যাগব্রতী শত সহস্র ভিক্ষুর পরিক্রমা ও প্রচারের মাধ্যমে এই নবধৰ্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব। এই সব বিষয়ে তিনি কোন ঔৎসুক্য দেখান নাই। এই কারণে হয়তঃ তথাগতের সাধনা অগণিত জনসাধারণকে উদ্বেলিত করিয়াছিল। এই ধৰ্ম্ম সাধকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। অনুভূতির দ্বারা ইহার স্বরূপ বুঝা যায়।

বুদ্ধদেব বলিতেন যে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে হইলে মানুষকে সাধনা করিতে হয়; সেই পরমতত্ত্বের প্রকাশ পায় নিজেরই

মধ্যে। নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বুদ্ধদেবের উপদেশের মূলসূত্র হইতেছে "অনিত্যবাদ"। তাঁহার মতে "সব্বং অনিচ্চং", "সব্বং দুঃখং, সব্বং অনাত্মং"। অর্থাৎ সবই অনিত্য, সবই দুঃখময়, এবং সবই অনাত্ম। নির্ব্বাণকে তিনি নির্গুণ ব্রহ্মবাদের স্বরূপ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, "হে ভিক্ষুগণ! আমি নির্ব্বাণকে, আগমন, গমন, স্থিতি, চ্যুতি এবং উৎপত্তি কিছুই বলিনা। ইহার প্রতিষ্ঠা, প্রবর্ত্তন ও অবলম্বন নাই। ইহা প্রেমও সত্যনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাই প্রচার কার্য্যে তোমাদের মহান্ অস্ত্র।

লুম্বিনীর শালকুঞ্জের মধ্যে আশীবৎসর পূর্ব্বে যে মহামানবের আবির্ভাব হইয়াছিল, মল্লশালবনে তাঁহারই ঘটে মহাপরিনির্ব্বাণ। ভগবান তথাগতের শেষশয্যা অজস্র শালপুষ্পে আকীর্ণ হয়।

বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের ত্রিশ মাইল দূরে "কাশিয়া" নামক গ্রামে অদ্যাপি গৌতমবুদ্ধের তিরোভাবের পরিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। দেশ-বিদেশের অগণিত নরনারী অদ্যাপি তাঁহার অমর স্মৃতির উদ্দেশে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

বুদ্ধদেবের জীবনবার্ত্তা তাঁহার ভক্ত ভিক্ষুদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় স্বপ্রকাশ হইয়া আছে। সাধারণ মানুষকে ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জীবন-যাত্রায় বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমত পরিস্ফুট হইয়া আছে।

তবুও একটি প্রশ্ন বরাবরই উঠিয়াছে—বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের আদর্শ কি এবং তাহার দার্শনিক ভিত্তি কোথায়?

মানবের আত্যন্তিক দুঃখ ও কষ্ট নিবারণ করাই ছিল বুদ্ধদেবের জীবনের মহান ব্রত। তাই তত্ত্বদর্শনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ বা অনুশীলন তাঁহার নিকট কোন প্রকার প্রাধান্য পায় নাই। সাধকদের কৌতুহল চরিতার্থ করার কাজকে তিনি কদাপি বড় মনে করেন নাই।

বুদ্ধদেব তাঁহার মনোভাব "দীঘনিকায়" ও "পোটাপাদ" সুত্তে বলিয়াছেন। তিনি বলেন "তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রকৃত কল্যাণ হয় না। অষ্টাঙ্গ মার্গের সাধনায় প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্তি হয়।" বুদ্ধদেবের বাণীর মূলকথা অনিত্যবাদ, সবই অনিত্য, সবই দুঃখময় এবং সবই অনাত্ম। সব্বং অনিচ্চং, সব্বং দুঃখং এবং সব্বং অনাত্মং।

কিন্তু কোথায় সে শাশ্বত পরমবস্তু। কোথায় সে অজর, অমৃত "মহান ধ্রুবঃ"? বুদ্ধদেবের উপদেশ সাধককে তন্‌হা বা তৃষ্ণা বা বিষয় বাসনার নিবৃত্তির পথে এবং ধ্যান ও সাধনার মার্গে স্তরে স্তরে আগাইয়া দেয়। তখন দুঃখময় জগতের অন্তে প্রকাশিত হয়, অমিয় অনির্ব্বচনীয় পরম সত্য, নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধতত্ত্বের গবেষণা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মতে এই নির্ব্বাণের অর্থ তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। ম্যাক্সমুলার, বীস, ডেভিড্‌স্ প্রভৃতি গবেষকগণ "নির্ব্বাণকে" "ঐকান্তিক বিনাশ" অর্থে গ্রহণ করেন নাই। আবার ওলডেনবার্গ, ডাহ্‌লক্, বিগানগেট্ প্রভৃতি গবেষকগণের মতে নির্ব্বাণ প্রকৃত পক্ষে "অভাবাত্মক" বিনাশের অতল পাথার। ইহাতে স্বর্গীয় আনন্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভিক্ষুশিষ্যদের মতে, এই নির্ব্বাণের অর্থ "সর্ব্বব্যাপী এক পরম সত্তা।" এই সত্তার বিনাশ নাই। ইহা নিত্য, ইহা চৈতন্যময়। আমিত্বের বা অহংভাবের বিনাশ হেতু সাধক এই পরমজ্ঞানের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ইহাতে বুঝা যায়, বুদ্ধদেবের সাধনায় ধর্ম্মের স্থান দর্শনের বহু উপরে ছিল। তর্ক বিতর্ক অপেক্ষা অভ্যাসযোগের উপর গৌতম-বুদ্ধদেব সমধিক গুরুত্ব দিয়াছেন।

২। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

(৭৮৮ খৃঃ অঃ)।

"কালাডি" কেরলের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। তথায় পরম নিষ্ঠাবান আচার্য্য শিবগুরু বাস করিতেন। তিনি জাতিতে "নম্বুদ্রি" ব্রাহ্মণ। তাঁহার পত্নীর নাম বিশিষ্টা দেবী। তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এই গ্রামেরই অপর প্রান্তে চন্দ্রমৌলিশ্বর শিবের মন্দির। উভয়ে মিলিয়া প্রত্যহ শ্রদ্ধাভরে এই জাগ্রত শিবের পূজা করিতেন।

অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই বলিয়া এই ব্রাহ্মণ দম্পতী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। অন্তরে তাঁহাদের এই জন্য বড়ই দুঃখ ছিল। প্রত্যহ শিব পূজার পর তাঁহাদের এই ব্যাকুলতা সমধিক প্রকাশ পাইত। একদিন শিব পূজার পর আচার্য্য শিবগুরু ধ্যানস্থ আছেন, হঠাৎ এই সময়ে দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, তিনি শিবকল্প, মহাজ্ঞানী, মহাজয়ী এক পুত্রসন্তান লাভ করিবেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি এই দৈববাণীর বিষয় পত্নী বিশিষ্টা দেবীর নিকট বিবৃত করিলেন। উভয়েই আনন্দিত হইলেন।

দৈববাণী সফল হইল। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে মধ্যাহ্নে রজতগিরিনিভ অনিন্দ্য সুন্দর এক পুত্র তাঁহাদের ভূমিষ্ঠ হইল। শিবকল্প শিবরূপী এই নবজাতকের নামাকরণ হইল শঙ্কর।

শৈশব হইতেই এই বালক বড়ই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসামান্য শ্রুতিধর ছিলেন। তিনি কোন কিছু একবার শুনিলেই তাহা তাঁহার স্মৃতিপটে চিরতরে গাঁথিয়া থাকিত। মাত্র তিন বৎসর বয়সে তিনি মালয়ালম সাহিত্যের যে কোন গ্রন্থ পড়িতে ও আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

শঙ্করের এই অলৌকিক মেধা দেখিয়া তাঁহার পিতা আচার্য্য শিবগুরু তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ এক বিখ্যাত পণ্ডিত করিতে মনস্থ করিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি অল্পকাল মধ্যেই মারা যান। মাতা বিশিষ্টা দেবী এই আকস্মিক অঘটনে অত্যন্ত শোকগ্রস্তা ও বিমূঢ়া হইলেন। তবুও সাহসে বুক বাঁধিয়া পাঁচ বৎসর বয়সে পুত্র শঙ্করের উপনয়ন কার্য্য সমাধা করিলেন এবং বিদ্যাধ্যয়ন ও শাস্ত্র পাঠের জন্য গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সুন্দর কান্তি, অসাধারণ মেধা ও শ্রুতিশক্তি দেখিয়া অধ্যাপকও বিস্মিত হন। তিনি আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়া শঙ্করকে পড়াইতে থাকেন। শঙ্কর অতি অল্পদিন মধ্যে জটিল শাস্ত্রাদি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। তখন তাঁহার জন্য উচ্চতর পাঠক্রম ব্যবস্থা হইল। তিনি মাত্র সাত বৎসর বয়সে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কৃতী পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনে মাতা আনন্দিতা হইলেন। আত্ম-সংস্থানের জন্য শঙ্কর নিজগ্রামে এক চতুষ্পাটী খুলিয়া বসিলেন। যদিও প্রথমাবস্থায় শঙ্করের স্বল্প বয়স দেখিয়া গ্রামের লোকেরা বহু বাধা বিঘ্ন জন্মায়, অবশেষে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। বহু প্রবীণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ অল্পকাল মধ্যে শঙ্করের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। শঙ্করের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য সর্ব্বত্র অচিরকালে খ্যাতি লাভ করে। তৎপর তাঁহার চতুষ্পাটীতে বহু ছাত্রের সমাগম হয়। তাঁহার অর্থোপার্জ্জনও বৃদ্ধি পায়।

এই সময় তিনি মহাযোগী গোবিন্দপাদের নাম শুনিতে পান। গোবিন্দপাদস্বামী সারা দাক্ষিণাত্যে তাঁহার ঋদ্ধি ও সিদ্ধির জন্য খ্যাত ছিলেন। কিম্বদন্তী ছিল যে মহর্ষি পাতঞ্জলি গোবিন্দপাদ-স্বামীর দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত পর্ব্বতগুহায় সমাধিস্থ হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন।

বালক শঙ্করের প্রাণে এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা হইল, কেমনে তিনি মহাযোগী গোবিন্দপাদের দর্শন লাভ করিবেন। কোথায়, কোন্ স্থানে এই মহাযোগীর ধ্যানগুহা? ব্যাকুল অন্তরে কত অজানা দেশ, পর্ব্বত, প্রান্তর বালক শঙ্কর ঘুরিলেন, কত মঠ মন্দির পরিক্রমা করিলেন, কত মহাপুরুষ ও সাধকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোথায় ও কোন সন্ধান পাইলেন না।

একদা নির্জ্জন নর্ম্মদার তীরে তীরে একাকী চলিবার কালে এক অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভাগ্যক্রমে বালক শঙ্করের দেখা হয়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বালক শঙ্করকে ওঁকারনাথ পর্ব্বতের দিকে এগিয়ে যাইতে বলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, বালকের মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

ওঁকারনাথ পর্ব্বত পুরাকালে বৈদূর্য্যমণিপর্ব্বতরূপে অভিহিত হইত। এই পর্ব্বত নর্ম্মদা নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই পর্ব্বত নর্ম্মদার স্রোতকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে। ইহা ভক্তবীর মান্ধাতার রাজধানী ছিল। ওঁকারনাথ, মহাকাল প্রভৃতি জাগ্রত শিব এই পর্ব্বতেই যুগ যুগান্ত ধরিয়া বিরাজিত আছেন। ইহা নির্জ্জন সাধনার একটি উপযুক্ত স্থান। অদ্যাপি ভারতের নানাস্থান হইতে অগণিত পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী ওঙ্কারনাথ ও মহাকাল শিব দর্শনের জন্য এইখানে আসেন।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী বালক শঙ্কর ওঁকারনাথ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। নানাস্থানে খুঁজিলেন। কাহারও দর্শন পাইলেন না।

হঠাৎ ঘনজঙ্গলাবৃত এক অপ্রশস্ত গুহামুখ তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি তাহাতে প্রবেশ করিলেন। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলেন জটাজুটসমন্বিত কয়েকজন যোগী সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। সঙ্গে একজন প্রাচীন তাপস ও রহিয়াছেন। তাপস বালক শঙ্করের দিকে তাকাইতেই তিনি তাপসকে সাষ্টাঙ্গে

প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমি মহাযোগী গোবিন্দপাদস্বামীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইয়া আমি এইখানে আসিয়াছি। তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিয়া আমার ব্যাকুলতা দূর করুন।" বালকের কথা শুনিয়া তাপসের কৃপা হইল। তিনি বালক শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া অপর একটি গর্ভগুহায় লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "এই প্রস্তরখণ্ড গুহামুখ অবরুদ্ধ করিয়া আছে। তাহা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ কর এবং এই মহাযোগীকে তোমার প্রার্থনা জানাও।" বালক শঙ্কর একা এই প্রস্তরখণ্ড সরাইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে গুহাবাসী অপর সন্ন্যাসীদের ধ্যান ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহারা ও আসিয়া বালক শঙ্করকে সাহায্য করিলেন এবং ধীরে ধীরে প্রস্তরদ্বার সরাইয়া দিলেন। ভিতরে গিয়া বালক শঙ্কর দীপালোকে মহিমময় মহাযোগীর মূৰ্ত্তি দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন মহাযোগীর নয়ন দুইটি নিমীলিত। তপঃসিদ্ধ দেহে অলৌকিক জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। বালক শঙ্কর উচ্ছ্বাসে ও আনন্দে যুক্তপাণি হইয়া অপূৰ্ব্ব স্তবগাথা গাহিতে আরম্ভ করিলেন। স্তব শুনিয়া মহাযোগী গোবিন্দপাদ ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন। তাঁহার দিব্যকৃপার অমৃতধারা বালকের উপর বর্ষিত হইল। বালক সেইদিন হইতেই যোগীবরের আশীৰ্ব্বাদ ও আশ্রয় লাভ করিলেন। এই নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণবালকই উত্তরকালের ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্করাচার্য্য যখন মহাযোগী গোবিন্দপাদের কৃপালাভ করেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র আট বৎসর। তিনি চারি বৎসর কাল তথায় অতিবাহিত করেন এবং এই সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের দ্বাদশ বৎসর বয়সে) তিনি অসামান্য যোগসিদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান করায়ত্ত করেন। তৎপর গুরুজী গোবিন্দপাদের আদেশে হিমালয়ের নিভৃতধাম বদরিকা আশ্রমে বেদান্ত ভাষ্য প্রভৃতি রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার ষোড়শবর্ষে তিনি গুরুর আদিষ্ট

এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ শেষ করেন। তাঁহার ভাষ্যাদি দেখিয়া বহু শক্তিধর সাধক ও পণ্ডিত তাঁহার শিষ্য হন্।

অতঃপর তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিষ্যগণসহ ভারতবিজয়ে বহির্গত হন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী, দ্বারকা হইতে কামাখ্যা, সর্ব্বত্র এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জয়জয়কার ঘোষিত হয়। একটী মানবের স্বল্পপরিসর জীবনে এমন বিদ্যাবত্তা, কর্ম্মপ্রেরণা ও অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ সারাবিশ্বের ইতিহাসে বিরল। শঙ্করাচার্য্য শুধু দিগ্বিজয় করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অদ্বৈত বেদান্তের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া জ্ঞানগঙ্গাকে ভারতভূমিতে প্রবাহমানা করেন।

গর্ভধারিণী জননীর প্রতি তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। প্রতিদিন পূজা, অর্চ্চনা ও অধ্যাপনার পর দীর্ঘসময় তিনি মাতৃসেবায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মাতা বিশিষ্টা দেবী নিজগ্রাম হইতে কিছু দূরে "আলেয়াই" নদীতে অবগাহন করিয়া কুলদেবতা শ্রীকেশবের পূজা দিতে স্থানীয় বিষ্ণুমন্দিরে প্রত্যহ যাইতেন। একদিন তিনি নদীতে স্নান করিয়া মন্দিরে পূজা দিতে যাইতেছেন। দৌর্ব্বল্য ও বার্দ্ধক্যহেতু তিনি পথে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। জননী দেবী অনেক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিতেছেন না দেখিয়া বালক শঙ্কর উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। দ্রুতপদে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া রাস্তার ধারে ধূলিশয্যায় পড়িয়া আছেন। তিনি পথশ্রমে মৃতপ্রায়। ইহাতে শঙ্কর অশ্রুজল রোধ করিতে পারিলেন না। শুদ্ধ, পূত, ব্রহ্মচারী মাতৃভক্ত বালকের অন্তর হইতে প্রার্থনা বাণী বাহির হইল, "ভগবান! তুমি কৃপা করিয়া "আলেয়াইর" স্রোতধারা কিছুটা বাড়ীর সন্নিকটে আনিয়া দাও, আমার মায়ের স্নানের ঘাটটী আরও কাছে হউক। আমার মা যেন এই কষ্ট না পান।" সত্যসন্ধ নিষ্কলুষ মাতৃভক্ত বালকের প্রার্থনা ভগবান পূর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলেয়াই নদী তট ভাঙ্গিয়া শঙ্করের গৃহসম্মু:খ উপস্থিত হইল। মায়ের

পথশ্রম কমিয়া গেল। আপামর জনসাধারণ বুঝিলেন, বালক শঙ্কর শুধু অসামান্য প্রতিভাধর নহে, অলৌকিক শক্তিধর ও বটে।

এই ঘটনা কেরলের রাজা চন্দ্রশেখরের শ্রুতিগোচর হয়। রাজা স্বয়ং বিদ্যোৎসাহী এবং বিদ্বান। তিনি বালক শঙ্করকে দেখিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। তিনি মন্ত্রীকে পাঠাইয়া শঙ্করকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বালক শঙ্কর তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলেন। বলিলেন, তিনি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন। রাজদ্বারে তাঁহার কি প্রয়োজন? মন্ত্রী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে রাজা চন্দ্রশেখরের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আঁরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি নিজে আসিয়া বালকের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিলেন। সাক্ষাৎ আলাপের পর তাঁহার বিস্ময় চরমে উঠিল। তিনি দেখিলেন এই বালক সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং অলোকিক ঐশীশক্তির অধিকারী। অজস্র সাধুবাদের পর তিনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া শঙ্করকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু শঙ্কর একটী মুদ্রা ও স্পর্শ করিলেন না। রাজার অমাত্যদের সাহায্যে এই মুদ্রা দরিদ্রজনগণের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন।

শঙ্করের জননী ইতিমধ্যে একদিন কয়েকজন পণ্ডিত ও সাধু, জ্যোতিষীকে আমন্ত্রণ করিয়া শঙ্করের জন্মকুণ্ডলী গণাইয়া দেখিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন শঙ্কর স্বল্পায়ু।

জননী কাতরা হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শঙ্কর ও এই কথা পরে অবগত হইলেন। ইহাতে জন্ম-জন্মান্তরের সাত্ত্বিকভাব তাঁহার জাগিয়া উঠিল। মহাকাল তাঁহার দুয়ারে ধন্না দিয়া রহিয়াছেন জানিয়া তিনি সদ্‌গুরুর কাছে সন্ন্যাস নিয়া আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তাঁহার জননীকে এই সঙ্কল্পের কথা বলিলেন। শঙ্কর বুঝিলেন তাঁহার আয়ু অল্প। আর সময় নষ্ট করা যায় না।

শঙ্করের সন্ন্যাস নেওয়ার কথা শুনিয়া জননী ব্যাকুল হইলেন।

অসহায়া বিধবার একমাত্র সম্বল শঙ্কর। তাঁহার এই বৃদ্ধাবস্থায় শঙ্কর সংসারত্যাগী হইলে, কি অবস্থা হইবে? বালকের কমনীয় দেহে সন্ন্যাসজীবনের কঠোর সাধনা কি প্রকারে সহ্য হইবে? জননী অতিশয় চিন্তাকুলা হইলেন।

শঙ্কর সংসারত্যাগে দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু জননীর অনুমতি না পাইলে গৃহত্যাগ কেমনে করিবেন? ভাগ্যবিধাতা তাঁহার এক আকস্মিক বিপদের মধ্য দিয়া এই সুযোগ মিলাইয়া দিলেন।

মায়ের সহিত শঙ্কর সেদিন "আলেয়াই" নদীতে স্নান করিতে নামিয়াছেন। যদি ও নদীর জল তত গভীর নহে, কোথা হইতে এক কুম্ভীর আসিয়া শঙ্করকে আক্রমণ করিল। আত্মরক্ষার জন্য তিনি জলের মধ্যে ছুটাছুটী করতে লাগিলেন। কুমীর ও পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল। মাতা বিশিষ্টাদেবী ও ঘাটের নরনারী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। শঙ্কর তাড়াতাড়ি এক ক্ষুদ্র চড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু হিংস্র কুম্ভীর ও ছাড়ে না। সেও চড়ায় তাড়া করিল। আর নিস্তার নাই। মৃত্যু বুঝি আসন্ন। দূর হইতে শঙ্কর জননীকে ডাকিয়া কহিলেন "মা! আমি মরিতে চলিয়াছি। আমার সন্ন্যাস নেওয়া ও হইল না, মুক্তি ও এই জীবনে ঘটিলনা। তুমি শীঘ্র অনুমতি দাও, আমি অন্ত্যসন্ন্যাস লই এবং ভগবানের নাম নিয়া মৃত্যু বরণ করি।" জননী অত্যন্ত ভীতা ও শঙ্কিতা হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "তাই হউক। আমি তোমায় সন্ন্যাস নিতে অনুমতি দিতেছি।" ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নদীতটে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

নদীতীরে এতক্ষণ ধরিয়া বিলাপ ও চীৎকার কম হয় নাই। তাহা শুনিয়া কয়েকজন ধীবর ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসে। বর্শা দিয়া তাহারা কুমীরটিকে আক্রমণ করে এবং পরে হত্যা করে। কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত শঙ্কর সেদিন দৈবকৃপায় বাঁচিয়া যান।

অতঃপর অন্ত্যসন্ন্যাসের কথা সত্যসন্ধ বালক শঙ্করের মনে

পড়িল। আনুষ্ঠানিক ভাবে না হউক, এখন তিনি মনে প্রাণে সত্য সত্যই সন্ন্যাসী। ভগবান প্রদত্ত এই আকস্মিক সুযোগ যেমন মিলিয়া গেল, তেমনি মিলিয়া গেল, মায়ের অনুমতি। সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহবাস নিষিদ্ধ। তিনি তাহা মাকে বুঝাইয়া বলিলেন। মাতা বিশিষ্টা দেবী তবুও কাঁদিতে লাগিলেন এবং কিছুতেই শঙ্করকে ছাড়িতে চাহিলেন না। তখন শঙ্কর পুনঃ মাতাকে বুঝাইলেন, সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে শঙ্করকে কে বাঁচাইল? একমাত্র ভগবান ব্যতীত এমন কৃপাময় শক্তিধর কে আছেন? সেই ভগবানের হাতে তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া দিতেছ। ইহার চেয়ে সুখ ও শান্তির বস্তু আর কি হইতে পারে?

মাতা সখেদে কহিলেন "তুই চলিয়া গেলে আমায় কে দেখিবে? মৃত্যুসময়ে পুত্রের মুখাগ্নি ও কি পাইব না?" মাতাকে শঙ্কর আশ্বস্তা করিলেন। তৎপর তিনি জ্ঞাতিদের ডাকিয়া তাঁহার সামান্য জমিজমা, তাঁহার মাতার ভরণ পোষণের প্রতিশ্রুতি নিয়া, তাহাদিগকে দান করিলেন। মাতাকে বলিলেন, আমি যেখানেই থাকিনা কেন, তোমার অন্তিম সময়ে আমি নিশ্চয় উপস্থিত হইব। ইষ্টদর্শন করিয়া পরমানন্দে তুমি অমর ধামে যাইবে। তোমার পারলৌকিক কাজে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন হইবে না।

মাতা বুঝিলেন, পুত্রকে আর গৃহে রাখা যাইবে না। পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সমস্ত উপচার মাতা বিশিষ্টা দেবী তৎপরদিনই শান্ত মনে সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া "কালাডি"র নরনারী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। শঙ্কর সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। নৈষ্ঠিকভাবে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ ও বিরজা হোম সম্পন্ন করিলেন। তারপর মুণ্ডিতমস্তক কৌপিনধারী বালক নর্ম্মদার দিকে চলিলেন। পরিব্রাজনের পথে তিনি তুঙ্গভদ্রার তীরে কদম্ববনে পৌঁছিলেন। শ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। অনেকগুলি ব্যাঙের

ছানা জল হইতে উঠিয়া সন্নিকটস্থ এক প্রস্তরের উপর বসিল। রৌদ্রের তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রস্তরও গরম হইয়াছে। ব্যাঙের বাচ্চাগুলি সেখানে আর থাকিতে পারিতেছে না। পুনঃ জলে লাফাইয়া পড়িবে, এমন সময়ে বৃহদাকার এক সর্প আসিয়া তাহাদের উপর ফণা বিস্তার করিয়া ছায়া প্রদান করিল। সাপ ব্যাঙগুলি না খাইয়া বাৎসল্যভাব দেখাইল। শঙ্কর ইহা দেখিয়া বুঝিলেন, তপঃপ্রভাবে এই স্থান পবিত্র ও অহিংস হইয়াছে। শঙ্কর অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, ইহা প্রাচীনকালে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম ছিল। এই কারণে এখানকার সর্প পর্য্যন্ত সহজাত খলতা ত্যাগ পাইয়াছে। এমন সুন্দর অহিংস ও পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তিনি এইখানে একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করিলেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার এই বাসনা ফলবতী হয়। এইখানেই তিনি শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করেন।

অতঃপর তিনি মহিষ্মতীনগর অতিক্রম করিয়া ওঁকারনাথের দ্বীপশৈলে উপস্থিত হন। এখানকারই পর্ব্বত গুহাতে তিনি ইতিপূর্ব্বে মহাযোগী গোবিন্দপাদের আশ্রয় লাভ করেন। গুরুর চরণতলে বসিয়া এই নবীন সাধক একাদিক্রমে তিন বৎসরের উর্দ্ধকাল কঠোর সাধনা করেন এবং অল্পকালের মধ্যে তিনি অসামান্য যোগসিদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। সতীর্থ সাধকেরা বুঝিতে পারিলেন, শঙ্করের প্রতিভা ও অলৌকিক শক্তি বিরাট ও মহান।

একবার শঙ্কর ওঁকারনাথে থাকার সময়ে নর্ম্মদার জল অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। অবিরাম বর্ষণও থামে না, জলবৃদ্ধিও কমে না। সকলেই শঙ্কিত হইলেন। জল স্ফীত হইয়া গুরুগুহায় প্রবেশ করিলে গুরুদেবের সমাধি ভঙ্গ হইবে এবং তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। প্লাবনের জল গুহাদ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কি করা যায় সকলেই ভাবিতেছেন। এমন সময় শক্তিধর শঙ্কর দৃঢ়পদে আগাইয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, "গুরু মহারাজ

মহাব্রহ্মজ্ঞ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না"। তিনি একটি মাটির কলসী আনিয়া গুহাদ্বারে "কাৎ" করিয়া রাখিয়া দিলেন। এদিকে জলোচ্ছ্বাস ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য? জলরাশি স্ফীত হইয়া গুহাদ্বারে পৌঁছান মাত্রই ঐ মাটির কলসীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং মূহুর্ত্ত মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইতেছে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই শঙ্করের মহান শক্তি উপলব্ধি করিলেন ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সমাধি ভঙ্গের পর যোগীবর গুরু গোবিন্দপাদ সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন "বৎস শঙ্কর! আমার আশীর্ব্বাদে তুমি পূর্ণকাম হইয়াছ। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছ। ভগবৎনির্দ্দেশে তোমার নূতন করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মবাদ প্রচার করিতে হইবে। লুপ্ত তীর্থগুলি উদ্ধার করিতে হইবে। ঈশ্বরবিমুখ জনসাধারণকে পরম কল্যাণের দিকে টানিয়া আনিতে হইবে। তোমার মধ্যে অদ্বৈত জ্ঞানের আলোক জ্বলিয়া উঠিবে এবং দেশে দেশে তাহা ছড়াইয়া পড়িবে। আমি এতদিন এই প্রতীক্ষায় ছিলাম। এখন আমার কাজ ফুরাইয়াছে। তাই এই দেহের প্রয়োজনও শেষ হইয়াছে। তুমি কাশীর দিকে যাও। কাশী বিশ্বেশ্বরের আদেশ লইয়া নির্দ্দিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন কর।"

শিষ্যদের কাছে বিদায় লইয়া মহাযোগী গোবিন্দপাদ সমাধিমগ্ন হন। তিনি আর উঠেন নাই। ব্রহ্মরন্ধ্র পথে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ভারতের অধ্যাত্মগগনের এক উজ্জ্বল রত্ন নিষ্প্রভ হইল।

গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী শঙ্কর কাশীতে আসেন। সারা ভারতের এই মহাতীর্থ কাশীতে দণ্ডীসন্ন্যাসী, শাস্ত্রবিদ্‌ ও পরিব্রাজকদের নিরন্তর সমাগম দৃষ্ট হয়। যতকিছু নূতন শাস্ত্রব্যাখ্যা রচিত হয়, তাহার উৎস পূত পুণ্যধাম এই বারাণসী।

শঙ্কর মণিকর্ণিকা ঘাটের সন্নিকটে ভক্ত সেবকবৃন্দসহ আসন

পাতিয়া কিছুদিন রহিলেন। এই তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসীকে দেখিয়া এবং তাঁহার অদ্বৈতবাদ শুনিয়া কাশীর জনসমাজ বিচলিত হইলেন। এক একদিন দেখা যাইত আচার্য্য শঙ্করকে ঘিরিয়া প্রবীণ দণ্ডীসন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদেরা বসিয়া আছেন আর অতুল বিক্রমে শঙ্করাচার্য্য প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতেছেন। শাস্ত্র বিচারের রণভূমিতে শঙ্কর অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। আবার মুমুক্ষু সাধনার্থী নরনারীর সমক্ষে তিনি পরিত্রাতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার দর্শনে ও উপদেশ শ্রবণে লোকের সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া যায়।

এই সময়ে চোল দেশীয় এক ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন এবং তাঁহার তেজঃদীপ্ত আনন ও অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং মহাসাধক শঙ্করের পদতলে পরম আশ্রয় লাভ করেন। এই চোল ব্রাহ্মণ বালক নৈষ্টিক ব্রহ্মচারীরূপে শাস্ত্রবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ যুবকই আচার্য্য শঙ্করের সর্ব্বপ্রথম দীক্ষিত শিষ্য সনন্দন। ইনিই অসামান্য যোগবিভূতিখ্যাত পদ্মপাদ।

শঙ্কর স্বামী গোবিন্দপাদের মানস পুত্র ছিলেন। গুরুর আদেশে তিনি তাঁহারই বাণী প্রচার করিবেন স্থির করিলেন। তিনি মানব-জাতির সম্মুখে আত্মজ্ঞানের পরমতত্ত্ব প্রচার করিতে উৎসুক হইলেন। আচার্য্য গৌরপাদ শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদের গুরু ছিলেন। আচার্য্য গৌরপাদের রচনার ব্যাখ্যা দিয়া কাজ আরম্ভ করার জন্য তিনি প্রথমে মৌণ্ডক্যকারিকা রচনা করিলেন ও গুরুর গুরুকে মর্য্যাদা দিলেন। আচার্য্য গৌরপাদ গৌড় দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। শঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য আচার্য্য সুরেশ্বর (পূর্ব্বনাম মণ্ডন মিশ্র) ও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এই সময় হইতে অদ্বৈতবাদের ধারা ভারতবর্ষে পুনরুজ্জীবিত হইল।

উদাত্তকণ্ঠে আচার্য্য শঙ্কর ঘোষণা করিলেন, "ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বস্তু। জগৎ একেবারে মিথ্যা। স্বপ্নের মতই অলীক"। এই ব্যাখ্যাকে তিনি চরম পর্য্যায়ে টানিয়া নিয়া কহিলেন, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ এই ব্রহ্মে শক্তিরও স্থান নাই। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছে একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব। মুমুক্ষু মানবকে এই তত্ত্বই জানিতে হইবে এবং নিজের জীবনে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। আচার্য্য শঙ্করের এই অতিমানুষিক তত্ত্বজ্ঞান ও যোগবিভুতির কথা শুনিয়া দলে দলে জনমানব তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার উপদেশ শুনিতে উপস্থিত হন। পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র, সাধু ও সাংসারিক—সকলেই তাঁহার ধর্ম্মসভায় যোগ দান করেন। কিন্তু তাঁহার এই চরম ব্যাখ্যা খুব কমলোকই বুঝিতে সক্ষম হন।

নির্গুণ অদ্বৈতবাদ।

আচার্য্য শঙ্কর প্রাণের প্রেরণায় এই ব্রহ্মের প্রকৃত অধিকারীকে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা তাই তাঁহাকে ছদ্মবেশে অদ্বৈতবাদের গূঢ় অর্থ বলিয়া দিলেন।

সগুণ অদ্বৈতবাদ।

সেইদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে শঙ্কর সশিষ্য স্নান করিতে যাইতেছেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক সদ্য বিধবা তরুণী তাঁহার মৃত পতির শব কোলে করিয়া কাঁদিতেছেন। রাস্তাটা সঙ্কীর্ণ। সমগ্র পথটা জুড়িয়া তিনি বসিয়া আসেন এবং শব সৎকারের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাহা তাঁহার কাছে নাই বলিয়া মাঝে মাঝে পথচারীদের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছেন। পথ বন্ধ। অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন, "মা! শবটাকে এমন আড়াআড়ি ভাবে রাখিও না। সোজা করিয়া রাখ, যাহাতে আমরা যাইবার পথ পাইতে পারি। কিন্তু কে কাহার কথা শোনে? শোকাকুলা নারী কাঁদিয়াই আকুল। নড়িবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত নাই। শঙ্কর শিষ্যগণ সহ বড়ই বিপদে পড়িলেন। কি করিয়া গঙ্গায় নামিয়া

যাইবেন ভাবিতেছেন ও বারবার বিধবা তরুণীকে মিনতি জানাইতেছেন। রমণী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "সন্ন্যাসী! সরিয়া যাইবার অনুরোধ এই শবকে কর। অভিরুচি হইলে সে এক পাশে সরিয়া যাইবে।"

এ কি অদ্ভুত কথা? তবে কি পতিশোকে এই নারীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে? করুণায় বিগলিত হইয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন, "মা! তাও কি কখন ও সম্ভব হয়? শব কি করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিবে?" বিধবা এইবার কঠোর ব্যঙ্গ ভাষায় বলিয়া উঠিলেন "আচার্য্য! আপনার মতে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্ম হচ্ছেন শক্তিশূন্য। তাহা যদি সত্য হয় তবে নিষ্প্রাণ শক্তিহীন শব কেন নিজকে সরিয়ে নিতে পারিবেনা?" কথা কয়টা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল শবসহ রমণী কোথায় অদৃশ্য হইলেন। অতঃপর ধ্যানস্থ হইয়া আচার্য্য শঙ্কর বুঝিতে পারিলেন স্বয়ং অন্নপূর্ণাই এই লীলার নায়িকা।

সাকার ব্রহ্ম।

তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশই উপযোগী। শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের ধারণা সহজেই হয়। নির্ব্বিশেষ পরমব্রহ্মতত্ত্ব যাহাদের উচ্চতর জ্ঞান সাধনা আছে শুধু সেই মুষ্টিমেয় সাধকদের জন্য।

আর একদিনের কথা। শঙ্কর গঙ্গার ঘাটে চলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন ভক্ত ও শিষ্যের দল। হঠাৎ সম্মুখে দেখিতে পান, ভীমকায় এক চণ্ডাল। এবং তার সঙ্গে ভীতিপ্রদ কয়েকটা কুকুর। সন্তর্পণে লোকটির সংস্পর্শ এড়াইয়া শঙ্কর দূরে দাঁড়াইলেন। কহিলেন, একটু সরিয়া দাঁড়াও।

চণ্ডাল অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। তারপর তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল জ্ঞানগর্ভ চমকপ্রদ শ্লোক। তাহার ভাবার্থ হইল, "সন্ন্যাসি! আপনি কাহাকে সরিয়া যাইতে বলিতেছেন? আমার আত্মা, না দেহকে? আত্মা সর্ব্বত্র বিরাজিত। দেহ জড় পদার্থ।

আপনি আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টারূপে লোককে কেবলই প্রতারণা করিতেছেন।"

এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার? কে এই ছদ্মবেশী চণ্ডাল? মুহূর্ত্ত মধ্যে শঙ্কর বুঝিলেন, এই ছদ্মবেশী চণ্ডালরূপে দেবাদিদেব মহেশ্বর জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা তাঁহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিলেন। শঙ্কর অপলকনেত্রে রজতগিরিনিভ প্রজ্ঞাঘন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর কহিলেন, "সংস্কার ছাড়। অদ্বৈত ব্রহ্মের ধারক ও বাহক হও। জগতমঙ্গলের জন্য অদ্বৈতজ্ঞান প্রচার কর। উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা কর। বৈদিক জ্ঞানের অবরুদ্ধ-ধারাকে দিকে দিকে প্রসারিত কর।"

শঙ্কর দেবাদিদেবের আদেশ পাইয়াছেন। তিনি নিভৃতে হিমাচলের কোলে আসন পাতিয়া আদিষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে হৃষিকেশ উপস্থিত হইলেন। এই হৃষিকেশ হিমাচলের তলদেশে, গঙ্গার পারে এবং পৌরাণিককালের পবিত্র যজ্ঞভূমি। যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ চিরকাল এখানে পূজিত হয়। বহুপূর্ব্বে একবার চীনা দস্যুরা এই স্থান আক্রমণ করে। পাণ্ডারা ভীত হইয়া এই বিগ্রহটা গঙ্গাগর্ভে লুকাইয়া রাখে। এই পবিত্র বিগ্রহের স্থিতি সন্ন্যাসী শঙ্কর ধ্যানে জানিতে পারেন। তিনি তাহা শিষ্য, সেবক ও ভক্তদের জানান এবং তিনি স্বয়ং তাহা গঙ্গাগর্ভের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ধার করেন।

বদরিধামের অবস্থা ও তাহাই হয়। সীমান্ত দস্যুদের ভয়ে বিগ্রহের পবিত্রতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নিকটস্থ এক জলকুণ্ডে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। শঙ্কর ইহাতে ক্রুদ্ধ হন। উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, নারায়ণের সেই প্রাচীন বিগ্রহটা আমি জলগর্ভ হইতে উদ্ধার করিব। আপনারা সত্বর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও অভিষেকের আয়োজন করুন। পাণ্ডারা ও স্থানীয় লোকেরা ভীত হইলেন। এই কুণ্ডের তলদেশে খরস্রোতা

পার্ব্বত্য নদী অলকানন্দার সংযোগ আছে। এখানে ডুব দিতে গিয়া অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছে। তরুণ সন্ন্যাসী শঙ্কর কেন এই বিপদের সম্মুখীন হইতেছেন? কিন্তু শঙ্কর কোন অনুরোধ, ওজর ও আপত্তি শুনিলেন না। ধ্যানাবিষ্ট হইয়া তিনি কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুর্জ বিগ্রহটি লইয়া যখন তিনি জলের উপর ভাসিয়া উঠিলেন তখন সমাগত ও উপস্থিত লোকেরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া সমবেত জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন "বদরীবিশাল লালাকি জয়"। "সাধু শঙ্করজীকি:জয়?"

ইহার পর এই তরুণ আচার্য্য ব্যাসতীর্থে আসিলেন। অলকানন্দা ও কেশব গঙ্গার সঙ্গমস্থানের উপরে, হিমালয়ের বক্ষে ব্যাসদেবের আশ্রমগুহা। এইস্থানের পরিবেশ দিব্যভাবে পূর্ণ। আকাশে বাতাসে চতুর্দ্দিকে এক ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের এই স্থানটা ভাল লাগিল। দীর্ঘ চারিবৎসর তিনি এই নির্জ্জন গিরিকন্দরে থাকিয়া ষোলখানি শাস্ত্রগ্রন্থের মহাভাষ্য রচনা করিলেন। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার দীপ্তিতে, নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয়ে আজ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থগুলি বিশ্বমানবের জ্ঞানভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পদ হইয়া আছে।

শঙ্করের রচিত ব্রহ্মসূত্র, দ্বাদশ উপনিষদ, ভগবৎগীতা, বিষ্ণুর সহস্রনাম ও সনৎসু জাতীয় গ্রন্থগুলি সর্ব্বত্র বিস্ময় উৎপাদন করে। অদ্বৈতবাদের নবতর ব্যাখ্যায় ভারতের সাধক ও পণ্ডিতসমাজ আলোড়িত হন।

আচার্য্যের অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভা দেখিয়া জ্যোতির্ধামের রাজা মুগ্ধ হন এবং তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাজশিষ্যের সহায়তায় তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির অনুলিপি সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তিনি বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন। অদ্বৈতবাদের প্রচারের মধ্য-দিয়া উত্তরাপথের বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকপ্রধান অঞ্চলগুলিতে বেদাচার

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। জিজ্ঞাসু সাধক, সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত সমাজ ক্রমশঃ তাঁহার আশ্রমে ব্যাসগুহায় মিলিত হন।

আচার্য্য শঙ্কর জানেন যে তিনি স্বল্পায়ু। অথচ এই স্বল্পপরিসর জীবনে এক বিরাট ব্রত তাঁহাকে উদ্‌যাপন করিতে হইবে। এই কাজ তাঁহার পক্ষে এক্‌লা করা সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য প্রয়োজন, কতিপয় শুদ্ধ মুক্তাত্মা সন্ন্যাসী। তাই তিনি শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চার করতঃ এই বৃহৎ কাজের জন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত করিতে উদ্যোগী হইলেন।

তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিল **সনন্দন**। তিনি সনন্দনকে যোগ ও জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। এই বিশেষ গুরুকৃপার জন্য কেহ কেহ সনন্দনকে ঈর্ষা করিতেন। তাই শঙ্কর তাঁহার প্রিয় শিষ্য সনন্দনের প্রগাঢ় গুরুভক্তি সর্ব্বসমক্ষে প্রকট করিলেন। অলকানন্দার তীরে আচার্য্যশঙ্কর শিষ্যগণসহ বসিয়া আছেন। সকলেই উপস্থিত। কিন্তু সনন্দন নাই। গুরুর জন্য কি একটা ঔষধি সংগ্রহ করিতে তিনি নদীর অপর পারে গিয়াছেন। পার্ব্বত্যনদী অলকানন্দা বড়ই খরস্রোতা। কাহারও পক্ষে সাঁতার কাটিয়া পার হওয়া সম্ভবপর নহে। কয়েক মাইল উপরে অলকানন্দা যেখানে সঙ্কীর্ণা, সেখানে লতা, পাতা ও বৃক্ষাদি দিয়া একটী ছোট সেতু করা হইয়াছে। বাসিন্দারা অপর পারে যাইতে হইলে সেই সেতু দিয়া পার হয়। শিষ্যদের কাছে আচার্য্য শঙ্কর এই সময়ে একটী জটিল প্রশ্নের সমাধান চাহিলেন। কিন্তু কেহ উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। আচার্য্য শিষ্য সনন্দনকে ডাকিলেন। গুরুর ডাক কাণে পৌঁছামাত্র সনন্দন ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি পৌঁছাইতে বেগবতী নদীর জলে নামিয়া পড়িলেন। অচিরে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। গুরুগতপ্রাণ সনন্দন পরমানন্দে অগ্রসর হইতেছেন। জলে নামিয়া তিনি যেখানে পা রাখিতেছেন, সেখানে এক একটি পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই হইতে গুরুর অভিলাষানুযায়ী সনন্দনের নাম

হইল "পদ্মপাদ"। অতঃপর সনন্দনের মুখে গুরুর তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া শিষ্যেরা সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। পরস্পরের ঈর্ষাভাব তিরোহিত হইল।

ভাষ্যাদি রচনার মাধ্যমে অদ্বৈতবাদের প্রচার বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মানবের জ্ঞান সাধনার নূতন পদ্ধতি প্রকাশ পাইতেছে। শিষ্যেরা শাস্ত্রবিৎ ও আত্মজ্ঞানী হইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর এইবার ব্যাসগুহার নির্জ্জনতা পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে আসিলেন। উত্তর খণ্ডের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তিনি সদলবলে উত্তর কাশীতে আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর। এইখানে তাঁহার ভাবান্তর হইল। তিনি সর্ব্বদা আত্মসমাহিত ও অন্তর্মুখী হইয়া থাকিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল তিনি তাঁহার গুরুদেব গোবিন্দপাদের আদেশানুযায়ী কাজ সমাপন করিয়াছেন। সর্ব্বত্র বেদান্তবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইবার উত্তর কাশীর পুণ্য ভূমিতে সমাধিযোগে দেহরক্ষা করিবেন স্থির করিলেন।

পদ্মপাদ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। তাঁহারা ও শুনিয়াছেন, গুরুদেব স্বল্পায়ু। আসন্ন বিপদের কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। ইহা প্রবাদ আছে যে এই সময়ে আচার্য্য শঙ্কর একদিন অলৌকিকভাবে ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি আদেশ দেন, "শঙ্কর! তোমার এখন দেহ রক্ষা করিলে চলিবেনা। তোমার অদ্বৈতবাদের ভাষ্য জগতে চিরজাগ্রত রাখিতে হইবে। "দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণকে তোমার স্বমতে আনিতে হইবে। তোমার আরও ষোল বৎসর এই কাজের জন্য বাঁচিতে হইবে।" আচার্য্য শঙ্কর এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না।

যুগাচার্য্য শঙ্করের জীবন নাট্যে এইবার নূতন ভূমিকা আরম্ভ হইল। তিনি দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইলেন। উত্তরাখণ্ড হইতে রামেশ্বর এবং দ্বারকা হইতে পরশুরামক্ষেত্র, সর্ব্বত্র তিনি

অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ এই শক্তিধর সন্ন্যাসীর অসাধারণ বিদ্যার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইল।

আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক নহেন। এই আদর্শ ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্ব হইতেই ছিল। তিনি তাহা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা, প্রচার, সংগঠনপ্রতিভা ও অলৌকিক শক্তি অদ্বৈতবাদ প্রচারে বিশেষ সহায়তা করে। যোগবিভূতির সহিত মনীষা ও কর্ম্মকুশলতার আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ তাঁহার জীবনে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। শুধু ভারতে নহে, সমস্ত বিশ্বের ইতিহাসে ইহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। নির্গুণ ও জ্ঞান-স্বরূপ পরম ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু এবং পরমতত্ত্ব। বিশ্বপ্রপঞ্চের সমস্ত কিছু মায়ার লীলাবৈচিত্র্য ও অনিত্য। এই সত্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যেরা ও ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ইহার নূতন জীবন দান করিয়াছেন। তাই শত শত বৎসরের পর ও অদ্যাপি তাহার প্রভাব অব্যাহত আছে।

সাকার অদ্বৈতবাদ।

আচার্য্য শঙ্কর ঘোষণা করিলেন, ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। মায়ার আবরণে এই দুইএর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জ্ঞানের আলোকসম্পাতে এই মায়ার অন্ধকার তিরোহিত হয়। "তত্ত্বমসি" এই মহাজ্ঞান মনে স্বতই জাগে।

এই সময়ে চোল দেশীয় পণ্ডিত কুমারিল ভট্টের নাম সর্ব্বত্র খ্যাত। তিনি মীমাংসা দর্শনের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য। যাগযজ্ঞ-সমন্বিত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই কুমারিল ভট্টের জীবনের ব্রত। তাঁহার বিরাট প্রতিভার সম্মুখে বৌদ্ধ ও জৈন নেতাগণ একে একে নতি স্বীকার করিতেছেন। ইহা শুনিয়া কুমারিল ভট্টকে স্বমতে আনিবার জন্য শঙ্করের ইচ্ছা হইল। তিনি প্রয়াগে আসিয়া কুমারিল ভট্টের দর্শন পাইলেন এবং তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের পোষকতায় আহ্বান করিলেন। কিন্তু কুমারিল ভট্ট তখন

হোমাগ্নিতে নিজের জীবন আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত। তাই তিনি তাঁহার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের নিকট যাইতে আচার্য্য শঙ্করকে বলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুমারিল ভট্ট স্বীকৃতি দিলেন যে মণ্ডন মিশ্রের পরাজয় হইলে কুমারিল ভট্টেরও পরাজয় হইবে। পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র দক্ষিণ মাহিষ্মতী নগরে বাস করেন। আচার্য্য শঙ্কর সেখানে গেলেন এবং মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী এই বিচার সভার নেত্রী হইলেন। বিচারশেষে উভয়ভারতী আচার্য্য শঙ্করের বিজয় ঘোষণা করিলেন। পরাক্রান্ত বেদবিদ্ মণ্ডনমিশ্রের এই পরাজয়ে চারিদিকে আলোড়ন পড়িয়া গেল। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মণ্ডনকে এইবার শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। উভয়ভারতী তখন এই সঙ্কট এড়াইতে নিজকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিণীরূপে প্রকাশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে পুনঃ শাস্ত্রবিচারে আহ্বান করিলেন। উভয়ভারতী বলেন তিনি স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিণী। তাঁহাকে হারাইতে না পারিলে আচার্য্য শঙ্করের জয় অর্দ্ধসমাপ্ত রহিল। শঙ্কর চিন্তায় পড়িলেন। তাঁহাকে যে দিগ্‌বিজয়ী হইতে হইবে। ইহা ব্যাসদেবের আদেশ। তিনি সম্মত হইলেন। উভয়ভারতী তখন কামশাস্ত্রে তর্কযুদ্ধ করিতে বলিলেন। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর অন্য যে কোন শাস্ত্র লইয়া তর্ক করিতে বলেন। উভয়ভারতী অস্বীকার করায় শঙ্কর স্বীকৃতি দিলেন; কিন্তু এক মাসের সময় নিলেন। শঙ্করাচার্য্য ভাবিত হইলেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী। নারীর সঙ্গে তিনি কামশাস্ত্রে কি প্রকারে জয়লাভ করিবেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রস্তুত হওয়ার একমাত্র পথ পরকায়ায় প্রবেশ। ভাগ্যক্রমে এক সুযোগও অচিরে উপস্থিত হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন, অদূরে বনের ভিতর 'আমরুক' নামক এক তরুণ রাজার শব সংকারের ব্যবস্থা চলিতেছে। আচার্য্য শঙ্কর এই সুযোগ ছাড়িলেন না। গহন বন মধ্যে এক

দুর্গম গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "যোগবলে আমি মৃত ঐ রাজার দেহে প্রবেশ করিব। একমাস শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আমি পুনঃ নিজ দেহে ফিরিয়া আসিব। তোমরা এই কয়দিন আমার পরিত্যক্ত দেহ সযত্নে রক্ষা করিবে। সাবধান, কেহ যেন টের না পায় এবং কেহ যেন এই দেহ স্পর্শ না করে।"

এইদিকে রাজদেহের সংকারের আয়োজন সম্পূর্ণ। অমাত্য ও রাজপুরোহিতেরা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ব্যস্ত। হঠাৎ শবাধারটি নড়িয়া উঠিল। মৃত রাজা ধীরে ধীরে চোখ খুলিলেন। রাজা আমরুকের দেহে প্রাণ আসিল। তিনি দৈবকৃপায় বাঁচিয়া উঠিলেন। আত্মীয় স্বজনের আনন্দের অবধি নাই। তাঁহাকে প্রাসাদে ফেরৎ আনা হইল। কিন্তু পুনঃ জীবন পাওয়ার পর রাজা এখন এক নূতন মানুষের মত চলিতেছেন। সেই রাজসিক ভাব আর নাই। রাজকার্য্যে মোটেই কূটকৌশলী নহেন। ইহাতে রাজমহিষী ও মন্ত্রীর সন্দেহ হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন কোন যোগী মন্ত্রবলে রাজদেহে প্রবেশ করিয়াছেন। রাণী ও মন্ত্রী উভয়েই পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন পরকায়ায় প্রবেশে সক্ষম যোগীর নিজদেহ নিকটে কোথায়ও আছে। উহা বিনষ্ট করিতে পারিলে রাজাকে জীবিত রাখা যাইবে। রাজদেহাশ্রিত সূক্ষ্মদেহী সাধক তাঁহার নিজ কায়ায় যাইতে পারিবেন না। রাণী ও মন্ত্রী এই দেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে ও তাহা বিনষ্ট করিতে রাজানুচর-দের আদেশ দিলেন। আদেশ পাওয়ামাত্র রাজানুচরেরা শবদেহের জন্য সর্ব্বত্র খুঁজিতে লাগিলেন। ইহাতে শঙ্করের শিষ্যেরা ভীত হইয়া পড়িলেন। কোনমতে যদি গুরুদেবের দেহের সন্ধান পায়, তবে উহা সর্ব্বনাশ হইবে। তাই প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ ভিক্ষার্থীরূপে রাজার সঙ্গে দেখা করিলেন। সকল কথা তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। তিনি চুপি চুপি শিষ্যকে বলিলেন, "আজই এই দেহ ছাড়িয়া যাইতেছি, তোমরা গুহায় অপেক্ষা কর।"

ইতিমধ্যে রাজানুচরেরা আসিয়া পড়িয়াছে। গুহার মধ্যে কোন শব আছে কিনা দেখিবে। শিষ্যেরা বাধা দিলেন। কোনমতে গুরুর দেহ স্পর্শ করিতে দিবেন না। এই সময়ে হঠাৎ দেহটী নড়িয়া উঠিল। আচার্য্য শঙ্কর ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। রাজসৈন্যেরা ইহা দেখিয়া অবাক হইল। তাহারা ধীরে ধীরে রাজধানীতে ফিরিয়া গেল। অপরদিকে রাজা আমরুকের প্রাণ পুনঃ বিয়োগ হইল। আচার্য্য শঙ্করের এই অত্যাশ্চর্য্য বিভূতির কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মাহিষ্মতীনগর আচার্য্যের বিষয় নিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল।

তৎপর দৃপ্ত ভঙ্গীতে শঙ্কর মণ্ডনমিশ্রের গৃহে আসিলেন। মিশ্র-পত্নী দেবী উভয়ভারতী সকল কথা শুনিয়া ভয় পাইলেন। তিনি অলৌকিক শক্তিধর এই তরুণ সন্ন্যাসীর স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন। দেবী যুক্তকরে পরাজয় স্বীকার করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই এই মহীয়সী মহিলা যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর আচার্য্য শঙ্করকে গুরুরূপে বরণ করিয়া মণ্ডনমিশ্র তাঁহার নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা নিলেন। মণ্ডনমিশ্রের সন্ন্যাস নাম হইল সুরেশ্বরাচার্য্য। এই সুরেশ্বরাচার্য্য উত্তরকালে ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিকরূপে সর্ব্বত্র খ্যাত হন।

নিজের মতবাদ প্রচারের জন্য আচার্য্য শঙ্কর তৎপর নাসিক ও পণ্ডারপুর আসিলেন। এইখানে তিনি উগ্রভৈরব নামীয় এক কাপালিকের সাক্ষাৎ পান। শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তবাদ শুনিয়া এই কাপালিক আচার্য্য শঙ্করকে হত্যা করিবার চক্রান্ত করেন। একদিন অমাবস্যার অন্ধকারে কাপালিকের শিষ্য রাজা ক্রকচ্ সহ কাপালিকের দলবল আসিয়া শঙ্করকে হত্যা করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গেল। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পদ্মপাদ ধ্যানযোগে ইহা জানিতে পারেন এবং নৃসিংহদেবের ভাবে আবিষ্ট হইয়া অপর শিষ্যসহ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া খড়্গ দ্বারা উগ্রভৈরবকে হত্যা করতঃ আচার্য্যদেবকে উদ্ধার করেন।

গুরুদেবের বিপদের সময় শিষ্য পদ্মপাদের মধ্যে নৃসিংহদেবের আবেশ এক অলৌকিক কাণ্ড।

তৎপর তিনি গোকর্ণে আসিয়া বিখ্যাত পণ্ডিত নীলকণ্ঠকে স্বকীয় মতে আনয়ন করেন। তৎপর মৌনাম্বিকা নামক শক্তিপীঠে উপস্থিত হন। দেবী দর্শনের পর শঙ্কর মন্দির হইতে ফিরিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, সম্মুখে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী মৃতপুত্র কোলে করিয়া কাঁদিতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব একমাত্র পুত্রকে বাঁচাইতে শঙ্করের পায়ে লুঠাইয়া পড়িলেন। দেবীর নির্ম্মাল্য শঙ্করের হাতে ছিল। তাহা মৃত পুত্রের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। ধীরে ধীরে বালক পুনর্জীবন লাভ করিল। ইহাতে সকলের মুখে শঙ্করাচার্য্যের জয়গান মুখরিত হইতে লাগিল। তিনি শিষ্যসহ দ্রুত সেস্থান হইতে পলাইয়া গেলেন।

তৎপর আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার দিগ্‌বিজয়ী বাহিনী লইয়া শ্রীবলীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার প্রবলপরাক্রান্ত আচার্য্য পণ্ডিত প্রভাকরের একমাত্র পুত্রের জিহ্বার ও দেহের জড়তা সারিতেছেনা। ছেলেটি একটি মূক মাংসপিণ্ড বিশেষ। বালককে পণ্ডিত প্রভাকর শঙ্করের পদতলে রাখিয়া সাশ্রুনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে আচার্য্য শঙ্করের মন বিগলিত হইল। তিনি বালককে, সে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকের জড়তা দূর হইল। সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকরাজি বিশুদ্ধ উচ্চারণে বালক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সকলেই শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইহাই হস্তামলক স্তোত্র। এই স্তোত্রের অর্থ বুঝিতে পারিলে ইহা করধৃত আমলকীর মত অতি সহজেই আয়ত্তে আসে। তিনি বালককে চাহিয়া লইলেন। বালকের নাম হইল হস্তামলকাচার্য্য। পদ্মপাদ ও সুরেশ্বরাচার্য্যের মতই শঙ্করমণ্ডলীতে ইঁহার অসামান্য খ্যাতি ছিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে আচার্য্য শৃঙ্গেরীতে আসেন। এই অঞ্চলটা

পৌরাণিক ঋষি বিভাণ্ডক ও ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যাপূত। এক সময়ে আচার্য্য শঙ্করের ইচ্ছা ছিল এইখানে একটা মঠ স্থাপন করেন। ইহার মনোরম পরিবেশ দেখিয়া শিষ্যেরা উৎসাহিত হইলেন। ইতিমধ্যে কর্ণাটের রাজা সুধন্ব তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন। এই রাজা ও শিষ্যদের উৎসাহে এইখানে সুপ্রসিদ্ধ শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপিত হইল। আচার্য্য শঙ্কর মহা সমারোহে সেইখানে সারদা দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই মঠে শঙ্কর কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তাঁহার বহুগ্রন্থ এইখানে রচিত হয়। এইখানে তাঁহারই শিষ্য "গিরি" অক্ষরত্ব লাভ করেন। গুরুকৃপায় তাঁহার মুখ দিয়া স্বরচিত বহুশ্লোক অনর্গল বাহির হইতে থাকে।

শৃঙ্গেরীতে বসিয়া আচার্য্য শঙ্কর একদিন অধ্যাপনা করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। জিহ্বায় তিনি মাতৃদুগ্ধের আস্বাদ পাইতেছেন। ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন মাতা তাঁহার মৃত্যুশয্যায়। মরিবার আগে একবার তিনি তাঁহার সন্ন্যাসী পুত্রকে দেখিতে চাহেন। তিনি যোগবলে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া কালাড়ির কুটির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ চারি বৎসরের পর মাতাপুত্রের মিলন হইল। মাতা শেষ বারের মত পুত্রকে দেখিয়া লইলেন। অদ্বৈতব্রহ্মাত্মবাদী আচার্য্য শঙ্করের কণ্ঠে ব্রহ্মের স্তুতিগান আরম্ভ হইল। তাঁহার মাতা সেই স্তুতি-গান শুনিতে শুনিতে চিরনিদ্রাভিভূতা হইলেন।

জ্ঞাতিরা শঙ্করের জ্ঞানমার্গীয় সাধনার বিরোধী ছিল। মৃত জননীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্যে কাহার ও সাহায্য পাওয়া গেলনা। মাতার দেহের সংকার সন্ন্যাসী শঙ্কর একাকী স্বহস্তে সমাপ্ত করিলেন।

এইবার শেষবারের মত শঙ্কর তাঁহার বেদান্ত ধর্ম্মের প্রচারে বাহির হইলেন। অনুগামী শিষ্যবৃন্দের ও ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং

অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া আচার্য্য শঙ্কর যখন যেখানে যান সেখানকার সাধক ও পণ্ডিত সমাজ তাঁহার মতবাদ মানিয়া নেন এবং তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করেন।

এই সময়ে বৌদ্ধবাদের ধারা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের শুদ্ধ অদ্বৈতবাদের বাণী সকলেই গ্রহণ করিতেছে। জ্ঞান ও সাধনার মধ্য দিয়া আত্মতত্ত্বের বিচার, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শুচিতার আদর্শ আচার্য্যদেব লোক সমক্ষে প্রচার করিলেন। সার্ব্বভৌম ধর্ম্মনায়করূপে, যুগাচার্য্যরূপে এই তরুণ বৈদান্তিক সারাভারতের বরেণ্য হইয়া উঠিলেন। বদরিধাম হইতে রামেশ্বর, দ্বারকা হইতে কামাখ্যা, আচার্য্য শঙ্করের ব্যক্তিত্বের আদর্শে প্রভাবিত হইয়া উঠিল।

ভারতের চারি প্রান্তে, বিষ্ণুর চারিধামে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, জ্যোতিঃ ধামে যোশীমঠ এবং রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ তাঁহারই দ্বারা স্থাপিত এবং তাঁহারই শিষ্য সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটকাচার্য্য ও হস্তামলক যথাক্রমে এই চারি মঠের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শঙ্করাচার্য্যের বৃহৎ কীর্ত্তি হইতেছে যে গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসী এই সমস্ত মঠের অধীনে আসিয়া সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হন।

কয়েক বৎসর পরিক্রমা ও অনলস কর্ম্মসাধনার পর আচার্য্য শঙ্কর উত্তরাখণ্ডে আসেন। গুরুদেবের আদিষ্ট কর্ম্ম শেষ হইয়াছে। সর্ব্বত্র ব্রহ্মাণ্ডবাদ প্রচারিত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার চির বিশ্রামের মহালগ্নটী সমাগত। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের সুললিত স্তবগাথা রচনা করিলেন। তারপর মহাসমাধিতে মগ্ন হন। সকলেই বুঝিলেন এই সমাধি ভাঙ্গিবে না। আত্মজ্ঞানী মহাসাধক সমাধির মধ্য দিয়া নিজের মরলীলা অবসান করিলেন। ভক্ত শিষ্যেরা তাঁহারই রচিত আত্মদর্শনের মহাবাণী উচ্চারণ করিলেন।

কিং করোমি ক্ক: গচ্ছামি
কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিং।
আত্মনা পুরিতং সর্ব্বং
মহাকল্পাম্বুনা যথা।

মহাপ্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস যেমন সারাবিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তেমনই আত্মা দিয়াই সমস্ত আবৃত রহিয়াছে এবং তাহাতেই নিমজ্জিত হইতেছে। আমার করিবার কি আছে? আমিই বা কোথায় যাইব? কোন্ বস্তু গ্রহণ করিব এবং কিই বা বর্জ্জন করিব?

৩। রামানুজ।

(১০১৭ খৃঃঅব্দ।)

আসুরী কেশবাচার্য্য পেরেমবুদুরের বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁহার স্ত্রীর নাম কান্তিমতী। কেশবাচার্য্য শাস্ত্রবিশারদ, নিষ্ঠাবান ও ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কান্তিমতী ও অত্যন্ত ভক্তিমতী ও সেবাপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শৈলপূর্ণ বৈষ্ণবনেতা যমুনাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং নিজে একজন প্রবীন সাধক ও ভক্ত ছিলেন। কেশবাচার্য্যের বেদজ্ঞান ও যজ্ঞনিষ্ঠা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে "শতক্রতু" উপাধি দেন।

কেশবাচার্য্যের বহুবৎসর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রকামনা করিয়া দাক্ষিণাত্যের পার্থসারথির মন্দিরে পূজা দিলেন এবং মন্দির সংলগ্ন তিরুইল্লিকেণিতে কুমুদ সরোবরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন।

কাজকর্ম্মশেষে কেশবাচার্য্য ক্লান্তিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। রাত্র নিশীথে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, ভগবান পার্থসারথি জ্যোতির্ম্ময়-রূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে অচিরে তিনি এক পরম ভাগবত পুত্র লাভ করিবেন। এই স্বপ্নাদেশ ফলিল।

১০১৭ খৃষ্টাব্দে কেশবাচার্য্যের গৃহ আলোকিত করিয়া এক দিব্য-কান্তি শিশু ভূমিষ্ট হইল। ইনিই উত্তরকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আচার্য্য রামানুজ। বৌদ্ধ ও শঙ্করযুগের পরে শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী আচার্য্য রামানুজের আবির্ভাব অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

রামানুজের অধ্যাত্মজীবনে পিতা কেশবাচার্য্যের সাধননিষ্ঠা এবং মাতা কান্তিমতীর ঐকান্তিকী ভক্তি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। বাল্যকাল হইতে রামানুজের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয়

পাওয়া যায়। দুরূহ পাঠসমূহ তিনি সহজে আয়ত্ত করেন। তাঁহার মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া অধ্যাপকেরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হন।

একদা রামানুজ চতুষ্পাঠী হইতে বাড়ী ফিরিবার কালে পথে প্রিয়দর্শন দিব্যকান্তি সাধু কাঞ্চিপূর্ণকে দেখিয়া সাগ্রহে আহ্বান করতঃ তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন। বালকের চোখে মুখে মহান সাধকের লক্ষণ দেখিয়া সাধু কাঞ্চিপূর্ণ বালককে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। পিতা কেশবাচার্য্য ও বালকের সাধুপ্রীতি দেখিয়া সুখী হইলেন এবং অতিথিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন। রাত্রে সাধু কাঞ্চিপূর্ণ শয্যায় বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় রামানুজ ধীর পদক্ষেপে আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে চাহিলেন। ইহাতে কাঞ্চিপূর্ণ বলিলেন, রামানুজ ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি শূদ্র। তাহা কি করিয়া সম্ভব হয়? রামানুজ উত্তর করিলেন, উপবীত ধারণ করিলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? হরিভক্তিপরায়ণ ভক্তই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কাঞ্চিপূর্ণ এই অদ্ভুত বাণী শুনিয়া বুঝিলেন, এই বালক ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। অসাধারণ ক্ষমতা এই বালকের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। শ্রীবরদারাজ বিষ্ণুর পরমভক্ত কাঞ্চিপূর্ণ রামানুজ সম্বন্ধে এই উচ্চ ধারণা লইয়া গেলেন।

রামানুজকে সংসারবন্ধনে বাঁধিবার জন্য তাহার পিতা কেশবাচার্য্য ষোলবৎসর বয়সকালে সদ্বংশের এক সুন্দরী কন্যার সহিত রামানুজের বিবাহ দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের কিছুকাল পরে রামানুজের পিতা মারা যান। শোকসন্তাপ কতক অবসান হইলে রামানুজ উচ্চতর শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতঃ মহাপণ্ডিত হইবার প্রয়াসী হইলেন। কাঞ্চীর অদ্বৈতবাদী আচার্য্য যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। তাহার পাঠাভ্যাস ও ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য দেখিয়া আচার্য্য যাদবপ্রকাশ অল্পদিনের মধ্যে রামানুজের প্রতি আগ্রহশীল ও স্নেহপরায়ণ হইলেন। একদা সেবানিষ্ঠ রামানুজ অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের স্নানের পূর্ব্বে তাঁহার দেহে তৈলমর্দ্দন

করিতেছেন। এমন সময় জনৈক ছাত্র আসিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্লোক "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" এর অর্থ জানিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন "কপ্যাসং" শব্দ নিয়া যত গোল। ইহার অর্থ সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ। তাহা কপির গুহ্য-দ্বার-দেশের মত। ইহাতে ভক্ত রামানুজ ব্যথিত হইলেন। তিনি বলিলেন, এই রকম হীন উপমা হইতে পারে না। তিনি অর্থ করিলেন, "কপ্যাসং" অর্থাৎ "কং" জল, পিবতি অর্থাৎ পান করা, এবং 'আস্' ধাতু বিকসিত। সমগ্র শব্দের অর্থ হইতেছে যে সূর্য্যের দ্বারা যাহা বিকসিত হয় অর্থাৎ পদ্ম। ইহা হইতে অর্থ দাঁড়ায় সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষের নয়নদ্বয় সূর্য্যবিকশিত কমলের ন্যায়। ইহাতে অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ বিস্মিত ও রুষ্ট হইলেন। বুঝিলেন উপরিউক্ত ছাত্র হইতে তাঁহার যশ ও খ্যাতি ভবিষ্যতে ক্ষুণ্ণ হইবে। তিনি ছাত্রটিকে রামানুজের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ মন্ত্রবিদ্যায় ও গুণী ছিলেন। সেই সময়ে কাঞ্চীর রাজকন্যা এক দুষ্ট প্রেতাত্মার প্রভাবে পড়েন। রাজা নিরুপায় হইয়া যাদবপ্রকাশকে সশিষ্য আনাইয়া লইলেন ও রোগ সারাইতে বলিলেন। যাদবপ্রকাশ রোগীর কাছে বসিয়া মন্ত্র ফুঁকিতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। হঠাৎ রাজকুমারীর মুখ দিয়া এক অদ্ভুত বাণী শোনা গেল। যদি উপস্থিত শিষ্য পরম পবিত্র ভক্তিমান রামানুজ আমার শিরে তাঁহার পাদস্পর্শ করান, আমি রাজকুমারীকে ত্যাগ করিয়া যাইব। রোগিণীর রোগ সারাইতে উপস্থিত সকলের একান্ত অনুরোধে রামানুজ তাহাদের সম্মুখে তাহাই করিলেন। রোগিণী ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিল। ইহাতে রামানুজের খ্যাতি ও যশ আরও বৃদ্ধি পাইল।

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। অনেক সময় যাদব-প্রকাশের মতও তিনি খণ্ডন করিতেন। ইহাতে যাদবপ্রকাশ রুষ্ট

হইয়া তাহাকে প্রাণে বধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের ছলনা করিয়া সঙ্গে লইলেন। পথে গহণ অরণ্য মধ্যে তাহাকে বধ করিবে টের পাইয়া সে পলাইয়া গেল। গহন বনমাঝে রাত্রে সে পথ স্থির করিতে না পারিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্তিতে ও অবসাদে এক জায়গায় ঘুমাইয়া পড়ে। নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখে যে এক ভীল বালক ও তাহার স্ত্রী রামানুজের শিয়রে বসিয়া আছে। তাহারা তাঁহাকে আহার্য্য প্রদান করিল, এবং কাঞ্চী সহরের প্রান্তে পৌছাইয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। এইসব কথা সাধক কাঞ্চীপূর্ণকে বলিলে তিনি বলেন স্বয়ং শ্রীবরদারাজ নারায়ণ ও তাঁহার পত্নী লক্ষ্মী ঠাকুরাণি রামানুজকে রক্ষা করিয়াছেন।

কিছুকাল পরের কথা। প্রসিদ্ধ সাধক শ্রীরঙ্গনাথের একনিষ্ঠ সেবক যমুনাচার্য্য কাঞ্চী আসিয়াছেন। ভীষণ জনতার মধ্যে তিনি রামানুজকে দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। রামানুজকে তিনি ভুলিতে পারিলেন না। রামানুজকে মঠাধ্যক্ষ করিতে তিনি তাঁহার শিষ্য মহাপূর্ণকে পাঠাইলেন। কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশে তিনি মহাপূর্ণ হইতে দীক্ষা নিলেন। এবং পরে তিনি স্ত্রীর রুক্ষ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবরদারাজ বিষ্ণুর মন্দিরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে বৈষ্ণবগুরু যমুনাচার্য্য তাঁহাকে ডাকাইলেন কিন্তু তিনি আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এক হস্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই রামানুজ এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হইলেন। তিনি সন্তরচিত এক শ্লোকে স্বীয় সংকল্পবাণী উচ্চারণ করিলেন। উহার অর্থ হইতেছে যে "আমি বিষ্ণুমতে দৃঢ়নিষ্ট থাকিয়া, অজ্ঞানমোহিত জনগণকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত দ্রাবিড়বেদে শিক্ষিত করিব এবং নারায়ণশরণাগত ব্যক্তিদের রক্ষা করিব।" কথিত আছে রামানুজের এই বাণী উচ্চারণের পর মৃত যমুনাচার্য্যের বদ্ধমুষ্টি খুলিয়া যায়।

ইহার পর রামানুজ অত্যন্ত খ্যাত হইয়া পড়েন এবং মঠাধীশ হন। আচার্য্য যাদবপ্রকাশও নিজের ভুল বুঝিয়া অনুশোচনায় রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যাদবপ্রকাশের নব নামকরণ হইল গোবিন্দদাস। তিনি এখন পূর্ব্বের সেই গর্ব্বোদ্ধত মহাতার্কিক ও অদ্বৈতবাদী আচার্য্য নহেন। তিনি এখন এক ত্যাগতিতিক্ষাময় পরমভাগবতরূপে পরিচিত হইলেন।

আচার্য্য রামানুজ যমুনাচার্য্যের আসন লাভ করিয়া মঠাধীশ-রূপে রাজোচিত সম্মান লাভ করিলেন এবং বিরাট বৈষ্ণব সমাজের নেতা বলিয়া গণ্য হইলেন। কিন্তু অন্তর তাঁহার দীনাতিদীন। জীবনের মহাব্রত হইতে তিনি ক্ষণতরে বিচ্যুত হন নাই। ভারতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তিনি স্থাপন করেন। ভারতের ধর্ম্মজীবন ও সাধনক্ষেত্রে রামানুজের প্রভাব বাড়িয়া যায়। তাঁহার রচিত বিষ্ণু-উপাসনা ও ভক্তিমার্গ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্য-দিগকে প্রভাবিত করে।

যমুনাচার্য্যের পাঁচজন অন্তরঙ্গ শিষ্য। কাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গ। প্রত্যেকেই বৈষ্ণবতত্ত্বের যাবতীয় শিক্ষা লাভ করেন। যমুনাচার্য্যের এই পাঁচজন প্রধান শিষ্যেরা গুরুদেবের এক একটি পৃথক ভাবধারা গ্রহণ করেন। এই পঞ্চধারা সামগ্রিক ভাবে রামানুজের জীবনে দেখা যায়। ইহাতে তিনি দাক্ষিণাত্যের ভক্ত ও জনসমাজে সর্ব্বগুণান্বিত বৈষ্ণবনেতারূপে পরিগণিত হন। রামানুজের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা দেখিয়া শ্রীরঙ্গম্ মঠের প্রধান পূজারী শঙ্কিত হইলেন। তিনি তাঁহার স্বার্থ ও প্রাধান্য রক্ষা করিতে রামানুজকে অন্নের সঙ্গে বিষপ্রয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পূজারীর স্ত্রী তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন। এই যাত্রা রামানুজ রক্ষা পাইলেন। আর একবার স্বয়ং পূজারী পানীয়ের সঙ্গে বিষ দিলেন। রামানুজ তাহা ৺ঠাকুরের চরণামৃত বলিয়া খাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু অলৌকিক শক্তির আধার এই

বিরাট পুরুষের কিছুই হইল না। এই সব দেখিয়া পূজারী অনুতপ্ত হইলেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর পরম পণ্ডিত দাক্ষিণাত্যবাসী অদ্বৈতবাদী যজ্ঞমূর্ত্তির সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। তিনি ভারতে দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। এই ব্যাপারে রামানুজের সঙ্গে অদ্বৈতমায়াবাদ লইয়া সতের দিন তর্কযুদ্ধ হয়। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিয়া মহাপণ্ডিত যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

রামানুজের বহু ভক্ত ও শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে দাশরথি ও শ্রীবৎসই প্রধান। তিনি তাঁহার দুই শিষ্যকে তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু বলিতেন। এই দুই শিষ্য তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল।

তাঁহার জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা শোনা যায়। তিনি স্বপ্নে জানিতে পারেন এক বিষ্ণুশিলা দিল্লীসম্রাটের অন্তঃপুরে আছে। তিনি নিজে দিল্লীসম্রাটের নিকট গিয়া তাহা চাহিয়া আনিলেন। এই শিলা সম্রাট কন্যা লছিমারের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। লছিমা ও তাঁহার প্রণয়ী কুরেশ উহা ফেরৎ নিতে আসিয়া রামানুজকে দেখিয়া অভিভূত হইলেন এবং উভয়েই তাঁহার পরমবৈষ্ণবভক্তরূপে পরিণত হইলেন।

দীর্ঘ একশত ত্রিশ বৎসর কাল রামানুজ জীবিত ছিলেন। যমুনাচার্য্যের অভিলষিত সাধন প্রণালী তিনি প্রায় সর্ব্বত্র ইতিমধ্যে রূপায়িত করিয়াছেন। সারা দাক্ষিণাত্যে এক বিরাট বিষ্ণুসেবী সাধকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল। ত্যাগ, তিতিক্ষা, অসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও বৈষ্ণবীয় দৈন্যে ইঁহারা অতুলনীয় ছিলেন। এই কারণে সমগ্র ভারতে এই রামানুজপন্থীদের আদর্শ বিস্তার লাভ করে।

তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য কুরেশ পরলোক গমন করিয়াছেন। কুরেশের পুত্র পরাশর এক মণ্ডলী অধিপতি। রামানুজের আশীর্ব্বাদে ধন্য হইয়া তিনি এই বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।



রামানুজ এই সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ বুঝিলেন তিনি সহসা মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিবেন। তাই তাঁহারা রামানুজকে তাঁহার এক প্রস্তরমূর্ত্তির জন্য নিবেদন জানাইলেন। শিষ্য ও ভক্তদের মিনতিতে রামানুজ বিগলিত হইলেন ও নিপুণ ভাস্কর ডাকাইয়া তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। আচার্য্য রামানুজ নিজেই এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। গুরুদেবের জীবন্ত দেহের প্রতিরূপ তাঁহার জীবদ্দশায় নির্ম্মিত এই ভাস্কর্য্য এক পরম পবিত্র বস্তু। ইহা পাইয়া ভক্তেরা অত্যন্ত প্রীত হইল।

এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে (১০৫৯ শকাব্দ) মাঘ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে এই মহাপণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব নিজ দেহ রক্ষা করিলেন।

অধ্যাত্মগগন হইতে এক মহান্ জ্যোতিষ্ক লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া গেল।

৪। ভক্ত নামদেব।

(১২৭০ খৃষ্টাব্দ।)

মহারাষ্ট্রের এক ক্ষুদ্র গ্রাম নরসিংহপুরে ১২৭০ খৃষ্টাব্দে নামদেব ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতা দামাশেট নিম্নশ্রেণীর এক নগণ্য দরজী। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দামাশেট গণকের নিকট যান এবং তথায় জানিতে পারেন যে জাতক অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন। অতুল ভক্তিধন সে অর্জ্জন করিবে এবং ভক্তিচন্দনে অগণিত অভঙ-পদের কবিতা লিখিবেন। তাহাতেই দেশবাসী মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইবে।

গণৎকারের এই ভবিষ্যৎবাণী প্রথম বয়সে ফলবতী হইল না। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বালক মহা দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তারপর সংসর্গ দোষে এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু ও নরঘাতকরূপে এই অঞ্চলে কুখ্যাত হইয়া উঠে।

পুত্রের কুকীর্ত্তির কথা দামাশেটের কাণে পৌঁছায়। সারা অন্তর ব্যথায় ভরিয়া উঠে। ভগবানের চরণে তিনি পুত্রের সুমতির জন্য আর্ত্তি জানান। এই পুত্র যোদ্ধৃবেশে মাঝে মাঝে আম্বোধিয়ার দেবী মন্দিরে পূজা দিতে যাইত। বড় রহস্যময় তাহার পূজা। মন্দিরে সে ঘোড়া ছুটাইয়া আসে, ভক্তিভরে পূজা অর্চ্চনা সম্পন্ন করে, দীনদুঃখীদের দুই হাতে টাকা কড়ি বিলায়, তারপর আবার ঘোড়া ছুটাইয়া বনমধ্যে চলিয়া যায়। সাহস করিয়া তাহাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না।

একদা ঘোড়া বাঁধিয়া লোকটি মন্দিরের সিঁড়িতে উঠিতে যাইবে এমন সময় এক ভিখারীবালকের কান্না শুনিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। আগাইয়া গিয়া সরোষে বালকের মাতাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হতভাগিনী নারী বলে তাহার স্বামী রাজসরকারের সেনাদলে কাজ করিত। সেদিনকার রাতে তাহারা ৮৫ জন সওয়ার ছিল। লোধনার জঙ্গলে তাহারা খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ ঘুমাইতেছে, এমন সময় তাহাদের উপর ডাকাত

পড়িল। অতর্কিত আক্রমণে সকলেই নিহত হইল। বালকের পিতাও প্রাণ হারাইল। কত নারী বিধবা হইল, কত শিশু পিতা হারাইল, কত জননী সন্তান হারাইল। ইহাদের দীর্ঘশ্বাসে সেই ডাকাত নরপশু জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইবে না কি? দীর্ঘশ্বাসে ভরা দুঃখিনী মায়ের এই মর্ম্মান্তিক অভিশাপ আগন্তুকের প্রাণে তীব্র কষাঘাত হানিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার আনন পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করিল। হাত পা থরথর কাঁপিতে লাগিল। সর্ব্বনাশ! ইহা ত শুধু এই রমণীরই দুঃখের কাহিণী নহে, ইহা যে তাহার নিজেরই পৈশাচিক দুষ্কৃতির ইতিহাস। সেদিনকার সেই নরমেধ যজ্ঞের হোতা সে নিজেই। তাহারই দ্বারা চালিত দস্যুদল এই হত্যাকাণ্ড করিয়াছে। রক্তাক্ত বীভৎস সেদিনকার সে দৃশ্য তাহার মনে পড়িল। শরীর তাহার শিহরিয়া উঠিল। বিধবার আকুল ক্রন্দন থামিতেছে না এবং দস্যুসর্দ্দারের পক্ষে এই কাতরতা সহ্যও হইতেছে না। হৃদয়ের তীব্র অনুতাপের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। অসহ্য অনুতাপে সে সন্নিকটে মন্দিরের দুয়ারে ঝুলান তীক্ষ্ণ কাটারী লইয়া নিজের গলায় বসাইয়া দিল। সকলে ভাবিল এ কি উন্মাদের কাণ্ড। ফিনকী দিয়া রক্ত দেবীর পায়ে গিয়া পড়িল। ক্ষত তত গভীর নহে। সকলে গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং বুঝাইয়া শান্ত করিয়া মন্দির হইতে বিদায় দিলেন।

অনুশোচনার আগুন এই দস্যুর জীবনে জ্বলিতেছে। অন্তরে তীব্র বেদনা ও আর্ত্তি। কোথায় হে সর্ব্বকল্মষহারী প্রভু? কোথায় তোমার সেই চির অমৃত লোক। কাঁদিতে কাঁদিতে সে পন্ধারপুরের বিঠ্‌টলজির চরণতলে পরম আশ্রয় গ্রহণ করে। দুর্দ্ধর্ষ নরহন্তা নামপ্রেমের মহাচারণে পরিণত হয়। নূতন নামকরণ হয় নামদেব।

সাধক জ্ঞানদেব মারাঠার ভক্তি-আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি পন্ধারপুরের বিঠ্‌টল সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা বলিয়া স্বীকৃত হন। যদি ও তিনি অল্প বয়সে মারা যান, তাঁহার

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আন্দোলন উদ্‌যাপনের ভার নামদেব ও তুকারামের উপর ন্যস্ত হয়। নামদেব সারা মহারাষ্ট্রে শুদ্ধা ভক্তির ধারা সিঞ্চন করেন। নামদেব জ্ঞানদেব হইতে অল্প কয়েক বৎসরের ছোট ছিলেন। জ্ঞানদেবের অকাল মৃত্যুর পর নামদেব প্রায় চুয়ান্ন বৎসর পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান। পন্দারপুরের বিঠ্‌টল সম্প্রদায় তাঁহারই আশ্রয়ে দৃঢ়ভিত্তিতে দাঁড়াইতে সক্ষম হয়।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর পি আর ভাণ্ডারকারের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা গেল। তিনি বলেন, "কৃষ্ণবিগ্রহ" বিঠ্‌টলজীর নামের অন্যতম বিশেষণ পাণ্ডুরঙ্গ বা শুভ্রবরণ। এই বিশেষণের মধ্য দিয়া বিঠ্‌টল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ প্রচার করেন যে, শিব ও কৃষ্ণ একই পরমতত্ত্বরূপে বিরাজমান। (R. D. Ranadie's Mysticism in Maharastra—P. 183).

এই বিঠ্‌টল সম্প্রদায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে পন্দারপুর বৈষ্ণবতীর্থরূপে বিস্তর প্রসিদ্ধি লাভ করে। জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ ও তুকারামের প্রচারের মাধ্যমে প্রভু বিঠ্‌টলজীর (কৃষ্ণবিগ্রহ) মাহাত্ম্য আর ও ছড়াইয়া পড়ে।

গোরা কুম্‌হার একজন শক্তিমান মহাপুরুষ ও নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন। তিনি একদিন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, বিঠ্‌টল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্ত নামদেব এখন ও কতকটা কাঁচা রহিয়াছে। ইহাতে নামদেব নিরাশ বা দুঃখিত না হইয়া আর ও কঠোর ব্রত আরম্ভ করেন। কিছুদিন সাধনার পর তিনি সাধক বিশোয়া খেচরার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি অভয় দিয়া নামদেবকে দীক্ষা দিলেন। আশীর্ব্বাদ করিলেন যেন তাহার পরম প্রাপ্তি হয়। মহাপুরুষের দীক্ষা ও আশীর্ব্বাদের ফল সহসাই ফলিল। বিশোয়ার কৃত এক 'অভঙে' (কবিতায়) তাহা উল্লেখ আছে। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকেই এই ভক্তি সাধনায় নামদেব আহ্বান

জানান। এই আহ্বান শুধু মহারাষ্ট্রে নহে, সারা দক্ষিণ ভারতেই এক অভূতপূর্ব্ব জাগরণ তোলে।

তখনকার দিনে পন্দারপুর ছিল মহারাষ্ট্রের দেওগিরি রাজ্যের অন্তর্গত। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খিলিজীর সেনাপতি মালিক কাফুর এই রাজ্য আক্রমণ করে। খিলিজীবাহিনীর তীব্র আঘাতে সারা দেওগিরি বিপর্য্যস্ত হয়। সর্ব্বত্র তীব্র হাহাকার উঠে। এই ঐতিহাসিক দুর্যোগের সময়েই ভক্ত নামদেবের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, ভগবৎজীবন ও এই মধুস্রাবী "অভঙ্গ" সঙ্গীত ভগবৎবিশ্বাসের শক্তি ও উদ্দীপনা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করে। বৈষম্যের ও দ্বেষের মনোভাব লুপ্ত হয়।

উত্তরকালে তাঁহার বহু শিষ্য সেবক ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিল। ভক্ত "চোখা" যদিও জাতিতে "অস্পৃশ্য" এবং ব্যবসায়ে রাজমিস্ত্রী ছিলেন, তিনি নামদেবের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন। ভক্ত "চোখা" সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া পরিবারের ভরণ-পোষণের অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। আর তাঁহারই এই কর্ম্মজীবনের আড়ালে ইষ্টনামের মধুপ্রবাহ তাঁহারই অন্তরে সর্ব্বদাই বহিয়া চলিত। মাঝে মাঝে নামদেব তাঁহাকে মন্দিরে ডাকিতেন। নৃত্য ও কীর্ত্তনের সহায়ে তিনি প্রভু বিঠ্‌ঠলজীর মন্দিরে ভক্তি রসের তরঙ্গ তুলিতেন।

"মঙ্গলভেদায়" কাজ করিবার সময় হঠাৎ একটা দুর্গপ্রাকার খসিয়া পড়ে এবং উহার নীচে পড়িয়া "ভক্ত চোখা" ও একদল সহকর্ম্মী মারা যায়। বহু চেষ্টা করিয়া ও তাঁহাদের উদ্ধার করা গেল না। কয়েকদিন পরে ধ্বংসস্তূপ অপসারণ করিয়া দেখা গেল, মৃত দেহগুলি ছিন্নভিন্ন ও গলিত হইয়া গিয়াছে। কোন্‌টা কাহার দেহ চিনিবার উপায় নাই। অথচ অপরদিকে পন্দারপুরের ভক্ত সমাজ পরম ভাগবত "চোখার" দেহাস্থি বাহির করিয়া সমাধিস্থ করিতে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিতেছিলেন না

কোনটী কাহার অস্থি। নিরুপায় হইয়া তাঁহারা ভক্ত নামদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

তিনি বলিলেন, একটা একটা করিয়া মৃতদেহের হাড়গুলি কাণের কাছে ধর। যে হাড়টার ভিতর নিরন্তর বিঠ্‌ঠলজীর নাম বাজিতেছে শুনিতেছ, মনে রাখিবে সেই হাড় প্রভুর মহান সেবক, নামসিদ্ধ ভক্ত চোখার। তাঁহার নির্দ্দেশমত ভক্তেরা এইভাবে ভক্ত চোখার দেহাস্থি বাছিয়া লইল।

বৈষ্ণবীয় সাধনার সাফল্য নামদেবকে ভক্তসমাজে বরণীয় করিয়া তোলে। ইষ্টনিষ্ঠা ও শরণাগতির মধ্য দিয়া এই মহাবৈষ্ণব প্রাণপ্রভুর জ্যোতির্ম্ময় লোকের সন্ধান পান। তাঁহার জীবন চিরভাস্বর হয়।

১৩৫০ খৃষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় আশীবৎসর বয়সে এই মহাজীবনে চিরবিরতির যবনিকা নামিয়া আসে।

নামমূর্ত্তি নামদেব প্রপঞ্চময় জগতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেন। সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়ে শোকাশ্রু বহিতে থাকে।

৫। স্বামী বিদ্যারণ্য।

(১২৭৮ খৃষ্টাব্দ।)

বর্ত্তমান অন্ধ্ররাজ্যের বেলারী জেলার অন্তর্গত হাম্পির নিকটে আনাগোণ্ডি নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুঃ শাখীয় ব্রাহ্মণ আচার্য্য মায়ন বাস করিতেন। বেদান্ত ও বহুশাস্ত্রবিদ্, সদাচারী ও সাধনপরায়ণ পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার স্ত্রী "শ্রীমতী" অত্যন্ত উন্নতমনা ও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। আচার্য্য মায়নের ঔরষে ও 'শ্রীমতী'র গর্ভে আনুমানিক ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার আরও দুই ভ্রাতা "শায়ন" ও "ভোলানাথ" ও এক ভগ্নী "সিঙ্গলী" ছিল।

মায়নাচার্য্যের এক চতুষ্পাটী ছিল। পিতার চতুষ্পাটীতেই মাধবাচার্য্য ও তাঁহার ভ্রাতাদের বিদ্যারম্ভ হয়। আচার্য্য মায়নের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, শাস্ত্রচর্চ্চা ও বিদ্যাবিতরণ। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে স্বীয় পুত্রদেরও তিনি পরম যত্নে বিদ্যাশিক্ষা দেন। তিন পুত্রদের মধ্যে মাধব ও শায়ন অসামান্য শ্রুতিধর ছিলেন। যতই কঠিন ও যতই জটিল হউক না কেন, কোন একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা একবার শুনিলে তাহা আর তাঁহারা ভুলিতেন না।

গৃহ চতুষ্পাটীর পড়া শেষ হইলে তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার্থে কাঞ্চী নগরে গমন করেন। সারা দক্ষিণ ভারতে তখন কাঞ্চীনগরী শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে খ্যাত ছিল। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও ধর্ম্মগুরুরা ও শিক্ষার্থীরা আসিয়া এইখানে সমবেত হইত। শাস্ত্রালোচনা, বিচারদ্বন্দ্ব ও ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠানে কাঞ্চীনগরী সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত।

এইখানে আসিয়া মাধবাচার্য্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি এইখানে প্রায় সর্ব্ব শাস্ত্র আয়ত্ত করিবার সুযোগ পাইলেন এবং স্বায় অভীষ্ট সাধনে তৎপর হইলেন।

মাধবাচার্য্যের ন্যায় শায়নও মহাপ্রতিভাশালী ছিলেন। উত্তরকালে তিনি বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শী হন এবং বেদের ভাষ্য রচনা করিয়া অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। এই প্রতিষ্ঠা ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে শায়নাচার্য্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোলানাথ বিজয়নগর রাজ্যের সুদক্ষ সচিব ছিলেন। তিনি সমকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

কাঞ্চীতে বিদ্যার্জ্জনসময়েই নবীন শিক্ষার্থী মাধবাচার্য্য সহপাঠী বেঙ্কটনাথের সহিত পরিচিত হন এবং ক্রমে ক্রমে এই পরিচয় অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

এই দুই বন্ধুর মধ্যে নানা রহস্যালাপ ও বাদানুবাদ হইত। শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তবাদের উপর মাধবাচার্য্যের প্রবল অনুরাগ ছিল। কিন্তু বেঙ্কটনাথ উহার ঠিক বিপরীত রামানুজের ভক্তি ও শরণাগতির পথের অনুসরণকারী ছিলেন। মাধবাচার্য্যের বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ হইয়াছে। তিনি তখন বেদ ও বেদান্তে অগাধ পণ্ডিত। তিনি নিজেও বহু মূল্যবান শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতকে দক্ষিণভারত মাধবাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছে। তবুও মাধবাচার্য্যের প্রাণে শান্তি নাই। তিনি সারাভারতে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের বিজয়পতাকা উড়াইতে চাহিলেন এবং আচার্য্য শঙ্করের মতবাদকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন বিপুল অর্থ। ইহাতে দরকার লক্ষ্মীর অপার করুণা। তিনি তজ্জন্য হাম্পির ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে হোমক্রিয়ার শেষে একদিন গভীর ধ্যানে ও জপে নিবিষ্ট হইলেন। মায়ের প্রত্যাদেশ পাইবার জন্য আকুল হইয়া রহিলেন।

সাতদিন অহোরাত্র ধ্যানের পর তিনি মায়ের প্রত্যাদেশ পাইলেন যে, তিনি এ জন্মে ধন সম্পদের অধিকারী হইবেন না। পরবর্ত্তী জন্মে বিত্তলাভ করিবেন। বড় দুঃখে তিনি বাড়ী

ফিরিলেন। মাধবাচার্য্য প্রাণের সহিত দেশকে ভালবাসিতেন। তিনি দেখিতে পাইলেন খিলীজি ও তুঘলক বাহিনীর অত্যাচারে সারাদেশ উৎসন্ন যাইতেছে। হিন্দুধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়। এমন কি তাঁহার নিজগ্রাম আনাগোণ্ডি ও আজ মহাবিপন্ন। তিনি ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিলেন। অচিরে হাম্পি পরিত্যাগ করিয়া মাধবাচার্য্য পদব্রজে রামেশ্বরের শৃঙ্গেরী মঠে আসিলেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত এই মঠ অদ্বৈতবিদ্যার মহান কেন্দ্র। শঙ্করের যুগ হইতে শত শত বৎসর ধরিয়া জ্ঞানসাধনার চর্চ্চা এইখানে চলিতেছে। এইখানকার মঠাধ্যক্ষ জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হন। তখন এই মঠের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন প্রবীণ সন্ন্যাসী বিদ্যাশঙ্করতীর্থ এবং ইনি এই সময়ের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য। এই মহাবৈদান্তিকের নিকট মাধবাচার্য্য দীক্ষা ও সাধন গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁহার নামাকরণ হইল বিদ্যারণ্য স্বামী। এই শৃঙ্গেরী মঠে থাকাকালীন ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যারণ্য স্বামী শুনিলেন বিজয়নগরের রাজা জম্বুকেশ্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য বুঝিলেন, পুনঃ মুসলমান অত্যাচার বৃদ্ধি পাইবে। পুনঃ মাদুরা ও শ্রীরঙ্গের মত এখানেও অবাধ বীভৎসতা চলিতে থাকিবে। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেশে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু গুরুদেবের বাধায় বাধ্য হইয়া আরও দুইবৎসর থাকিয়া গেলেন। ক্রমে দুই বৎসর অতীত হইল। বিজয়নগরের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছাইল। এইসময়ে একদিন মঠের সন্ন্যাসীদের শোক-সাগরে ভাসাইয়া বিদ্যাতীর্থ মহারাজ সমাধি নেন। গুরুর সমাধি-বেদীতে প্রণাম করিয়া বিদ্যারণ্য স্বামী শৃঙ্গেরী মঠ হইতে বাহির হইলেন ও ভুবনেশ্বরী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি পুনঃ ধ্যানে বসিলেন। ইহা তাঁহার শেষ প্রয়াস এবং এই দুর্ব্বার সঙ্কল্প নিয়া তিনি আসন পাতিলেন। রাত্রিশেষে

জগন্মাতা দর্শন দিলেন, বলিলেন, সন্ন্যাস নেওয়া হেতু তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। এইবার ঋদ্ধি ও সিদ্ধি দুইই তুমি পাইবে। মায়ের প্রত্যাদেশ শুনিয়া বিদ্যারণ্য স্বামীর দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠে "মা" "মা" রবে মন্দির কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। দেবী সহসা কখন অন্তর্হিত হইলেন, বুঝিতে পারিলেন না।

এইবার তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। হরিহর রায় ও তাঁহার ভ্রাতা বক্কুকে সহায়ক পাইলেন। বক্কু রায় যুদ্ধকুশলী ও করিৎকর্ম্মা যুবক। তাহারা শিকার করিতে কুকুর সঙ্গে করিয়া পাহাড়ে আসে। সেখানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন কতকগুলি পার্ব্বত্য শশক কুকুরদের কামড়াইয়া জখম করিয়া পুনঃ জঙ্গলে অদৃশ্য হইল। ইহাতে বিদ্যারণ্য স্বামী বুঝিলেন, ইহা মায়ের সঙ্কেত। তিনি তাড়াতাড়ি হরিহর ও বক্কুকে লইয়া সেই স্থান খনন করতঃ বিপুল ধনরাশি, অজস্র স্বর্ণপিণ্ড ও রত্নসম্ভার পাইলেন। তদ্বারা দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইল। হস্তিনাবতীর অরণ্যময় জনহীন প্রান্তরে হাম্পি নবজাগরণে জাগিয়া উঠিল।

বিদ্যারণ্য তখন হরিহরের অভিষেক সম্পাদনে উদ্‌গ্রীব হইল। তৎপূর্ব্বে রাজনৈতিক কারণে হরিহর বিদ্যাতীর্থের নিকট দীক্ষা নিয়াছিলেন। রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার পর হরিহর বিজয়নগরের নাম "বিদ্যানগর" রাখিলেন। পরবর্ত্তীকালে বিদ্যারণ্যের স্থাপিত এই বিজয়নগর, বিদ্যানগর নামেও অভিহিত হইত।

সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। তৎসঙ্গে সঙ্গে বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও শক্তি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল বিদ্যারণ্য স্বামী রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ও প্রেরণায় বিজয়নগর একচ্ছত্র রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা শায়নাচার্য্য এই গুরুভার গ্রহণ করেন।

কেহ কেহ বিত্তারণ্যকে যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায় সন্ন্যাসী বিত্তারণ্য স্বামী যদিও যুদ্ধের প্রেরণা যোগাইয়াছেন, তিনি নিজে কোনদিন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। বিজয়নগরের ভিত্তি দৃঢ় হইবার পর তিনি পুনঃ শৃঙ্গেরী মঠে ফিরিয়া যান। তিনি সেখানকার ষড়বিংশতি মঠাধীশ ও জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য-রূপে বৃত হন। তাঁহার গুরু আচার্য্য বিত্তাশঙ্কর ও ভারতীতীর্থের পর তিনি এই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি বেদান্তপ্রকাশ, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদের দীপিকা, বৃহদারণ্য, বাত্তিক-সার, পরাশর মাধব (পরাশর স্মৃতির ব্যাখ্যা), জৈমিনীর স্তায়মালা বিস্তর (পূর্ব্ব মীমাংসার টীকা), বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, অনুভূতি প্রকাশ, জীবন্মুক্তি, পঞ্চদশী, কালমাধব, ধাতুবৃত্তি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।

উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের সহিত কর্ম্মজীবনের এইরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ একমাত্র বিত্তারণ্যস্বামীর জীবনে দেখা যায়। তিনি একাধারে ভক্ত, কর্ম্মী ও জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার স্থাপিত বিজয়নগর মাতুরা যুদ্ধের পর চতুর্দ্দশ শতকের শেষপাদের দিকে অজেয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মহান্ সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব, কর্ম্মশক্তি ও আত্মিক প্রেরণা বিজয়নগরের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের অশেষ সহায় হইয়াছে।

বিত্তারণ্য স্বামী এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। ভারতের শ্রেষ্ঠ বেদান্ত-পীঠ শৃঙ্গেরী মঠের তিনি অধ্যক্ষ। তিনি এখন সারা ভারতের বেদান্তীসমাজের মধ্যমণি। তাই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, জ্ঞানপন্থী সাধকেরা শৃঙ্গেরী মঠে আসিয়া মিলিত হন এবং মুক্তির নির্দ্দেশ চাহেন। সময়ে সময়ে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নিয়া রাজা ও অমাত্যেরা মাঝে মাঝে এই মঠে উপস্থিত হন। জিজ্ঞাসু রাজা ও মন্ত্রীদের তিনি রাজর্ষি জনকের উক্তি স্মরণ

করাইয়া দিতেন।

কোটয়ো ব্রহ্মণো যাতা গর্তাঃ সর্গপরম্পরা।
প্রযাতা পাংশুবৎ ভূপাঃ কা ধৃতি মমজীবিতে।

(যোগবাশিষ্ট রামায়ণ)

"অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কত সৃষ্টি ধ্বংস হইয়াছে। কত মহীপতি ধূলির মত কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। তবুও আমার এ জীবনের উপর আস্থা কেন?"

তাঁহার মরলীলার শেষ দিন উপস্থিত। শুধু শৃঙ্গেরীর মঠে নহে, সারা দক্ষিণ ভারতে শোকের নিদারুণ ছায়া পড়ে। শিষ্য ও সেবকের দল তাঁহার অন্তিমশয্যা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একান্ত সেবক হরিহর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, বেদান্তের মহাপীঠ এই শৃঙ্গেরী মঠের জন্য এবং আপনারই সৃষ্ট বিজয়নগরের জন্য আপনার শেষ নির্দ্দেশ কি? তিনি স্মিতহাস্যে আবৃত্তি করিলেন ঃ—

"ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন যন্ময়ি,
কিমন্যদভিবাঞ্ছামি সর্ব্বং সংকিন্ময়ং ততম্।"

অর্থাৎ সংসারে এমন কিছু নাই যাহাতে আমি নাই। এমন কিছু নাই যাহা আমাতে নাই। সেই আমি অন্য কোন্ বস্তু কামনা করিব? আমার চতুর্দ্দিকে যত বস্তু সবই আমার চেতনায় ওতপ্রোত।"

বেদান্তকেশরী বিদ্যারণ্য স্বামীর কণ্ঠ নীরব হইল। মহাপ্রস্থানের প্রশান্তি বদনে দৃষ্ট হইল। ধীরে ধীরে নয়ন মুদিত হইল। আত্মজ্ঞানী মহাসাধক চিরনিদ্রায় মগ্ন হইলেন। তাঁহার বহুবাঞ্ছিত চিরনির্ব্বাণ তিনি লাভ করিলেন।

৬। স্বামী রামানন্দ।

(১২৯৯ খৃষ্টাব্দ।)

মালকোট শৈব ব্রাহ্মণদের বিখ্যাত কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। আচার্য্য রামানুজ পরিব্রাজন কালে একদা মালকোটে আসেন এবং আপন মণীষা ও সাধনশক্তি বলে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের স্বকীয় মতে আনয়ন করেন। তারপর সাড়ম্বরে এখানে এক বিষ্ণু বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া যান।

রামানুজের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত এই গ্রামেই গৌড়ব্রাহ্মণ "পুণ্যসদন" অত্যন্ত বিদ্বান ও শুদ্ধসত্ত্ব পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সুশীলা দেবী। সুপণ্ডিত "পুণ্যসদনের" ঔরসে ও সাধ্বী স্ত্রী সুশীলা দেবীর গর্ভে ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে এক বালক ভূমিষ্ঠ হন। প্রিয়দর্শন শিশুকে পাইয়া জনক জননীর আনন্দের সীমা নাই। স্নেহভরে তাঁহারা নাম রাখিলেন "রামদত্ত"। শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় এই মহান্ প্রতিভাধর বালকের জন্ম। অষ্টম বর্ষে তাঁহার উপনয়ণ হয়। তৎপর তাঁহার শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ হইল। অতি অদ্ভুত তাঁহার প্রতিভা ও মেধা। শুধু চতুষ্পাটির ছাত্রেরা নহে, গ্রামের বড় বড় পণ্ডিতেরাও এই বালকের কৃতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

রামদত্তের মাত্র বার বৎসর বয়সে চতুষ্পাটীর পড়া শেষ হইল। তাই তাঁহাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বারাণসীধামে পাঠান হইল। এইখানে আসিয়া তিনি এক স্মার্ত্ত আচার্য্যের চতুষ্পাটীতে ভর্ত্তি হইলেন। এই খানেই এই বালক শিষ্যের নূতনতর সাধন জীবনের সূচনা হইল।

রামদত্তের গুরুদেবের পূজার ফুল প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। রামদত্ত এই পূজার ফুল মহা উৎসাহে সংগ্রহ করে। সম্মুখেই পঞ্চগঙ্গা মহাল্লার বিরাট ফুলের বাগান। প্রত্যহ খুব ভোরে আসিয়া সে এই বাগান হইতে ফুল লইয়া যায়। বাগানের ফুল

যে প্রত্যহ রামদত্ত লইয়া যাইতেছে, ইহা কিরূপে আশ্রমবাসীরা টের পান। একদিন সে ফুল তুলিতে আসিয়া ফুল সহ ধরা পড়িল। স্বয়ং স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ সেদিন তাহার সম্মুখে উপস্থিত। রামদত্ত সাধু মহারাজের নিকট অকপটে স্বীকার করিল যে, সে নিজের জন্য নহে, দেবতার জন্য ফুল নিতেছে।

রামদত্ত এই জটাজুটমণ্ডিত বিশালকায় সন্ন্যাসীকে সম্মুখে দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বালক রামদত্তের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভয় নাই। আমার কথা শোন। তোমার জীবন প্রদীপ নির্ব্বানপ্রায়। তুমি দিবারাত্র শুধু হরিনাম জপ কর।

তীক্ষ্ণধী বালক এই মহাপুরুষের সঙ্কেতবাণী বুঝিতে পারিল। গৃহে ফিরিয়া সমস্ত কথা তাহার আচার্য্য গুরুদেব স্মার্ত্ত মহারাজকে বলিল। তিনি তাহাকে লইয়া অনতিবিলম্বে স্বামী রাঘবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরম আর্তির সহিত আচার্য্য স্মার্ত্ত শিষ্যরামদত্তকে স্বামীজির পায়ে সঁপিয়া দিলেন। পরদিনই এক শুভলগ্নে বালকের সন্ন্যাসদীক্ষা সম্পন্ন হইল। গুরুদত্ত নামাকরণ হইল, রামানন্দ স্বামী।

কাশীধামে জনশ্রুতি আছে, কয়েকদিনের মধ্যেই রামানন্দের জীবনে মৃত্যুলগ্ন উপস্থিত হয়। গুরু রাঘবানন্দজী তাঁহার অসামান্য যোগশক্তিবলে তাহা প্রতিহত করেন। তারপর তাঁহার আশীর্ব্বাদে রামানন্দ সুদীর্ঘ পরমায়ু ও বিপুল কর্ম্মশক্তি লাভ করেন। সমর্থ গুরুর আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া এই বালকশিষ্যের নূতনতর জীবন আরম্ভ হয়।

নবীন সন্ন্যাসী শিষ্য রামানন্দের প্রতি গুরুজী রাঘবানন্দের স্নেহের অন্ত নাই। আন্তরিক যত্নে মনের মত করিয়া তিনি এই শিষ্যকে গড়িয়া তোলেন। রাঘবানন্দ বুঝিতে পারিয়াছেন যে রামানন্দ এক শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র আধার। তাই অত্যন্ত আগ্রহের

সহিত বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র ও সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব একের পর এক করিয়া গুরুজী এই শিষ্যের নিকট উদঘাটিত করেন। একান্ত নিষ্ঠায় রামানন্দ দিনের পর দিন আত্মিক সাধনার দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

দীর্ঘদিন গত হইয়াছে। রামানন্দ এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক। তাঁহার অল্পবয়সে যে 'মৃত্যুদশা' ছিল, গুরুকৃপায় তাহা প্রতিহত হইয়াছে। তিনি সাধনার উচ্চতর উপলব্ধি, শক্তি ও বিভূতি লাভ করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক মরমী ব্যাখ্যাতা হিসাবে তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং কাশীর সাধকসমাজেও অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন।

এইবার গুরুদেব রামানন্দকে পরিব্রাজনের মাধ্যমে জন-সাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লাভ করিতে ও অন্তরের অভাব ও দৈন্যকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইতে বলিলেন।

গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রামানন্দ কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা ও গুজরাট হইতে গঙ্গাসাগর পরিভ্রমণ করেন। তীর্থ ও সাধুসঙ্গের জন্য ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান। বদরীধামে উপনীত হইয়া রামানন্দ দীর্ঘদিন শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। তারপর তিনি গঙ্গাধারার কূলে কূলে পূর্ব্বাঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হন। কথিত আছে গঙ্গানদীর মোহানায় গঙ্গাসাগর তীর্থে উপনীত হইয়া তিনি ভাবাবেশে কপিলমুনির প্রাচীন সাধনপীঠ আবিষ্কার করেন। স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় সেখানে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরকালে এই মন্দিরসংলগ্ন পুণ্যময় স্থান লক্ষ লক্ষ ভক্তের দর্শনীয় তীর্থরূপে পরিগণিত হয়।

কয়েক বৎসর এইভাবে পরিব্রাজনের পর রামানন্দ আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। রামানন্দ গুরু রাঘবানন্দের প্রিয়শিষ্য। এতদিন পরে তিনি শিষ্যকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। স্নান, তর্পণ ও

পূজাদির শেষে রামানন্দ মন্দিরে আসিলে গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শ্রীবিষ্ণুর ভোগরাগের আয়োজন করিতে বলিলেন। রামানুজী সম্প্রদায় ভোগ রন্ধন ব্যাপারে অদ্ভুত নিষ্ঠাসম্পন্ন। বাহিরের লোকের স্পর্শ ও দৃষ্টিশূন্য হইতে হইবে। ভোগশালা পবিত্র স্থান, সকলে প্রবেশ করিতে পারে না। রামানন্দ এই অস্পৃশ্য রীতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলেন। রামানন্দের মতে ভগবান ভক্তদের হৃদয়ে হৃদয়ে আছেন। ভগবানকে ভালবাসিব এবং তাঁহার ভক্তদের ঘৃণা করিব, ইহা হইতেই পারে না। ইহা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন, রামানন্দ সাধনার গভীরে প্রবেশ করিয়াছে। তাই তিনি নিজ হইতে রামানন্দকে সম্প্রদায়ের গণ্ডী হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। নতজানু হইয়া রামানন্দ আচার্য্যের চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া বিদায় হইলেন। গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করিলেন, রামানন্দের দ্বারা অগণিত জনসমাজের যেন কল্যাণ হয়।

রামানন্দ অসাধারণ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া রামানন্দ ঘোষণা করেন "যে ভক্ত ভগবানের শরণ নেয়, ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, জাতিভেদ মানিয়া চলা তাঁহার প্রয়োজন নাই। এই নির্দ্দেশ যে পালন করিবে, সে একত্রে পান ভোজন করিবার অধিকার পাইবে।" রামানন্দের এই বাণী জনমনে নূতন সাহস ও নূতন আশা আনিয়া দিল। তাঁহার নির্দ্দেশিত সাধনা "সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নাম জপ করা।" তিনি বলিতেন, "অবিরাম ভগবানের নাম জপ কর, জিহ্বায় রাখ, ইহাতে পরমামুক্তি পাইবে। সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তাঁহার আশ্বাসবাণী—

"জাতি পাতি পূছই নহি কোই
"হরিকো ভজই সো হরিকো হোই।"

"ওহে ভাই! জাতি নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলিও না হরিকে যে করিবে ভজন, সে হ'বে হরির আত্মজন।"

রামানন্দের উপাস্য ও ইষ্টদেব শ্রীহরির স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র। রামমন্ত্র ও রামভজনের মধ্য দিয়াই সেই যুগের অগণিত আশ্রিত সাধক ও ভক্তদের জীবনে আচার্য্য রামানন্দ অপূর্ব্ব রূপান্তর আনিয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায় সর্ব্বত্র "রামাওয়াৎ" নামে খ্যাত ও পরিচিত হন। এই প্রথা অনুযায়ী আজিও দক্ষিণ ভারতে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন জানায় "রামরাম", "জয়রাম" অথবা "সীয়ারাম।"

রামানন্দ তাঁহার ধর্ম্মীয় আদর্শ ও জীবনদর্শন হিন্দিভাষার মাধ্যমে প্রচার করেন। তাঁহার ভক্তশিষ্যদের রচনা ও প্রকাশ হয় হিন্দিবহুল নানা উপভাষায়। তাঁহার শিষ্য সুখানন্দ ও উত্তর সাধক কবীরের অজস্র রচনা হিন্দিতে লিখিত হয়। হিন্দি সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন তুলসীদাস ছিলেন একজন বিখ্যাত "রামাওয়াৎ" সাধক।

আচার্য্যজীবন আরম্ভ হইবার পর তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদল আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বিদ্বান, অস্পৃশ্য, নিরক্ষর, নারী ও পুরুষ সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনন্তানন্দ, সুখানন্দ, সুরেশ্বরানন্দ, নরহরিয়ানন্দ, যোগানন্দ, গালভানন্দ, পিপানন্দ, কবীর, ভবানন্দ, সেনানন্দ, রুইদাস, পদ্মাবতী ও সুরেশ্বরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নারী শিষ্যা পদ্মাবতী ও সুরেশ্বরী। কবীর মুসলমান, জোলা বংশীয়। সুখানন্দের অজস্র সঙ্গীত, ভক্ত কবীরের মরমিয়া সাধনা, সুরেশ্বরানন্দ ও তাঁহার পত্নী সুরেশ্বরীর শক্তি বিভূতির নানাকাহিনী, গাঙ্গরোতের রাজপুত বংশীয় রাজা পিপাজী (পিপানন্দ), পিপাজীর প্রিয়তমা 'সীতা-সহচরী'র বাণপ্রস্থ, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সিদ্ধজীবনের কথা অনেক গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

বেদান্ত ও শৈবধর্ম্মের মহাপীঠ বারাণসীতে রামানন্দ স্বামী বহু-বৎসর অবস্থান করেন। তিনি ভক্তপ্রবর চর্ম্মকার রুইদাসের মর্য্যাদা

সর্ব্বসমক্ষে তুলিয়া ধরেন। ইঁহাদের কাহিনীতে অনেক অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ পায়।

লোকচক্ষুর অন্তরালে রামানন্দ স্বামী নিজকে ধীরে ধীরে একেবারেই অপসারিত করিয়া নেন। তারপর একদিন ১৪১০ খৃষ্টাব্দে (১৪৬৭ সম্বৎ) ১১১ বৎসর বয়সে তাঁহার ইহলোকের অবসান ঘটে। সমকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ভক্তিভাবগঙ্গার নবভগীরথ নিত্যলীলার অমৃতময় লোকে প্রবিষ্ট হন।

৭। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

(১৫০০ খৃষ্টাব্দ।)

পণ্ডিত মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষের বসতি ছিল উত্তরবঙ্গে মঙ্গলজানি গ্রামে। মঙ্গলজানির মৈত্রবংশীয় বলিয়া তাঁহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। এই পরিবার নবদ্বীপ আসার পর তাঁহাদের বংশের খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পায়। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত। এই কারণে তাঁহাকে "গৌড়াচার্য্য" উপাধি দেওয়া হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতা। বড় কৃষ্ণানন্দ এবং ছোট ভাই সহস্রাক্ষ। কৃষ্ণানন্দ উচ্চাঙ্গের তান্ত্রিকসাধক এবং সহস্রাক্ষ পরম বৈষ্ণব। এই আগমবাগীশের নামে শান্তিপুরে ও নবদ্বীপের আগমেশ্বরীতলা এখনও সর্ব্বত্র বিদিত।

এইসময়ে বাঙ্গলায় প্রেমভক্তি ও শক্তিসাধনার দুইটি ধারা বহিতে থাকে। শ্রীচৈতন্য ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। উভয়েই প্রায় একই সময়ে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। বিদ্যাচর্চ্চার একই ক্ষেত্রে ও সামাজিক পরিবেশে তাঁহারা বর্দ্ধিত হন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে দুইটি বিশিষ্ট ধারায় এই দুই মহাপুরুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

তন্ত্রশাস্ত্রের সংস্কার ও উন্নতি সাধন করা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র উদ্দেশ্য। আগমবিশারদ, মাতৃসাধক কৃষ্ণানন্দের বড় ক্ষোভ যে তন্ত্রসাধনা অত্যন্ত অবনতির পথে পৌঁছিয়াছে। কদাচার ও দুর্নীতির প্রাবল্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতেছে। শক্তি সাধনার মহানক্ষেত্র ক্লেদাক্ত ও পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছে। এইসব দেখিয়া আগমবাগীশ মাতৃপূজার নূতন পদ্ধতি ও সূচনা রচনা করিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রিতে, অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকারে, লোকালয় হইতে

বহুদূরে শ্মশানে, পেচক, শিবা ও সারমেয়ের আৰ্ত্তির মধ্যে, তিনি স্বহস্তে মাতৃমূর্ত্তি গঠন করিয়া, সাধন, ভজন ও পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূজার সময় "মা" "মা" রবে শ্মশান কাঁপাইয়া তুলিতেন। এক একদিন অমাবস্যা তিথির পূজা অনুষ্ঠান শেষ করিয়া ইষ্টদেবীর চরণে অন্তরের আবেদন নিবেদন করিয়া কৃষ্ণানন্দ ধ্যানস্থ হইতেন। কথিত আছে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া উঠিত। তাঁহার "মা" "মা" ডাকে বিগ্রহ জাগ্রত হইয়া উঠিতেন।

একদা পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধক ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। দিব্যপ্রভায় চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া জগন্মাতা গৃহমধ্যে আবির্ভূতা হইলেন। কৃষ্ণানন্দ ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা! মাগো! কোন রূপে তোমায় আমি পূজা করিব? কোন মূর্ত্তি তোমার, এদেশে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে? ধ্যানের ধারণায় নহে, স্থূলজগতের আরাধ্য দেবতাকে স্থূলভাবেই আমায় দেখাইয়া দাও, তারই পূজা আমি সর্ব্বত্র প্রচার করিব।" মাতৃ আদেশ পাইলেন। মা আদেশ দিলেন, "বৎস! তাহাই হইবে। নিশাবসানে কাল সর্ব্বপ্রথমে যে নারীমূর্ত্তিটি, যেই রূপে যেই ভঙ্গীতে তুমি দেখিবে তাহাই হইবে সাধকসমাজের হৃদয়বিহারিণী রূপ। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সকলেই তাহা আরাধনা করিবে।"

পরদিন ভোরে আগমবাগীশ গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। অস্ফুট উষার আলোকে দেখিতে পাইলেন, কিছুদূরে এক শ্যামাঙ্গিনী গোপবালিকা অপরূপ ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দক্ষিণ-পদ ঘরের অনুচ্চ বারান্দার উপর এবং বামপদ ভূতলে। দক্ষিণ হস্তে একতাল গোময়। বামহস্ত তাহার কর্ম্মচঞ্চল। মেয়েটি বেড়ার গায়ে মাটির প্রলেপ দিতেছে। বালিকার কাল কেশরাশি আলুলায়িত। পরিধানে ক্ষুদ্র অপরিসর একটি সাড়ী। আচার্য্য-কৃষ্ণানন্দকে দেখিয়া সে লজ্জায় জিব কাটিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মেয়েটি এমনভাবে দাঁড়াইয়াছে, মনে হয়, যেন বরাভয় মুদ্রারই এক প্রতিচ্ছবি।

কৃষ্ণানন্দের অন্তঃস্থল কম্পিত হইল। মায়ের আদেশ মনে পড়িল। এই বালিকার মধ্যদিয়াই মায়ের ঐশী নির্দ্দেশ আসিয়াছে বুঝিলেন। এই ভঙ্গিমাতেই জগন্মাতার বিগ্রহ তৈয়ার করিতে হইবে। তিনি স্থির করিলেন. এই মূর্ত্তিতেই মায়ের পূজার বহুল প্রচার তাঁহাকে করিতে হইবে। সাধক কৃষ্ণানন্দের সংকল্প অচিরেই সিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রচারিত শ্যামা পূজার পদ্ধতি ও রীতি অচিরে সমগ্র বাঙ্গলাদেশে গৃহীত হইল। তন্ত্র সাধনার অবনতির খাদে মাতৃসাধনার রসধারা প্রবাহিত হইল। কৃষ্ণানন্দ আগম শাস্ত্রে অত্যন্ত সুপণ্ডিত। তন্ত্র বিশারদ পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূজার পদ্ধতি তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহস্রাক্ষ তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের জন্য এক জন্মগত প্রেরণা নিয়াই জন্মিয়াছেন। গৃহের এক পার্শ্বে নিজস্ব এক ক্ষুদ্র কুটীরে গোপালবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহারই পূজা অর্চ্চনা নিয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন এবং সেইভাবে দিনাতিপাত করিতেন। অপর দিকে কৃষ্ণানন্দ দিবারাত্র মাতৃধ্যানে বিভোর থাকিতেন। প্রতি অমাবস্যা তিথিতে জগজ্জননীর আদিষ্ট বিগ্রহ তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন। পূজা সাঙ্গ হইলে মায়ের মূর্ত্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতেন।

আর এক অমাবস্যা তিথি। গভীর রাত্রে কৃষ্ণানন্দের অনুষ্ঠিত শ্যামাপূজা সম্পন্ন হইবে। তাই ভোর হইতে তিনি পূজার উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত। বাগানে ঢুকিয়া দেখিলেন এক কাঁদি সুপুষ্ট কলা বেশ পক্ক হইয়াছে। তিনি মনে মনে আনন্দিত হইলেন। মায়ের পূজা ও ভোগে এই কলা লাগিবে। দিনশেষে বাগানে গিয়া দেখিলেন, কলাগুলি ইতিমধ্যে কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। সংকল্প কলা মায়ের সেবায় লাগান গেল না বলিয়া তাঁহার দুঃখ ও

অনুতাপ হইল। ঘরে আসিয়া শুনিলেন তাঁহার ভ্রাতা সহস্রাক্ষ এই কদলী কাটিয়া নিয়াছে এবং তাঁহার ইষ্টদেবের পূজায় ভোগ লাগাইয়াছে। ভ্রাতাকে কিছুই বলিলেন না। মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

মধ্যরাত্রে যথানিয়মে শ্যামা পূজার অনুষ্ঠান শেষ হইল। কৃষ্ণানন্দ ধ্যানে বসিলেন। কিন্তু আজিকার ধ্যান ঠিক হইতেছে না। বারবার তাঁহার মনে পড়িতেছে সেই কদলীর কথা। মায়ের ভোগে না লাগিয়া এই কদলী বালগোপালের ভোগে লাগিল। আচার্য্যের মনে খেদ আসিয়াছে; তাই মন স্থির হইতেছে না এবং ধ্যান গাঢ় হইতেছে না। পূজাগৃহের কাজ কর্ম্ম সারিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া উঠানে দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইলেন, ছোট ভাই সহস্রাক্ষের স্থাপিত বালগোপালের কুটীরে এই গভীর রাত্রে আলো জ্বলিতেছে। তিনি বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন এতরাত্রে সেখানে আলো জ্বলিতেছে কেন? সহস্রাক্ষ এখনও কি ধ্যান জপ প্রভৃতি করিতেছে? তিনি গোপালের পূজাকক্ষে ঢুকিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবী শ্যামা মা বালগোপালকে কোলে তুলিয়া নিয়াছেন এবং সম্মুখে নৈবেদ্যের থালা হইতে এক একটী করিয়া কদলী তুলিয়া বালগোপালকে খাওয়াইতেছেন। এই দৃশ্য যেমনই অলৌকিক তেমনই প্রাণস্পর্শী।

ইহাতে আগমবাগীশের একটি ভুল ধারণা অপসৃত হইল। তিনি এক নতুনতর সত্যের আলোক দেখিতে পাইলেন। শ্যামা ও শ্যামের পার্থক্য বিলীন হইয়া গেল। শক্তি সাধনার এক উদার সার্ব্বভৌম অনুভূতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। বুঝিতে পারিলেন, কালী ও কৃষ্ণ সেখানে একাকার।

তন্ত্রসাধক ও আচার্য্যদের জন্য আগমবাগীশ মন্ত্র ও কৌলিক আচার ও ক্রিয়া পদ্ধতির সঙ্কল্প করিতেছিলেন। নবউপলব্ধ সত্যের

স্বীকৃতি অবিলম্বে তাঁহার সঙ্কলিত শাস্ত্রগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলেন। তিনি লিখিলেন

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বয়ং ব্রহ্মাদিসুরপূজিতম্,
গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং কৃষ্ণানন্দেনধীমতা।

মাতৃসাধক আগমবাগীশের অধ্যাত্ম অনুভূতি আরও গভীর হইয়া উঠে। শক্তিসাধকের আবাহন, ধ্যান ও জপে মৃণ্ময়ী বিগ্রহ চিণ্ময়ী হইয়া উঠিল।

জগন্মাতার কৃপায় জটাধারীপরমহংস নামে এক মহাকৌল তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দের অধ্যাত্ম জীবনে শক্তি ও প্রেরণা আনিয়া দেন। এই সিদ্ধ মহাপুরুষ অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার জীবনে অলৌকিক শক্তির বহুল প্রকাশ দেখা যাইত। তাই জনসাধারণ তাঁহাকে "জটিয়া-যাদু নামে ডাকিতেন।

সেদিন কার্ত্তিকী-অমাবস্যা। জঙ্গলাকীর্ণ বাগিচায় পঞ্চমুণ্ডির আসনযুক্ত গৃহটীতে অনুষ্ঠানের বড়ই সমারোহ। বহু উপচার লইয়া আগমবাগীশ জগন্মাতার বিগ্রহের সম্মুখে উপবিষ্ট। পূজার সময়ে তাঁহার আত্মহারা "মা" "মা" রবে মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া উঠিত। তখন মৃণ্ময়ী দেবী চিণ্ময়ী হইয়া পুষ্পার্ঘ্য ও ভোগান্ন গ্রহণ করিতেন। সেদিনও দেবী গৃহমধ্যে আবির্ভূ্তা হইয়াছেন। কৃষ্ণানন্দের তখন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা। বেহুঁস অবস্থায় তাড়াতাড়ি পূজা শেষ করিলেন। ভোগের পায়সান্ন নিবেদন করিয়া দেবীকে আচমন জল নিবেদন করিতে যাইবেন, এমন সময় কক্ষের ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "কৃষ্ণানন্দ, দেখিতেছ না কি? মায়ের ভোগগ্রহণ এখনও সম্পন্ন হয় নাই। ইতিমধ্যে তাঁহাকে আচমণীয় জল আগাইয়া দিয়া বিদায় দিতেছ? ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, তোমার পত্র, পুষ্প ও নির্ম্মাল্যের মধ্যে পায়সান্ন চাপা পড়িয়া আছে। মা তাহার মধ্যে হাৎড়াইয়া বেড়াচ্ছেন। কৃষ্ণানন্দ সবিস্ময়ে দেখিলেন,

মায়ের ভোজন তখনও শেষ হয় নাই। তিনি পুনঃ নূতন করিয়া ভোগ নিবেদন করিলেন।

এইবার হুঁস হইল। কাহার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিলেন? তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরিতেই দেখিলেন, দীর্ঘবপু, কপালে রক্তচন্দন-তিলক, এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। পূজার সময় পঞ্চমুণ্ডি আসন সন্নিবেশিত ঘরটীকে আগমবাগীশ অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহা সত্বেও এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কেমন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল? বুঝিলেন, এই শক্তিধর মহাপুরুষ আপন বিভূতিবলেই এই রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঢুকিয়াছেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তিনিই সেই জটিয়াবাবা। তিনি বলিলেন যে কৃষ্ণানন্দের সাধন ভজনের কথা শুনিয়া মা ও ছেলেতে নিভৃতে যে আনন্দ উপভোগ করিতেছে, তাহার ভাগ বসাতেই তিনি আসিয়াছেন। ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে আগমবাগীশ এই সিদ্ধ কৌলাচার্য্যের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

জটাধারী পরমহংস নবদ্বীপে কিছুকাল অবস্থান করেন। এই সুযোগে কৃষ্ণানন্দআগমবাগীশ তাঁহার নিকট হইতে শক্তিসাধনার নানা গূঢ় ও দুরূহ তত্ত্ব শিক্ষা করেন। অচিরে তন্ত্রসিদ্ধির আলোকে তাঁহার অধ্যাত্মজীবন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের অন্যতম দিকদর্শকরূপে তিনি বাঙ্গলায় চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

তাঁহার রচিত "তন্ত্রসার" ও "শ্রীতত্ত্ববোধিনী" গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পণ্ডিত ও সাধক-সমাজে তিনি অত্যন্ত সমাদৃত হন। তাঁহার কাছে কৌল সাধনার দীক্ষা নিয়া শত শত সাধক নবজীবন লাভ করেন।

তিনি বুঝিতে পারিলেন, বামাচারী সাধকেরা এই সাধনার সঙ্গে বহু অবাঞ্ছিত আচার যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইহার সংস্কারে মনোযোগ দিলেন। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা, ব্যক্তিত্ব ও সাধনসাফল্য

অল্পকাল মধ্যে নূতনতর চেতনা আনিয়া দিল। তন্ত্রভাবিত বাঙ্গালী-সমাজে ইহা নূতন প্রেরণা যোগাইল।

কৃষ্ণানন্দের তিরোভাবের পরও তাঁহার প্রবর্ত্তিত তন্ত্রসাধনা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার নির্দ্দেশিত পদ্ধতিতে শ্যামাবিগ্রহের পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেশের দিকেদিকে, সহরে, গ্রামে ও বারোয়ারী তলায় এই মাতৃমূর্ত্তির আরাধনা অদ্যাবধি সাড়ম্বরে হইয়া থাকে।

আপন শক্তিবলে শক্তিসাধনার গূঢ় অন্তঃসঞ্চারী ধারাকে কৃষ্ণানন্দ সর্ব্বজন সমক্ষে আনিয়া দেন। ধীরে ধীরে দেশের জনগণমধ্যে ইহার বিস্তার ঘটে।

৮। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

(১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ।)

জগন্নাথ মিশ্রের আদি নিবাস শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। তিনি বিদ্যার্থী হইয়া শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে আসিলেন এবং আর ফিরিলেন না। নবদ্বীপেই রহিয়া গেলেন। এই সালে তিনি তাঁহার অধ্যাপক নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসার পাতিলেন। এই সংসারে তাঁহার কোন অনাটন ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। অতঃপর কয়েকটি শিশুর মৃত্যু হয়। তৎপর ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে (মোতাবেক ১৪০৭ শকাব্দ) ফাল্গুণী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই নবদ্বীপে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জননী নবজাতকের নাম দিলেন নিমাই। কোষ্টির নাম হইল বিশ্বম্ভর। দৌহিত্রের জন্ম সংবাদ পাইয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী স্বয়ং আসিলেন এবং গণনা করিয়া কহিলেন, জাতক অসামান্য মণীষা ও বিদ্যার অধিকারী হইবে। বহুলোক তাহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে।

নিমাই দিন দিন বড় হইতে লাগিল। পূর্ণিমার স্বর্ণকান্তি তাহার কোমল অঙ্গ উপচিয়া পড়িতেছে। তাহার ভূবনভুলানো দিব্যরূপের ছটা যে দেখে সে অপলকনেত্রে চাহিয়া থাকে। সেই কারণে নিমাই পাড়া পরশী সকলেরই নয়নপুত্তলি হইয়া উঠিল। যথাসময়ে তাহার হাতেখড়ি হইল। ক্রমে দেখা গেল বালকের প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। বিদ্যালয়ের পাঠ একের পর এক সে অবলীলাক্রমে অল্প সময় মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিল।

চতুষ্পাটির পড়া নিমাইএর যখন শেষ হইল, তখন তাহার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। এই বয়সেই তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব্ব দীপ্তি সকলকে মোহিত করিল। তাঁহার বাল্যকালের সেই চপলতা আর নাই। তিনি এখন একজন কুটতার্কিক। নানা দুরূহতত্ত্ব যেমন

তিনি অবলীলায় আয়ত্ত করেন, উহা নিয়া সহপাঠীদেরও তিনি কম বিব্রত করেন না। নিমাই এখন ফাঁকির নানা কূটপ্রশ্ন তুলিয়া লোককে অপদস্থ করিতে ও তামাসা দেখিতে ভালবাসেন। তাঁহার এই স্বভাবের দরুণ নবদ্বীপের নবীন প্রবীণ সকল ছাত্রই তাঁহার ভয়ে ভীত। সকলেই তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে ব্যস্ত।

নিমাইয়ের টোলের পড়া সমাপ্ত হইল। তিনি এখন অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। নবদ্বীপের মুকুন্দ সঞ্জয় বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। তাঁহারই বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপটিতে এই নবীন শিক্ষক নিজস্ব টোল খুলিয়া বসিলেন। নিমাইপণ্ডিতের প্রতিভা ও খ্যাতি প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। টোল সহসা জমিয়া উঠিল।

নিমাইএর পিতার মৃত্যুর পর শচীদেবীর সংসারে আর্থিক অনাটন ছিল। কিন্তু নিমাই এইবার অধ্যাপক। টোল ও জমিয়াছে। তাই সংসারেও স্বচ্ছলতা দেখা দিল। এইবার মাতা শচীদেবী নিমাইএর বিবাহের জন্য উদ্বিগ্না হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বল্লভ আচার্য্যের সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনিলেন।

নিমাইএর ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ। বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা ও পণ্ডিতগণ ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেন। তদানীন্তন সময়ে কেশবাচার্য্য কাশ্মীরের প্রতিথযশা পণ্ডিত ছিলেন। ভারতের প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্রগুলি তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং তর্কযুদ্ধে সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপে আসিয়াই পণ্ডিতসমাজকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সকলেই ভীত হইলেন। কেহই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না।

নিমাই সেদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া শিষ্যদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। দিগ্বিজয়ী কাশ্মিরী পণ্ডিত কেশবাচার্য্য পাল্কীতে চড়িয়া কোথায় যাইতেছিলেন। এই প্রতিভাদীপ্ত নবীন অধ্যাপককে দেখিয়া তিনি পাল্কী হইতে নামিলেন এবং গঙ্গার ঘাটে

আসিয়া নিমাইএর সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ভারত-বিখ্যাত মহারথী পণ্ডিতকে তাঁহার সম্মুখে পাইয়া নিমাই পণ্ডিত উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া নতি জানাইলেন।

নানা কথাবার্ত্তা হইতেছে। কেশবাচার্য্য বলিলেন তিনি যে-কোন স্তব বা গাথা সদ্য রচনা করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া নিমাই বলিলেন, আচার্য্য-দেব! সুরধুনি গঙ্গা সম্মুখে। দয়া করিয়া গঙ্গার একটি নূতন স্তব রচনা করতঃ আমাদিগকে শুনান। কেশবাচার্য্য অমনি এক সদ্যরচিত স্তব আবৃত্তি করিয়া চলিলেন। রচনাটি যেমনই সুদীর্ঘ তেমনই শ্রুতিমধুর। স্তব রচনা শেষ হইলে কেশবাচার্য্য অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া নবীন অধ্যাপক নিমাইএর দিকে তাচ্ছিল্যের কটাক্ষপাত করিলেন।

তখন নিমাই সবিনয়ে শ্লোকের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। শব্দ ও ভাবের অশুদ্ধতা এবং অলঙ্কারের অপপ্রয়োগ, অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মেধার বলে নিমাই বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অল্পসময় মধ্যে কেশবাচার্য্য পরাজিত হইলেন। কেশবাচার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ কি অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি এই নবীন অধ্যাপকের। পণ্ডিতের এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিমাই বলিলেন, "আজ শ্রান্ত হইয়াছেন। বিশ্রাম করুন। কাল পুনঃ তর্ক হইবে।"

পরের দিন ভোর হইতে না হইতেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবাচার্য্য একাকী পদব্রজে নিমাইএর কাছে আসিলেন, তাঁহার ভাব নিতান্ত দীনহীন। আচার্য্য বলিলেন, স্বপ্নযোগে নিমাইএর অলৌকিক স্বরূপ তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন। পণ্ডিত নিমাইএর সঙ্গে আর তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না। তৎপরদিনই পণ্ডিত কেশবাচার্য্য নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। ইহার ফলে নিমাইপণ্ডিতের খ্যাতি

আরও বিস্তার লাভ করিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজেও নিমাইএর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল।

কিছুদিন পরে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যটনে বাহির হন। সুদর্শন, সুপণ্ডিত ও প্রতিভাবান বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে তিনি অত্যন্ত মর্য্যাদা ও খ্যাতি লাভ করেন। প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করিয়া আনেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহার গৃহে এক শোকাবহ বিষাদের ছায়া। তাঁহার নবপরিণীতা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রীবিয়োগজনিত শোক কতকটা উপশমিত হইলে তিনি অধ্যাপনার উপর পুনঃ জোর দেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে দূর দূরান্ত হইতে বহু ছাত্র তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিতে আসিল। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী নাগরিকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় অচিরে তাঁহার যশ ও কীর্ত্তি বিস্তৃতি লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অনাটনও তিরোহিত হইল।

কিন্তু, তবুও মাতা শচীদেবীর অন্তরে শান্তি নাই। তিনি পুনঃ পুত্রের বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন। সুপাত্রীও সহসা পাওয়া গেল। তিনি রাজপণ্ডিত নবদ্বীপের সনাতন মিশ্রের পরমরূপ-লাবণ্যময়ী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পছন্দ করিলেন। কন্যাপক্ষও সম্মত হইলেন। মহা আড়ম্বরের সহিত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। জননী শচীদেবী নিশ্চিন্তা হইলেন।

নিমাই পণ্ডিতের গৃহ মাতার স্নেহে, সুন্দরী স্ত্রীর সোহাগে ও নিমাইয়ের অগাধ পাণ্ডিত্যে বড়ই সুখের হইল। কিন্তু ইহা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। নিমাই পবিত্র বিষ্ণুপাদ মন্দির দর্শন করিতে গয়ায় আসিলেন এবং ভক্তিভরে তথায় তাঁহার পিতৃকার্য্যাদি সমাপন করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই তিনি ভাবাবেশে অধীর হইলেন। নয়নে তাঁহার অবিরল অশ্রুধারা বহিতেছে। দেবাদিদেব শঙ্কর যাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন, মহালক্ষ্মী যাঁহার চরণসেবায় মগ্না, এই সেই চরণযুগল চিহ্ন। যোগীজনের

চিরবাঞ্ছিত ধন, এই সেই বিষ্ণুপাদপদ্ম। ঐকান্তিক ভক্তিরসে উদ্বেল, ক্রন্দনরত নিমাই মন্দিরে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দীর্ঘায়ত সুন্দর সুঠাম তনু, কে এই তরুণ? সর্ব্ব-চিত্তহারী কে এই করুণাসুন্দর পুরুষ? মন্দিরের এক কোণে পরম ভাগবত ঈশ্বরপুরী দাঁড়াইয়া আছেন। সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসাধক এই সন্ন্যাসী। প্রেমভক্তি ধর্ম্মের উৎস মহাত্মা মাধবেন্দ্রপুরীর ইনি অন্তরঙ্গ শিষ্য। ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ঈশ্বরপুরী বিষ্ণুপাদপদ্মবেদীর দিকে চাহিয়াছিলেন। দৃষ্টি ফিরাইতেই এইবার নিমাইএর দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। এই যুবক যে তাঁহার পরিচিত। নবদ্বীপে যে তিনি ইঁহাকে বহুবার দেখিয়াছেন। জনতা সরাইয়া ঈশ্বরপুরী নিমাইএর দিকে অগ্রসর হইলেন। বড়ই অপ্রত্যাশিতভাবে এই বৈষ্ণব মহাপুরুষের সঙ্গে নিমাইএর সাক্ষাৎ হইল। নিমাই তাঁহার চরণাশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ঈশ্বরপুরী দেখিলেন নিমাইএর হৃদয়মধ্য হইতে এক অমানুষী ভক্তিরস উদ্গত হইতেছে। তিনি বুঝিলেন, পরম কৃপাময় কৃষ্ণ নিশ্চয় নিমাইএর অভীষ্টাকাঙ্ক্ষী। তাই তিনিও আগ্রহান্বিত হইলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই নামমন্ত্রে শক্তি সঞ্চার করিয়া ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দীক্ষা দিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর ভক্তিবীজ সেদিন সর্ব্বোত্তম আধারে রোপিত হইল। এই বীজের পুষ্পিত ও ফলিতরূপ, প্রেমভক্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য।

যে নামমন্ত্র সেদিন এই ভক্তিসিদ্ধ মহাবৈষ্ণব নিমাইএর কানে ঢালিয়া দিলেন, তাহার প্রতিক্রিয়া হইল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। বিদ্যাভিমানের কঠিন আবরণটী মুহূর্ত্তমধ্যে ছুটিয়া গেল। কৃষ্ণ-মিলনের পিয়াসে, বিরহের দুঃসহ দহনে তিনি অধীর হইলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। নয়নের জলে বয়ান ভিজিয়া গেল। সর্ব্ব অঙ্গে তাঁহার ফুটিয়া উঠে অশ্রু-কম্প-পুলক-চিহ্নিত সাত্ত্বিক প্রেমবিকার।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আশীর্ব্বাদ অমোঘ ছিল। ইহার ফল অবিলম্বে ফলিল। যুগ যুগান্তের ধ্যানের বিগ্রহ, প্রাণের ইষ্টদেবকে নিমাই গুরুদেবের কৃপায় সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন। নবকিশোর নটবর মুরলীধর মনোহররূপে প্রাণপ্রভু কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ও আবির্ভূত হন। এই ভুবন ভুলানো রূপের মাধুর্য্য তাঁহার সর্ব্বসত্বায় তরঙ্গায়িত হইল। এই রূপ, এই মাধুর্য্য তাঁহাকে কখনও পাগল করিয়া দেয়, আবার হঠাৎ আত্মগোপন করে। কোথায় কেমন করিয়া প্রেমময়ের দর্শন মিলিবে? বিরহে নিমাই মাঝে মাঝে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যান। অধীর হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন। "কৃষ্ণরে, বাপরে, কোথায় তুমি? প্রাণের ঠাকুর! এসো, এসো, কৃপা করে আমায় দর্শন দাও।"

সঙ্গীয় সকলে প্রবোধ দেন। কিন্তু কে কথা শোনে? কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা তাঁহার সর্ব্বসত্বায় বিরাজিত। তিনি নবদ্বীপে পুনঃ যাইবেন না। কোথায় গেলে কৃষ্ণের দর্শন পাইবেন, তাহা জানিতে উৎকণ্ঠিত। বহু সাধ্য সাধনা করিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে আনা হইল। সর্ব্বত্র রটিয়া গেল, পাণ্ডিত্য গৌরবে গর্ব্বিত নিমাই এখন বৈষ্ণবীয় দৈন্যের একটি মূর্ত্ত বিগ্রহ। গয়াধামে গিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব রূপান্তর ঘটিয়াছে। নিমাই এখন একজন পরম ভাগবত। প্রাণপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ বিরহে তিনি সদা মুহ্যমান। তাঁহার আর্ত্তি দেখিলে নয়নজল রোধ করা যায় না। ভাগবৎ হইতে শুধু শ্লোক আওড়াইতে থাকেন এবং কৃষ্ণ দরশনের জন্য অহঃরহঃ কাঁদিতে থাকেন। কখনও ধূলায় গড়াগড়ি যান, কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। "আমার কৃষ্ণ কোথায়" "আমার কৃষ্ণ কোথায়" বলিয়া মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়েন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া আবার কখনও কখনও মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতে থাকেন। সকলেই বুঝিতে পারিলেন নিমাই পণ্ডিতের ইহা সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। ভাগবতে যে সব অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে, সুদীর্ঘ সাধনার পর সিদ্ধ ও শুদ্ধ

ভক্তদেহে যাহা প্রকাশ পায় নিমাই পণ্ডিতের দেহে সেই সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হইল।

মুরারি, সদাশিব, শুক্লাম্বর, দামোদর প্রভৃতি সাধকগণ এই প্রেমবিকার দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, গয়াধামে নিমাইএর ইষ্টদর্শন হইয়াছে। ঐশী নির্দ্দেশে তাঁহার জীবনে এই পুণ্য প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে। ভারতে লুপ্তপ্রায় ভক্তিধর্ম্ম পুনরুজ্জিবীত করিতে নিমাই পণ্ডিত পুনঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নিমাই বর্ত্তমানে কৃষ্ণকাতর। একদা তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই গদাধর, তোমরা ধন্য। পূর্ব্ব হইতেই তোমরা কৃষ্ণ ভজনা করিতেছ। তোমরা আমায় সত্য করিয়া বল, আমি কোথায় গেলে আমার প্রাণপ্রভু কৃষ্ণকে পাইব।" নানাভাবে প্রবোধ দিবার পর নিমাই একটু শান্ত হইলে, তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

নিমাই এখন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ। টোলের জন্য খেয়াল নাই। তেজোদৃপ্ত অধ্যাপক আজ দীনাতিদীন সেবক। কৃষ্ণ দর্শনের ব্যাকুলতায় তিনি অধীর।

পাঠ গ্রহণের জন্য ছাত্রেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে ব্যাকরণ খোলা পড়িয়া আছে। নিমাই ভাবাবেশে বিভোর। আয়ত নয়ন দুইটী দিয়া দরদর ধারে কৃষ্ণবিরহের অশ্রুধারা ঝড়িতেছে। বহুক্ষণ পরে আবার তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি শিষ্যদের বলিতে থাকেন, "পড়াইবার কাজ আর আমার দ্বারা হইবে না। গ্রন্থ খুলিয়া বসিলে ও পাঠ বা পড়ার দিকে মন আমার যায় না। নয়ন মেলিতে না মেলিতেই দেখি, কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু, হাতে তাঁহার মোহন বাঁশী, মাথায় শিখিপুচ্ছ-চূড়া, গলায় গুঞ্জামালা। মধুর হাসিতে তাঁর চারিদিক দীপ্ত হইয়া উঠে। মৃদু হাসি হাসিয়া তিনি মুরলী বাজান, আর আমায় হাতছানি দিয়া ডাকেন। তখন আমি আর আমিতে থাকিতে পারি না। তোমরা

আমায় বিদায় দাও। আমি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের কৃষ্ণভক্তি হউক।" অতঃপর তিনি পড়াইবার কথা ভুলিয়া গিয়া ছাত্রদের লইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

সারা দেহে পূত নির্ম্মলতা বিরাজমান। সুগৌর সুঠাম দেহ ধুলায় লুটায়। নয়নের নীরে বসন ভিজিয়া যায়। মাঝে মাঝে জ্ঞান হয়। পুনঃ অচিরেই দিব্যোন্মাদ হইয়া পড়েন।

কৃষ্ণ প্রেমে নিমাই অধীর। মাতা শচীদেবী ইহার কিছুই বুঝিতেছেন না। পতিগতপ্রাণা কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াও ভাবিয়া কুল পান না। সকলেই নিমাইএর এই অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত ইঁহাদের বড়ই ঘনিষ্ঠতা। শচীদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া এই প্রবীন বৈষ্ণবকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি সব কথা শুনিয়া আসিয়া দেখিলেন, অভূতপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেম নিমাইএর মধ্যে স্ফুরিত হইতেছে। উচ্চস্তরের সাধকগণের মধ্যেও যে ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। জন্মান্তরের পুণ্যফল না থাকিলে ইহা সম্ভবপর নহে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার উত্তর না পাইয়া, অশ্রুসজলনয়নে শচীদেবী পণ্ডিত প্রবরকে বলিলেন, "স্বামী ও বড়ছেলের অভাবে নিমাইকে নিয়া কোনমতে বাঁচিয়াছিলাম। শেষে কি নিমাইও পাগল হইল ?"

শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিয়া উত্তর দিলেন, এই পাগলামি অতীব সৌভাগ্যের কথা। ইহার এক কণাও যদি আমাতে প্রকাশ পাইত, আমি মুক্ত হইয়া যাইতাম। ইহা বায়ুরোগ নহে। মহাভক্তির আবেশ তোমার নিমাইএর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। চিন্তার কোন কারণ নাই।"

শ্রীবাসপণ্ডিত বিদায় হইলেন। নিমাইএর গৃহে নামকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নবদ্বীপে ক্ষুদ্র একটি বৈষ্ণবগোষ্ঠী পূর্ব্ব হইতেই

বর্ত্তমান আছে বটে। কিন্তু তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন ছিল না। নিমাই পণ্ডিতের মত তেজস্বী ও প্রতিভাধর মহাপুরুষ কৃষ্ণনামে উন্মাদ হইয়াছেন। ভক্তসমাজ বড়ই আনন্দিত হইলেন। শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাইএর গৃহে আসিয়া জড় হইল। খোল, করতাল, মন্দিরা প্রভৃতি লইয়া তুমুল বাদ্যে নৃত্য ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অল্পকাল মধ্যেই শ্রীবাস অঙ্গন হইতে কীর্ত্তনের আসর নিমাইএর বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইল। বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ সকলেই যোগদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বৈষ্ণব গোষ্ঠী বাড়িতে লাগিল।

তখনকার দিনে অদ্বৈত আচার্য্য ছিলেন বাঙ্গলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়। জ্ঞান ও ভক্তিরসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ এই অদ্বৈতাচার্য্য। তিনি প্রেমিকশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম প্রধান শিষ্য। গীতা ও ভাগবতের ভক্তিরসাত্মক ব্যাখ্যায় শ্রীঅদ্বৈতের তুল্য আর কেহ ছিলেন না। বহুভক্ত ও বৈষ্ণব মহাপুরুষ তাঁহার চরণকৃপা লাভ করিয়া ধন্য হন। ভক্তপ্রবর যবন হরিদাসও ছিলেন ইঁহাদের অন্যতম।

তাঁহার আদিনিবাস শ্রীহট্ট। কিন্তু শান্তিপুরে স্থায়ীভাবে তিনি বসবাস করিতেন। নবদ্বীপেও তাঁহার বাড়ী আছে। এখানেও তিনি মাঝে মাঝে আসিতেন। বন্ধুবর গদাধরকে সঙ্গে করিয়া নিমাই একদিবস অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন তুলসীমঞ্চের নিকটে বসিয়া পূজাপাঠ করিতেছেন। উভয়ের দর্শন হওয়া মাত্রই নিমাই এক দিব্য ভাবাবেশে জ্ঞানহারা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সর্ব্বদেহে তাঁহার সাত্ত্বিক বিকাশের দুর্ল্লভচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

ইহা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বিস্মিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই স্বর্গীয় প্রেমভাব মানুষে কেমনে সম্ভব হয়? ভাগবতে যে প্রেমবিকারের বর্ণনা আছে, তাহাই যে এই দুর্ল্লভ-

কান্তি তরুণের সারাদেহে প্রকাশ পাইতেছে। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর তিনি ৺ঠাকুরের চরণে চন্দন তুলসী দিয়া আকুল ক্রন্দনে জানাইয়াছেন—"প্রভু! তোমার সৃজিত এই পৃথিবীতে এখন ভক্তি নাই, প্রেম নাই। স্তরে স্তরে মানুষের কলুষতা ও ক্লেদ দেখা যাইতেছে। এসো প্রভু! এসো! তুমি ধরাধামে অবতীর্ণ হও। সর্ব্বকলুষতা হরণ কর। সব শুচিসিদ্ধ করিয়া তোল।"

তবে কি ভগবান তাঁহার আকুল প্রার্থনা শুনিয়াছেন? ভগবান স্বয়ং কি নিমাইরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন? অদ্বৈত আচার্য্যের অন্তরে কে যেন বলিয়া দিল, "এ যে তোর সেই প্রার্থিত ধন। সেই প্রেমঘন বিগ্রহ। বৃদ্ধ আচার্য্য আনন্দাবেশে অধীর হইলেন। নিমাইএর জ্ঞানহীন দেহের সম্মুখে বসিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তিনি নিমাইকে পূজা করিলেন। এই স্বীকৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজে এক অপূর্ব্ব মর্য্যাদা আনিয়া দিল। প্রেমভক্তি ধর্ম্মের নেতারূপে নিমাই সর্ব্বত্র পরিগণিত হইলেন। অতঃপর তিনি ভক্তজনের হৃদয়প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হইলেন এবং প্রেমিক সাধকেরা তাঁহাকে আখ্যা দিলেন গৌরসুন্দর। এখন হইতে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভুর অন্তরঙ্গদের প্রেমলীলা ও কীর্ত্তনবিলাস প্রভুসহ নিয়মিত আরম্ভ হইল।

কখনও শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখা যায় মহাভক্তরূপে, আবার কখনও তিনি অপরূপ দিব্যচেতনায় আবিষ্ট থাকেন। চুম্বক যেমন লৌহকণাসমূহ অবলীলায় আকর্ষণ করে তেমনই শ্রীগৌরাঙ্গ এক এক করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের স্বীয় সন্নিধানে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। এখন তিনি প্রেমভক্তিমার্গের উচ্ছল সাধক নহেন, এখন তিনি শত শত ভক্তজনের অধীশ্বর ও নূতন বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর নিয়ামক। এখন তিনি ভক্তজনগণের একমাত্র 'প্রভু। সকলেই বুঝিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন মূর্ত্তি আর ভুবনমঙ্গল নামকীর্ত্তনের আকর্ষণ বড়ই অমোঘ। এই শক্তি তাঁহার সর্ব্ব-

হৃদয়বিহারী ঐশীপ্রেমের মধ্যে নিহিত আছে। অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে শ্রীবাস, মুরারী, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম, সঞ্জয় একে একে সকলেই তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য্য ও যবন হরিদাসকেও অন্তরঙ্গ করিতে দেরী হইল না। এখন তিনি নিত্যানন্দের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তন সমাপন করিয়া প্রভু একদিবস ভক্তগণ সঙ্গে ইষ্ট গোষ্ঠী করিতেছেন। হঠাৎ সকলকে বলিয়া উঠিলেন, একজন উচ্চকোটি মহাপুরুষ কয়েকদিন হইল নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তিনি নিজ ইচ্ছায় আত্মগোপন করিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে আমার প্রাণ আকুল হইয়াছে। তোমরা অবিলম্বে ইঁহার সন্ধান আমাকে আনিয়া দাও।

ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। কোথায় এত বড় সহরে, কাহার বাড়ীতে সন্ধান লইবেন? তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই মহাপুরুষের সন্ধান পাইলেন না। তখন মহাপ্রভু নিজেই ভাবাবেশে সপার্ষদ বাহির হইলেন এবং সোজা নন্দন মিশ্রের বাড়ী গিয়া উঠিলেন। সকলেই দেখিতে পাইলেন, শুভ্রকান্তি অনিন্দ্যসুন্দর এক অবধূত সেখানে বসিয়া আছেন। প্রভু ভক্তগণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মনে মনে স্থির করিলেন, কৌশলে অবধূতের হৃদয়ের অর্গলটী তিনি খুলিয়া লইবেন। তাই শ্রীবাসকে ভাগবত হইতে একটী ভক্তিরসাত্মক শ্লোক পড়িতে বলিলেন। শ্লোকটী পঠনের পরমুহূর্ত্তেই অবধূতের দেহে ভক্তির বিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল। দুই নয়নে তাঁহার অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। তারপর গৌরসুন্দর তাঁহার দেহটি স্পর্শ করিবা-মাত্রই তিনি হতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সকলেই বুঝিতে পারিলেন প্রভুর দর্শন ও স্পর্শের মধ্যে এক দিব্যশক্তি আছে। এই সন্ন্যাসী গৌরসুন্দরের প্রেমবন্ধনে চিরতরে বাঁধা

পড়িলেন। সকলেই তখন জানিতে পারিলেন, ইঁনিই প্রভুর বহু প্রতীক্ষিত মহাপুরুষ শ্রীনিত্যানন্দ। এখন হইতে তিনি প্রভুর প্রধান পার্ষদরূপে পরিগণিত হইলেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও মুকুন্দ দত্ত চট্টগ্রামের লোক। উভয়েই পরম ভক্ত। মহাপ্রভু তাঁহাদের সঙ্গে মিলনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। মুকুন্দের সহযোগিতায় গদাধর পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির দেখা পাইলেন। বিদ্যানিধি তখন দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাকিয়া হেলান দিয়া যেভাবে রাজসিক ভঙ্গিতে বসিয়া আছেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে একজন ভক্ত বা বৈরাগ্যপ্রাণ সাধক বলিয়া ধারণা করিবার উপায় নাই। তাই গদাধর যুগপৎ হতাশ ও বিস্মিত হইলেন। গদাধর চিন্তা করিতে লাগিলেন, তিনি কাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন? কে এই মহাবিলাসী ব্যক্তি। কিন্তু মুকুন্দ গদাধরের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুণ্ডরীকের ভাবাবেশ হয়। তাঁহার প্রেমোন্মাদের করুণ দৃশ্য দেখিয়া গদাধর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই পরম বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গদাধর ভীত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হইতে তিনি দীক্ষা লইবেন। মহাপ্রভু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির খোঁজ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া সেই রাত্রিতেই শ্রীবাস অঙ্গনে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিলেন। পরিধানে তাঁহার মলিন বস্ত্র। দীনহীন বেশ। তিনি প্রভুর পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—প্রভু আমায় উদ্ধার কর। দূরে সরাইয়া রাখিও না, বঞ্চনা করিও না। ইহা শুনিয়া প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে প্রভুও কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন, পুণ্ডরীক! বাপ আমার! তোমায় পাইয়া হৃদয় আমার শান্ত হইয়াছে। তোমায় পাইয়া আমি পুনর্জীবন পাইলাম।

এই প্রেমলীলা দেখিয়া ভক্তেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হইলে মহাপ্রভু বলিলেন, "আমার উপর শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বড়ই দয়া। শ্রীকৃষ্ণ পুণ্ডরীককে আমার কাছে আনিয়া দিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছেন। আজ হইতে পুণ্ডরীক আর বিদ্যানিধি নহে। তাঁহার নতুন নামকরণ হইল প্রেমনিধি। প্রেম-ভক্তির নিগূঢ় সাধন বিলাইবার জন্যই কৃষ্ণ ইঁহাকে গড়িয়াছেন।" অতঃপর পুণ্ডরীক প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদভুক্ত হইলেন। প্রভুর প্রিয় পার্ষদ গদাধরও কয়েকদিনের মধ্যেই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

এইদিকে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রেমনাট্যের নব নব দৃশ্য আরম্ভ হইল। দিনের পর দিন অন্তরঙ্গ সাধনের সঙ্গে প্রভুর নানা লীলাবৈচিত্র্যও ফুটিয়া উঠিল। ভক্ত কবি বৃন্দাবন দাস তাঁহার এই সময়কার অবস্থাটির বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন

"দাস্য ভাবে প্রভু যখন করেন ক্রন্দন
হইল প্রহর দুই, গঙ্গা আগমন
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে
মূর্চ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে।
ক্ষণে হয় সানুভাব দন্ত করি বৈসে,
মুই সেই মুই সেই ইহা বলি হাসে।"

প্রভু প্রায়শঃই থাকেন ভক্তি ও প্রেমরসে বিভোর। ভক্তজনের দৈন্যের ও আর্ত্তির তিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ। আবার এক এক দিন তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরীয় আবেশ দৃষ্ট হয়। কখনও দীপ্ত তেজে, প্রমত্তভঙ্গীতে শ্রীবাসের গৃহের বিষ্ণুখট্টায় অবলীলায় বসিয়া পড়েন। বিশিষ্ট ভক্তেরা প্রভুর অলৌকিক ও ঐশ্বর্য্যময় রূপ দেখিয়া ধন্য হন। এই ভাগ্যবানদের মধ্যে রহিয়াছেন অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারী ও হরিদাস প্রভৃতি পরম বৈষ্ণব ও ভক্তগণ।

এই সময়ে মহাপ্রভু নানা অলৌকিক বিভূতি ভক্তদের মধ্যে প্রকট করিতেন। একদা তিনি বাজারে কলার খোলা বিক্রয়কারী

শ্রীধরকে খুঁজিয়া আনিতে ভক্তদের বলিলেন। এই শ্রীধরকে বহুলোকে তুচ্ছজ্ঞান করে। কিন্তু সে যে একজন ভক্ত শিরোমণি তাহা কেহই জানেন না। তাঁহার আদেশ পাইয়া ভক্তগণ শ্রীধরকে প্রভুর সম্মুখে হাজির করিলেন।

শ্রীধর অবাক্। কনকদণ্ডসম বাহু দুইটি প্রসারিত করিয়া শ্রীধরকে প্রভু আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার কত পূর্ব্বের পরিচয়। কত প্রণয়, কত কলহ তোমার সঙ্গে করিয়াছি। আজিকার এই আনন্দের হাটে তুমিও আসিয়া যোগদান কর। শ্রীধর বড়ই দরিদ্র। সে চিরঅনাটনের মধ্যে থাকিয়াও কোনদিন কাহাকেও কোনরকম প্রতারণা করে নাই। কোন জিনিষ অন্যায্য দরে বিক্রয়ও করে নাই। এইকারণে ভক্ত-প্রবর শ্রীধর মহাপ্রভুর শরণাগতি লাভ করিলেন।

এইবার প্রভু প্রচারকার্য্যে মন দিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে দুয়ারে দুয়ারে কৃষ্ণনাম বিলাইতে বলিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়া পরম আনন্দে নগরের পথে পথে নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সাধিয়া, কাঁদিয়া, লোকের পায়ে পড়িয়া তাঁহারা কৃষ্ণনাম বিতরণ করেন। কৃষ্ণকথা ও গৌরাঙ্গ-কথা শুনিয়া জনমানব মুগ্ধ হইল। এই নাম বিতরণে প্রভুর পার্ষদ-দ্বয় হরিদাস ও নিত্যানন্দ একদিন বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। দুইজনেই আনন্দে নামকীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যমদূতের মত দুইজন লোক অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে—ইহারা দুই ভাই—জগন্নাথ ও মাধব, ডাকনাম জগাই-মাধাই। যদিও উভয়েই ব্রাহ্মণসন্তান, পাপানুষ্ঠানে ইহাদের সমকক্ষ নবদ্বীপে আর নাই। লুণ্ঠন ও নরহত্যায় উভয় ভ্রাতা সিদ্ধ-হস্ত। হরিনাম, কৃষ্ণনাম শুনিলেই রাগিয়া যায় ও ছুটিয়া মারিতে আসে। তাহারা মদের নেশায় বিভোর হইয়া রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। নিতাই অগ্রসর হইয়া এই পাষণ্ডদ্বয়কে হরিনাম

শুনাইতেই উহারা মারমুখী হইয়া ছুটিয়া আসিল। হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নিতাই দৌড়াইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে একেবারে গৌরসুন্দরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নিতাই আব্দারের সুরে প্রভুকে নিবেদন করিলেন, "প্রভু! যদি এই দুর্বৃত্তদের হরিনাম নোওয়াইতে পার, তোমার কৃতিত্ব বুঝিতে পারিব।" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন—"তাই হবে।"

কয়েকদিন পরের কথা। নামকীর্ত্তন করিতে করিতে নিতাই ও হরিদাস একদিবস রাত্রিকালে এই জগাই মাধাইএর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণনাম কানে পশিবামাত্রই উভয়ভ্রাতা উত্তেজিত হইয়া ধাওয়া করিয়া আসিল। হরিদাস ও নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিল "তোরা কে?" নিত্যানন্দ বলিলেন—"ভাই! আমি কৃষ্ণনাম শুনাইতে আসিয়াছি। আমি একজন অবধূত।" ইহা শুনিয়া পাপিষ্ঠ মাধাই রাগিয়া উঠিল। রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে একটি ভাঙ্গা কলসী তুলিয়া লইয়া নিতাইএর মাথায় ছুঁড়িয়া মারিল। ভাঙ্গা কলসীর কাণা নিত্যানন্দের মাথায় লাগিয়া মাথা ফাটিয়া গেল। দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। ইহাতে জগাই দুঃখিত হইল। বলিল—একজন নিরীহ শান্ত-স্বভাব সন্ন্যাসীকে মারিয়া কি লাভ হইল? ইতিমধ্যে খবর পাইয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, পাষণ্ডদের শাস্তি দিতে হইবে।" প্রভুর রোষ দেখিয়া নিত্যানন্দ উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া প্রভুকে বলিলেন "প্রভু! মাধাই আমাকে একেবারেই মারিয়া ফেলিত। জগাই আমায় রক্ষা করিয়াছে। ইহারা মহাপাতকী। ইহাদিগকে তোমার কৃপাপ্রসাদ প্রদানে রক্ষা করিতে হইবে। যদি অনুগ্রহ করিয়া উভয় ভ্রাতাকে আমায় ভিক্ষা দাও, আমার সব কষ্ট দূর হইবে। গৌরসুন্দরের রোষ ততক্ষণে প্রশমিত হইয়াছে। তিনি করুণার্দ্র হইয়াছেন। তিনি সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "ভাই জগাই!

নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়া তুমি আমায় কিনিয়া লইয়াছ। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ তোমায় কৃপা করিবেন। আজ হইতে তোমার প্রেমভক্তি লাভ হইল।" ইহা বলিয়া প্রভু তাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভুর দর্শনে ও স্পর্শনে এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। জগাই প্রেমাবেশে মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এইরূপ পাষণ্ড জগাইএর সৌভাগ্য উদয়ে ভক্তরা আনন্দিত হইলেন। নামকীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে তাঁহারা সমগ্র অঞ্চলটি মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

মাধাইএর নিষ্করুণ প্রাণ এইবার করুণ হইয়া উঠিল। বুঝিতে পারিল যে এক অদ্ভুত পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত। এই যুগে যে এই হেন পুরুষ বড়ই দুর্ল্লভ। নয়নে তাঁহার স্বর্গীয় মোহময় দৃষ্টি। বদনে তাঁহার মধুস্রাবী কৃষ্ণনাম। আর বুক ভরিয়া পাতা রহিয়াছে প্রেম ভালবাসার ইন্দ্রজাল। কি বিস্ময়কর তাঁহার স্পর্শ। জগাই-এর মত, দুরন্ত পাষণ্ড মাধাইও মহাপ্রভুর স্পর্শে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আরও বিস্ময়কর, নিমাইএর কর্ম্মসঙ্গী মহাপ্রেমিক অবধুত নিত্যানন্দ! এমন মারাত্মক প্রহারের পরও অপার করুণা নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহারা মানুষ না দেবতা! মাধাই মুর্চ্ছাভঙ্গে অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে। অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। কাতরকণ্ঠে বারবার প্রভুর পায়ে মিনতি জানাইয়া উভয়েই তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া প্রভুও তাহাদিগকে তখনই কোল দিলেন। জগাই মাধাই দুই ভাইকে আশ্বাস দিয়া প্রভু কহিলেন, "ভাই! আজ থেকে সমস্ত পাপের বোঝা আমার উপর দিয়া তোমরা আনন্দে কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণ তোমাদের সর্বঅভীষ্ট প্রদান করিবেন।"

প্রভুর কৃপালাভ করিবার পর এই দুই ভাই জগাই মাধাই পরম ভাগবত হইয়া উঠেন। সমস্ত বিষয়বিত্ত ত্যাগ করতঃ কন্থা-

করঙ্গধারী কাঙ্গাল বৈষ্ণবরূপে নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ ও ধ্যানে এবং বৈষ্ণব সেবায় দিন অতিবাহিত করেন। প্রত্যহ প্রত্যেক গঙ্গা-স্নানার্থীদের নিকট করজোড়ে অশ্রুসজলনেত্রে মিনতি জানায়, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে কোন দোষ করিলে তাহা যেন ক্ষমা করে। স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য ভক্তপ্রবর মাধাই কোদাল দিয়া নিজহস্তে মাটি কাটিয়া একটি ঘাট তৈয়ার করিয়া দেন। এই ঘাট অত্যাবধি নবদ্বীপে মাধাইএর ঘাট নামে পরিচিত।

জগাই মাধাইএর এই পরিবর্ত্তন নবদ্বীপে বেশ একটি আলোড়ন সঞ্চার করে। গৌরাঙ্গের নব প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রভুর বদনে প্রসন্নহাসির ছটা। হরিনামে সিক্ত করিবার জন্য তিনি ভক্তদের এমনিভাবে রিক্ত করিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী ও তরুণ বৈষ্ণবদের জন্য প্রভু কঠোরতম বৈরাগ্য ও কৃষ্ণব্রতের ব্যবস্থা করিতেন। ভগবানআচার্য নামক এক ব্যক্তি প্রভুর একজন বিশিষ্ট ভক্ত। একদিন তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সরু ও সুগন্ধি চাউল অনতিবিলম্বে যোগাড় করিতে হইবে। তিনি খবর পাইলেন, প্রভুর জনৈক ভক্ত শিখীমাহিতীর ঘরে সরু চাউল আছে। ছোট হরিদাস একজন তরুণ ভক্ত। পরম বৈষ্ণব, সুকণ্ঠ গায়ক এবং ভাবোন্মাদ বলিয়া চৈতন্যের সে বড়ই প্রিয়। ভগবান আচার্যের সহিত ও তাহার হৃদ্যতা আছে। সেই সূত্র ভগবানআচার্য ছোট হরিদাসকে প্রভুর ভোগের জন্য শিখিমাহিতীর ভগ্নী মাধবীদাসীর নিকট হইতে সরু চাউল আনিতে পাঠাইলেন। ছোট হরিদাস তখনই ছুটিয়া গিয়া চাউল লইয়া আসিল। ভোজন করিতে করিতে প্রভু ইহা জানিতে পারিলেন এবং মর্ম্মাহত হইলেন। বৈরাগী হইয়া যে নারীসম্ভাষণ করে তাহার মুখদর্শন করা যায় না। সে বৈষ্ণব নহে। প্রভুর দ্বার চিরতরে ছোট হরিদাসের কাছে রুদ্ধ হইল। দুঃসহ মর্ম্মযাতনা

লইয়া তরুণ হরিদাস তিনদিন যাবৎ উপবাসী রহিলেন। স্বরূপ দামোদর এই তরুণ বৈষ্ণব ছোট হরিদাসের এই অজ্ঞানজনিত অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু কিছুই হইল না, নিজ সঙ্কল্পে প্রভু অটল রহিলেন। ছোট হরিদাস কিছুদিন পরে মনদুঃখে ত্রিবেণীতে ঝাপ দিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। ভক্তগণ ইহার পর একদিন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত লঘুপাপে এত গুরুদণ্ড কেন? তিনি বলিলেন বৈরাগীকে শক্তিধর সাধক হইতে হয়। যেমন রামানন্দ রায়। তাঁহার ক্ষেত্রে নারীসান্নিধ্য মোটেই বিপজ্জনক নহে। রামানন্দ প্রেমভক্তিরসের মহানঅধিকারী পুরুষ। প্রত্যেক বৈষ্ণবকে সেইরকম শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

একদা তাঁহার জনৈক ভক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর মুখ হইতে কৃষ্ণনাম শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভুকে ইহা জানাইলে প্রভু বলিলেন, কৃষ্ণনাম শুনাইবার একমাত্র সক্ষম ব্যক্তি রামানন্দ রায়। প্রদ্যুম্ন রামানন্দ রায়ের কাছে গিয়া দেখিলেন তিনি দুইটি যুবতী রূপসী নারীকে সাজাইতে ব্যস্ত। প্রদ্যুম্ন ইহা দেখিয়া হতাশ হইলেন এবং তাহা প্রভুর গোচর করিলেন। প্রভু বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী। নারী দর্শন স্পর্শন করা দূরে থাকুক, নাম পর্যন্ত এড়াইয়া চলি। আর দেখ রামানন্দ রায়ের কি অপূর্ব শক্তি। রূপলাবণ্যময়ী তরুণীদের স্পর্শ করিয়া ও তিনি নির্বিকার থাকেন। তাঁহার মত সাধুব্যক্তিরই কৃষ্ণনাম শুনাইবার একমাত্র অধিকার। ভক্তি-প্রেম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই তাঁহার এই উচ্চ অবস্থা। পরদিন প্রদ্যুম্নমিশ্র পুনঃ রামানন্দ রায়ের নিকট গিয়া কৃষ্ণকথা শুনিলেন। তিনি একেবারে উন্মত হইয়া পড়িলে আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিল। রামানন্দ রায়ের প্রকৃতরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের আর ভুল হইল না।

অপরদিকে দেখা যায়, যে মাধবী দাসীর নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করিবার জন্য ছোট হরিদাসকে আত্মবিসর্জন করিতে

হয়, সেই মাধবী দাসী ও তাহার ভ্রাতা শিখি মাহিতী প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত। মাধবী দাসী বৃদ্ধা। নীলাচলে ভাগবত সমাজে তাঁহার অপূর্ব সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে প্রভুর মধুর সাধনার মর্ম্মজ্ঞ ও তাঁহার প্রেমরস ধারণের উপযুক্ত পাত্র নীলাচলে আছে মাত্র সাড়ে তিনজন। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখিমাহিতী এবং এই তিনজন ছাড়া অর্দ্ধপাত্র শিখির ভগিনী মাধবী দাসী। ইঁহার কাছে সামান্য চাউল চাহিতে গিয়া ছোট হরিদাসের এ কি দুর্গতি!

যাহা হউক, এত কঠোরতা সত্ত্বেও ভক্ত ও সাধকদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। চারিদিকে কেবলই হরিনামের জয়ধ্বনি। এই সময়ে সর্ব্বত্র খোল করতাল লইয়া নামকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান ছড়াইয়া পড়ে।

কাজী বারবাহুক তখন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা। তিনি এত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না বটে। কিন্তু এই নূতন বৈষ্ণবদলের এতটা হৈ হুল্লোড় তিনি ভালবাসিতেন না। একদিন কাজীর একদল অনুচর একদল ভক্তবৃন্দের খোল করতাল ভাঙ্গিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ জারী হইল সমবেত কণ্ঠে বা উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করা চলিবে না। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ভীত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে মনস্থ করিলেন। প্রভু ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। রোষে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দাও, আজ সন্ধ্যায় নবদ্বীপের পথে পথে নগরকীর্ত্তন হইবে। হরিনামে কে বাধা দেয় তাহা আমি দেখিব।" ইহা শুনিয়া ভক্তদের আনন্দ ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। প্রভুর আদেশ পাইয়াছে। শাসনকর্ত্তা কাজীর ভয় আর কেন? সন্ধ্যার সময় খোল, করতাল, ঝাঁজ, কাসর, ও নিশান লইয়া দলে দলে লোক শ্রীবাসঅঙ্গন হইতে বাহির হইল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহার অতিমানবীয় প্রেমনাট্যের দৃশ্য উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহার

ভুবনমোহন রূপ লইয়া রঙ্গীয়ার বেশে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কাজির বিরুদ্ধে অহিংস অভিযান আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি এক একটি কীর্ত্তন মণ্ডলীতে নৃত্যগীত করিতে করিতে চলিয়াছেন। আর প্রভু চলিয়াছেন সকলের মধ্যস্থলে। এক দিব্য ভাবাবেশে তিনি আবিষ্ট। কীর্ত্তনীয়ার এক বিপুল জনতা কাজির গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল। এমন অহিংস অভিযান ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। গৌরাঙ্গ কাজির বাড়ী গিয়া কাজিকে ডাকিয়া আনিলেন এবং আদেশ চাহিলেন যে, নবদ্বীপে যেন কেহ কদাপি কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া না দেয়। কাজী প্রভুর ভুবনভুলান রূপ দেখিয়া ও তাঁহার আবেদন শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলিলেন, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি বা আমার বংশের কেহই তোমার প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন কদাপি বন্ধ করিবে না।" ইহা শুনিয়া চারিদিকে জয়জয়কার পড়িল। প্রেমের বলে কাজীকে বশীভূত করিয়া সানন্দে প্রভু স্বজনসহ গৃহে ফিরিলেন।

সমকালীন পদকর্ত্তা শ্রীপাদ বাসুদেব ঘোষ প্রভুর এই সময়ের অলৌকিক লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন :—

"আমার পরশমণির কি দিব তুলনা ?
পরশমণির গুণে জগতের জীবগণে
নাচিয়া গাহিয়া হইল সোনা।"

প্রতিদিনের মত সেইদিনও শ্রীবাসের অঙ্গনে নামকীর্ত্তন হইতেছে। সাঙ্গোপাঙ্গসহ প্রভু কীর্ত্তনাবিষ্ট। পরমানন্দে প্রভু নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। শ্রীবাসের একটি শিশুপুত্র কিছুদিন হইতে অসুস্থ। হঠাৎ অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া শ্রীবাস দ্রুতপদে অন্দরে চলিয়া গেলেন। দেখিলেন—শিশুটি এইমাত্র দেহত্যাগ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, পুত্রশোকে এই পরম বৈষ্ণবকে অধীর হইতে দেখা গেল না। তিনি বরং প্রভুর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বাড়ীর মেয়েদের ক্রন্দন করিতে নিষেধ

করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রভুর কণ্ঠে নামগান শুনিতে শুনিতে পুত্র দেহত্যাগ করিয়াছে। সে ঊর্দ্ধলোকে গিয়াছে। ইহাতে কাঁদিবার কি আছে? তোমরা যদি কান্নাকাটি কর ও প্রভুর কীর্ত্তন-আনন্দ ভঙ্গ কর, তবে আমি গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিব। সবাই একেবারে চুপ থাকিবে। কাঁদিতে হয় পরে কাঁদিবে।" সকলেই চুপ রহিল। কীর্ত্তন অঙ্গনের অনেকেই কিছু জানিতেও পারিল না। শ্রীবাস আবার আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই প্রভুর প্রেমাবেশ ভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। কীর্ত্তনে মন বসিতেছে না। নিশ্চয় শ্রীবাসের গৃহে কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। তোমরা আমায় সব কথা খুলিয়া বল। তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিতে এইবার সকলে বলিতে বাধ্য হইল, শ্রীবাস পণ্ডিতের শিশুপুত্রের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। পণ্ডিতের গৃহে পুত্রশোকে সকলেই বিহ্বল। প্রভুর কীর্ত্তনানন্দ ভঙ্গ হইবে ভাবিয়া প্রভুকে ইহা জানিতে দেওয়া হয় নাই। ইহা শুনিয়া প্রভুর নয়নযুগল সজল হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ আমার পরম কৃপালু। শ্রীবাসের মত অন্তরঙ্গ আত্মীয় আমার দুর্ল্লভ। ইহারা আমার জন্য সব করিতে পারে। ইহাদের ছাড়িয়া আমি কি করিয়া থাকিব?"

অতঃপর ব্যগ্র হইয়া মৃত শিশুর শয্যাপার্শ্বে আসিলেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবী ও অন্যান্য আত্মীয়দের কান্নাকাটি দেখিয়া প্রভুর অন্তর গলিয়া গেল। পুরনারীদের সান্ত্বনা দিতে প্রভু সর্ব্বজন সমক্ষে এক অলৌকিক লীলা প্রকটিত করিলেন। মৃত শিশুর দেহটিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিলেন, "তোমার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনেরা শোকার্ত্ত। একবার তাঁদের বল, কেন তাঁদের ছেড়ে যাচ্ছ এবং কোথায় বা যাচ্ছ।"

উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন শিশুটি প্রাণ পাইয়া চক্ষু উন্মীলন করিল এবং বলিল, "প্রভু! যতদিন নির্ব্বন্ধ ছিল, শ্রীবাসের

পুত্ররূপে নর দেহে বিরাজ করিয়াছি। অনেক কিছু ভোগ করিয়াছি। প্রাক্তন আমার শেষ হইয়াছে। নূতন জায়গায় চলিলাম। কাহারও সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার ও তোমার পার্ষদদের চরণে আমার সহস্র প্রণাম রহিল। এইবার বিদায় নিতেছি।" শিশু আবার অসাড়দেহে পড়িয়া রহিল। প্রাণের চিহ্নমাত্র রহিল না।

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ভেদ নাই। ইহা বুঝাইতে প্রভু এই অলৌকিক লীলা দেখাইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী মালিনীদেবীকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি কহিলেন, "একপুত্র তোমাদের চলিয়া গেল। আজ থেকে আমি ও নিত্যানন্দ তোমার দুইপুত্র হইলাম।"

গয়াধাম হইতে ফিরিবার পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ বিরাট বৈষ্ণবগোষ্ঠি গড়িয়াছেন। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে এখন কীর্ত্তনের আনন্দধ্বনি শোনা যায়। গৌরসুন্দর এখন ভক্তদের সর্ব্বস্বধন। তাহাদের জীবনমরনের প্রভু। কিন্তু ইহা শুধু নবদ্বীপের মাঝে সীমিত। তিনি এইবার বিশ্বমানবের কল্যানে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তিনি যে সংসারী। মাতার স্নেহ, কিশোরী ভার্য্যার প্রেম আর ভক্ত শিষ্যদের শরণাগতির বন্ধন তাঁহার চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। সংসার ত্যাগ করিয়া তাই প্রভু সন্ন্যাস নিতে মনস্থ করিলেন। স্থির করিলেন কাটোয়ার সন্ন্যাসী কেশব ভারতীকে তাঁহার দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবেন। এই সংকল্প নিত্যানন্দ ও অপর কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে ও মাতা শচীদেবীকে জানাইলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত হইলেন। নানা চেষ্টা করিয়াও কেহ গৌরাঙ্গকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে গভীর নিশিথে গৌরসুন্দর গৃহত্যাগ করিলেন। কাটোয়ার পথ

লক্ষ্য করিয়া প্রভু ছুটিলেন। কাহার ও কাতর ক্রন্দন তাঁহাকে বিরত করিতে পারিল না। কেশব ভারতীর কুঠিরে পৌঁছিবার পর একে একে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি পার্ষদেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। মস্তকমুণ্ডনের পর কেশব ভারতী তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর বয়স তখন সবেমাত্র চব্বিশ বৎসর। তাঁহার নূতন নামকরণ হইল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

এইবার প্রভুর লক্ষ্য হইল নীলাচল। পথিমধ্যে দশদিনের জন্য প্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে অবস্থান করেন। সেখান হইতে তিনি দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথের মহাধামে চলিলেন।

কথিত আছে এই জগন্নাথ মূর্ত্তি পুরীক্ষেত্রে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক স্থাপিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শবদেহ সেই বৃক্ষমূলে পতিত থাকে। পরে কোন মহাপুরুষ সেই দেহাস্থি সংগ্রহ করেন। অনন্তর তাহা ইন্দ্রদ্যুম্নের হস্তগত হইলে তিনি তাহাতে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মানার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে নিযুক্ত করেন। বিশ্বকর্ম্মা রাজাকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন যে "আমার মূর্ত্তিনির্ম্মান সময়ে যদি কেহ তাহা দর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিব। বিশ্বকর্ম্মা দ্বাররুদ্ধ করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে ইন্দ্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি দর্শনার্থ একান্ত ঔৎসুক্য বশতঃ অধীর হইয়া যেমন দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন, অমনি বিশ্বকর্ম্মা অন্তর্হিত হইলেন। তখনও মূর্ত্তির হস্তপদাদি নির্ম্মিত হয় নাই। অগত্যা মূর্ত্তি সেই অবস্থাতেই রহিল। পরে ব্রহ্মার আদেশে তদবস্থ মূর্ত্তিই জগন্নাথদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহা জগতের নাথ বা জগন্নাথ বা পুরুষোত্তম বলিয়া জ্ঞাত। পুরীর যে অংশে এই তীর্থ তাহা শ্রীক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত।

মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিয়াছেন। দূর হইতে দীর্ঘ মন্দিরের চূড়া দেখিয়া প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় তিনি দৌড়াইতে

লাগিলেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই প্রভুর ভাবাবেশ হইল। তিনি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন। কিন্তু পূজকেরা বাধা দিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সেই সময়ে রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া ও নবদ্বীপের লোক বলিয়া জানিতে পারিয়া নিজ আলয়ে লইয়া আসিলেন। সেখানে কিছুদিন মহাপ্রভু বেদান্তপাঠ শুনিলেন। একদিন পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক বাধিল। প্রভু তাঁহাকে বুঝাইলেন যে অদ্বৈতবাদী শঙ্করের অনুসরণে তিনি যে কাল্পনিক ভাষ্য করিতেছেন তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। শ্রীভগবান হইতেছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। আর তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সার্ব্বভৌম তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি চিনিলেন মহাপ্রভু কে? তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকট নতি স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন এবং জীবনমরণের প্রভুরূপে তাঁহাকে মানিয়া লইলেন।

নীলাচলে প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হইল। তৎপর তিনি দক্ষিণদেশে পরিব্রাজনে বাহির হইলেন। সার্ব্বভৌম বলিয়া দিলেন, গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরীতে উৎকলরাজের প্রতিনিধিরূপে রামানন্দ রায় দেশশাসন করিতেছেন। তিনি পরম বৈষ্ণব। প্রভু যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন। প্রভু সম্মত হইলেন। কৃষ্ণ-প্রেমরসে মগ্ন হইয়া প্রভু পথ চলিতেছেন। ভক্তি, প্রেম ও শরণা-গতির ভাবে বিভোর। কণ্ঠে চলিতেছে নামকীর্ত্তন।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্॥

নামগান, প্রেমাবেশ ও নৃত্যকীর্ত্তনে নবীন সন্ন্যাসী পথে পথে সকলকে মুগ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। কেহ তাঁহার দিব্যরূপ দেখিয়া, কেহ তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া, কেহ বা স্পর্শ পাইয়া প্রেমাবেশে অধীর

হইতেছেন। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে তিনি এইরূপে শক্তিসঞ্চয় করিয়া চলিয়াছেন। দক্ষিণাপথে দিনের পর দিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবিরাম পরিক্রমা চলিতেছে। তার্কিক, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বিষয়াসক্ত ধনীরা, পাষণ্ড, দস্যু, পতিতা সকলেই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও মায়াবাদী সাধকেরাও দলে দলে যোগ দিতেছেন। অবশেষে প্রভু গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে রামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি দশদিন বিদ্যানগরীতে অতিবাহিত করিলেন। বৈষ্ণব সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব রামানন্দ রায় হইতে জানিয়া লইলেন। একান্তভক্তি, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যময় ভক্তি এবং ইহার পর "কান্তাপ্রেম" বৈষ্ণবের সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া রামানন্দ রায় জানাইলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রভুর তৃপ্তি হইল না। প্রভু কহিলেন—"এহ বাহ্য, আগে কহ আর"। তখন রামানন্দ রায় কহিলেন, "প্রভু! ইহার পর হইতেছে "রাধাপ্রেম"। ইহা প্রেমের পরমসার, সাধ্যশিরোমণি। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইল, সৎ-চিৎ-আনন্দময়। আর তাঁহারই আনন্দাংশে, হ্লাদিনীশক্তিরূপে বিরাজিতা শ্রীরাধা। এই রাধাপ্রেমই মহাভাব হ'য়ে টেনে নিয়েছে, প্রেমসাধনাকে সর্ব্বোচ্চস্তরে।" ইহাতেও মহাপ্রভুর জ্ঞানপিপাসা মিটিল না। তখম রামানন্দ রায় বলিলেন, "রাধাকৃষ্ণের প্রেমের চরমে দুইটি তত্ত্ব থাকে না। রাধাকৃষ্ণের যুগলসত্তা সেইখানে এক হইয়া যায়। "ন সো রমণ ন হাম রমণী"। রসরাজ ও মহাভাব দুই একরূপ। সেখানে সব কিছু একাকার। এই অবস্থায় লীলা আর থাকে না। বিষয় ও আশ্রয়, গোলকপতি কৃষ্ণ ও রাধা সেখানে একীভূত। এখানে দ্বৈত রসসত্তার বিলাস থাকে না।" মহাপ্রভু বলিলেন, "রায়! এ বড় নিগূঢ় কথা। সব একাকার করার কথা। রায়! এ কথা আর নয়।" কৃষ্ণরসের বন্যাধারা অর্গলমুক্ত হওয়ায়, মহাভাবরসে দুইজনেই ডুবিয়া গেলেন।

বিদ্যানগরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সানন্দে দশদিন অতিবাহিত করিলেন। রামানন্দ রায় এখন সর্ব্বতোভাবে প্রভুময় হইয়া উঠিলেন। রাজকার্য্যে মন আর নাই। এখন তিনি প্রভুর সঙ্গে যাইতে উদ্‌গ্রীব হইলেন। তখন রামানন্দকে প্রভু বুঝাইয়া বলিলেন, পরিক্রমার শেষে উভয়ে পুনঃ নীলাচলে মিলিত হইবেন। পুনঃ উভয়ে মিলিয়া কৃষ্ণলীলার অন্তরঙ্গ ভাব আস্বাদন করিবেন। অতঃপর প্রভু দক্ষিণের দিকে চলিলেন। প্রভুর এই পরিক্রমা শুধু তীর্থদর্শনের জন্য নহে। এই লীলা শুধু জনমনে কৃপাবিতরণের জন্য। যেখানেই ভক্ত সেখানেই তাঁহার আবির্ভাব ঘটিতেছে। আর যেখানেই তিনি যান সেখানেই ভক্তিরসের আনন্দস্রোত বহিতে থাকে।

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভু শ্রীরঙ্গম ক্ষেত্রে আসিলেন। পুণ্যতোয়া কাবেরীতে স্নান তর্পণ শেষ করিয়া রঙ্গনাথজীকে দর্শন করিলেন। মন্দিরের এক কোনে যুধিষ্ঠির নামক এক সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণ গীতাপাঠ করিতেছেন ও অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন দেখিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, গীতার কোন শ্লোক পড়িয়া তিনি এত কাঁদিতেছেন? যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তিনি সংস্কৃত জানেন না। এমন কি শব্দের অর্থও বুঝেন না। তবুও তিনি এই মহাগ্রন্থ গীতা যখনই পড়িতে বসেন, তিনি দেখিতে পান তাঁহারই শ্যামসুন্দর রথাগ্রে বসিয়া অর্জ্জুনকে পরমতত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন। সেই দিব্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে ভাসিয়া উঠে। তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়েন। কান্না ভিতর থেকে উথলিয়া উঠে। তিনি রোদন করিতে থাকেন। প্রভু তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। বলিলেন যে গীতাপাঠে পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটিয়ে দেয়, তাহাই প্রকৃত গীতাপাঠ, তাহাই গীতাধ্যান।"

তৎপর প্রভু রামেশ্বর, ত্রিবাঙ্কুর, পন্ঢরপুর, প্রভৃতি পর্যটন করিয়া দুইবৎসর পরে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। ভক্তগণ তাঁহাকে পুনঃ নীলাচলে ফিরিয়া পাওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

গৌড় হইতে প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রথযাত্রার উৎসবে বৈষ্ণবদের নৃত্য ও কীর্ত্তন পুরীধাম মুখরিত হইয়া উঠিল। রথাগ্রে প্রভুর উদ্দণ্ড কীর্ত্তন ও প্রেমাবেশ, ভক্ত ও দর্শকদের মনে দিব্য আনন্দের সঞ্চার করিল। উৎকলরাজ প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যের শ্রীচরণে আত্মসমর্পন করিলেন। তিনি অচিরেই প্রভুর প্রেমভক্তি ও ধর্ম্মের ধারক ও বাহকরূপে গণ্য হইলেন।

প্রভু গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে আনন্দে আছেন। ভক্তেরা কেহ প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না। প্রভু একদিন শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে গৌড়ে ফিরিয়া যাইতে এবং সংসারধর্ম্ম করিয়া গৃহী বৈষ্ণবদের আদর্শ জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিলেন। ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু বুঝিলেন যে ইহা প্রভুর আদেশ। তিনি ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তারপর সমগ্র গৌরদেশ তাঁহার প্রভাবে, নৃত্যে ও নাম প্রচারে মাতিয়া উঠিল। তিনি কৃষ্ণপ্রেমদাতা দয়াল নিতাই নামে সর্ব্বত্র খ্যাত হইলেন।

প্রভু তৎপর একটি মাত্র সঙ্গী লইয়া বৃন্দাবন ও মথুরা চলিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া, প্রভু কখনও গাভীর হাম্বারব শুনিয়া, কখনও ময়ুরীর নৃত্য দেখিয়া, কৃষ্ণলীলার অনুভূতি পাইতে থাকেন এবং অনেক সময় বাহ্যচেতনা হারাইয়া ফেলেন। এই সময়ে তিনি দিব্য আবেশে ব্রজমণ্ডলের বহু প্রাচীন তীর্থ পুনরুদ্ধার করেন, ও রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করেন। বৃন্দাবনের সাধক সমাজ অচিরেই তাঁহার আবিষ্কৃত তীর্থাদি ও তাঁহাকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। মুসলমান আক্রমণকারীদের উপর্য্যুপরি লুণ্ঠনে এই অঞ্চলের জনপদগুলি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। এইবার এই বনাকীর্ণ পবিত্র অঞ্চলকে শ্রীচৈতন্য সারা ভারতের জনমানবের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। লুপ্ত তীর্থাদির পুনরুদ্ধার ও বিস্মৃতপ্রায় পুণ্য স্থানগুলির মাহাত্ম্য পুনঃ

প্রচার হয়। প্রভু ও তাঁহার শক্তিমান ভক্তদের চেষ্টায় বৃন্দাবন পুনঃ জাগিয়া উঠে, এবং দেশবাসীর অন্তরে বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের লীলা পুনঃ প্রকাশ পায়। বৃন্দাবন হইতে প্রভু প্রয়াগের দিকে চলিলেন। সঙ্গে সেবক বলদেব ভট্টাচার্য্য ও নবাগত রাজপুত ভক্ত কৃষ্ণদাস। তাঁহারা বিশ্রামের জন্য রাস্তার ধারে এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার কানে রাখালের বংশীধ্বনি পশিল। অমনি প্রভু ভাবাবেশে সংজ্ঞা হারাইলেন। বাদসাহের এক অশ্বারোহী পাঠান ফৌজ এই সময়ে এই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা সাধুর মূর্চ্ছা দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে সাধুকে সাধুর সঙ্গীরা বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে। তাই তাঁহারা সাধুর সঙ্গীদের আটক করিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি নিজেই ফৌজের সেনাপতিকে সব কথা বলিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ পাঠান সেনাপতি একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রভুর অমৃতময় বাণি শুনিয়া মুমুক্ষুরূপে তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। দীক্ষা ও আশ্রয় প্রদানান্তে প্রভু তাঁহার নাম দিলেন রামদাস।

এই পাঠান বাহিনীতে বিজলী খাঁন নামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ওমরাহের পুত্র ও ছিলেন। এই বিজলী খাঁন প্রভুর ভক্ত হইলেন। তিনি প্রভুর নিকট হইতে প্রেমভক্তি ও ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং কৃপালাভে ধন্য হন।

ইহার পর প্রভু প্রয়াগে পৌছিলেন। সেখানে প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য বিরাট জনতার সমাবেশ হইল। গৌড়ের বাদসাহ হুসেন সাহেবের প্রাক্তন সচিব "শ্রীরূপ" (উপাধি সাকর মল্লিক) এই সময় প্রভুর নিকট উপস্থিত হন। রূপের জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'সনাতন' বাদসাহের প্রধান সচিব (উপাধি দবীর খাস) সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। রূপের কবিত্বশক্তি ও সনাতনের পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। শ্রীরূপ তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং প্রভুর নিকট

দীক্ষা নিলেন। ইহা শুনিয়া সনাতন ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাদসাহ সনাতনকে ছাড়িতে চাহিলেন না। কিন্তু সনাতনের আকাঙ্খা উদগ্র। তাই দীন ফকিরের বেশে লুকাইয়া প্রভুর কাছে পৌঁছিলেন এবং সন্ন্যাস দীক্ষা লইলেন। সনাতন একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। বর্ত্তমানে দীনবেশ, পরণে ছিন্নবস্ত্র, স্কন্ধে ভোটকম্বল। উদরপূর্ত্তি করেন মাধুকরীতে। তবুও প্রভুর মনে সন্দেহ হইল। বারবার সনাতনের কাঁধের উপর নূতন ভোটকম্বলটীর দিকে তাকাইতেছেন। এই কম্বলটী সনাতনের জনৈক আত্মীয় সনাতনের কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছিলেন। প্রভু বারবার সনাতনের কাঁধের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া তিনি প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন যে কাঙ্গাল বৈষ্ণবের কাঁধে ছিন্নকন্থার পরিবর্ত্তে ভোটকম্বল কেন? তিনি তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গেলেন। এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে পাইলেন, এক দরিদ্র ভিখারী তাহার জীর্ণকন্থাখানি রৌদ্রে শুকাইয়া লইতেছে। তিনি তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নূতন ভোটকম্বলটী তাহাকে দিয়া পুরাতন কন্থাটী লইলেন। এবার সনাতন সত্যই ভারমুক্ত হইলেন। কাঁধে তাঁহার নূতন ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে ছিন্নকন্থা। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরমুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। ব্রজমণ্ডলের ভাবীকর্ত্তা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের ভাবী শিক্ষাগুরু এই সনাতন। ইঁহারা দুই ভাই রূপ সনাতন উত্তরকালে প্রভুর প্রধান পার্ষদরূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

তৎপর দুইমাস প্রভু বারাণসীতে থাকেন। সনাতনকে তাঁহার নব প্রবর্ত্তিত ব্রজরস সাধনায় ব্রতী করিলেন। গৌড়ের বাদসাহের প্রধান সচিব এখন কন্থাকরঙ্গধারী দীন বৈষ্ণব। রাজার ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য নগরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যিনি এই দৃশ্য দেখেন তিনি বিস্মিত হন। ফলে কাশীতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির বহুল প্রচার আরম্ভ হয়। প্রভুকে

ঘনিষ্ঠভাবে জানিয়া এবং তাঁহার ভক্তদের ভক্তি ও বৈরাগ্য দেখিয়া সকলে ক্রমে ক্রমে প্রভুর শরণাগতি লইলেন।

কাশীতে তখন অদ্বৈতানন্দ সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দের বড়ই প্রতাপ। আশ্রমে তাঁহার সর্ব্বদা বেদ-বেদান্তবাদীর ও শিক্ষার্থির প্রবল সমাগম। প্রবেধানন্দ চৈতন্যের কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু তিনি এতটা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। বরং নিজের সভায় একদিন প্রভুর সম্বন্ধে নানা প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলেন।

একদিন প্রভু গঙ্গাস্নানান্তে বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া এক মহারাষ্ট্রীয় ভক্তের গৃহে ভিক্ষান্নের জন্য আসিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহদর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। সঙ্গীগণসহ উৎসাহ ও আনন্দে তিনি নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। রসতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। ক্রমশঃ জনসমাগম বৃদ্ধি পাইল। প্রবোধানন্দ কয়েকজন শিষ্যসহ সেদিক দিয়া যাইতেছিলেন। কীর্ত্তনের মধুর ও প্রাণস্পর্শী স্বর তাঁহার প্রাণে লাগিল। তিনিও সেখানে গেলেন। দেখিলেন, নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া সংজ্ঞাহীন হইলেন ও ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের চিহ্ন প্রভুর সারা দেহে ফুটিয়া উঠিল। প্রবোধানন্দ ইহা দর্শনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। পদপ্রান্তে পড়িয়া তিনি প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রভুর কৃপায় বেদান্তবাদী প্রবোধানন্দের মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসীরূপে রূপান্তর ঘটিল। তাঁহার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তদের প্রভাবে কাশীতে প্রেমভক্তি ধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িল।

চৈতন্য এইবার নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন এবং একাদিক্রমে আঠার বৎসর নীলাচলে অবস্থান করিলেন। শ্রীক্ষেত্রের বুকে তাঁহার প্রেমধর্ম্মের রসবর্ষণ আরম্ভ হইল। প্রভু শ্রীচৈতন্যের নর্ত্তন কীর্ত্তনের মাধুর্য্য দেখিয়া দর্শনার্থীরা আনন্দ-চঞ্চল হইলেন। অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময় চরমে পৌছায়।

প্রেমের এই অদ্ভুত সংক্রমণ দিকদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। প্রভুর এক একটী শিষ্য এক একজন দিক্‌পাল। ভক্তি ও প্রেমের আলোকে, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অপরূপ মহিমায় ইহাঁরা উজ্জ্বল ও স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হইলেন।

নাম-প্রেম-সর্ব্বস্ব প্রাচীন ভক্ত হরিদাস নগরীর এক প্রান্তে বাস করেন। মুসলমান বলিয়া তিনি নিজে স্বেচ্ছায় জগন্নাথ মন্দিরের দিকে যান না, পাছে স্পর্শদোষ ঘটে। কৃষ্ণনাম রসে ও কৃষ্ণ-ভাবনার ভাবে তিনি সর্ব্বদা বিভোর থাকেন। প্রভু রোজ জগন্নাথদেবের উপলভোগ দর্শনের পর হরিদাসের খবর নিতে আসেন। পরমভক্ত হরিদাসের সঙ্গে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করেন। রূপ ও নীলাচলে আসিয়াছেন। মুসলমান বাদসাহের ভৃত্য ছিলেন বলিয়া তিনি নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করেন। তাই তিনিও হরিদাসের কুঠীতে থাকেন। প্রতিভাধর রূপ রাধাকৃষ্ণলীলা নাট্য লিখিতেছেন। প্রভুর ইহাতে মহাউৎসাহ। স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি সহ প্রভু প্রত্যহ রূপের কাব্যরস আস্বাদন করেন। ইহাতে রূপের উৎসাহ বাড়ে ও যথেষ্ট প্রেরণা পান। নাট্যলেখা শেষ করিয়া কয়েক মাস পরে রূপ বৃন্দাবনে গিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন।

ইহার পর সনাতন প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের জন্য নীলাচলে আসেন। তিনি ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়া আসিয়াছেন। সেখানকার দূষিত জল পান করিয়া তাঁহার দেহে দুরারোগ্য চর্ম্মরোগ দেখা যায়। তাই তিনিও হরিদাসের কুটিরে আছেন। প্রভু প্রতিদিন মন্দির হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাকে ও হরিদাসকে দেখিতে আসেন। পরমানন্দে পরমভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন না করিলে প্রভুর তৃপ্তি হয় না। চর্ম্মরোগের ক্লেদ ও পুঁজ রোজই প্রভুর গায়ে লাগে। প্রভু তজ্জন্য কোন ভাবনা করেন না। কিন্তু সনাতন ইহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিলে

সনাতন শুধু পিছু হঠেন। বলিতে থাকেন, "প্রভু আমায় স্পর্শ করিবেন না। দুরারোগ্য চর্ম্মরোগ। আপনার দেবদুর্ল্লভ দেহে যে এর ক্লেদ লাগে ইহা আমার সহ্য হয় না।" কিন্তু প্রভুকে নিরস্ত করে কাহার সাধ্য? প্রভু হাসিমুখে উত্তর দেন, "সনাতন! তুমি পরম বৈষ্ণব। নিজে পবিত্র হইবার জন্য আমি তোমার দেহ স্পর্শ করি।" সনাতনের মনে ইহাতে এক সমস্যা উপস্থিত হইল। সারাদেহে চর্ম্মরোগের ক্লেদ। তবুও প্রভু তাঁহাকে নীলাচল ছাড়িয়া যাইতে দিবেন না। আবার আলিঙ্গন ও রোজ করা চাই। ফলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ রোজ ক্লেদাক্ত হয়। ইহা বড়ই দুঃসহ। সনাতন মনে মনে স্থির করিলেন, সম্মুখে রথযাত্রা। রথের চাকার তলে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন। কিন্তু প্রভু যে সর্ব্বজ্ঞ। ভক্ত সনাতনের এই গোপন অভিসন্ধি প্রভুর অজ্ঞাত রহিল না। তিনি সনাতনকে বলিলেন, "দেহনাশ করিলে, কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না। কৃষ্ণ লাভ হয়, ভক্তি আর প্রেমে। তা ছাড়া, তুমি ভুলে যাচ্ছ, এ দেহ তোমার নহে। যেদিন থেকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছ সেদিন থেকে এ দেহ আমার। আত্মহত্যা মহাপাপ। এ চিন্তা ত্যাগ কর।"

সনাতন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আত্মহত্যা করিবার বাসনা প্রভু জানিতে পারিয়াছেন। প্রভুকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা বৃথা। সনাতন কি করিবেন, ভাবিতেছেন। কেমন করিয়া প্রভুকে তাঁহার ক্লেদাক্ত শরীরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলিবেন, চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। বিস্ময়ের সহিত তিনি দেখিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই প্রভুর কৃপায় সনাতনের চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়াছে এবং তাঁহার দেহে দিব্য আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তৎপর প্রায় একবৎসরকাল সনাতনকে নিজের কাছে রাখিয়া প্রেম সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশ দিয়া প্রভু তাঁহাকে ও বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন "তুমিও রূপ ব্রজমণ্ডলে থাকিয়া লুপ্ত তীর্থগুলি উদ্ধার কর। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের

লীলাস্মৃতিকে লোক সমক্ষে প্রকট কর। বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি তোমাদের চেষ্টায় পুনঃ সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠুক।"

রূপ সনাতন ও তাঁহাদের উত্তর সাধকগণ এ দুঃসাধ্য আদেশ পালনে সফলকাম হন। কন্থাকরঙ্গধারী এই কাঙ্গাল বৈষ্ণবদ্বয় লক্ষ লক্ষ মানবকে প্রেমধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। লোকনাথ ও ভূগর্ভ পণ্ডিত অনেক পূর্ব্ব হইতেই প্রভুর নির্দ্দেশে বৃন্দাবনে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়করূপে প্রভুর দুই প্রধান পার্ষদ, রূপ ও সনাতন তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। পরে রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি শক্তিমান সাধকদের ও পাঠাইয়া তিনি বৃন্দাবনে এক বিরাট কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন।

অপর এক বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র তিনি গৌড়দেশে প্রতিষ্ঠা করিলেন। অভিন্নহৃদয় নিত্যানন্দকে তিনি এখানকার কর্ম্মভার অর্পন করেন এবং অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস, মুরারী, নরহরি, রাঘব পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি পরম ভক্তবৃন্দ তাঁহার সাহায্যার্থে তথায় প্রেরিত হন।

লৌকিক ও অলৌকিক এই দুই প্রকার লীলা প্রভু নীলাচলে প্রকাশ করেন। গৌড় বা ব্রজমণ্ডলে (বৃন্দাবনে) প্রভু নিজে যান নাই বটে, কিন্তু সেখানে থাকিয়াই বহুভক্তবৃন্দ তাঁহার অলৌকিক দর্শন পাইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেন। কখনও নিজ জননী শচীদেবীর ঠাকুর ঘরে, কখন ও বা নিত্যানন্দের কীর্ত্তন-সভায় সূক্ষ্মদেহে প্রভুকে দেখা যাইত। শ্রীবাসের অঙ্গনে ও পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে ও প্রভুর আকস্মিক আবির্ভাব দৃষ্ট হইত। ব্রজমণ্ডলে তপস্যারত গোস্বামীদের জীবনেও প্রভুর অলৌকিক দর্শন মাঝে মাঝে ঘটিত।

রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়িয় ভক্তেরা প্রতিবৎসর নীলাচলে আসেন। প্রভুর নিবির সান্নিধ্যে কয়েক মাস আনন্দে অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া যান। নীলাচলের মন্দির ও বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া

উৎসব প্রতিদিনই লাগিয়া আছে। নানারূপে, নানাভাবে, নানারসে তাঁহারা প্রভুর মোহনমূর্ত্তি দেখিতে পান ও আত্মহারা হইয়া পড়েন।

কৃষ্ণ কথা ও কৃষ্ণপ্রেমাবেশে প্রভু সর্ব্বদা বিভোর থাকেন। পুরীর এক প্রান্তে টোটা গোপীনাথের মন্দির। ইহা প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধরের ভজন স্থান। এই প্রেমিক ভক্তের সেবানিষ্ঠার ফলে গোপীনাথ সেখানে জাগ্রত হইয়াছেন। গদাধরের ভাগবৎপাঠ ও বড়ই মধুর। ভক্তদলসহ প্রতিদিন প্রভু সেখানে উপস্থিত হন এবং কৃষ্ণকথার রসস্রোতেই সকলেই নিমগ্ন থাকেন। স্বরূপ, দামোদর, রামানন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা সেখানে সাগ্রহে সমবেত হন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মধুর ভজনের ও রাগানুগ নামকীর্ত্তনের আদর্শ প্রচার করেন। এই প্রচার তিনি স্বীয় জীবনলীলার মাধ্যমে দেখাইয়া যান। স্বল্পকয়টী শ্লোক রচনা করা ব্যতীত তিনি কোন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। সভা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে ও তিনি তেমন উৎসাহী ছিলেন না। এমন কি তিনি তাঁহার কোন ভক্তকে ও কোন মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই। তবুও সহস্র সহস্র মানব কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার স্পর্শ পাইয়া একেবারে নূতন মানুষে পরিণত হইয়াছেন।

প্রভুর মতে জীব ভগবানের নিত্যদাস। ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের ভিতর দিয়া মানব ভগবানের স্বরূপ ও মাধুরীর আস্বাদন পাইতে পারে। নামকীর্ত্তন, বিগ্রহ-সেবা এবং সদাসর্ব্বদা ব্রজধামের রাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণ ও মনন হইল প্রকৃত সাধনা। এই সাধনার মধ্য দিয়া মানব ভগবানের সান্নিধ্য পাইতে পারে এবং ইহাই প্রভুর নবপ্রচারিত মধুর ভজনের ভিত্তি।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির ধর্ম্ম জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে

এবং সকল স্তরের জনমানবকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছে।
প্রভু বলেন ঃ—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত, হীন ছাড়,
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুল বিচার।

তিনি দীপ্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন

কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র ন্যাসী কেনে নয়,
যেই কৃষ্ণবেত্তা সেই গুরু হয়॥

কৃষ্ণ প্রেম লাভের সহজপন্থা চৈতন্য নিজেই বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোবির সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

গৌড়দেশের বারলক্ষ টাকা আয়ের জমীদার রঘুনাথ দাস ও নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং দৈন্যের চরম নিদর্শন প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া মাধুকরীতে বাহির হইতে কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা করিতেন না। তাঁহার এই তীব্র বৈরাগ্য ও অভিমানশূন্যতার ভাব দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

নাম মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রচারক প্রভুর পরম পার্ষদ হরিদাস এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি এখন জনসঙ্ঘ হইতে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখেন। তাঁহার একান্ত বাসনা হইল প্রভুর লীলা সাঙ্গ হবার পূর্ব্বেই যেন তাঁহার ও জীবনের অবসান হয়। প্রভু ইহা শুনিয়া বলিলেন—“হরিদাস! তাহাই হইবে। কৃষ্ণ আমার বড়ই কৃপাময়! তিনি তোমার মত মহাভক্তের মনোবাসনা নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন।”

তৎপর দিনই হরিদাস প্রভুকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার চরণযুগল

বক্ষে ধারন করতঃ নিত্যলীলা সম্বরণ করিলেন। সেই হইতে বৈষ্ণবেরা বলেন।

মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে,
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।

প্রভুর লীলার শেষ পর্য্যায় আসিয়া পড়িয়াছে। এখন তিনি গম্ভীরা গৃহে রাধাভাবে প্রভাবিত হইয়া কালাতিপাত করেন। কখনও বিরহ বেদনায় তিনি কাতর হইয়া পড়েন। কখনও তিনি মিলনের আনন্দে আত্মহারা হন। কখনও তিনি মধুর কান্তাপ্রেমে ভরপুর। এইভাবে এই গম্ভীরা লীলায় তিনি বারবৎসর কালাতিপাত করেন। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর ভাষায় :—

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান,
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরিমাণ,
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে তৈছে, কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই একই স্বরূপ,
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।

রাধা কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপিনী। এই রাধাকে চৈতন্য প্রভু সাধ্যসার রূপে মনন করিলেন। এবং লোকচক্ষে সেইভাব উন্মোচন করিলেন। ভারতের অন্যান্য বৈষ্ণব সমাজে এই রাধাতত্ত্ব এমন করিয়া আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। শ্রী, নিম্বার্ক, বল্লভী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে কৃষ্ণের সহিত রাধা বিরাজ করেন। কিন্তু কৃষ্ণশক্তি শ্রীরাধিকার প্রাধান্য তেমন দেখা যায় না। কান্তাশিরোমণি রাধাপ্রেম ব্যতীত ও সেখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভক্তিভাবের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের রাধাপ্রেম বা মাধুরী উপাসনা ও লীলাবাদের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন। মদন-মোহনমোহিনী শ্রীরাধাকে তিনি লীলাময়ী-

রূপে, সাধ্যসাররূপে জনসমাজে তাঁহার স্বকীয় আচরণের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রভু এই প্রকার দিব্যোন্মাদের অবস্থায় আজকাল সর্ব্বদা আত্মসমাহিত থাকেন।

এই কারণে তাঁহার অন্তরঙ্গপার্ষদেরা সবসময় প্রভুকে নিয়া চিন্তিত থাকেন। স্বরূপ, দামোদর ও রামানন্দ রায় প্রভৃতি প্রভুর বিলাপ ও রোদন শুনিয়া প্রায়সময়েই সান্ত্বনা দান করেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদ্যাপতি আর গীতগোবিন্দের মধুর শ্লোক ও সঙ্গীত অহরহ তাঁহারা প্রভুকে শুনাইতেছেন। এইভাবে প্রভুর দিন কাটিতেছে।

একদিন নিশীথে প্রভু শয্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া স্বরূপ ও প্রভুর সেবক গোবিন্দ কুঠিরের বাহিরে শয়ন করিয়া প্রভুকে পাহারা দিতেছেন। ভিতর হইতে প্রভুর সুকণ্ঠে নামকীর্ত্তন শোনা যাইতেছে। হঠাৎ নামকীর্ত্তন বন্ধ হইল। ইহাতে স্বরূপ ও গোবিন্দের সন্দেহ হইল। তাঁহারা ঘরের ভিতরে প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া তখনই তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন মন্দিরের সিংহদ্বারে ভাবাবেশে প্রভু অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কর্ণে কৃষ্ণ নাম শুনাইতেই তিনি ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহার ভাব স্বাভাবিক হইল। সুস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

আর একদিন পূর্ণিমা নিশির নিস্তব্ধতায় প্রভু আইটোটার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত একাকী পদক্রমা করিতেছেন। দূর হইতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত নীল সমুদ্র দেখিয়া তিনি আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল শারদ পূর্ণিমার রাতে যমুনা চন্দ্রকিরণে প্রাণপ্রভু শ্যামসুন্দরের বাঁশীর রব শুনিয়া ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে এবং উচ্ছ্বাসে উজান বহিতেছে। তিনি উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপ দিলেন। স্রোতের টানে ও

তরঙ্গাবাতে তিনি ক্রমশঃ কোনার্কের দিকে ভাসিয়া চলিলেন এবং কিছুদূরে এক ধীবরের জালে আটকাইয়া গেলেন। ধীবর প্রভুর স্পর্শ পাইয়া পাগলের মত হাসিতেছে, নাচিতেছে এবং কখনও কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। মুখে অনবরত কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইতেছে। স্বরূপ, দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তালাস করিতে করিতে সাগর সৈকতে এই ধীবরের দেখা পাইলেন। তাহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন— ইহা প্রভুরই লীলা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, প্রভু সাগর তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তাহারই জালে জড়াইয়া পড়েন, জাল হইতে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় প্রভুকে সে উঠাইয়াছে। প্রভু বাঁচিয়া আছেন জানিয়া তাহারা প্রাণ পাইল। কিন্তু মহাভাবময় জীবনের অমৃতমন্থনপর্ব্ব ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে আসিয়া পড়িল।

১৪৫৪ শকাব্দ (১৬৩৪ ইং) আষাঢ় মাস। বেলা তৃতীয় প্রহর। প্রভু এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দেবের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ এই সময়ে অন্তর্গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চিরতরে অন্তর্হিত হইলেন।

বহু অনুসন্ধানের পরও প্রভুর নরদেহের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। লক্ষ লক্ষ ভক্তের ব্যাকুল অনুসন্ধান, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের আপ্রাণ প্রয়াস সব ব্যর্থ হইল। এ রহস্যময় অন্তর্দ্ধান চির দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিল।

প্রাকৃত লীলার অবসান হইল। কিন্তু প্রভুর অপ্রাকৃত লীলা চিরন্তন, শাশ্বত হইয়া রহিল। সাধক কবি তাই সত্য উপলব্ধি করিয়া জয়গান গাহিয়াছেন,

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়,
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।

৯। মীরাবাঈ।

(১৫৩২ খৃষ্টাব্দ।)

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। যোধপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাঠোর বংশীয় রাণা রাও যুধাজীর পৌত্র ছিলেন রতনসিংহ। পরম বৈষ্ণব ও ধার্ম্মিক রতনসিংহের পরোপকার করাই ছিল জীবনের ব্রত। অতিথি, অভ্যাগত, বিশেষতঃ সাধু-মহন্তদের জন্ম তাঁর গৃহদ্বার চিরউন্মুক্ত ছিল। তাঁর পিতা ছদাজীর চতুর্ভুজ গিরিধারীলালের মন্দির প্রাঙ্গণ ছিল ভক্তদের গানে চির-মুখরিত। এমনই পরিবেশে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে (কেহ কেহ বলেন ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ) মেড়তার অন্তর্গত কুড্‌কী গ্রামে রতন সিংহের স্ত্রী যে অপরূপ রত্ন প্রসব করেন, তিনিই উত্তরকালের বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা রাজকন্যা রাজপুত মহিলা ভারতখ্যাতা সন্ন্যাসিনী মীরাবাঈ।

অপরূপ রূপলাবণ্যের সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও মধুর কণ্ঠস্বর শৈশবে সবাইকে আকৃষ্ট করে। শৈশবেই তিনি মায়ের কোলে বসিয়া ভক্তদের গান শুনিতেন এবং অত্যন্ত মধুরভাবে তাহা আবৃত্তি করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। ঠাকুরদাদা ছদাজীর পূজার পুষ্পচয়ন করাই ছিল তাঁর নিত্যকার কাজ। সখীদের সঙ্গে খেলা করিতে গিয়া বা ফুল তুলিতে গিয়া বাগানে তিনি মাটির শ্রীকৃষ্ণ বানাইতেন ও মনোরমভাবে সাজাইয়া নানাভঙ্গীতে তাঁর চতুর্দ্দিকে নাচিয়া গাহিয়া আনন্দ করিতেন। আর দর্শকের হইত বেজায় ভীড়। সময়ের দিকে খেয়াল থাকিত না। পূজার আয়োজনে বিলম্ব দেখিয়া মা হয়তো আসিয়া দেখেন—মীরা গাইছেন

"হম্‌রো প্রণাম বাঁকে বিহারীকো"……।

একদিন এক বিবাহের উৎসব দেখিয়া মীরা 'মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বর কে মা?" মা হাসিয়া উত্তর দিলেন,

"তোমার বর? সে যে আমাদের গৃহদেবতা গিরিধারীলালজী।"
উত্তর শুনিয়া মীরা আনন্দে আত্মহারা হন ও গাহিয়া উঠেন—

"মেরেতো গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ।

কে জানিত সেই শিশুমন তখন হইতেই নিবিড়ভাবে এই গিরিধারী-লালকে এত আপন করিয়া নিয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী আধ্যাত্মিক জীবনের সুত্রপাত এইভাবেই আরম্ভ হয়।

কুড্‌কীতে একবার এক শিলামূর্ত্তি হাতে এক সাধু আসেন। তাঁহাদের বাড়ীর গিরিধারীলালজীর সঙ্গে সেই মূর্ত্তিটীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল। মীরা তাহা দেখিয়া বায়না ধরিল এই মূর্ত্তিটী তাহার চাই-ই। সাধুজী কিছুতেই সম্মত হন না। বলেন—ইহা তাঁহার নিত্যপূজার ঠাকুর। রাত্রিতে সাধু স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং অবশেষে সাধু মূর্ত্তিটি মীরাকে দিয়া দেন। সেই হইতে সেই শিলামূর্ত্তিটির নিত্যপূজা অর্চ্চনার দায়িত্বভার শিশু মীরা নিজ হস্তে নেন। ক্রমে তাঁহার খেলাধূলা ও সর্ব্বক্ষণের সাথী হইয়া দাঁড়াইল সেই শিলামূর্ত্তি।

সঙ্গীতানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে শৈশবেই তাঁর অনন্যসাধারন কাব্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি অল্প বয়সেই তিনি অপূর্ব্ব ভজন রচনা করিয়া তাহা নাচে গানে রূপ দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী হইয়া উঠেন। ইনি বাহিরে যেরূপ অনুপম রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, অন্তরেও সেইরূপ নানাগুণভূষণে ভূষিতা ছিলেন। মীরার রূপগুণের খ্যাতি ক্রমশঃ সারা রাজস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। মীরার খ্যাতি শুনিয়া চিতোরের মহারাণা "সঙ্গ" মেওয়ারপতি ভোজরাজকুমার কুম্ভের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। পিতা রতনসিং সানন্দে সম্মত হন। শুভলগ্নের পূর্ব্বে সখীরা বস্ত্রালঙ্কারে মীরাকে সাজাইয়া আনন্দে নাচিতে থাকিলে, মীরার কণ্ঠে শোনা যায়—

মৈ গিরিধরকে ঘর জাঁউ……।

স্বামীগৃহে যাওয়ার সময় অঞ্চলে করিয়া সেই শীলামূর্ত্তিখানি মীরা সঙ্গে নেন। শ্বশুরালয়ে মীরা অতুল বিভবের অধিকারিণী হইলেন। কিন্তু ঐহিক ঐশ্বর্য্যের চমক তাঁহার মন মোহিত করিতে পারিল না। রাজরাণী হইয়াও মীরা সন্ন্যাসিণীর ন্যায় অতি সামান্যভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কারণ বাল্যকাল হইতেই তিনি বিষ্ণুকে হৃদয়াসনে বসাইয়া সর্ব্বদা দৈন্যভাবে তাঁহার আরাধনা করিতে শিখিয়াছিলেন। শীলামূর্ত্তির সঙ্গে মীরার আলাপ প্রলাপকে রাজ অন্তঃপুরের সকলে তাঁহার বালসুলভ-চপলতা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তাঁর ভক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ মহারাণা মা ভবানীর পূজারী হইয়াও তাঁহাকে গিরিধারীলালের মন্দির গড়িয়া দিলেন। মীরা সেই মন্দিরে বসিয়া গান রচনা করিতেন, আর প্রাণের ঠাকুরকে প্রাণ ভরিয়া গাহিয়া শুনাইতেন। আড়াল হইতে স্বামী, শ্বাশুড়ী, ননদ ভাবে আবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। মীরার ভক্তি-মিশ্রিত গানের টানে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে ক্রমশঃ বহু ভক্ত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল।

মীরা গাহিতেন—

"ভজলেরে মন গোপাল গুণা।"

এমনি করিয়া দিন যায়, বৎসরও অতিবাহিত হয়। প্রায় দশ বৎসর পর মীরার স্বামী কুমার কুম্ভ দেহ রক্ষা করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মীরা বিধবার বেশ ধারণ করেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন গিরিধারীলালজীই তাঁর স্বামী। কিছুকাল পরে পবিত্র কাশীধামে শ্রীপাদ সন্তরৈদাসের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং আরও নিবিড়ভাবে ভজন পূজনে আত্মনিয়োগ করেন। কখনও বা সাধুসন্তদের লইয়া নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইতেন। নাম রস পান করিয়া তিনি কতই না আনন্দে গাহিতেন

"পায়োজী মেহ্‌তো নাম রতন ধন পায়ো"

মেওয়ারের রাজবংশ শক্তি উপাসক অথচ মেওয়ারের রাণী বৈষ্ণবী। মীরার দেবর মহারাণা বিক্রমজিৎ রাজকুলবধূ মীরার এই আচরণ পছন্দ করিলেন না। তিনি রাজভগিনী উদাবাঈকে দিয়া মীরাকে এই প্রকার সাধুসঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। গীতচ্ছলে মীরা উদাবাঈকে বলেন—

"বলো মৈ বৈরাগন হুঁগী...।"

তথাপি ঘোরতর আপত্তি উঠিল। মীরার এই বৈষ্ণবীয় আচরণ অনেকেরই অসহণীয় হইল। এই বিষয় লইয়া ক্রমে নানা আলোচনা ও বহু আন্দোলন চলিল। রাজমাতা পুত্রবধূকে বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করিয়া শক্তিপূজা গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু মীরা প্রাণান্তেও তাহা ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না।

অবশেষে মীরাবাঈ বিষ্ণুপূজা অথবা রাজপ্রাসাদ এতদুভয়ের মধ্যে একটা পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলে মীরাবাঈ ধর্ম্মার্থে সর্ব্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য্য অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাজরাণী দীনা ভিখারিণী বেশে রাজপ্রাসাদ হইতে বিনির্গত হইলেন। অতঃপর স্বামী প্রদত্ত অর্থে ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করিয়া ইনি অনাথ-দীনহীনের আশ্রয়স্থল হইয়া পরোপকারে তাঁহার নশ্বর জীবন উৎসর্গ করিলেন।

কিন্তু ইহাতেও মীরার দুর্গতি কমিল না। মীরাকে তাঁহার বিষ্ণুভক্তি হইতে বিরত করিতে ও সমুচিত শিক্ষা দিতে মীরার দেবর মহারাণা বিক্রমজিৎ চম্পা ও চামেলী নামে দুইজন দাসী নিযুক্ত করিলেন। পরশপাথরের স্পর্শে লোহাও সোনা হইয়া যায়। রাণা সাপের ঝুড়ী, বিষের বাটী, কাঁটার বিছানা পাঠাইয়া দিলেন যাহাদের হাতে, মীরার অকৃত্রিম ভক্তি ও কৃষ্ণনিষ্ঠা দেখিয়া সেই চম্পা ও চামেলী দাসীদ্বয় তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া উঠে।

স্নান আহ্নিক সারিয়া এক সন্ধ্যায় যথারীতি পূজা করিতে বসিয়া ভাবাবিষ্ট মীরা পূজার আয়োজনের পাশে সজ্জিত ঝুড়িতে হাত

দিয়া দেখিতে পাইলেন, শালগ্রামশিলা। ভাবিলেন, কোন ভক্ত পাঠাইয়াছেন। তাই যত্ন সহকারে তাহা গিরিধারীলালজীর সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিলেন। চম্পা চামেলী জানিত যে উহা শালগ্রাম নহে, বিষধর সর্প। তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু মীরার পুণ্যপূত স্পর্শে বিষধর সর্পও অহিংস এবং নিষ্ক্রিয় হইল।

আর একবার বিষের বাটিতে হাত দিয়া মীরা ভাবেন চরণামৃত। তাই তাহা মাথায় ছোঁয়াইয়া পান করেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভীষণ হলাহল অমৃত হইল। চম্পা ও চামেলী আর স্থির থাকিতে পারিল না। মীরার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। মীরা গান ধরিলেন—

"মীরা মগন ভঙ্গী হরিকে গুণ গায়।"

সেই হইতে চম্পা ও চামেলী মীরার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল।

ভজন পূজনেই মীরার সারা রাত্রি অতিবাহিত হয়। ধ্যানস্থা অবস্থায় ৺ঠাকুরের সান্নিধ্য পাইয়া গাহিতে থাকেন—

"হোড়মত জাজ্যোজী মহারাজ....।"

এই গান শুনিয়া কুচক্রীরা রাণাকে জানায়, মীরা নিজের ঘরে অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলে, নাচে ও গান করে। বিশ্বাস না হয় এখনই গিয়া পরীক্ষা করুন। ক্রোধান্ধ রাণা দরজার আড়াল হইতে সত্যই শুনিতে পাইলেন মীরা গান করিতেছেন। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহাকে গান শোনাচ্ছিলে? কথা বলছিলে কার সঙ্গে? সত্য করিয়া বল, নইলে তোমাকে হত্যা করা হবে।" ভাবাবিষ্ট মীরা দেখাইয়া দেন, তাঁর শিলামূর্ত্তি নারায়ন। রাণার তাহা বিশ্বাস হইল না। তিনি ঘরে ঢুকিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। কোথায়ও কাহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন

এবং মীরাকে অবিলম্বে রাজ্যত্যাগের আদেশ দিলেন। ইহা শুনিয়া মীরা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। চম্পা, চামেলী ও উদাবাঈ এর যত্নে একটু সুস্থা হইলে তিনি রাজ্যত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভক্তরা শুনিয়া দলে দলে আসিয়া মীরার পথরোধ করিল। উদাবাঈ উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণার আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইতে বলেন। ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত রাণা রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় মীরার কাছে ক্ষমা চাহিলেন ও আদেশ প্রত্যাহার করিলেন।

কিন্তু মীরা আজ মুক্ত। তিনি চলিয়াছেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। তাই কোন বাধা বিঘ্ন ও কাকুতি মিনতি তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। তিনি রাণার অপরাধ ভুলিয়া গিয়া সকলের নিকট ক্ষমা চাহিয়া রাজরাণী হইয়াও ভিখারিণীর বেশে বিদায় নিলেন ও গাইলেন—

"তেরো কোঈ নেহি রোকন হরি"

ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা মীরার সঙ্গ নিয়াছিলেন, কেহ কেহ ফিরিয়া গেলেন, কেহ কেহ চলিলেন মীরার সঙ্গী হইয়া। গন্তব্য স্থান বা পথের সন্ধান কাহারও জানা নাই। তাই তিনি নিজ মনকে শুধান

"চলো মন গঙ্গা যমুনাকী তীর"......।

পথশ্রমে অনভ্যস্ত রাজকুলবধূ মীরা শ্রান্ত হইয়া একদিন অজ্ঞান অবস্থায় বনবিথীকার পাশে পড়িয়া যান। এক রাখাল বালক সেবা যত্ন করিয়া তাঁহাকে সুস্থা করেন ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোথা যাবে তুমি"? তিনি উত্তর দিলেন, "বৃন্দাবন, কিন্তু পথ যে আমি জানি না।" রাখাল বালক হাসিয়া উত্তর দিল, "চল, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব"। তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু কোথায় সে রাখাল বালক? মীরার চমক ভাঙ্গিল। আকুল হইয়া গাহিয়া উঠিলেন,

"তুমরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা".........।

মহাপণ্ডিত, ভক্তপ্রধান শ্রীযুৎ দিলীপ রায়ের "ভিখারিণী রাজকন্যা" নামক পুস্তকে পাই, বৃন্দাবনে আসিয়া মীরা গুরু সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। উত্তর পাইলেন, গুরুদেব ব্রত নিয়াছেন। প্রকৃতির সঙ্গে দেখা করেন না। মীরা দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"অসম্ভব, গুরুদেব জ্ঞান চূড়ামণি, ভক্তশ্রেষ্ঠ ও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য। তিনি এমন অসম্ভব ব্রত নিতেই পারেন না।"

মীরা গাহিলেন :—

"বঁধু, রাখিয়া ছলনা, মীরারে বলোনা, আলো করি' কালোরাতি,
ব্রজে, পুরুষ কি পারে, বাসর বিহারে, হ'তে তব লীলা সাথী ?
তারা, আজো জানে না কি, গোকুলে একাকী তুমি শ্যাম, তারা রাধা
কোন্ হিয়া হায়, পেয়েছে তোমায় হ'তে যে না চায় রাধা ?"

শ্রীপাদ সনাতনের ভুল ভাঙ্গিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, মীরা পুণ্যশীলা রাজকন্যা। মীরা তাঁহার চরণে পড়িয়া উত্তর দিলেন, "না গুরুদেব! আমি ভিখারিণী রাজকন্যা।"

আবার দেখি শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার লিখিয়াছেন—মীরার আগমনে বৃন্দাবনে আনন্দ আর ধরে না। পথেঘাটে সর্বত্র সকলে ভীড় করিয়া ভক্তিমতী মীরার ভজন শুনেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তখন বৃন্দাবনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধু। মীরা তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। শিষ্যগণ জানাইলেন, তিনি স্ত্রীমুখ দর্শন করেন না। মীরা লিখিয়া পাঠাইলেন, ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি। গোস্বামীজীর এ জ্ঞান না থাকিলে, তাঁর পক্ষে ব্রজধাম ত্যাগ করা উচিৎ। চিঠি পাইয়া গোস্বামীজীর ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি নিজে গিয়া মীরাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। মীরা উপদেশ ছলে গাহিলেন,

"সাধন কর্না চাহীয়ে মন্থয়া, ভজন কর্না চাহী
........বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা।"

কত দেশে কত উৎসব দেখিলেন। কত কৃষ্ণকথা, কত কৃষ্ণগান শুনিলেন, কিন্তু মীরার প্রাণের পিপাসা মিটিল না। বরং প্রাণের ব্যথা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে তাঁহারই অন্তরের আকুল বিরহব্যথা বাড়িয়া চলিল।

বৃন্দাবনে আজ হোলী উৎসব। ব্রজগোপীরা নাচিতেছে, গাহিতেছে। আবীর কুঙ্কুমে ভরাইয়া দিল মন্দির প্রাঙ্গণ। মীরা তাহা দেখিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রাত্রি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। গোপীরাও একে একে সকলেই চলিয়া গেল। ধ্যান ভাঙ্গিবার পর তিনি ৺ঠাকুরের কপালে তিলক পড়াইয়া দিলেন। তারপর ৺ঠাকুরের চরণ হইতে ফাগ তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া গাহিতে লাগিলেন—

'হরি তুম্ হরো জন্‌কী ভীড়্'……

তৎপর ভারতে বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, নানাতীর্থে ধর্ম্মশালা, স্নানঘাট ও সদাব্রত খুলিয়া বৃদ্ধবয়সে মীরা দ্বারকায় চলিলেন। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, দেহ বার্দ্ধক্যগ্রস্ত। তবুও তাঁর পথ চলার বিরাম নাই। কত নদনদী, গিরি প্রান্তর পার হইয়া মীরা চলিয়াছেন দ্বারকার পথে। প্রকৃতি যেন এইবার রমনীয় সাজে তাঁর পথশ্রম ভুলাইয়া দিতে ব্যস্ত। বিভিন্ন ঋতুতে নানারঙ্গের নানা ফুল সান্ধ্যতারকার হাতছানিতে ও সুগন্ধে দশদিক ভরাইয়া দিতেছে। ফুলের গন্ধে ও মাতাল হাওয়ায় ভাসিয়া আসে ভ্রমরের দল। নানাবর্ণের প্রজাপতি প্রভাতের আলোয় অপরূপ পাখা বিস্তার করিয়া এ ফুল সে ফুল ঘুরিতেছে, যেন মীরার প্রাণের ঠাকুরকে খুঁজিতেছে আর মীরার কাণে গুণ গুণ করিয়া কি যেন বলিতেছে।

প্রখর রৌদ্রের তাপে ক্লান্ত মীরা গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করেন। কত সুন্দর সুন্দর হরিণশিশু তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। যেন বলে, তোমার দর্শন পাইয়া আমরা ধন্য। তোমার ঠাকুরকে আমাদের প্রণাম জানাইও। মীরার অত্যন্ত

ভাল লাগে। পথশ্রমের গ্লানি ভুলিয়া যান। অজ্ঞাতে তাঁহার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসে। একটু দরদ, এতটুকু সহানুভূতি কতই না আনন্দ দেয় মানুষের প্রাণে।

আকাশে ঘনঘটা। এখনই হয়ত বৃষ্টি নামিবে। বনের ময়ূর উড়িয়া আসে। পাখা মেলিয়া দেয় আস্তে আস্তে মীরার উপর। নহিলে মীরার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া পড়িবে। এমনই করিয়া তিনি একদিন দ্বারকায় পৌঁছান, ও প্রাণের ঠাকুরকে গাহিয়া শোনান।

"দরশ বিন দুখন লাগে নৈন......"

চিতোর তখন শত্রুর হাতে বিধ্বস্ত হইতে চলিয়াছে। রাজগুরু, পুরোহিত সকলেই রাণাকে বলিলেন, মেবারের কুললক্ষ্মী পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে যতদিন ফিরাইয়া না আনেন, ততদিন রাজ্যের মঙ্গল নাই। রাণার আদেশে চারিদিকে লোক ছুটিল মীরার অন্বেষণে। অবশেষে দ্বারকায় আসিয়া সন্ধান মিলিল। তাহারা নিবেদন করিল—"মহারাণী। চিতোরের আজ বড়ই দুর্দ্দিন। রাজকুললক্ষ্মী ফিরিয়া চলুন, স্বআবাসে। চিতোরের অশান্তির কথা শুনিয়া ব্যথিত চিত্তে তিনি বলিলেন, "ঠাকুরের আদেশ পাইলেই তিনি তাহাদের সঙ্গে যাইবেন।" রন্‌ছোড়জীর মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া মীরা গাহিতে লাগিলেন।

"প্রভুজী মৈ অরজ করু হুঁ
মেরো বেড়ো ল্যাজ্যো পার......"

ভক্তের ব্যাকুলতায় ভগবানের আসন টলিল। ভাবাবেগে মীরা স্পষ্ট দেখিলেন, মন্দিরের ভিতর হইতে প্রাণের ঠাকুর তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছেন। গম্ভীর আবেগে মীরা গাহিয়া উঠিলেন—

"জোগী, মত্‌ জা, মত্‌ জা, মত্‌ জা......"

গান থামিয়া গেল। ভক্ত ও ভগবান দ্বারকার রণছোড়জীর মন্দিরে এক হইয়া মিশিয়া গেল। অভিভূত ভক্তগণ দেখিতে পাইলেন, বালকৃষ্ণের সহাস্যবদন। তাঁহারা দশদিক মুখরিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"বোলো। ভক্ত আর ভগবানকী জয়।"

এই ভাবে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দ্বারকায় বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণা সন্ন্যাসিনী মীরা কৃষ্ণগতপ্রাণা হইয়া নশ্বর জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মীরার স্মৃতি তাঁহার ভজন ও গানে অমর হইয়া রহিল।



১০। ভক্ত দাদু।

(১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ।)

আম্মেদাবাদে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে "লোদী" নামক জনৈক দরিদ্র মুসলমান "ধুনকর" বাস করিত। তাঁহার স্ত্রীর নাম বসীবাঈ। এই দীন ধুনকরের গৃহে পিতা লোদীর ওরসে ও মাতা বসীবাঈ এর গর্ভে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে ভক্ত দাদুর জন্ম হয়। গরীব মুসলমান ধুনকরের পুত্র রূপে তাঁহার জন্ম হওয়ায় শিক্ষাদীক্ষার কোন সুযোগ তিনি পান নাই। চামার পল্লীর সহজাত গুণাবলীর উপর নির্ভর করিয়াই ভক্ত দাদু তাঁহার জীবনে অগ্রসর হন। তাঁহার বাল্যজীবনের তথ্য অত্যন্ত স্বল্প।

বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনে ও তাঁহার মধ্যে কোন অসাধারণত্ব দৃষ্ট হয় নাই। দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট সাধারণ গৃহস্থ জীবনই তিনি অনুসরণ করেন। তাঁহার স্ত্রী "হাওয়া" এবং চারিটা পুত্র কন্যা নিয়া তিনি সাধারণভাবে সংসারজীবন যাপন করেন। তাঁহার ব্যবসা ছিল চর্ম্মকারের। তিনি জলবহনের "মশক" সেলাই করিতেন এবং তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

একদা গ্রীষ্মকালের এক প্রখর অপরাহ্ণে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেই সময়ে সাধক "কমাল" ঝড় জল এড়াইবার জন্য চর্ম্মকার পল্লীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু বৃষ্টি আসিয়া পড়ায় অচেনা এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তখন সেই গৃহমধ্যে দরিদ্র মুচি মশক সেলাইয়ে ব্যস্ত। একমনে দাদু 'মশক' সেলাই করিতেছে। সাধক "কমাল" গৃহের মালিককে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। চর্ম্মকার দেখিল, তাঁহারই দুয়ারে এক সাধু ঝড় বাদলে আশ্রয় লইয়াছেন। তখন ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন ও সেলাম করিয়া বলিলেন, "এ ঘর চামারের বলিয়া

কি ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন না?" উত্তর হইল, "না বাবা। তাহা নহে। আমি যে দীনদয়াল হরির এক দীনদাস। আমার যে কোন অভিমান সাজে না। পাছে তোমার কাজের বাধা পড়ে ও মজুরী কমিয়া যায়, এই ভাবনায় ঘরে ঢুকি নাই।" অতঃপর বার বার অনুরোধে বাধ্য হইয়া সাধক "কমাল" ভিতরে গেলেন। গৃহস্বামী বসিবার জন্য তাহাকে একখানি চর্ম্মাসন দিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, এই চর্ম্মাসনে বসিয়া সাধক "কমাল" আকুল ভাবে কাঁদিতেছেন। হাত দুইটী অঞ্জলিবদ্ধ, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, ও নয়নে অশ্রু ঝড়িতেছে। চর্ম্মকার বড়ই ভয় পাইল। কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আমি ইচ্ছা করিয়া আপনাকে মনঃকষ্ট দেই নাই। আমার এই ক্ষুদ্রকুটিরে এই চর্ম্মাসন ব্যতীত বসিবার যে আর কিছুই নাই।"

প্রকৃতিস্থ হইয়া "সাধক কমাল" বলিলেন, "আমি দুঃখিত হই নাই। বরং তোমার ব্যবহারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। তোমার মধ্যে যে সরল সহজ আন্তরিকতা রহিয়াছে, তাহা যে আমাতে নাই। তোমার দুয়ারে ছাঁচতলায় দাঁড়াইতেই তুমি যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলে, সেইভাবে আমি যে কিছুই করিতে পারিতেছি না। তোমার মত এমন সহজ, সরল ও সার্থক অদ্যাপি আমি হইতে পারি নাই। আজিকার দিনে তোমার ঘরের দুয়ারে ছাঁচতলায় যেমনটী দাঁড়িয়েছিলাম, আমার প্রাণপ্রভু তেমনি করে রোজ এই জীবনের দ্বারদেশে অপেক্ষমান থাকেন, আর রোজই তিনি ব্যাথাতুর অন্তরে ফিরিয়া যান। যাহা কিছু সামান্য বস্তু আমার আছে তাহা এমন নম্র নিরভিমান হ'য়ে প্রাণপ্রভুর সম্মুখে আজও বিছিয়ে দিতে পারি নাই। অহঙ্কারের কত সূক্ষ্ম রশ্মি আমার জীবনে গ্রথিত আছে, এবং সেই কারণেই আমার প্রেমভিখারী আমারই প্রাণপ্রভু এমনই করিয়া বারবার ফিরে যান; ইহা মনে পড়ায় আমার অন্তরবেদনার অশ্রু ঝড়িতেছে।"

সরল, নিরক্ষর চর্ম্মকার এই হৃদয়বেদনা বুঝিতে পারিল না। তাই সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিলেন, "এই প্রভু কে ?" সাধক কমাল উত্তর করিলেন—"সবার যিনি প্রভু তিনিই আমার জীবনপ্রভু।"

চর্ম্মকার পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি তা'হলে আমারও প্রভু ? আমারই জীবন দুয়ারে তিনি কি এমনি করে অপেক্ষা করছেন ?" সাধক কমাল উত্তর দিলেন, "ঠিক তাই। তিনি ও তোমার দুয়ারে অপেক্ষা করছেন।"

বাহিরের ঝড় জল ততক্ষণে থামিয়াছে। কিন্তু সাধক কমালের বাণীতে চর্ম্মকারের অন্তঃস্থলের ঝড় জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার উদাস নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি ঐশীভাবে বিভোর হইয়াছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সাধক "কমাল" আশ্রয়দাতা মুচিকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় নিলেন। সেদিনকার এই আশীর্ব্বাদধন্য চর্ম্মকারই ভারতবিশ্রুত পরমভক্ত দাদু। ইনিই মধ্যযুগের অন্যতম মরমিয়া সাধক। সাধক কমাল লোকগুরু কবীরের পুত্র এবং তাঁহার সার্থকনামা শিষ্য।

সেইদিন হইতে এই দীন চর্ম্মকার দাদু সাধক কমালের ভক্ত হইয়া পড়েন। দাদু সবিনয়ে বলেন, "বাবা! প্রভুর কথা বলিয়া সেদিন তুমি আমায় পাগল করিয়া দিয়াছ। এখন বল, কোথায় গেলে আমি তাঁর সন্ধান পাবো।" সাধক কমাল আশ্বাস দেন যে, ভক্ত দাদুর প্রেম ও ব্যাকুলতা যেমন বাড়িতে থাকিবে, সাধনার পথও সুগম হইবে। তখন প্রভু নিজেই দর্শন দিবেন। তিনিই যে প্রভু, তিনিই যে গুরু। মরমিয়া সাধক কমালের স্পর্শে দাদু এক নতুন মানুষে পরিণত হইলেন। দাদুর বাণীতে দেখিতে পাওয়া যায়—

গৈব মাঁহি গুরুদেও মিলাপায়া হাম্ পরসাদ
মস্তক মেরা কর ধরা দক্ষ্যা হাম্ অগাধ।

সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া গুরু আমায় দর্শন দিলেন। আমি তাঁহার প্রসাদ পাইলাম। আমার শিরে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি পরম দীক্ষা লাভ করিলাম।

দাদূ এইবার বাহির হইয়া পড়িলেন। কাশী, বিহার এবং বাঙ্গলার নানাস্থানে পরিব্রাজকরূপে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের পর তিনি রাজপুতনার "সাম্ভরে" আসিয়া বসতি করেন। শিষ্যমণ্ডলী ও পরিবার পরিজনসহ তাঁহার অনেক পোষ্য ছিল। কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শ্রীভগবানই তাঁহার যাবতীয় ভরণ-পোষণ বহন করিতেছেন। তাঁহার বাণীতে আছে—

দাদূ রোজী রাম হৈ রাজিক রিজিক হামারা
দাদূ উস্ পরসাদ সোঁ পোষ্যা সব পরিবার।

অর্থাৎ, হে দাদূ, রামই আমার প্রতিদিনকার অন্ন। তিনিই আমার বৃত্তি। তিনিই আমার জীবিকা। তাঁহারই প্রসাদেই যে আমার সমস্ত পরিবারের ভরণ পোষণ চলে।

তিনি মন্দির মস্‌জিদের পার্থক্য করিতেন না। হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ তাঁহার ছিল না। সকল অবস্থায় সকল মানবের কল্যানের জন্য সত্যানুসরণের সহজ পথটি তিনি বাছিয়া লইলেন। সনাতনপন্থী হিন্দু সাধক ও মুসলমান উলেমারা অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করিতেন "দাদূ! তুমি কোন সম্প্রদায়ের"? উত্তরে দাদূ বলিতেন, "ভাই! চন্দ্র, সুর্য্য, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, জল ইহারাও সকলের সেবাকার্য্যে রত। ইহারা কোন্ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত কেহ কি বলিতে পার?"

দাদূ নৃত্যগীতময় সাধনভজনের এবং অন্তরের আকুলতা ও ভাবালুতার উপর প্রাধান্য দিতেন। একবার এক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শিল্পী, দাদূর কীর্ত্তনসভায় গান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গীতে তান

লয়ের প্রাধান্য অধিক ছিল। তিনি ডাকিয়া কালোয়াৎকে বলিলেন, "তান লয়ের দিকে মন না দিয়া, যেন আবেগভরে ভগবানকে ডাকেন।"

সেবার "নারায়ণা" গ্রামে সাড়ম্বরে হোলি উৎসব হইতেছে। প্রসিদ্ধ গায়ক "বখনা" বসন্তের গান গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতেছেন। ভক্ত দাদূ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "যদি প্রিয়তম প্রভুর সঙ্গে তোমার মিলন না ঘটে, এইসব গান ব্যর্থ। ইহাতে কালোয়াৎ "বখনার" জীবনে এক অপ্রত্যাশিত শুভলগ্ন উপস্থিত হইল। দাদূর প্রেমময় বাণী, অশ্রুসজল নয়ন এই সঙ্গীতশিল্পীর জীবনের ভিত্তি টলাইয়া দিল। 'বখনা' ঈশ্বরের নামসুধায় মত্ত হইলেন। দাদূর শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে তিনি পরিগণিত হইলেন।

পরবর্ত্তীকালে চৌদ্দ বৎসর দাদূ রাজপুতানার "আম্বের" গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এইসময়ে তাঁহার শিষ্য ও ভক্ত অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শিষ্য ও ভক্তদল নিজেদের গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে দাদূর আশ্রমে মিলিত হইত। এই মিলনকেন্দ্রটি ছিল, সকল শিষ্য ভক্তদের আশ্রয়স্থল। সকল আকর্ষণ, সকল অভিমান ত্যাগ পাইয়া দাদূ আপন প্রভুর মধ্যেও নিঃশেষে ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি বলিতেন—

জহাঁ রাম তহঁ মৈ নহী, মৈ তহু় নহী রাম।
দাদূ মহলবারিক হৈ দাও কি নহী ঠাও।

যেখানে আমার 'রাম' (ঈশ্বর) সেখানে 'আমিত্ব' নাই। 'আমিত্ব' যেখানে আছে সেখানে 'রাম' নাই।

দাদূ একদা এক চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উপলক্ষে আঁধী গ্রামে বাস করেন। তখন প্রবল 'খরা'। বহুঈপ্সিত বৃষ্টিপাতের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তখন সকলে ভক্ত দাদূর শরণাপন্ন হইলেন। কথিত আছে দাদূর আকুতিপূর্ণ প্রার্থনা সঙ্গীতে অবিলম্বে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

"টোঁক" অঞ্চলে এক মহোৎসবে খাদ্য দ্রব্য হঠাৎ কম পড়ে। উদ্যোক্তাগণ ভীত হইয়া ভক্ত দাদুর কাছে উপস্থিত হইলেন। দাদু-পন্থীদের মধ্যে ইহা প্রবাদ আছে যে, দাদু তাঁহার উপাস্যের ভোগ লাগাইবার পর ভোজ্যের ভাণ্ডার সেদিন অফুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দাদু নিজে বিভূতি বা 'সিদ্ধাই'এর পক্ষপাতী ছিলেন না। শুধু বিশেষক্ষেত্রে কৃপা করিয়া ইহা প্রকাশ করিতেন।

দাদু তখন "আম্বেরে" বাস করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে হিন্দুমুসলমান সাধকদের ভীড়। সম্রাট আকবর শুনিতে পাইলেন, এই মরমিয়া সাধক সারা ভারতে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন। তিনি এই সাধুর সঙ্গে দেখা করিতে উদ্বিগ্ন হইলেন। ভক্ত দাদু কিছুতেই দিল্লী যাইবেন না। স্থির হইল—ফতেপুর সিক্রির এক নির্জ্জন প্রান্তরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে। এই সময়ে জনৈক শিষ্য বলিলেন—"আপনার এই অলকপন্থী ব্রহ্মসম্প্রদায়ের কাজে সম্রাটের সাহায্য নিলে প্রচার ও সংগঠনের কার্য্য সুবিধা হইবে। ভক্ত দাদু বলিলেন—"তাহা হইতে পারে না। ইহাতে ভগবানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইবে। এই পরম সত্য যুগে যুগে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার জন্য রাজা বা সম্রাটের সাহায্য প্রয়োজন হয় না।"

দাদুর সঙ্গে সম্রাট আকবরের প্রায় চল্লিশদিন ধর্ম্মালাপ হয়। একদিন আকবরশাহ প্রশ্ন করিলেন "আল্লাহ প্রথম কোন বস্তু রচনা করিলেন—আকাশ, বায়ু, জল না ভূমি? দাদু হাসিয়া বলিলেন, "সম্রাট। আমার প্রভুকে এত ছোট ভাবিলেন কেন? সর্ব্বশক্তির আধার যিনি, তাঁর কাছে কোন্‌টী আগে এবং কোন্‌টী পরে এই প্রশ্ন উঠে কেন?"

এক শব্দ সব কুছকিয়া এসা সমরথ সেই,
আগে পিছে তো করৈ জৈ বলহীনা হোঁই।

দাদুর সাধনমার্গ "সহজপন্থ"। দৈনিক জীবন ও শাশ্বত

জীবনের মধ্যে সহজ যোগাযোগ স্থাপনই ইহার সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা। ভক্তদের সাধন ভজনের সুবিধার্থে দাদু দুইটী ভক্তি-রসাশ্রিত সংগ্রহগ্রন্থের নির্দ্দেশ দেন। তদনুসারে তাঁহার হিন্দুশিষ্য জগন্নাথজী এবং মুসলমান শিষ্য রজ্জবজী যথাক্রমে "গুণগঞ্জনামা" এবং "সর্ব্বাঙ্গী" নামক দুইটী ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। ভক্ত দাদুর এই প্রেমের সাধনায় নামজপের স্থান অতি উর্দ্ধে।

"মন পবনা সহি সুরতি সৌ দাদু পাঠে স্বাদ"

অর্থাৎ মন দিয়া প্রতিশ্বাসযোগে প্রেমের সহিত নাম নিলে অমৃতের আস্বাদ পাইবে। দাদুর "সহজ পংথ" ভক্ত ও সাধকের সম্মুখে সাধনের পথ সহজ করিয়া দেয়।

"সহজ সমর্পণ, সুমীরণ সেবা, তিরবেণীতট সংপথ সমরা" অর্থাৎ সহজ আত্মসমর্পণ, স্মরণ ও সেবার মধ্য দিয়াই সাধক সাধনার সমাপ্তিতে উপনীত হইতে পারে।

তিনি শেষ বয়সে "নারায়ণায়" বাস করিতেছিলেন। তিনি যে সহসা মহাসমাধি লইবেন, তাহা তিনি স্বয়ং ও তাঁহার শিষ্যেরা বুঝিয়াছিলেন।

১৬০৩ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির শনিবারে তাঁহার নরদেহ তিনি ত্যাগ করিলেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা উপস্থিত ছিলেন। এক সাধু ও হঠাৎ কোথা হইতে উপস্থিত হন। সাধু দর্শনে তিনি রামরসায়ন পান করেন এবং রামনাম মুখে রাখিয়া তিনি দিব্যধামে প্রয়াণ করেন। তখন তাঁহার বয়স উনষাট বৎসর। "নারায়ণায়" আজিও দাদুর "গাদী" শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হয় এবং অনেকেই তাঁহার পবিত্র গ্রন্থ ভক্তির সহিত পাঠ করেন।

২৪। স্বামী বিবেকানন্দ।

(১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।)

স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতার শিমুলিয়ার শ্রীযুৎ বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র। কাশীবিশ্বেশ্বরের বহু আরাধনার পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। সেই জন্য শৈশবে বিবেকানন্দকে বিশ্বেশ্বর নামে ডাকা হইত। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাখা হয় নরেন্দ্রনাথ। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা ও আর্ত্তের প্রতি সহানুভূতি এবং অসম্ভব আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা দেখা যাইত। কলেজজীবনে বিবেকানন্দ হার্বার্ট স্পেন্সারকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শশাস্ত্র প্রণালীর একটী মন্তব্য প্রেরণ করেন। বিখ্যাত দার্শনিক তাহা পাঠ করিয়া বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হন এবং সত্য নির্দ্ধারণ করিতে তাঁহাকে উৎসাহ দেন। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া বিবেকানন্দ প্রথমে নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হন। পরে ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিশিয়া সেই মতের পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া ও তাঁহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলনা দেখিয়া তিনি ম্রিয়মান হন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্য তৈয়ার হইতেছিলেন। তাঁহার এক পিতৃব্য রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য ছিলেন। তিনি একদিন বিবেকানন্দকে পরমহংস দেবের নিকট লইয়া যান। সেখানে গিয়া এতদিন বিবেকানন্দ যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরমহংসদেব তাঁহার মধুর-কণ্ঠের গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইলেন। অতঃপর বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের নিকট ঘনঘন আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেবের স্নেহভাজনদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৬

খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট তারিখে পরমহংসদেবের দেহান্তর ঘটিলে বিবেকানন্দসহ তাঁহার শিষ্যগণ গুরুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনে জীবন যাত্রা সুরু করিলেন।

বিবেকানন্দ প্রায় ছয়বৎসরকাল হিমালয় পর্ব্বতে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে তিনি তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অনুশীলন করেন। তাহার পর খেতরী রাজ্যে আসিয়া সেখানকার মহারাজকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি রামনাদে আসিয়া রামনাদের রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় চিকাগো নগরে ধর্ম্মসভার (Parliament of Religion) সমিতির যে অধিবেশন বসিয়াছে, মাত্রাজবাসীগণের অনুরোধে ও অর্থ সাহায্যে বিবেকানন্দ সেখানে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা দেখিয়া ও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া আমেরিকাবাসীদের হৃদয়ে বিরাট সাড়া পড়ে। এই সময় নিউ ইয়র্ক হিরাল্ড (New York Herald) নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক লেখেন যে, "হিন্দু জাতির ন্যায় পণ্ডিত-জাতির মধ্যে খৃষ্টান প্রচারক প্রেরণ করা যে অতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পর তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।" এই সময়ে বিবেকানন্দ মাদাম লুইজ (Madam Louise) ও মিঃ সেণ্ডস্‌বার্গ (Mr. Sandsburg)কে শিষ্যরূপে লাভ করেন। ইঁহারা যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকায় নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বিবেকানন্দ সেই দেশে বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আসিয়া বহু সভায় বক্তৃতা করেন ও যথেষ্ঠ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আলাপ করিয়া "Life and sayings of Ramkrishna" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করান। এইখানেই Miss

২৪। স্বামী বিবেকানন্দ।

(১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।)

স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতার শিমুলিয়ার শ্রীযুৎ বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র। কাশীবিশ্বেশ্বরের বহু আরাধনার পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। সেই জন্য শৈশবে বিবেকানন্দকে বিশ্বেশ্বর নামে ডাকা হইত। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাখা হয় নরেন্দ্রনাথ। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ন মেধা ও আর্ত্তের প্রতি সহানুভূতি এবং অসম্ভব আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা দেখা যাইত। কলেজজীবনে বিবেকানন্দ হার্বার্ট স্পেন্সারকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্র প্রণালীর একটী মন্তব্য প্রেরণ করেন। বিখ্যাত দার্শনিক তাহা পাঠ করিয়া বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হন এবং সত্য নির্দ্ধারণ করিতে তাঁহাকে উৎসাহ দেন। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া বিবেকানন্দ প্রথমে নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হন। পরে ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিশিয়া সেই মতের পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া ও তাঁহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলনা দেখিয়া তিনি ম্রিয়মান হন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্য তৈয়ার হইতেছিলেন। তাঁহার এক পিতৃব্য রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য ছিলেন। তিনি একদিন বিবেকানন্দকে পরমহংস দেবের নিকট লইয়া যান। সেখানে গিয়া এতদিন বিবেকানন্দ যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরমহংসদেব তাঁহার মধুরকণ্ঠের গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইলেন। অতঃপর বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের নিকট ঘনঘন আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেবের স্নেহভাজনদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৬

খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট তারিখে পরমহংসদেবের দেহান্তর ঘটিলে বিবেকানন্দসহ তাঁহার শিষ্যগণ গুরুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনে জীবন যাত্রা সুরু করিলেন।

বিবেকানন্দ প্রায় ছয়বৎসরকাল হিমালয় পর্ব্বতে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে তিনি তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অনুশীলন করেন। তাহার পর খেতরী রাজ্যে আসিয়া সেখানকার মহারাজকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি রামনাদে আসিয়া রামনাদের রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় চিকাগো নগরে ধর্ম্মসভার (Parliament of Religion) সমিতির যে অধিবেশন বসিয়াছে, মাদ্রাজবাসীগণের অনুরোধে ও অর্থ সাহায্যে বিবেকানন্দ সেখানে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা দেখিয়া ও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া আমেরিকাবাসীদের হৃদয়ে বিরাট সাড়া পড়ে। এই সময় নিউ ইয়র্ক হিরাল্ড (New York Herald) নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক লেখেন যে, "হিন্দু জাতির ন্যায় পণ্ডিত-জাতির মধ্যে খৃষ্টান প্রচারক প্রেরণ করা যে অতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পর তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।" এই সময়ে বিবেকানন্দ মাদাম লুইজ (Madam Louise) ও মিঃ সেণ্ডস্‌বার্গ (Mr. Sandsburg)কে শিষ্যরূপে লাভ করেন। ইঁহারা যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকায় নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বিবেকানন্দ সেই দেশে বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আসিয়া বহু সভায় বক্তৃতা করেন ও যথেষ্ঠ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আলাপ করিয়া "Life and sayings of Ramkrishna" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করান। এইখানেই Miss

Margaret Noble নাম্নী রমণীকে তিনি শিষ্যা করেন। এই রমণী উত্তরকালে ভগিনী নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা হন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ সশিষ্য ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত যে যে স্থানে তিনি গিয়াছিলেন, সেই সব স্থানে অপ্রত্যাশিত ও অশ্রুতপূর্ব্ব সম্বর্দ্ধনা পান। তৎপর তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কলিকাতার সম্মুখস্থ বেলুড় গ্রামে এবং আলমোড়ায় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানের জন্য তিনি এক একটি মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেশের উন্নতি কল্পে কি কি কার্য্য করিতে হইবে নির্দ্ধারণ করেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের সাহায্যার্থে "রিলিফ ওয়ার্ক" (Relief Work) প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমাগত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে চিকিৎসকের পরামর্শে বিবেকানন্দ আবার অল্পদিনের জন্য ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যান। এই সময় তিনি সেন্‌ফ্রান্সিস্‌কো (Sansfrancisco) নগরে একটী বেদান্ত সোসাইটী ও শান্তি আশ্রম স্থাপন করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরে (Congress of Religions) ধর্ম্মীয় কংগ্রেস সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে ফরাসী ভাষায় হিন্দু দর্শন সম্বন্ধেও বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন।

এইবার তিনি সাধুদিগের জন্য রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বারাণসীতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, রামকৃষ্ণ হোম ও রামকৃষ্ণ পাঠশালা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জাপানে সেই সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী কংগ্রেস সভা বসে। তাঁহাকে সেইখানে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসেন। কিন্তু শরীরের অবস্থা তত ভাল ছিল না বলিয়া তিনি জাপানী ভদ্রলোকদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই বেলুড়মঠে তিনি শিষ্যগণকে "পাণিনি"

শিক্ষা দিয়া অপরাহ্নে বেদ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তাহার পর অল্প সময়ের জন্য বেড়াইয়া আসেন। সন্ধ্যাকালে ধ্যানস্থ হন এবং রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় মহাসমাধিস্থ হইয়া বিবেকানন্দ জীবনলীলা সম্বরণ করেন।

বিবেকানন্দের প্রধান ও মূল্যবান বাণী হইল,—

১। ব্রহ্ম হ'তে কীট, পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সুখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

২। দরিদ্র, অজ্ঞানী, কাতর, ইহারাই তোমার দেবতা। ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম্ম। সর্ব্বদা তাহা স্মরণ রাখিবে।

বিবেকানন্দ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সন্ন্যাসী ছিলেন। ত্যাগ ও সেবাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং বেদান্তদ্বারা তাঁহার এই অভিলাষ সফল হইবে ভাবিয়া পাশ্চাত্যদেশে বেদান্তের প্রচার যাহাতে বহুল পরিমাণে হয় তজ্জন্য সমধিক যত্নবান ছিলেন। তিনি রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বহুভাষাজ্ঞান, ধর্ম্মপ্রাণতা ও গুরুভক্তি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা পুথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই উপলব্ধিই স্বামীজির ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে বেগ ও বলিষ্ঠতা আনিয়া দিয়াছিল।

স্বামীজির মতে প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের কর্ত্তব্য তাহার অশিক্ষিত প্রতিবেশীকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া বা আত্মশক্তিতে জাগ্রত করা। এই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মশক্তি আয়ত্ত হইলে প্রত্যেকেই স্বীয় মুক্তি সাধনে সমর্থ হইবে। স্বামীজি আন্তরিকতার সহিত

বিশ্বাস করিতেন যে বাহিরের কোন সাহায্যের দ্বারা কোন ব্যক্তি বা জাতির মুক্তিসাধন হয় না বা সম্ভব নহে। সেইজন্য মানুষ মানুষকে সাহায্য করিবার কোন অধিকার নাই। কেবল আছে সেবার অধিকার। আর্ত্তমানবের সেবাই হইল ঈশ্বর-সেবা। কারণ প্রত্যেক মানবমাঝে ভগবান বিরাজ করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই সেবাধর্ম্মই এই যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

স্বামীজি অত্যন্ত স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়তাকে তিনি সর্ব্বদা উর্দ্ধে মনে করিতেন। ভারতের পরাধীনতা দেখিয়া তিনি বলিতেন—

"আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র ভারতমাতার সেবা। আপাততঃ অন্যসকল দেবতার মূর্ত্তি আমাদের মন থেকে মুছে যাক্। ভারত-মাতাই একমাত্র জাগ্রত দেবতা। আমাদের জাতি ও আমাদের সমাজের মধ্যে ইনি বিরাজিতা। সর্ব্বত্র এঁর পানিপাদ। সর্ব্বত্র এঁর চক্ষু। সর্ব্ব সমাজের শরীর ইনি আবৃত ক'রে রয়েছেন। আর যত দেবতা তাঁরা এখন নিদ্রিত। যে বিরাট দেবতা আমাদের চারিদিকে ঘিরে রয়েছেন, তাঁকে ছেড়ে অপর বৃথা দেবতার অন্বেষণে কেন আমরা ঘুরে বেড়াই।"

উপরি উক্ত বাণী হইতে বুঝা যায় বিবেকানন্দ ভারতমাতাকে কত উর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন এবং স্বদেশহিতৈষণা তাঁহার কতই প্রবল ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন তিনি জন্ম হইতেই বীর। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিতেন "তুই যে বীর রে!"

শ্রীঅরবিন্দ বলেন আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বিবেকানন্দের মত দেশের কার্য্য করিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে "তুই যে বীর রে!"

১১। শ্যামানন্দ (ভক্তি সাধক)।

(১৬০৭ খৃষ্টাব্দ।)

বাঙ্গলাদেশের দণ্ডেশ্বর গ্রামে কয়েকঘর সদ্‌গোপ বাস করিত। কালস্রোতে তাহাদেরই একজন শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যার ধাবেন্দা-বাহাদুর অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম দুরিকা। উপর্য্যুপরি তাঁহাদের সন্তানদের অকালমৃত্যু হয়। ইহাতে মাতা পিতা উভয়ের দুঃখের অবধি নাই। তাঁহারা একটি সন্তানের জন্য অত্যন্ত আকুল অন্তরে আকাঙ্খিত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মনদুঃখ অপহরণ করিতে, ভগবানের কৃপায় শেষবয়সে তাঁহাদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নানা মনঃকষ্ট ও দুঃখের মধ্যে তাহার জন্ম বলিয়া নবজাতকের নাম রাখা হইল দুঃখীরাম। গ্রামবাসীরা সংক্ষেপে তাহাকে দুঃখী বলিয়া ডাকিত।

মাতাপিতার একান্ত বাসনা, দুঃখীরাম ভাল লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া একজন বড় পণ্ডিতরূপে সমাজে সম্মানিত হন। সেইহেতু বালককে তাহার পিতা সন্নিকটস্থ সংস্কৃত টোলে পাঠাইলেন। এইখানে দুঃখীরাম তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার অসাধারণ পরিচয় দিয়া অতি দ্রুত পাঠসমূহ শেষ করেন এবং কঠিন শাস্ত্রাদি অনায়াসে আয়ত্ত করেন। এই অবস্থায় দুঃখীরাম ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে এই অপরিণত বয়সেই তীব্র বিষয়বিরক্তি এবং একটি সহজাত ভক্তি স্বতঃই প্রকটিত হইল।

তখন ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি। নিতাই গৌরাঙ্গের পুণ্যময় জীবনের নবসাধনা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায় এক অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। কিশোর দুঃখীরামও এই ভক্তি তরঙ্গে উদ্বেলিত হইলেন। তাঁহার বাসনা যে গৃহত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবীয় সাধন গ্রহণ করিবেন। তিনি শুনিয়াছেন পরম ভাগবত হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর

কালনার একজন বড় বৈষ্ণব সাধক। দুঃখীরাম এই সাধক হৃদয়-চৈতন্যঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইলেন। দুঃখীরাম তাঁহার অন্তরের এই আকুলতা জনকজননীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। অনেক কষ্টে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া কালনায় হৃদয়-চৈতন্য ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলা দীর্ঘ বন্ধুর অরণ্যসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া এতদূরে হৃদয়-চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া ঠাকুরের অন্তর বিগলিত হইল। তিনি দুঃখীরামকে চরণাশ্রয় ও দীক্ষা দিলেন। তাঁহার নবনামকরণ হইল দুঃখীরাম কৃষ্ণদাস।

হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের গৃহে এক গৌরবিগ্রহ স্থাপিত ছিল ঠাকুর দুঃখীরাম-কৃষ্ণদাসকে এই বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিলেন ইহাতে নবীন সাধক অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মহাউৎসাহে গুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী গৌরবিগ্রহের নিত্য সেবা ও অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

বিগ্রহের স্নানের জন্য প্রতিদিন দুঃখীরামকে একটি বৃহৎ ও ভারী কলসে বহুদূর হইতে গঙ্গাজল আনিতে হইত। ইহাতে তাঁহার মাথায় এক দুরারোগ্য 'ক্ষত' হয়। কিন্তু তিনি গৌর বিগ্রহের সেবায় আত্মহারা হইয়া এইসব শারীরিক ক্লেশ ও ক্ষত একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন।

একদিন দুঃখী কৃষ্ণদাস গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছেন এমন সময় শিষ্যের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কেমনে এই ক্ষত হইল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, প্রতিদিন বহুদূর হইতে বহুবার ভারী কলসে গঙ্গাজল আনিবার পরিণামেই এই ক্ষতের উৎপত্তি। গৌর বিগ্রহের সেবায় বিঘ্ন হইবে ভাবিয়া ইহা তিনি কাহাকেও বলেন নাই এবং নিত্যকার্য্যও ত্যাগ করেন নাই। তরুণ শিষ্যের এই

সেবানিষ্ঠা দেখিয়া তিনি পরমহর্ষে দুঃখীরামকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন।

আচার্য্যদেব সেদিন বুঝিতে পারিলেন, দুঃখীকৃষ্ণদাস প্রেম ভক্তি সাধনার এক বিরাট উৎস। তিনি তাহাকে বৃন্দাবনধামে গিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বলেন। গুরুর কাছে থাকিতে পারিবে না বলিয়া কৃষ্ণদাসের অত্যন্ত দুঃখ হয়। তথাপি গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তিনি নবদ্বীপ ও অন্যান্য বৈষ্ণবতীর্থ পরিব্রাজনান্তে বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হন। তখন রঘুনাথদাস গোস্বামীর সাধন প্রভাব সারা ব্রজধামে খ্যাত। পবিত্র রাধাকুণ্ডের তীরে এই সাধক প্রেম ও ভক্তির দ্বারা এক নব বৃন্দাবন সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রজধামে পৌঁছিয়াই দুঃখী কৃষ্ণদাস রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট গেলেন। তরুণ সাধক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রঘুনাথদাস সকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে সেখানে রাখিলেন না। গুরুর নির্দ্দেশ-মত শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি শ্রীজীব আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ইতিপূর্ব্বেই বৃন্দাবন আসিয়াছেন। এই তিন সতীর্থ মহাপ্রতিভাধর। সাধননিষ্ঠাও ইহাদের অপূর্ব্ব! ধীরে ধীরে ইঁহাদের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল।

শ্রীজীবের গৃহে তিনি ভক্তি শাস্ত্র পড়িতেন। কিন্তু ভজন-নিষ্ঠা, বিগ্রহ-সেবা একদিনের জন্যও বন্ধ হইতে দেন নাই। তিনি বুঝিতেন যে সেবাই ভক্তিশাস্ত্রের সার। তাই এ সেবাকার্য্যে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ মন্দিরে দুঃখী কৃষ্ণদাস ঝাড়ুদারের কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার বড় আশা শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণদর্শন করিয়া এই জীবন সার্থক করিবেন।

যতই তিনি মন্দির প্রাঙ্গণ ঝাঁঠ দেন ততই শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের

আনন্দলীলা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেবী রাধা-রাণীকে দর্শনের জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। দেবীর কৃপা কবে হইবে, সখীবেষ্টিত রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত নিকুঞ্জবিহার কবে দর্শন করিবেন, তজ্জন্য তিনি একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

রাত্রি তখন শেষ প্রহর। দুঃখী কৃষ্ণদাস নিদ্রা হইতে উঠিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে নিকুঞ্জমন্দির পরিস্কার করিতেছেন। এমন সময় দেখিলেন বাহিরের অঙ্গনে, এক কোণে একটি উজ্জ্বল জিনিষ দেখা যাইতেছে। তাড়াতাড়ি তিনি সেইদিকে দৌড়াইয়া গেলেন। কাছে গিয়া দেখিলেন, একগাছা অপূর্ব্ব সুন্দর সুবর্ণ নুপুর। ইহা দেখিবার পর দুঃখী কৃষ্ণদাসের অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব প্রেমবিহ্বলতা জাগিয়া উঠিল। তাহা মস্তকে লইয়া ভূমিতে লুঠিয়া কেবলই গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব-বিকার তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে, কৃষ্ণদাস উঠিয়া বসেন এবং ভক্তিভরে সোনার নুপুরটি হাতে তুলিয়া ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক অপরূপ সৌরভ অনুভব করিলেন।

তখন কৃষ্ণদাস অশ্রুপূর্ণনয়নে সখেদে বলিলেন, "কৃপাময়ী রাধে ! এত অনুগ্রহ যখন করিলে, শ্রীচরণকমল-দর্শন-দানে বঞ্চিত কর কেন ? তিনি একটু পরে দেখিতে পাইলেন একটী পরমাসুন্দরী দশ এগার বৎসরের বালিকা চঞ্চলপদে নিকুঞ্জ মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই ! একটা সোনার নুপুর পেয়েছ কি ?" কৃষ্ণদাস পুলকিত চিত্তে উত্তর দিলেন "হাঁ"। নুপুরটি দেখাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নুপুরটি কার ?" কিশোরী বলিল, "এটা রাজনন্দিনীর।" কৃষ্ণদাস কৌশল অবলম্বন করিয়া কহিলেন, "তুমি সত্যকথা বলিতেছ কিনা কেমনে বুঝিব ? এই নুপুর যাহার তাহার পায়ের সঙ্গে আমি মিলাইয়া দেখিতে চাই।" কৃষ্ণদাসের সিদ্ধান্ত অবিচলিত। হারাণো নুপুর উদ্ধারের ছলে

রাধারাণীজী দুঃখী কৃষ্ণদাসকে দর্শন দিলেন। অশ্রুগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে করজোড়ে কহিলেন, "রাধারানি! যদি এই অধমকে কৃপা করিলে তবে নিজস্বরূপ দেখাইয়া কৃতার্থ কর।"

তখন শ্রীশ্রীরাধারাণী তাঁহার কৃপাভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন। কৃষ্ণদাসের নয়নে অতীন্দ্রিয় লোকের দুয়ার খুলিয়া গেল। তিনি দর্শন করিলেন, শ্রীগোবিন্দের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ। রাধারাণী মধুর কণ্ঠে তাঁহাকে আশীর্ব্বাণী দিলেন, "কৃষ্ণদাস! তোমার একনিষ্ঠা সেবা ও ঐকান্তিক ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। আমার কৃপার চিহ্নস্বরূপ তুমি এই নুপুরচিহ্নিত তিলক ললাটে ধারণ কর। বৃন্দাবনের ধূলিমাখা নুপুরগাছা কৃষ্ণদাসের ললাটে স্পর্শ করাইয়া রাধারাণী সঙ্গিনীসহ অন্তর্হিতা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণদাস সম্বিৎ হারাইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন।

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে ব্যক্ত করিলেন। বিবরণ শুনিয়া শ্রীজীবের নয়ন হইতে পুলকাশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি কৃষ্ণদাসকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, "ভক্তি সাধনায় তুমি শ্যামপ্রিয়া প্যারীজীর বহুজনবাঞ্ছিত কৃপা লাভ করিয়াছ। আজ হইতে তোমার নূতন নাম হইল গোস্বামী শ্যামানন্দ। রাধারাণীর নুপুরলাঞ্ছিত তিলক চিহ্নই তুমি ললাটে ধারণ করিবে।"

এই কথা নানা মুখে বিস্তৃতি লাভ করিয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের কাণে পৌঁছিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন। কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া গুরুদত্ত ভেক্ কেন পরিবর্ত্তন করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া নিজ বস্ত্র দ্বারা শিষ্যের তিলক মুছিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! যতই তিলক মুছিতে লাগিলেন ততই তাহা উজ্জ্বল হইতে লাগিল। হৃদয়চৈতন্য বুঝিতে পারিলেন তাঁহারই ভ্রম হইয়াছে। ইহা রাধারাণীর প্রদত্ত দিব্যতিলক। দিব্যশক্তিতে তিনি শক্তিমান। সাশ্রুনয়নে তিনি শিষ্য কৃষ্ণদাসকে আলিঙ্গন

করিলেন। আনন্দে উদ্বেল হইয়া তিনি বৃন্দাবন হইতে আনীত রাধাগোবিন্দজীর সেবার ভার শ্যামানন্দকে অর্পণ করিলেন। শ্যামানন্দ সানন্দে তাহা গোপীবল্লভপুর মঠে স্থাপন করিলেন এবং নিজেই তাহার সেবা পূজা করিতে থাকেন। এই সময়ে গুরুর আদেশে তিনি বিবাহও করেন এবং তাঁহার আচার্য্যজীবন আরম্ভ হয়। রাধাগোবিন্দজীবিগ্রহের সেবার মধ্য দিয়া বৈষ্ণবীয় আচার সমূহ তিনি উড়িষ্যার জনসমাজে প্রচার করেন। লক্ষ লক্ষ উড়িয়া ভক্তকে দীক্ষা দিয়া ভক্তিসাধক শ্যামানন্দ সমগ্র উড়িষ্যায় এক নব প্রেরণা জাগাইয়া তুলেন।

দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের শেষে এই শক্তিধর বৈষ্ণব তাঁহার আচার্য্য-জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া আনিলেন। শিষ্য ও ভক্তদের কাছে গৌরলীলা ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন।

শ্যামানন্দের বিশিষ্ট বারজন শিষ্য হইতে বারটি বৈষ্ণবশাখার উৎপত্তি হয়। রয়নীর জমিদার পুত্র রসিক মুরারী তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি ঠাকুর গোঁসাই বা রসিকানন্দ নামে বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সুবর্ণরেখার তীরে গোপীবল্লভপুরে শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং উড়িষ্যার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে।

১২। সাধক রামপ্রসাদ।

(১৭২০ খৃষ্টাব্দ।)

পূর্ব্বকালে ধলহণ্ড গ্রামে ধন্বন্তরি গোত্রীয় বিনায়ক সেন বাস করিতেন। তাঁহারই আদি পুরুষ কৃত্তিবাস যিনি রামায়ণ লিখিয়া অমর হইয়াছেন। ইঁহাদের পারিবারিক অবস্থা ভালই ছিল। তাঁহাদেরই বংশধর রামেশ্বর। নানা দুর্দ্দৈবে তাঁহার আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে তিনি উপার্জ্জনের আশায় হালিসহর কুমারহট্টে আসিয়া বসবাস করেন। রামেশ্বরের এক পুত্র—নাম রামরাম। এই রামরামের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে অম্বিকা ও নিধিরাম এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে ভবাণী, রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ জন্ম গ্রহণ করেন।

এই দ্বিতীয় সন্তান রামপ্রসাদ ১১২৭ বাংলার ১৩ই ফাল্গুন তারিখে মাঘমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে (ইংরেজী ১৭২০ খৃষ্টাব্দ ২২শে ফেব্রুয়ারী) ভূমিষ্ঠ হন। সেই হইতে রামপ্রসাদ শুক্লপক্ষের শশিকলার মত দিনদিন বাড়িতে লাগিলেন। অঙ্গসৌষ্টব ও সুবর্ণকান্তি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ষষ্ঠমাসে তাঁহার অন্নপ্রাশন ও নামকরণ হয় এবং পঞ্চমবর্ষে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। অসাধারণ মেধা সম্পন্ন বালক ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও ন্যায় প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া উঠেন। ইতিমধ্যে তাঁহার উপনয়ন ও স্বীয় জননীর নিকট মন্ত্রদীক্ষাও হয়। তৎপর হইতে প্রসাদের ভক্তিপ্লুত ভাবরাশি ভক্তিমূলক গানের মাধ্যমে প্রকাশ পাইতে থাকে। তাঁহার পিতা রামরাম সেন যখন পূজায় বসিতেন রামপ্রসাদ পেছনে বসিয়া সকল বিষয়ে সাহায্য করিতেন এবং পূজার সময়ে অনিমেষনয়নে মা মহামায়ার চরণে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া বিভোর হইয়া থাকিতেন।

এই অল্প বয়সেই রামপ্রসাদের দেবভক্তি দেখিয়া মাতা পিতা

বড়ই সুখী হইলেন। শৈশবেই রামপ্রসাদের পিতৃবিয়োগ হয়। তদবধি শাস্ত্রচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গেই প্রসাদের সংসারবৈরাগ্য হয়। ইহাতে শঙ্কিতা হইয়া প্রসাদ জননী প্রসাদকে সংসার বন্ধনে বাঁধিবার জন্য সহসা তাঁহাকে বিবাহ করান। এই সময়েই তিনি "আমি এত দোষী কিসে" গানটি রচনা করেন।

প্রসাদের পিতা রামরাম সেন কবিরাজ ছিলেন। বিশেষ কোন বিত্তবৈভব বা বিষয়সম্পত্তি তাঁহার ছিল না। তাই চাকরীর সন্ধানে প্রসাদের ভগ্নীপতি লক্ষ্মণ সেনের পরামর্শে প্রসাদ কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরামও তখন কলিকাতায় থাকিতেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কণ্ট্রাক্‌টার কৃষ্ণবিহারী মল্লিকের সহিত নিধিরাম ও লক্ষণ সেন উভয়েরই বিশেষ প্রণয় ও প্রীতি ছিল। তাঁহারা বলিয়া কহিয়া রামপ্রসাদকে মল্লিকবাবুর দপ্তরে এক চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রসাদ কুমারটুলীতে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের নিকট থাকিতেন। এই সময়ে জলপ্লাবনে তাঁহার পিতৃপরিত্যক্ত বাস্তুভিটা নষ্ট হইয়া যায়। বিষয়বৈরাগী প্রসাদের মন উদাস এবং চাকরী ও তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি নিজে রচনা করিয়া গাহিলেন।

আছে মা তোমার মনে কত ?
কেবল সার হল ভ্রমণ পথ।
হয়ে তারিনীতনয় গেল মা আলয়
হব আমি এখন কার অনুগত ?
প্রসাদ বলে ও' মা তারা।
বল কিসে হবে হিত
আমার ঘর বেঁধে ঘর কর্‌তে হলে,
একাল হবে আখেরের মত।

চাকরী না করিয়া তিনি বাড়ীতে (কুমারহট্টে) ফিরিয়া

আসিলেন। কিন্তু সংসার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যবোধে তিনি "অন্নদে অন্ন দে" গান করিতে করিতে চাকুরীর অন্বেষণে পুনঃ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় মাতা অন্নপূর্ণা তাঁহার কাতর প্রার্থনা শুনিলেন। তিনি দর্জ্জিপাড়ায় 'জহরত' ব্যবসায়ী দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতে প্রধান ধনরক্ষকের অধীনে মুহুরীর কাজ পাইলেন। মায়ের নামে পাগল রামপ্রসাদ ভাবতদগত অন্তরে দপ্তরের খাতায় হিসাবের পরিবর্ত্তে তাঁহার স্বরচিত গান লিখিয়া রাখিলেন। "আমায় দে মা তহবিলদারী"...ইত্যাদি।

গান রচনা করা এবং সেই গান গাওয়া বাল্যাবধি প্রসাদের অভ্যাস ও স্বভাব বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি অন্তরের সমস্ত ব্যাথা, জ্বালা ও কাতরতা গানের ভিতর দিয়া ইষ্টদেবীর চরণে নিবেদন করিতেন। এই হিসাবের খাতায় তিনি এক পৃষ্ঠায় "দুর্গা" নাম লিখিতেন এবং অপর পৃষ্ঠায় মায়ের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক গান নিজে রচনা করিয়া লিখিতেন। আনমনা প্রসাদের এই ঔদাসীন্য তাঁহার হিসাব রক্ষক পছন্দ করিতেন না। তিনি তাহা মনিব মিত্রমহাশয়ের দৃষ্টিগোচর করিলেন। বিচক্ষণ মিত্রমহাশয় গানগুলি পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রসাদ একজন মাতৃভক্ত সাধক। তিনি প্রসাদকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন ও মাতৃনাম সাধনায় রত হইতে বলিলেন। তাঁহার জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা বরাদ্দ করিলেন।

মিত্র মহাশয়ের এই আশ্বাসবাণীতে প্রসাদ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং বিশিষ্ট মন্ত্র-সাধক কৃপানাথের নিকট পূর্ণাভিষেক প্রাপ্ত হইয়া বীরাচার সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি গাহিলেন—

"ডুব দেরে মন কালী বলে।"

কাশী পুরেশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদের গান শুনিতে কুলকামিনীরূপে প্রসাদের গৃহে আসেন। প্রসাদ তখন গৃহে ছিলেন না। পথে তিনি একবার মা ভগবতীর দেখা পান। কিন্তু

চিনিতে পারেন নাই। গৃহে ফিরিয়া মায়ের মুখে সকল কথা শুনিয়া আত্মহারা হইয়া রাস্তা দিয়া ছুটিলেন। কিন্তু কোথায় সে রমনী? কোথাও দেখা পাইলেন না। আকুল প্রাণে গাহিলেন—

মা তোমারে বারে বারে

* * *

দাঁড়াও একবার দ্বিজমন্দিরে
দেখে যাই জনমের মত"

এই সময়ে তিনি একবার কাশী যাইবার মনস্থ করেন। পদব্রজে ত্রিবেণীতক গেলে বর্গীর হাঙ্গামায় তিনি ফিরিতে বাধ্য হন। তাহার পর তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি দুঃখে ও শোকাবেগে

"অসকালে যাব কোথা?"

* * *

"মরি গো এই মন দুঃখে"

এই গান দুটী রচনা করেন।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দীখাঁন বাঙ্গলার নবাব হইলে দুর্গাচরণ মিত্র নবাব সরকারের জুয়েলার্স নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া যান। তাই প্রসাদের মাসিক বৃত্তি বন্ধ হয়। ফলে, তিনি পুনঃ দুর্দ্দশায় পতিত হন। তিনি হুগলীতে গোকুল সরকারের বাড়ী ও চুঁচুড়ায় শীলবাবুদের বাড়ীতে সাময়িকভাবে চাকরী গ্রহণ করেন। এইভাবে দেশ বিদেশ ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রান্ত হইয়া তিনি গাহেন—

"মা! আমায় ঘুরাবি কত?"

তৎপর একদিন চাকরী ছাড়িয়া দিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

"কার বা চাকরী কররে মন্?"

তিনি নিভৃতে ভবানী মন্দিরে বসিয়া সাধনায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধির দেরী হইতেছে দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তিনি

গাহিয়াছিলেন—

"এবার মা কালী তোমায় খাব"

* x *

"আমি কি মা তোর আঠাশে ছেলে"

প্রসাদের নাম শুনিয়া নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে আসেন। নিভৃতে নির্জ্জন মন্দিরে প্রসাদের গান "এমন দিন কি হবে মা তারা?" ও "কাল মেঘ উদয় হল অন্তর অম্বরে" শুনিয়া তিনি বড়ই মুগ্ধ হন। তিনি ও পূর্ণ অভিষিক্ত কৌল ছিলেন। এই কারণে উভয়ে অতঃপর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইলেন।

একদিন প্রসাদ তাঁহার ঘরের বেড়া বাঁধিতেছিলেন। কন্যা পরমেশ্বরী অপরদিকে থাকিয়া দড়ির মুখ ফিরাইতেছিল। হঠাৎ সে কার্য্যান্তরে চলিয়া যায়। প্রসাদ তাহা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি আপন মনে গান গাহিতেছেন ও বেড়া বাঁধিতেছেন। পরমেশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা! আমি যে ছিলাম না। কে দড়ি ফিরাইল?

রামপ্রসাদের বিশ্বাস ছিল যে পরমেশ্বরীই দড়ির মুখ ফিরাইতেছেন। কিন্তু নিজ কন্যার এই প্রশ্নে তিনি বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন—কে সেই বালিকা।

তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

"মন কেন তোর চরণ ছাড়া?"

এই সময়ে তিনি মা ভবানীর অলক্তরঞ্জিত চরণ দুখানি দেখিতে পান। এই চরণতলে শতদল দেওয়ার তাঁহার বাসনা হইল। কিন্তু পদ্ম কোথাও মিলিল না। কাতর হইয়া প্রসাদ গাহিলেন—

"আমার কপাল গো তারা"

মা ভগবতী তাঁহার আশা মিটাইলেন। প্রসাদ দেখিলেন কালী-পাদপদ্ম। তাহারই পরে দেখা গেল নকুলবাটীতে গাব গাছে

পদ্মফুল ফুটিয়াছে। তিনি ফুলগুলি সংগ্রহ করিয়া ভগবতীর চরণে অঞ্জলি দিলেন। তিনি গাহিলেন—

সমন জয়ী হুকুম পেয়েছি
শ্যামা মায়ের হুজুর থেকে (আমি)।

অতঃপর তিনি বড়তির বিলে শবসাধনা করেন ও সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৩৪ বৎসর হইবে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে শবসাধনার বিশদ বিবরণ তিনি দিয়া গিয়াছেন।

একদা ফৌজদার (পরে মহারাজা) নন্দকুমার ভিখারীমুখে তাঁহার ভক্তিমূলক গান শুনিয়া রামপ্রসাদের খোঁজে হালিসহর পর্য্যন্ত আসেন। প্রসাদের গান তাঁহার বড়ই ভাললাগিত। যদিও তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, প্রসাদের গান তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মহারাজা নন্দকুমারকে উদ্দেশ করিয়া প্রসাদ গাহিয়াছিলেন…

"ওরে মন ভজ কালী, ইচ্ছে হয় যে প্রকারে,"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও মাঝে মাঝে রামপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করিতে ভবাণী মন্দিরে আসিতেন। এইসময়ে রণ দামামা বাজিয়া উঠে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রসাদ গান শুনাইলেন—

"কে রে! রজনীরূপিণী রণ করে?"

এই সময়ে ইংরেজ এড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন্‌ ও আসিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদের গান শুনিতেন। প্রসাদ গাহিতেন—

"ওহে দৈত্যরায় ভজ এই দক্ষিণায়
আর কি কাজ আশায়?"

সেই সময় হইতে ওয়াটসনের পরামর্শ অনুযায়ী ইংরেজেরাও কালীঘাটে পূজা দিতে থাকেন। রামপ্রসাদ মাঝে মাঝে কলিকাতায়ও আসিতেন। নানা লোক নানা স্থান হইতে আসিয়া প্রসাদকে প্রণামী দিয়া গান লিখাইয়া লইত। এইভাবে প্রসাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হইতেছিল। সাধারণ ব্যক্তির মত তিনি

সংসার করিয়াছেন। হাটবাজার করিয়াছেন। বাঁখাড়ী দড়ি নিয়া বেড়া বাঁধিয়াছেন। আবার নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ সংসারের মধ্যে থাকিয়া পরমার্থ চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

প্রসাদের সংসারে নিত্য অনটন। তিনি কিছুই সঞ্চয় করিতেন না। সমস্ত জিনিষ দীন দরিদ্রদের বিলাইয়া দিতেন। একবার তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে পাকা ঘর করিতে বলিলে তিনি গাহিলেন :

"নিতি তোরে বোঝাবে কেটা
যত ধন জন সব অকারণ
সঙ্গেতে না যাবে বেটা॥"

এইসময়ে সাবর্ণ চৌধুরী দর্পনারায়ন রায় দশবিঘা জমি এবং সুভদ্রা দেবী সবৃক্ষ একবিঘা জমিসমেত একটী বসতবাটী প্রসাদকে দান করেন। তিনি এই গৃহে বসিয়া কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর) রচনা করেন এবং তাহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দেন। রাজা-বাহাদুর তাঁহার এলাকার মধ্যে তাঁহাকে একান্ন বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন।

তিনি শেষ বয়সে আর একবার কাশী যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিলনা। ইহার পর প্রসাদ তরুতলে পঞ্চমুণ্ডির আসনে যোগারূঢ় থাকেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের হাহাকার দর্শন করিয়া প্রসাদ গাহিলেন—

"আমি কেবা আমার কেবা, আমা ভিন্ন আছে কেবা?"

প্রসাদের শেষ জীবনের মানসিক অবস্থা তাঁহারই গানে বুঝা যায়,

"হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে সহস্রাতে মন রেখেছি,
কুল কুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি প্রাণ সঁপেছি
মুখে কালী কালী বলে যাত্রা করে বসে আছি।"

অপর গানে রহিয়াছে—

"আমার দফা হ'ল রফা দক্ষিণান্ত হ'য়েছে।"

১৮৮৮ সালের কার্ত্তিক মাস। শ্যামা প্রতিমার বিসর্জন দিতে গিয়া তিনি স্বেচ্ছায় গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া দেহত্যাগ করিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় ও মৃত্যু ঘটে।

১৩। সাধু কমলাকান্ত।

(১৭৭০ খৃষ্টাব্দ।)

বর্দ্ধমানের অম্বিকা-কালনা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী চান্না গ্রামের মহামায়া দেবীকে বিবাহ করেন। যদিও তাঁহাদের সাংসারিক অনটনের মধ্যে থাকিতে হইত, তাঁহাদের জীবনযাত্রা ছিল পরম সাত্ত্বিক।

এহেন পরিবারে মহেশ্বরের ঔরসে ও মহামায়ার গর্ভে কমলাকান্ত ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মহেশ্বরের আকস্মিক মৃত্যুতে সাংসারিক অনটন আরও বৃদ্ধি পায়। নিরুপায় হইয়া মাতা মহামায়া দেবী পুত্রকে লইয়া চান্না গ্রামে পিত্রালয়ে উঠিয়া আসেন। মাতুলের অনুগ্রহে কিছু মাতুল সম্পত্তি পাইয়া কায়ক্লেশে কমলাকান্ত দিনাতিপাত করিতে থাকেন।

ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম। শাস্ত্রাধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন। অথচ অর্থের দারুণ অভাব। তাই কমলাকান্ত অম্বিকা গ্রামে এক যজমানের বাড়ীতে থাকিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। পুঁথিপত্র তিনি বিশেষ খুলিতেন না। অথচ পরীক্ষায় দেখা যাইত তাঁহার সব শাস্ত্র মুখস্থ। এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। কমলাকান্ত সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। প্রায় সময়েই তিনি রামপ্রসাদী গান গাহিতেন ও ভাবে বিভোর থাকিতেন। টোল হইতে পলাইয়া পথে প্রান্তরে বনে জঙ্গলে নির্জ্জনে বসিয়া নিজ মনে কালীর মালসী গাহিয়া চারিদিক মুখরিত করিয়া রাখিতেন।

উপনয়নের পর কমলাকান্তের ভাবান্তর হইল। তিনি অবসর পাইলেই চান্নায় বিশালাক্ষী দেবীর নিস্তব্ধ মন্দিরে গিয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। ধ্যানস্তিমিতনেত্রে কিশোর ব্রাহ্মণের নিশীথের

পর নিশীথ রাত্রি গড়াইয়া পড়িত। এই গ্রামেরই কিছু দূরে গোবিন্দ মঠ। প্রভুপাদ চন্দ্রশেখর গোস্বামী তখন এই মঠের সেবাইত এবং একজন উচ্চস্তরের সাধক। কমলাকান্ত সময়মত এই মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে বসিয়া নানা উপদেশবাণী শুনিতেন। পরে তাঁহার নিকট হইতে কমলাকান্ত মন্ত্রদীক্ষা লন।

মাতা মহামায়া দেবী পুত্রের বৈরাগ্য দেখিয়া শঙ্কিতা হন। এই বয়সে কমলাকান্ত সংসার ত্যাগ করিয়া গেলে সংসার কে দেখিবে? তাই তিনি তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া লাড্ডুকা গ্রামের ভট্টাচার্য্যদের এক সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে কমলাকান্তের বিবাহ দেওয়াইয়া পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন।

ক্রমে ক্রমে বয়সোচিত ধর্ম্মে প্রণোদিত হইয়া কমলাকান্ত তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেন। তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি তেজ-বাহাদুরের গুরু ছিলেন। মহারাজের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কমলাকান্তকে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কামিনী কাঞ্চন লইয়া কি ভাবে ভজনা করেন?" ইহার উত্তরে কমলাকান্ত বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর সতী নারীগণ সেই আদর্শসতী ভগবতীর অংশরূপিনী।" চণ্ডীতে আছে "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ, সকলজগৎসু।" জগতে সমস্ত স্ত্রীই সাধারণতঃ জগদম্বার অংশভূতা। অতএব সাধ্বী স্ত্রী কদাপি সাধন ভজনের বিঘ্ন নহে, বরং সহায়স্বরূপিনী। সাধ্বী স্ত্রী সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

"নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুঃ নাস্তি ভার্য্যাসমাগতি,
নাস্তি ভার্য্যাসমালোকে সহায়ো ধর্ম্ম সংজ্ঞকে ॥"

এইরূপ স্ত্রী কদাচ কামিনীকাঞ্চনের কামিনী নহেন। ইঁহারাই সাধনের সমধিক সহায়।

কিন্তু কমলাকান্তের এই পত্নী বেশীদিন জীবিতা ছিলেন না। অল্পদিন পরেই মারা গেলেন। চান্নার নিকটেই খড়্গেশ্বরী নদী।

ইহারই তীরে বালুকাময় শ্মশানের চিতাশয্যায় প্রিয়তমা পত্নীর মৃতদেহে আগুন দিয়া কমলাকান্ত উদাসভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সূর্য্যাস্তের সন্ধ্যা ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। চোখের সম্মুখে পত্নীর দেহটী পুড়িয়া ছাই হইতেছে। চিতাগ্নির ধূম উর্দ্ধে উঠিয়া আকাশের মহাশূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। মনের এই অবস্থায় উদাসস্বরে কমলাকান্ত স্বরচিত গান গাহিলেন,—

"কালী। সব ঘুচালি ল্যাঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি না রাখবি সেটা।
তোমার যারে কৃপা হয় তার সৃষ্টিছাড়া রূপের ছটা,
তা'র কটিতে কৌপিন জোটেনা, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা,
শ্মশান পে'লে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি, কোটা
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলোনা তার সিদ্ধি ঘোঁটা।
দুঃখে রাখ, সুখে রাখো, করবো কি আর দিয়ে খোঁটা,
আমি দাগ দিয়ে পড়েছি, আর পুছতে কি পারি সাধের ফোঁটা।
জগৎ জুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা,
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যভার, ইহার মর্ম্ম জানবে কেটা।"

মাতার একান্ত অনুরোধে ও পীড়াপীড়িতে কমলাকান্ত আবার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। এইবার বিবাহ করেন, বর্দ্ধমানের কাঞ্চনপুরে। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের যে স্রোত তাঁহার জীবনে প্রবাহিত হইতেছিল তাহা আরো তীব্র হইয়া উঠে। দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিতে পারিল না।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁহার সঙ্গে তন্ত্রসাধক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিল। কেনারাম শক্তিমান কৌলসাধক। তাঁহার বাড়ী অমরার গড়মানকরের সন্নিকটে। তিনি সেখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও শ্যামাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধন ভজন করেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীতে নিপুণ। একবার তাঁহার

গান যে শুনিয়াছে সে মোহিত হইয়াছে। ইঁহারই চরণে কমলাকান্ত আত্মসমর্পণ করিলেন। দীক্ষা ও শাক্তাভিষেকের পর কেনারাম বুঝাইলেন তন্ত্রসাধনায় ব্রতী হইলে তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। মহামায়ার রচিত এই সংসারেই থাকিয়া,কেবল সাধনার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে মায়ার বন্ধন কাটিতে হইবে।

কমলাকান্ত গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপকবৃত্তি গ্রহণ করিলেন এবং গ্রামে ছোট একটি চতুষ্পাঠীও খুলিলেন।

একদা কমলাকান্ত শিষ্যবাড়ীতে কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। সন্ধ্যার বেশী দেরী নাই। সম্মুখে ওঁড়গাঁয়ের বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা। ঠেঙ্গাড়ে ডাকাতদের ভয়ে এপথে একাকী কেহ চলাফেরা করে না। সুযোগ পাইলেই ডাকাতেরা নিরীহ পথিকদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয় ও বিনাদ্বিধায় খুন করে। সমস্ত প্রান্তরে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। কমলাকান্ত একাকী পথ চলিতেছেন। এমন সময়ে প্রাণ কাঁপান শব্দে ডাকাতেরা লাঠি সড়্কি হাতে আগাইয়া আসিল এবং কমলাকান্তের কাছে যাহা ছিল তাহা কাড়িয়া লইল। বাড়ী নিকটস্থ চান্না গ্রামে শুনিয়া এবং বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত কথা বলিয়া দিবে ভাবিয়া ডাকাতেরা তাঁহাকে খুন করিতে উদ্যত হইল। ডাকাতদের সর্দ্দার তাঁহাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল। মরিবার পূর্ব্বে কমলাকান্ত মায়ের নাম গান করিবার অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইবার পর কমলাকান্ত ভূমিতলে আসন গ্রহণ করিয়া আবেগময় কণ্ঠে গাহিলেন—

আর কিছুই নাই, শ্যামা মা তোর, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা,
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী, দেখে হ'লাম সাহসভাঙ্গা,
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদকালে কেহ কোথায় নাই, হই কেন আমি মনমরা।
যদি রাখ নিজগুণে দেখিও করুণা নয়নে
অধম কান্ত মাগে স্থান তব রাঙ্গা চরণে।

হৃদয় গলানো এই অপরূপ সঙ্গীত কান্নার মূর্চ্ছনায় ফাটিয়া পড়িতেছে। নয়ন মুদিয়া জোড়হস্তে কমলাকান্ত বারবার এই গানটি গাহিতেছেন, আর নেত্রে বহিতেছে অশ্রুধারা। শ্যামা মায়ের দিব্যভাবরসে কমলাকান্ত আবিষ্ট। তাঁহার সুঠাম দেহে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, চোখে স্বর্গীয় দ্যুতি। দস্যুরা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেছে ও সাধকের দিকে চাহিয়া আছে। তাঁহার কাতর সঙ্গীত দস্যুদের প্রাণে ভাবাবেশের লহরী তুলিয়াছে। সঙ্গীত থামিবার পর ডাকাত সর্দ্দার তাহার অনুচরদের লইয়া কমলাকান্তের চরণ জড়াইয়া ধরে এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সাধক কমলাকান্তের কৃপায় ও আশ্রয়ে দস্যুরা ভক্ত ও সাধক রূপে রূপান্তরিত হয় এবং তাহার পর হইতে ওঁড়গাঁয়ের কুখ্যাত ডাঙ্গা দস্যুশূন্য হইয়া নিরাপদ হয়।

কমলাকান্ত তন্ত্রমতের সাধক ছিলেন। শক্তিস্বরূপিনী শ্যামা মায়ের সাধনাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। কমলাকান্ত বাঙ্গলার প্রতি জনপদে মাতৃনামের মহিমা বিস্তার করেন।

দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় সময়েই রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। কমলাকান্তের গানে দিন দিন ঠাকুরের অন্তরে মাতৃপ্রেমের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিত। একএকদিন তিনি মা ভবতারিণীর সম্মুখে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিতেন, "মা! তুই রামপ্রসাদকে ও কমলাকান্তকে দেখা দিয়াছিস্; আমায় তবে কেন দেখা দিবিনে?"

কমলাকান্ত জগন্মাতার দর্শনের জন্য ব্যাকুল থাকিতেন। এক একবার আসনে বসিলে কোন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। মাতৃধ্যানে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। মাঝেমাঝে কখনও নিকটস্থ শ্মশানে গিয়া নির্জ্জনে মায়ের আরাধনা করিতেন। এইসব কারণে তাঁহার স্থাপিত চতুষ্পাঠির সুনাম কমিয়া গেল। ছাত্রও তেমন আর আসে না। ফলে অর্থাভাব দারুণ হইয়া দেখা দিল।

ঘরে রহিয়াছে এক স্ত্রী ও একটী কন্যা। কোন রকমে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতেছে না। সাধক কমলাকান্ত ইহাতে নির্ব্বিকার। এত অর্থকষ্ট সত্ত্বেও শ্মশানে ও বিশালাক্ষীর মন্দিরে তিনি আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

ভট্টাচার্য্যপত্নী বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। ঘরে টাকা পয়সা কিছুই নাই। শিশু কন্যাটীরও দুধের প্রয়োজন। তাহাও বা কিভাবে জুটাইবেন? স্বামীর ও নিজের খাওয়ার কি ব্যবস্থা করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছেন না। এমন সময় হঠাৎ দুয়ারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে ডাক আসিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী আছেন কি? একবার দরজা খুলুন।" দুয়ার খুলিতেই কমলাকান্ত পত্নী দেখিতে পাইলেন, শ্যামবর্ণা পরমরূপলাবন্যময়ী এক কিশোরী সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। সঙ্গে তাঁহার দুইজন পরিচারিকা। তাহাদের মাথায় চাঙ্গাড়ীভর্ত্তি বহুপ্রকারের বহু খাদ্য। কমলাকান্তের স্ত্রী বিস্মিতা ও কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এই বিস্ময় ও কৌতূহল দেখিয়া কিশোরী বলিয়া উঠিলেন—"মা তোমাদের জন্য সিধে পাঠিয়েছেন। এ সব ঘরে তুলে নাও লো।" সিধের প্রাচুর্য্য দেখিয়া ও এই অপ্রত্যাশিত করুণা কাহার, বুঝিতে না পারিয়া কমলাকান্তের স্ত্রী হতবাক্ হইলেন। বিস্ময় কাটিতে না কাটিতে দেখিলেন, কিশোরী তাঁহার রহস্যময় ভুবন ভুলানো হাসি ছড়াইয়া পরিচারিকা সহ কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। কে কোথা হইতে খাদ্য পাঠাইয়াছে, তাহা জানিতেও পারিলেন না। ভট্টাচার্য্য পত্নী চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন।

গভীর রাত্রে কমলাকান্ত ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়াছেন। ঘরে ঢুকিয়া চাঙ্গাড়িভর্ত্তি এত সব খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এই দীনদরিদ্রের জন্য এত যত্ন করিয়া কে এই সমস্ত খাদ্য পাঠাইয়াছে? গৃহিনী ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া

কহিলেন, "দেখ, মেয়েটির পরিচয় পাইলাম না। কে এই খাদ্য পাঠাইয়া আমাদের প্রাণ বাঁচাইল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কিশোরী মেয়েটি শুধু বলল, 'মা এই সব পাঠিয়েছেন' ওগো! এই মা কে?"

ইহা শুনিয়া সাধক কমলাকান্ত নয়নাশ্রু রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই নয়নে ধারা নামিয়াছে। এতক্ষণে তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিলনা যে এই মা তাঁহারই মা। সারা জগতেরই তিনি মা। জগৎপালয়িত্রী জগদ্ধাত্রী ছদ্মবেশে এই দীন ভক্তের কুঠিরে আসিয়াছিলেন। ইহাই যে মায়ের স্নেহলীলা।

আরও একবার কমলাকান্ত দেবীর ভোগের জন্য মৎস্য জোগাড় করিতে না পারিয়া ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। কি করিবেন, কোথায় গেলে মৎস্য পাইবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় এক কৃষ্ণবর্ণা নারী, বাগদী মেয়ে বলিয়া তাঁহাকে দুইটি মাগুর মাছ দিয়া যায়। তাঁহারই স্মৃতিপটে এই অপরূপ নীলঘনমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া যায়। তিনি ভাবাবেশে গাহিলেন,

"শ্যামারূপে নয়ন ভুলেছে, অতি নিরুপম চিকণ কালো তুই
তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন হৃদয়ে ধরেছে"।

সাধক কমলাকান্তকে ঘিরিয়া জগজ্জননীর লীলা চলিয়াছে। রহস্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া তিনি কমলাকান্তের আশে পাশেই রহিয়াছেন। ধরা দিতেছেন না।

মায়ের দর্শন মিলিতেছে না। কমলাকান্তের হৃদয় ব্যাকুল। পঞ্চমুণ্ডির সাধন ক্রিয়ার শেষে, সেদিন গভীর রাত্রে কমলাকান্ত বিশালাক্ষীর সম্মুখে বসিয়া আছেন। একাগ্রচিত্তে রক্তজবার মালা গাঁথিতেছেন এবং একমনে মাতৃনাম গাহিতেছেন,—

"জানি, জানি গো জননী, যেমন পাষাণের মেয়ে
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারেই লুকা'য়ে

কারও প্রতি দুর্ম্মতি, সুমতি হও মা কারও প্রতি,
আপনার দোষ ঢাকো, অপরের দোষ দিয়ে।
মা। না করি নির্ব্বান আশ, না চাহি স্বর্গবাস,
নিরখি নয়ন দুইটি, হৃদয়ে রাখিয়ে"।

ধ্যানানন্দে কমলাকান্ত বিভোর। অকস্মাৎ মন্দিরের নির্জনতা ভঙ্গ করিয়া কে বলিয়া উঠিল, 'বাস। চুপ করলে কেন? আবার গাও। বড় মধুর তোমার গান। আমায় আরও কিছু শোনাও'। কমলাকান্ত দেখিলেন—মমতাভরা নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন এক বৃদ্ধা। বলিলেন, তিনি ধর্ম্মনারায়ণের মা। কমলাকান্ত পুনঃ গান গাহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, বৃদ্ধা নাই। তৎপরদিন ধর্মনারায়ণ গোয়ালার সঙ্গে দেখা হইতেই, সে বলিল তাহার মা মারা গিয়াছে বহু বৎসর। বিশালাক্ষীদেবীই এখন তাহার মা। এই পৃথিবীতে আপনজন বলিতে তাহার আর কেহ নাই। ইহাতে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবার ভাবাবেশ হইল। গত রজনীতে স্বয়ং জগজ্জননী আসিয়াছিলেন এবং কৃপা করিয়া তাহার গান শুনিয়াছেন। মাতৃবিরহের তীব্রবেদনায় তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং মা, মা রবে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

মায়ের দর্শন পাওয়া সম্বন্ধে অনেক ঘটনা শ্রুত আছে। কমলাকান্তের সিদ্ধির পর মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন এবং স্বীয় পুত্র প্রতাপকে তাঁহার শিক্ষাধীনে দেন। কিম্বদন্তী আছে যে কমলাকান্ত একভাড় কারণবারি লইয়া যাইতেছিলেন। তাহার গন্ধে সকলেই উত্যক্ত। মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে মদ কেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"ইহা দুধ।" মহারাজা ও উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন—ইহা প্রকৃতপক্ষে দুধ।

আরো বহুবৎসর অতীত হইয়াছে। কমলাকান্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য প্রতাপচান্দ আর নাই। উত্তর সাধিকা প্রিয়তমা দ্বিতীয়া পত্নীও দেহরক্ষা করিয়াছেন। গার্হস্থ্য জীবনের একমাত্র বন্ধন একটি কন্যা। ইহাও তিনি ছাড়িতে চলিলেন। পরপারের ডাক আসিয়াছে। পীড়িত গুরুদেবকে দেখিতে মহারাজ তেজচন্দ্র ছুটিয়া আসিলেন। জীবনলীলার সমাপ্তি সন্নিকট। মহারাজ গুরুদেবকে গঙ্গাতীরে নিতে ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু কমলাকান্ত বারণ করিলেন। তিনি আর্ত্তস্বরে ক্ষুব্ধকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন,—

কি গরজ! কেন গঙ্গাতীরে যাব,
আমি কালো মায়ের ছেলে হ'য়ে,
কেন বিমাতার শরণ লব।

তিনি মহারাজকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন এবং তৎপরদিন আসিতে বলিলেন। তৎপরদিন মহারাজা আসিলে কমলাকান্ত বলিলেন,

'মায়ের মন্দিরের সম্মুখে আমি চোখ বুজিতে চাই,
আমার তৃণশয্যা সেখানে পাতিয়া দাও'।

তাই করা হইল। এক দিব্যভাবে বিভোর হইয়া কমলাকান্ত মায়ের নাম করিতে করিতে মায়ের কোলে সমাধি লইলেন।

১৪। লালাবাবু।

(১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ।)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কলিকাতায় বিশেষ সম্মানিত ও খ্যাত ছিলেন। মর্য্যাদায় তিনি সারা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অতি প্রিয় দেওয়ান ছিলেন। বাংলা ও উড়িষ্যার দেওয়ানী কার্য্য তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত চালান। যথেষ্ট খ্যাতি, অর্থ ও ক্ষমতা তিনি অর্জ্জন করেন। গৃহে প্রভু শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘদিন যাবৎ সেবাপূজা নিয়মমত চলিয়া আসিতেছে।

প্রাণকৃষ্ণ সিংহ তাঁহারই একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভ্রাতা রাধাগোবিন্দ সিংহও প্রচুর বিভবের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তিনি তাঁহার অর্থ ও বিত্তাদি একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহকে দান করিয়া যান। উভয়ের ধন, ঐশ্বর্য্য ও কৌলিন্যের উত্তরাধিকারী হইয়া প্রাণকৃষ্ণ সিংহ পূর্ব্ব ভারতে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (আনুমানিক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে) ইতিহাসবিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র এবং প্রাণকৃষ্ণ সিংহের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। অনিন্দ্যসুন্দর এই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কাঁথির সিংহ পরিবার আনন্দে উচ্ছল হয়। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও নিজে অত্যন্ত সুখী হন।

প্রিয়দর্শন পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নয়নমণি ছিলেন। আদর করিয়া তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে "লালা" বলিয়া ডাকিতেন। প্রাণপ্রিয় পৌত্র এই "লালা"বাবুর অন্নপ্রাশনের সময় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তাহা

ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই উৎসবে আমন্ত্রিত হন। তিনি প্রত্যেকের কাছে সোনার পাতে খোদাই করিয়া আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেন। সেই বিরাট উৎসবের কথা এখন জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে। এই লালাবাবু (ওরফে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) ঐতিহ্য, আভিজাত্য ও বিপুল বিভবের মালিক হন।

বালক "লালা"র মেধা ও প্রতিভা অসাধারণ ছিল। সে ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে। পিতা প্রাণকৃষ্ণ তাহাকে সুশিক্ষা দিতে উৎসুক হন। শুধু সংস্কৃত ও বাংলা নহে, ইংরেজী, ফার্সী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত করার জন্য পিতা প্রাণকৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া পড়েন। বিশিষ্ট শিক্ষকদের চেষ্টা যত্নে লালাবাবু অল্প সময়ের মধ্যে এই কয়টি ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষাতেই তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উত্তরকালে তিনি বিশিষ্ট ফার্সীবিদ্‌রূপে খ্যাতি লাভ করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত তাঁহার পরম প্রিয় ছিল। এই গ্রন্থের কোন শ্লোক সম্বন্ধে কেহ তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিলে তিনি মহাউৎসাহে তাহার নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরভক্তি পরিস্ফুট হয়। গৃহদেবতা গোবিন্দজীউর প্রভাব ও তাঁহার উপর কম ছিল না। বাড়ীর দেবমন্দিরে পুরাণপাঠ, ধর্ম্মসভা ও পূজা প্রভৃতিতে তিনি আবিষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিতেন।

পরোপকারে তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। দীনদুঃখীর কাতরোক্তি তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিত। একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্থ হইয়া তাঁহাদের বাড়ীর সম্মুখে ঘুরিতে থাকেন। দরওয়ান কিছুতেই কর্ত্তা প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিতে দেয় না। কোনরূপে লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র) ইহা দেখিতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণটিকে ডাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন এবং

খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া এক হাজার টাকা দিতে বলেন। খাজাঞ্চি ইহা কর্ত্তার কাছে জানাইলে তিনি বলেন, "ইহা সদ্ব্যয় সন্দেহ নাই। লালা যখন কথা দিয়াছে তখন টাকা দিয়া দাও। কিন্তু ভবিষ্যতে যেন এমন না হয়। লালাবাবু উপার্জ্জনক্ষম হইয়া জমিদারীর আয় বাড়াইতে পারিলে দান ধ্যান করিবে।" দরিদ্র ব্রাহ্মণটিকে টাকাটা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে খাজাঞ্চি লালাবাবুকে কর্ত্তার কঠোর মন্তব্যটিও শুনাইয়া দেন। কথাগুলি তাঁহার অন্তরে ব্যথা দিল। এত বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াও এক কপর্দ্দক দান করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। তিনি সঙ্কল্প করিলেন নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইবেন। পিতৃপিতামহের সঞ্চিত অর্থের এক কপর্দ্দকও তিনি গ্রহণ করিবেন না। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবেন স্থির করিলেন।

মাতার অশ্রুজল পিতার করুণ আনন তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। অল্পদিন মধ্যে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান সহরে উপস্থিত হইলেন।

ফার্সী ভাল জানেন। চাকরী পাইতে বিলম্ব হইল না। তিনি বর্দ্ধমান কালেক্টরীর সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হন। কর্ম্মে অসাধারণ দক্ষতার ফলে তাঁহার ক্রমশঃ পদোন্নতি হইতে থাকে। এই সময় তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা ইংরেজঅধিকারভুক্ত হয়। ইহার পর উড়িষ্যার জরীপের কার্য্যে লালাবাবু নিযুক্ত হন। দক্ষতা ও কৃতিত্বের ফলে তিনি দেওয়ানপদ লাভ করেন। সরকারী কার্য্য উপলক্ষে লালাবাবুর সহিত উড়িষ্যার রাজার পরিচয় হয়। অচিরে তাহা আরও ঘনিষ্ট হইল। পুরীর মন্দিরের রাজকর অনেক বৎসর বকেয়া পড়ে। রাজসরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই কারণে শ্রীমন্দির নীলামে চড়ান। সৌভাগ্যক্রমে নীলামের পূর্ব্বদিন এই দুঃসম্বাদ লালাবাবুর কাণে পৌঁছায়। তিনি তীব্র

অশান্তি বোধ করেন। সর্ব্বজনআরাধ্য হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ পুরীর শ্রীমন্দির এইভাবে নীলামে চড়িবে, শ্রীমন্দির এইভাবে লাঞ্ছিত হইবে,—ইহা তাঁহার সহ্য হইল না।

তৎক্ষণাৎ তিনি নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি স্বীয় দায়িত্বে নীলাম বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সুযোগে মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ রাজকর আদায় দিয়া দিলেন। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। ইহাতে লালাবাবুর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলে তাঁহাকে ধন্যধন্য করিতে লাগিল। তাঁহার সৎসাহস ও সুবিবেচনার জন্য শ্রীমন্দির নীলাম হইতে রক্ষা পাইয়াছে, অমর্য্যাদার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এজন্য পুরীরাজ ও তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং নিজ জমিদারীর কিছু অঞ্চল তাঁহাকে দান করেন। অদ্যাবধি সেইস্থান হইতে আনীত নিমগাছের কাঠ দ্বারা দারুব্রহ্ম জগন্নাথের কলেবর পরিবর্ত্তন করা হয়। প্রতি বার বৎসর অন্তর এই নবকলেবরধারণ উৎসব আজ পর্য্যন্ত পুরীতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

জগন্নাথ বিগ্রহের দর্শন ও সান্নিধ্য, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থানের মাহাত্ম্য, ভক্তিশাস্ত্রপাঠ ও নামকীর্ত্তন শ্রবণ প্রভৃতি তাঁহার অন্তরে এক নিদারুণ ব্যাকুলতা জন্মায়। তিনি তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষে বৃন্দাবনে আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মোহন বিগ্রহ ও লীলাভূমি দর্শনে অনাবিল আনন্দ পান। ব্রজমণ্ডলে তিনি বৈষ্ণব সাধকদের ভজনগুম্পা ও কুঠিয়াগুলি পরিদর্শন করেন এবং বুঝিতে পারেন ভোগ, ঐশ্বর্য্য, যশ, মান সকলই অস্থায়ী। কিন্তু উপায় নাই। সংসারে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অনেক বেশী। তাই তিনি আনন্দময় বৃন্দাবনধাম ছাড়িয়া পুনঃ কর্ম্মজীবনের আহ্বানে উড়িষ্যায় ফিরিয়া আসেন।

এই সময়ে হঠাৎ সংবাদ পান যে তাঁহার পিতৃদেব প্রাণকৃষ্ণ সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত্ত

হন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহে অর্থদান নিয়া পিতা পুত্রের মনোমালিন্য মনে জাগে। পিতার বারবার অনুরোধ সত্বেও কৃষ্ণচন্দ্র দেখা করেন নাই। ইহাই তাঁহার বড় দুঃখ। পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ে ও নয়নের অশ্রু গড়াইতে থাকে। গভীর শোক ও আর্ত্তির মধ্যে পিতার পারলৌকিক কার্য্যাদি কলিকাতায় সম্পন্ন করেন। পিতামহ ও পিতার বিরাট ধন দৌলতের মালিক এখন তিনি একা। এইসব রক্ষা করিতে হইবে। সংসারের ও দায়িত্ব আছে। তাই লালাবাবু উড়িষ্যার বাস উঠাইয়া দিয়া স্থায়ীভাবে কলিকাতায় আসেন।

জীবনে তাঁহার এইবার বিরাট সমস্যা দেখা দিল। বাহিরে তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারী। বৈষয়িক কাজ ও বিলাস ব্যসনে ব্যস্ত। অন্তরে তিনি বিগ্রহসেবা, পুরাণ-ভাগবতপাঠ, দান ও ধ্যানের মধ্য দিয়া একজন বাসনাহীন নীরব ভক্তিসাধক।

এইরকম মনের অবস্থায় একদিন লালাবাবু কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া অফিস হইতে প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছেন। তাঁহার তাঞ্জামের পিছনে পাইক, বরকন্দাজ, ও ভৃত্যের দল চলিতেছে। শীতের পড়ন্ত বেলা, বৈকালের নাতিউষ্ণ রৌদ্র ও মুক্ত বাতাস দেখিয়া তিনি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে চলিয়াছেন। আদেশমত বাহকেরা গঙ্গার ধারেই চলিল। নদীর তীরে এক বড় গাছের ছায়ায় তাঞ্জাম নামাইল। পূতসলিলা সুরধুনী কুলুকুলু নাদে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর নয়নাভিরাম দৃশ্য লালাবাবু মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন। তাঞ্জামের মধ্যে কিংখাবে মোড়া তাকিয়ায় হেলান দিয়া লালাবাবু সুগন্ধি অম্বুরী তামাক সেবন করিতেছেন। মন অনন্তের পানে উধাও হইয়াছে। হঠাৎ তাঁহার কানে বালিকা-কণ্ঠের শব্দ গেল "বাবা! বেলা যে যায়; এবার ওঠো, দিন ত শেষ হয়ে গেল"। এ ব্যাকুল আহ্বান লালাবাবুর অন্তঃস্থলে

গিয়া পৌঁছিল। তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন। ফর্‌সীর নল হাত হইতে পড়িয়া গেল। তিনি দিশাহারা হইলেন।

সত্যই যে বেলা যায়। এই নিদারুণ সত্যকে কি করিয়া অস্বীকার করিবেন? তাঁহার জীবনপ্রান্তে ও ধীরে ধীরে চির-বিরতির যবনিকা নামিয়া আসিতেছে। তাঁহার জীবনে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—সব কিছুরই প্রাচুর্য্য। কিন্তু তাহার তিনি সুযোগ লইলেন কই? আজ ইহ জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া তিনি কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

গঙ্গার ধারে এক ধীবরের কুটির। দ্বিপ্রহরে কর্ম্মক্লান্ত দেহে ধীবর নিদ্রা গিয়াছে। তাহার ঘুম ভাঙ্গে না। তাই ব্যগ্র হইয়া ও সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কন্যা ডাকাডাকি করিতেছে। এই আকস্মিক আহ্বানেই লালাবাবুর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল। মহা-ভোগীর রূপান্তর ঘটিল।

তিনি তাঞ্জাম ছাড়িয়া সেই ধীবর কন্যার কাছে গেলেন। বলিলেন "মা! তোর এই ঋণ শোধ করিতে পারিব না। তোর মুখ দিয়েই আজ রাধারাণী আমায় বৃন্দাবন যেতে ডাক দিয়েছেন। আমি সেখানেই যাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করি মা, তুই চিরসুখী হ্"।

প্রাসাদে ফিরিয়াই তাঁহার নূতনতর জীবন আরম্ভ হইল। মহাপরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী ভোগী ও বিলাসী লালাবাবু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল বেশে ইষ্টধাম শ্রীবৃন্দাবন যাইতে সঙ্কল্প করিলেন।

পত্নী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন কাহারও অনুরোধ শুনিলেন না। দৈন্যভাবে সকলকে বলিলেন, "রাধারাণী কৃপা করে আমায় ডাক দিয়েছেন, "বেলাগেল"। আমায় ছেড়ে দাও। বিষয়কূপে আমি আর পড়ে থাকব না। আজ থেকে জীবনের ব্রত হ'বে রাধাকৃষ্ণের সেবা, ভজন ও পূজন। প্রাণপ্রভু বৃন্দাবনচন্দ্র আর রাইকিশোরীর যেন দর্শন পাই, এই আশীর্ব্বাদই তোমরা

আমায় কর।" পরদিনই ভিখারীর বেশে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন এবং ইষ্টধামের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ভক্তের পবিত্র তীর্থ এই বৃন্দাবনধাম। শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে এই মহাতীর্থের রজ চিরপবিত্র হইয়া আছে। প্রাকৃত বৃন্দাবন, অপ্রাকৃত চিরমধুর বৃন্দাবনের দিব্যদর্শন, লালাবাবু মনে প্রাণে কামনা করেন। ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং কৃচ্ছ্রব্রত তিনি নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। সারাদিন ভজন ও জপে অতিবাহিত করেন। কোন অবসরে বাহির হইয়া মাধুকরী সারিয়া লন। ভিক্ষার ঝুলিতে যাহা পান তাহাই দিয়া উদরপূর্ত্তি করেন।

কলিকাতার প্রাসাদে তাঁহার দৈন্যজীবনের খবর পাইয়া তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী দেবী কাঁদিয়া আকুল হন। তাঁহার পুত্র নারায়ণ ও আত্মীয় স্বজন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহারা সকলেই আসিয়া লালাবাবুকে কাতর অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এত বিত্ত বিভব। কেন তিনি তাহা দেবসেবায় ব্যয় করিবেন না? তাঁহার দেওয়ানজীও তাহাই নিবেদন করিলেন। তখন লালাবাবু তাঁহার পত্নী ও পুত্রের অংশ বাদ দিয়া, তাঁহার অংশের আয় গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন এবং তাহা তিনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপূজা, ঘাট ও মন্দির সংস্কারে ব্যয় করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু নিজের অন্ন নিজে মাধুকরী করিয়া সংস্থান করিবেন এই সিদ্ধান্ত অটল রহিল।

ইহার পর তাঁহার নামে তাঁহার জমিদারী হইতে পঁচিশ লক্ষ টাকা আসিল। তিনি ইহার প্রতিটি মুদ্রা প্রভুর সেবায় ব্যয় করেন। পুরাণ, শাস্ত্র ও সিদ্ধপুরুষদের বর্ণনা অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের লীলাবিজড়িত স্থানসমূহ চিহ্নিত করিয়া এই সব পবিত্র তীর্থ নিজ আয়ত্তে রাখিবার জন্য ব্রজমণ্ডলে তিনি একে একে চুয়াত্তরটি পরগণা ক্রয় করেন। বৃন্দাবন হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাপূত স্থান এবং তৎনিকটবর্ত্তী অঞ্চল তিনি

ক্রয় করেন। এই জমিজমা ও তাহার উপস্বত্ব বিগ্রহ স্থাপনে, মন্দির, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণে ও দেবসেবার কাজে ব্যয়িত হয়।

বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি ভরতপুর প্রাসাদে বাস করেন। ভরতপুরের রাজা তাঁহার পূর্ব্বতন বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে প্রাসাদে থাকিতে দেন। কিছুদিন পরে লালাবাবু ইষ্টবিগ্রহের জন্য এক বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কার্য্যোপলক্ষে তিনি মাসে মাসে ভরতপুরের রাজার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। এই সময়ে ভরতপুররাজের সঙ্গে ইংরেজদের কি এক দলিল দস্তখত লইয়া মনোমালিন্য ঘটে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন রেসিডেণ্ট স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ তখন দিল্লীর দরবারে অধিষ্ঠিত। তিনি এই ব্যাপারে লালাবাবুকে সন্দেহ করেন। এই সন্দেহের বশে লালাবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লী নেওয়ার কালে তাঁহার সঙ্গে ত্যাগব্রতী বৈষ্ণবদের এক বিরাট জনতা গমন করে। লালাবাবুর এই জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখিয়া মেটকাফ্ সাহেব শঙ্কিত হন ও চিন্তিত হইয়া পড়েন। লালাবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করিতে তাঁহার ফার্সী লেখক শান্তিপুরের দেবীপ্রসাদ রায়কে দেওয়া হয়। তাঁহার তদন্তের ফলে ইহা প্রকাশ পায় যে লালাবাবু ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ চিরকালই কোম্পানীর সহযোগিতা করিয়াছে। ইহাতে মেটকাফ্ সাহেবের ধারণা পরিবর্তিত হয়। তিনি তাড়াতাড়ি অভিযোগ প্রত্যাহার করেন।

ইহার পর লালাবাবু বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন এবং ইষ্টদেবের মন্দিরের কাজ আরম্ভ করেন ও দ্রুত সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হন। ধীরে ধীরে এই বিরাট মন্দির পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। "গম্ভীরা" গৃহে মহাসমারোহে মুরলীধর কৃষ্ণচন্দ্রমাজীউর নয়নাভিরাম মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে লালাবাবু জমিদারীর আয়ের বৃহদংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সাধুসন্ত ও দরিদ্র জনগণ এই মহাবৈষ্ণবের সেবাপরায়ণতার সুখ্যাতি আরম্ভ করেন এবং

লালাবাবুর অন্নছত্র সহসা ব্রজমণ্ডলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ভক্ত লালাবাবুর অন্তরের একান্ত ইচ্ছা তাঁহার স্থাপিত বিগ্রহ যেন জাগ্রত হইয়া উঠে। এক একদিন তিনি কাঁদিয়া আকুল হন। গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইতে থাকে। তিনি কাতর কণ্ঠে বলিতেন—"হে ঠাকুর। তুমি নিত্য জাগ্রত। তোমার লীলা অধমকে দেখাও।" লালাবাবুর এই কাতরোক্তি ও আকুল আবেদনে প্রাণের ৺ঠাকুর সাড়া দেন।

মাঘমাস। বৃন্দাবনে বেজায় শীত। ষোড়শোপচারে ৺ঠাকুরের পূজা সেদিন সকাল বেলা হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াইয়া লালাবাবু ভক্তিভরে নয়নমনোহর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেছেন এবং আকুল প্রাণের ব্যাকুলতা ছাপাইয়া নয়নাশ্রু বহিতেছে। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার আরাধ্য ঠাকুর প্রাণবন্ত হইয়াছে। পরীক্ষা করিতে এক তাল মাখন লইয়া পূজারীকে তাহা শ্রীবিগ্রহের মাথার তালুর উপর বসাইয়া দিতে বলিলেন। ৺ঠাকুর যদি প্রকৃতই প্রাণবন্ত হয়, মাখন গলিয়া যাইবে। পূজারী প্রথমতঃ আপত্তি করিল। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে? কিন্তু লালাবাবুর আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী পূজারী এক তাল মাখন শ্রীবিগ্রহের ব্রহ্মতালুর উপর রাখিল। পূজা অর্চ্চনা পূর্ব্ববৎ চলিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল শ্রীবিগ্রহের মাথার উপর রক্ষিত মাখন গলিয়া পড়িতেছে ও শ্রীবিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গ মাখনলিপ্ত হইতেছে। মন্দিরের পূজারী ও সেবকগণ ইহা দেখিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ভাবাবেশে কাঁদিতে কাঁদিতে লালাবাবু মন্দিরের মেঝেতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

আর একদিনের কথা। সেদিন লালাবাবুর মাথায় আর এক নূতন খেয়াল চাপিল। তিনি ভাবিলেন, বিগ্রহের মাথায় যদি উত্তাপ থাকে এবং তাহাতে মাখন গলিয়া যায়, তবে নাসিকায় নিঃশ্বাস

বহিবেনা কেন? তখনই পুজারীকে দিয়া একটুকরা তুলা আনাইলেন এবং শ্রীবিগ্রহের নাসিকার কাছে তাহা ধরিতে বলিলেন। তুলাখণ্ড নাসিকার কাছে আগাইয়া দিতেই দেখা গেল, নাসারন্ধ্রের বাতাসে তুলা ঘন ঘন কাঁপিতেছে। ঠাকুরের এই কৃপালীলা দর্শনে লালাবাবু উল্লসিত হইলেন এবং প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাটমন্দিরে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

ইহার পর লালাবাবুর উপর আদেশ হইল, তিনি যেন ব্রজমণ্ডলের সমস্ত তীর্থ পরিব্রাজন করিয়া গিরিগোবর্দ্ধনে যাইয়া তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন। উহাতে লালাবাবুর দুঃখ হইল। মধুর বৃন্দাবনে তাঁহার স্থাপিত কৃষ্ণচন্দ্রমাজীউকে ছাড়িয়া তিনি কোথায় যাইবেন? কিন্তু ৺ঠাকুরের প্রত্যাদেশ কি করিয়া লঙ্ঘন করিবেন? তাই ব্রজমণ্ডলের সমস্ত তীর্থাদি পরিব্রাজন করিয়া গিরিগোবর্দ্ধনে আসিলেন। মন্দিরের পূজা অর্চ্চনা সারিয়া গোফায় বসিয়া সাধন ভজন করিতে থাকেন। এই সময়ে এক দিবস গোবর্দ্ধনে বেজায় বর্ষা নামিল। ঝড় জল অত্যন্ত প্রবলাকার ধারণ করিল। মন্দিরের পূজারী অনেক রাত্র অবধি ভোগের প্রসাদ পৌঁছাইয়া দিতে পারিল না। মধ্যরাত্রের পর ঝড় জল থামিলে মন্দিরে গিয়া পূজারী দেখেন যে ভোগের থালা নাই। তিনি বিস্মিত হইলেন। পূজারী ব্যতীত মন্দিরে যে আর কেহ নাই! কোথায় গেল ভোগের থালা? অগত্যা তিনি কিছু প্রসাদী ফুল লইয়া লালাবাবুর গোফায় গেলেন। ভোগের থালা পাওয়া যাইতেছেনা ও আনিতে পারিলেন না বলিয়া তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া লালাবাবু বলিলেন, "সে কি! একটু আগেই যে তুমি আমায় ভোগের থালা দিয়া গিয়াছ। আমি প্রসাদ যথাসময়ে পাইয়াছি।" পূজারী ও লালাবাবুর তখন বুঝিতে বাকী রহিলনা যে, ইহা ঠাকুরের লীলা। ঠাকুরের পরম ভক্ত অনাহারে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া ঠাকুর নিজেই প্রসাদের থালা বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহা বুঝামাত্রই

লালাবাবুর সারাদেহে প্রেমকম্পন আরম্ভ হয় এবং তিনি সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িয়া যান। এখন লালাবাবুর গুরু করণের ইচ্ছা। তজ্জন্য তিনি অনেক স্থানে ঘোরাঘুরি করেন। কিন্তু সকলেই বলেন যে সময় মত তাঁহার সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইবে। ক্রমশঃ দিন যাইতে লাগিল এবং গুরু পাওয়ার ইচ্ছা তাঁহার আরও প্রবল হইল। এই সময়ে পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস বাবাজী গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় আসেন। লালাবাবু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শরণাগতি ভিক্ষা করেন। এই কৃষ্ণদাস বাবাজী ভক্তমাল গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তিনি বলিলেন তোমার এখনও সূক্ষ্ম অহমিকা আছে। তাহা দূর হইলে আমি নিজেই আসিয়া তোমায় দীক্ষা দিব। তোমার কোথাও যাওয়া দরকার নাই।

এইভাবে কয়েকমাস অতিবাহিত হইল। হঠাৎ একদিন লালাবাবু মাধুকরীর জন্য শেঠজীর মন্দিরে গেলেন। এই শেঠজী ও লালাবাবুর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে বহু মামলা মোকর্দ্দমা ও হইয়াছে। সেদিন শেঠজীর মন্দিরে ভিখারীর বেজায় ভীড়। তন্মধ্যে গৌরকান্তি সুদর্শন এই পরম বৈষ্ণবকে দেখিয়া সকলেই চিনিতে পারিল, ইনি রাজা লালাবাবু। মাধুকরী ভিক্ষার জন্য আসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ শেঠজীর নিকট খবর গেল। লালাবাবু স্বয়ং ভিক্ষার্থে আসিয়াছেন। শুনিয়া শেঠজী বিস্মিত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ একটি থালায় করিয়া ভিক্ষার চাউল ও ১০১টি স্বর্ণমুদ্রা আনিলেন এবং রাজা লালাবাবুর নজরানা বলিয়া দিতে গেলেন। লালাবাবু তাহা স্পর্শ ও করিলেন না। কারণ বৈষ্ণবের স্বর্ণে প্রয়োজন নাই। একমুষ্টি চাউল ভিক্ষা করিয়া লইলেন এবং উভয় পক্ষের বাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ শেঠজী অত্যন্ত অভিভূত হইলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন এবং উভয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। এই মাধুকরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া লালাবাবু তাঁহার

ভজন কুঠিরের দিকে যাইতেই দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে তাঁহার বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস বাবাজী। বাবাজী মহারাজের চোখে মুখে এক দিব্য প্রসন্নতার দীপ্তি। লালাবাবু ভক্তিভরে প্রণাম করিতেই বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, "লালা! এইবার তোমার সময় হইয়াছে। আমিও আসিয়াছি। প্রতিদ্বন্দ্বী ধনকুবের শেঠজীর কাছে এতদিন মাধুকরী করিতে যাও নাই। তোমার অন্তরের গোপন গভীরে যে সূক্ষ্ম অহমিকাটুকু ছিল তাহা আজ বিনাশ হইয়াছে। ক্ষেত্র তোমার প্রস্তুত। দীক্ষাদানের আর কোন অন্তরায় নাই।" ইহার পর একদিন শুভলগ্নে কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ লালাবাবুকে দীক্ষা দেন।

নবদীক্ষিত শিষ্যের সাধনজীবন এইবার আরম্ভ হইল। গুরুর আদেশেই তিনি নির্জ্জনে গোফায় থাকেন এবং কোন জনমানবের মুখ দর্শন করেন না। কয়েক বৎসর মধ্যে তাঁহার তপস্যা সার্থক হয়। ইষ্টবিগ্রহের দর্শন ও লীলারস ভুঞ্জনে তিনিই পূর্ণ মনস্কাম হন।

এই সময়ে সিন্ধিয়ার অধিপতি পারেখজী বৃন্দাবনে আসেন। বিশিষ্ট তীর্থ ও লীলাস্থানাদি দর্শন করিয়া অধ্যাত্ম জীবনযাপনের জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হয়। তিনি ভক্তিসিদ্ধ বৈষ্ণব লালাবাবু হইতে দীক্ষা নিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু লালাবাবু সতর্ক করিয়া দেন যে, কৃষ্ণসাগরে ডুব দিতে হইলে তাঁহাকে এই কুলের বন্ধন কাটাইতে হইবে। সর্ব্বত্যাগী ও কৌপিনবস্ত হইয়া তাঁহাকে গোবর্দ্ধনের গোফায় থাকিতে হইবে। এই জন্য দরকার পূর্ব্বজন্মের প্রচুর সুকৃতি। ইহা শুনিয়া সিন্ধিয়া অধিপতি ভক্তিভরে লালাবাবুর চরণ বন্দনা করিয়া গোবর্দ্ধন ত্যাগ করেন।

লালাবাবুর বৈরাগ্য সাধনা ও সিদ্ধির খ্যাতি সারা ব্রজমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বৃন্দাবনধামে যে কোন ভক্ত আসুক না কেন, গোবর্দ্ধন গোফাবাসী এই পরম বৈষ্ণবকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হন। ফলে গোফার সম্মুখে প্রত্যহ জনসমাগম বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বিফল মনোরথ না হন। জীবেশ্বর তেওয়ারী যোগীবরকে তদ্রূপ প্রতিশ্রুতি দেন।

বিশবৎসর পর ঝুঁসিতে দেখা হইলে যোগীবর জীবেশ্বরকে সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং জীবেশ্বরকে বলেন যে আগামী পরশ্ব মৌনী অমাবস্থার দিন জীবেশ্বরের এক পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে। এবং সেই সন্তান যোগীবরকে দান করিতে হইবে। ইহাতে জীবেশ্বর ও হরপিয়ারী যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু বলিলেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইবে না।

যথাসময়ে ১৮০০ সালের মৌনী অমাবস্থার স্নানের দিন হরপিয়ারী দেবী প্রয়াগক্ষেত্রে এক অনিন্দ্যসুন্দর শিশুপুত্র প্রসব করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা যোগীবর শিষ্যসহ সেখানে উপস্থিত হন।

জীবেশ্বর ও তৎপত্নী যোগীবরের আগমন কারণ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু একদিকে সত্যরক্ষা ও ধর্ম্মপালন ও অপরদিকে অপত্যস্নেহ—কোনটা রক্ষা করিবেন ভাবিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর জীবেশ্বর নিজের মনকে দৃঢ় করিলেন। পত্নীর কোল হইতে শিশুটাকে লইয়া সন্ন্যাসী যোগীবরের কোলে দিলেন। কিছুক্ষণ যোগীবর শিশুরদিকে তাকাইয়া বলিলেন "শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টাভিজায়তে"। এ শিশু পূর্ব্বজন্মে এক বিশিষ্ট যোগী ছিল। তোমার ঘরে যদিও জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইবে না। আজ থেকে এই শিশুর উপর তোমাদের কোন অধিকার নাই। সন্ন্যাস জীবনের জন্য, সর্ব্ব-ত্যাগী যোগী জীবনের জন্য এ শিশু চিরতরে চিহ্নিত হইয়া রহিল। তাহাকে তোমাদের কাছে রাখিয়া গেলাম। সময় হইলেই বৈদিক সংস্কারাদি করিয়া ইহাকে লইয়া যাইব।"

ইহা বলিয়া তিনি শিশুকে ফিরাইয়া দিলেন ও সন্ন্যাসীরা প্রস্থান করিলেন। জীবেশ্বর ও হরিপিয়ারী নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

জীবেশ্বর তেওয়ারীর প্রথম দুই পুত্রের নাম জীবনারায়ণ ও জীবরাম। তাই নবজাত এই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হইল বেণীপ্রসাদ। প্রয়াগে বেণীমাধব ক্ষেত্রে তাহার জন্ম বলিয়া শিশুর এই নাম রাখা হইয়াছিল।

প্রয়াগ হইতে শিশুপুত্রকে লইয়া কনৌজে ফিরিবার কালে তাঁহারা অরণ্যমধ্যে ডাকাতের হাতে পড়েন। তাঁহার পাইক-বরকন্দাজ সকলেই মারের চোটে ধরাশায়ী হয়। জীবেশ্বর ডাকাতদের সর্ব্বস্ব দিয়া বলেন, "শিশুপুত্র লইয়া যাইতেছি। পথে কিছু খাবার দরকার হইতে পারে। কিছু টাকা ফেরৎ দিলে ভাল হয়।" ডাকাত সর্দ্দার শিশুকে দেখিতে চাহে। শিশুকে দেখান হয়। নবজাত শিশুকে দেখিয়া ও তাহার সুঠাম সুগৌর কোমল অঙ্গ ও কান্তি দর্শনে ডাকাত সর্দ্দার দয়ার্দ্র হয় এবং সব টাকা ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। ডাকাতেরা বলাবলি করিতে লাগিল, এই শিশুর দরুণ সকলেই প্রাণে বাঁচিয়াছে। নচেৎ কেহই প্রাণ লইয়া ফিরিত না। কয়েকদিন পরে জীবেশ্বর কনৌজে পৌঁছিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

পুত্রের বয়স পাঁচ বৎসর হইলে তাহার বৈদিক সংস্কার করাইয়া উপনয়ন দেওয়া হইল। শুভ বিদ্যারম্ভও হইল। এই বালক বেদ-পুরাণ প্রভৃতি সত্বর আয়ত্ত করিতে লাগিল। এই সময়ে একদিন যোগীবর তেওয়ারীজীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "এইবার বেণীপ্রসাদকে আশ্রমে লইয়া যাইব। সেখানে সে প্রকৃতির কোলে থাকিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিবে। বলিতে বলিতে যোগীবরের আনন উজ্জ্বল হইল। বালকের শিরে হাত রাখিয়া নয়ন মুদিলেন। চঞ্চল বালক বেণীপ্রসাদ এক মুহূর্ত্তে নিশ্চল হইয়া গেল। অন্তরে তাহার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সাত্ত্বিক সংস্কার জাগিয়া উঠিল। বালক ভাবাবিষ্ট অবস্থায় যোগীবরের দিকে চাহিয়া রহিল। স্বাভাবিক অবস্থায়

ফিরিয়া আসিলে বালক যোগীবরের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "প্রভু! আপনার আশ্রমেই যাইব। কৃপা করিয়া আমাকে সেখানে লইয়া চলুন।" অতঃপর বালক জননীর নিকট ছুটিয়া গিয়া নানা প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দেয় এবং সেই দিনই তেওয়ারী বাড়ী আঁধার করিয়া ও পরিবারের সকলকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া বালক বেণীপ্রসাদ যোগীবরের আশ্রমে চলিয়া গেল।

বড় সুন্দর এই আশ্রম। চতুর্দ্দিকে পাহাড়। আশ্রমের সম্মুখে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী। প্রভাত না হইতেই আরম্ভ হয় পাখীর বন্দনা গান। বৃদ্ধ যোগীবরের স্নেহ ভালবাসা ও অপার্থিব যত্নে বালক বেণীপ্রসাদ বড় হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল তাহার শিক্ষা ও সাধনা। শাস্ত্রাদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে সাধন ও মহাত্মাজীর উপদেশ।

আশ্রমের এই শান্ত ও নিরালা পরিবেশে বেণীপ্রসাদের এগার বৎসর অতিবাহিত হইল। অসামান্য মেধা, স্মৃতিশক্তি, বিচার বিশ্লেষণ ও উদ্ভাবনী শক্তি বালকের মধ্যে দেখা গেল। পুত্রপ্রতিম ছাত্রের এই কৃতিত্ব দর্শনে যোগীবর অত্যন্ত আনন্দিত হন। ইহার পর একদিন বেণীপ্রসাদকে লইয়া যোগীবর কনৌজে আসিলেন। বহু বৎসর পরে পুত্রকে দেখিয়া জনক জননী অত্যন্ত পুলকিত হইলেন।

যোগীবর তাঁহাদিগকে এই পুত্রের বিবাহ দিতে বলিলেন। কহিলেন, কিছুদিন তাহাকে সংসারধর্ম্ম করিতেই হইবে। তবেই প্রারব্ধের ভোগ ক্ষয় হইবে। তারপর যথাসময়ে আসিয়া তিনি তাহাকে লইয়া যাইবেন।

বেণীপ্রসাদ কাতর হইয়া পড়িল। কি অপরাধে গুরুদেব তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, বুঝিতে পারিল না। অথচ গুরুর আদেশ। অমান্য করিবার উপায় নাই।

একবৎসরের মধ্যে বেণীপ্রসাদের বিবাহ হইল। পত্নী গঙ্গা দেবীর বয়স তখন মাত্র এগার বৎসর। যেমন সুন্দরী তেমনই

সুলক্ষণা। কয়েক বৎসর উভয়ের আনন্দে অতিবাহিত হইল। বেণীপ্রসাদের এক অনিন্দ্য সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইল।

কিন্তু পুত্রের জন্মের পর বেণীপ্রসাদের ভাবান্তর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ধীরে ধীরে তিনি সংসারবন্ধনে জড়াইয়া পড়িতেছেন এবং ক্রমশঃ যোগীবরের কৃপা হারাইতেছেন। মর্ম্মান্তিক দহনে দগ্ধ হইয়া বেণীপ্রসাদ কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, "হে প্রভু! আমায় সঙ্কটে উদ্ধার কর। আমায় বাঁচাও। তোমার আলোক ও আশীষ আমার উপর বর্ষিত হউক।"

সেইদিনই গভীর রাত্রে বেণীপ্রসাদ তাঁহারই পরমারাধ্য যোগীবর ও শিক্ষাগুরুর দর্শন পাইলেন। তিনি বলিলেন, "এবার বন্ধন কাটিয়ে বেড়িয়ে এসো। আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করো না। অমূল্য সময় নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।"

রাত্রি প্রভাতে বেণীপ্রসাদ পিতার নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং জনক-জননী ও পত্নী গঙ্গাদেবী হইতে অনুমতি ও বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। যোগীবরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বেণী-প্রসাদ অধীর। ব্যাকুলতার মাঝে প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিতেছেন। হঠাৎ পথিমধ্যে যোগীবরের দর্শন পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গ লইলেন।

কিছুদিন যোগীবরের সঙ্গে থাকিয়াই নিগূঢ় যোগ ও সাধনা আয়ত্ত করিলেন। তৎপর মন্ত্রদীক্ষার জন্য যোগীবরকে বলিলে তিনি কহিলেন, "তুমি মন্ত্রদীক্ষার জন্য ব্যস্ত হইও না। দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বর তীর্থে মহা সমর্থ গুরু তুমি শীঘ্র পাইবে। তারপর যোগীবর সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ধ্যানাসনে বসিয়া নরলীলা সম্বরণ করিলেন।

তরুণ সাধক বেণীপ্রসাদ শোকে মুহ্যমান হইলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের পথে বাহির হইয়া পড়েন। এই পর্য্যটন সময়ে তিনি

রামেশ্বর তীর্থে যোগীবর ত্রৈলিঙ্গস্বামীর দর্শন। পান পূর্ব্বনির্দ্দেশমত তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লন। তাঁহার সন্ন্যাসনাম হইল ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী।

ত্রৈলিঙ্গস্বামী শিবকল্প মহাযোগী। স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র মহাপুরুষ। তিনি নির্দ্দিষ্ট আশ্রম বা মণ্ডলী গ্রহণের প্রয়াসী নহেন। তিনি ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। তাই, তিনি দুই তিন বৎসরের মধ্যে রামেশ্বর ত্যাগ করেন। বিদায়ের কালে ত্রিপুরলিঙ্গকে বলেন, "চিন্তা করোনা, পরিব্রাজনে থাক। অবশেষে সব পাইবে।" ত্রিপুরলিঙ্গস্বামী কিষ্কিন্ধ্যা, পম্পাসরোবর ঘুরিয়া নর্ম্মদাতীরে আসেন। এইখানে বিভূতিযোগসম্পন্ন জ্যোতিস্বামীর সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তিনি দেখিতে পান জ্যোতিস্বামী চিমটার স্পর্শে তাঁহার ঝোলা হইতে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া উপস্থিত সকলকে বিলাইতেছেন। ইহাতে ত্রিপুরলিঙ্গস্বামী বিস্মিত হন এবং তাহার কারণ নির্ণয় করিতে উদগ্রীব হন। তাঁহার নিকট থাকিয়া ত্রিপুরলিঙ্গস্বামী সাধন ভজনের উপদেশ পান এবং আত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হন।

তাঁহার এক বন্ধুর অনুরোধে তিনি পত্নী ও পুত্রকে দেখিতে বাড়ী আসেন। সেদিন পুত্রের উপনয়ন হইতেছিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার পুত্র স্বল্পায়ু এবং তাহার জীবন প্রদীপ শীঘ্রই নিবিয়া যাইবে। তিনি তাহা তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন এবং পত্নী গঙ্গাদেবীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে সংসার অনিত্য। তৎপর তিনি চলিয়া গেলেন। বলাবাহুল্য অল্পদিন মধ্যেই পুত্র এক মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগিয়া মৃত্যু বরণ করিল।

ত্রিপুরলিঙ্গস্বামী হিমালয় পরিব্রাজনকালে এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকন্যাকে আবাহন করিয়া অগ্নিপ্রজ্জলিত করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। তিনি তাহা শিখিতে বাসনা করেন ও শিখিয়া লন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে আপ্তকাম হন এবং ঢাকায় স্বামীবাগে

আশ্রম স্থাপন করেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল আনন্দ পাকরাশী, পুলিন দাস ও নারিন্দার পুরন্দর ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য ছিলেন। পুরন্দর ঘোষকে তিনি একবার তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে জলডুবি হইতে উদ্ধার করেন।

কয়েকটি ভক্তিমতী মহিলা ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামীজীর আশ্রমে যাওয়া আসা করিত। ইহাতে ঢাকায় নানাপ্রকার গুজব রটে। ডাক্তার নৃপেন বোসও এই সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করেন। একদা ভোলাগিরি মহারাজ ঢাকায় আসিলে তাঁহার শিষ্য নৃপেন বোসকে লইয়া ত্রিপুরলিঙ্গস্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে যান। ভোলাগিরি হঠাৎ বলিয়া উঠেন, 'সাধুজী তুম্ নাঙ্গা হো যাও'। তিনি তৎক্ষণাৎ নাঙ্গা হইলেন। সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাইলেন এই বিরাটকায় মহাপুরুষের লিঙ্গ শিশুলিঙ্গবৎ। তাহা দেখিয়া ডাক্তার বোস লজ্জিত হইলেন। তখন ভোলাগিরি মহারাজ ডাক্তার বোস ও অন্যান্য সকলকে সাধু মহাত্মাদের আধ্যাত্মিক সিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে নিষেধ করিলেন।

উভয় সন্ন্যাসী অতি উচ্চস্তরের সাধু ছিলেন। উভয়ের পরস্পর সাক্ষাতে লোকের অলীক সন্দেহ দূর হইল। তৎপর ভোলাগিরি মহারাজ ত্রিপুরলিঙ্গস্বামী হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর ত্রিপুরলিঙ্গস্বামীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। গিরিমহারাজের লীলারঙ্গের মধ্য দিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামীর যোগশক্তি ও মাহাত্ম্য আরও প্রকাশ পাইল।

দেড়শত বৎসরের অধিককাল এই শক্তিধর মহাপুরুষ ও যোগী তাঁহার নরদেহে অবস্থান করেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে তাঁহার করুণার ধারা শত শত আর্ত্ত আশ্রয়ার্থী ও মুমুক্ষুকে উদ্ধারের সহায়তা করে।

২৬। হংসরাজ অবধূত।

(১৮২৯ খৃষ্টাব্দ।)

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সিপাহীযুদ্ধের সমকালে পাঞ্জাবের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণপরিবারে হংসবাবা জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা উভয়েই সাত্ত্বিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। গৃহে প্রায়শঃ সাধুসন্তদের আগমন অব্যাহত থাকিত। তাঁহাদের কাছে তীর্থ ভ্রমণের বিচিত্র কথা, সাধকদের মহিমা ও সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা শুনিতেন।

সম্প্রতি তাঁহাদের ঘরে এক প্রবীণ সন্ন্যাসী অতিথি হইয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অমৃতসরের বেদান্তবাদী সাধু অনুভবদেব বড়ই উন্নত সন্ত। তিনি সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশের গৌরবের বস্তু। সন্ন্যাসীর এই উক্তি হংসবাবার প্রাণে লাগিল। ইহার পর তিনি একবস্ত্রে পদব্রজে অনুভবদেবের আশ্রয় গ্রহণ উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়েন।

সেদিন শিবরাত্রি। সেই উপলক্ষে আশ্রমে সারাদিনব্যাপী ধ্যান, ভজন ও পারায়ণ চলিয়াছে। রাত্র গভীর। স্বামী অনুভবদেব সাধনকুটীরে গিয়া ধ্যানে বসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এমন সময় এক অপূর্ব্বদর্শন বালক অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। অনুভবদেব দেখিলেন বালকটী যেন একটুকরা আগুন। তিনি বলিলেন, "এত রাত্রে ঘর ছাড়িয়া এখানে কেন?" বালক উত্তর দিল, সে চিরদিনের জন্য ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে এবং তাঁহার আশ্রমে থাকিতে তাহার একান্ত বাসনা। অনুভবদেব কিয়ৎক্ষণ এই বালকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বুঝিতে পারিলেন পূর্ব্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার তাহার প্রবল। তাহাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব। তিনি বয়স কত জিজ্ঞাসা করায় বালক উত্তর দিল "বারোবৎসর।"

এই নবাগত বালককে অনুভবদেব তাঁহার আশ্রমে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। এখানকার বিগ্রহপূজা, অর্চ্চনা, অতিথি অভ্যাগতদের সেবা, বহু আশ্রমিকের আহার্য্য তৈয়ারী এবং আশ্রমের বহু গরু মহিষের তত্ত্বাবধান, সমস্ত এই বালক হংসবাবার উপর ন্যস্ত হইল।

বালক হংসবাবা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিতেন। আত্মকর্ম্ম ও স্নান সারিয়া ধ্যান ও জপে বসিতেন। তৎপর স্বাধ্যায় সমাপন করতঃ গোচারণে বাহির হইতেন। ফিরিয়া আসিয়াই রান্না ও থালা বাসন পরিষ্কার করার কাজে লাগিতেন। রাত্রে সাধন ভজন ও আশ্রমের কাজ শেষ করিয়া যখন শুইতে যাইতেন, শরীর তখন এলাইয়া পড়িত। এমনই কঠোরতার মধ্য দিয়া তাঁহার নূতন-জীবনচর্চ্চা চলিত।

কয়েকবৎসর অতীত হওয়ার পর অনুভবদেব এই নবীন ব্রহ্মচারীকে বেদান্তের পাঠ গ্রহণের জন্য পণ্ডিত কালা সিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই স্বনামধন্য পণ্ডিতের কাছে হংসবাবা কয়েক বৎসর পাঠ গ্রহণ করেন এবং অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভাবলে বেদান্তের জটিল তত্ত্বসমূহ আয়ত্ত করেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন মহাত্মা অনুভবদেব ইহলীলা সম্বরণ করেন। নবীন ব্রহ্মচারী অনুভবদেবের এই আকস্মিক বিয়োগে শোকে অধীর হন। উন্মাদের মত নানা মঠ, মন্দির ও তীর্থস্থান তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একদিন নির্ব্বাণী আখাড়ায় আসেন এবং সেখানে হীরানন্দ অবধূতের দর্শন লাভ করেন। মনের অস্থিরতা নিরসনের জন্য তাঁহার নিকট দীক্ষা লন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হয় হংসবাবা অবধূত। উত্তর জীবনে তিনি হংসবাবা নামে প্রখ্যাত হন।

হীরানন্দ অবধূত ছিলেন, পরম আত্মজ্ঞানী সাধক। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তিনি হংসবাবার নিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়া বারোবৎসরের জন্য তীর্থ ভ্রমণের নির্দ্দেশ দিলেন। সতর্ক করিয়া

দিলেন যেন অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করে এবং কোন গৃহস্থ বাড়ীতে যেন রাত্রিযাপন না করে। আশীর্ব্বাদ করিলেন তাহার যেন পরম-প্রাপ্তি ঘটে এবং সাধনায় জয়যুক্ত হয়।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হংসবাবা পরিব্রাজনে বাহির হইয়া পড়েন। পরিব্রাজক জীবনে হংসবাবা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গুরুর আদেশ পালন করেন।

হিমালয়ের উচ্চতর স্থানে অনেকবার তাঁহাকে প্রচণ্ড শীতে কাটাইতে হইয়াছে। কোন কোন দিন এমনও হইয়াছে যে, তিনি বৃক্ষতলে পত্রস্তূপের উপর শুইয়া আছেন এবং পানীয় জল রাত্রের হিমে একেবারে বরফ হইয়া গিয়াছে।

এইভাবে হংসবাবা পূর্ণ বারোবৎসর বৈরাগ্যময় পরিব্রাজক-জীবন অতিবাহিত করেন। অযাচিতভাবে ভিক্ষায় যাহা পাইতেন, তাহা দিয়া জীবনধারণ করিতেন। "হরিহর" বলিয়া গৃহীদের কাছে উপস্থিত হইতেন। পাইতেন কখনও মিশ্রিত অথবা শাকশব্জী একত্রিত করা ভোজ্য দ্রব্য। আবার কখনও বা তিরস্কার বা শ্লেষোক্তি। ইহাতে হংসবাবা ক্ষুন্ন হইতেন না। এই বারো বৎসরে তিনি একটি দিনও রন্ধন করেন নাই। আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া ভোজন ও করেন নাই। অরণ্যে, পর্ব্বতে ও নির্জ্জন প্রবাসে তিনি বহুবার হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বদা এই তপঃনিষ্ঠ সাধক অলৌকিকভাবে রক্ষা পাইয়াছেন। মাঘের শীতে হংসবাবা অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় ধ্যানাবিষ্ট থাকিতেন। রৌদ্র, বর্ষা, ঝড়. তাণ্ডব তাঁহার কাছে কোন পার্থক্য আনিয়া দিত না। আসমুদ্র হিমাচল, প্রায় সবতীর্থগুলি হংসবাবা ঘুরিয়া বেড়ান। একবার তিনি ভারতের বাহিরে আফগানিস্থানে ও যান। সেখানে এক নির্জ্জন পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রায় দেড়বৎসর ধ্যান ও ভজনে অতিবাহিত করেন। এই হিন্দুযোগীর খ্যাতি অবিলম্বে আফ-গানিস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। কিষমিষ, বাদাম, পেস্তা, আখরোট,

প্রভৃতি বহু জিনিস আফগানিরা ভেট আনিত। কেহ রোগ-মুক্তির জন্য আসিত। কেহ বা আসিত শোকে সান্ত্বনার জন্য। বাবাজী কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। কিন্তু ক্রমশঃ জনসমাগম বৃদ্ধি পায় বলিয়া ও একান্ত সাধন ভজনের বিঘ্ন হওয়ায় তিনি একদিন পলাইয়া চলিয়া আসেন। দেবতাত্মা হিমালয় ও নর্ম্মদা-তীর তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল।

একবার তিনি উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে পরিব্রাজনকালে তাঁহার ভজন কুঠীরের প্রাঙ্গনে এক বিরাট নরখাদক ব্যাঘ্র দেখিতে পাইলেন। হংসবাবা আগাইয়া আসিয়া নরখাদক ব্যাঘ্রপুঙ্গবকে পরমাত্মার কথা শুনাইলেন। ব্যাঘ্র এই উচ্চতর দর্শনের কথা বুঝিতে পারিল কিনা বুঝা গেলনা; কিন্তু একটী গৃহপালিত পশুর মত ধীরে ধীরে গৃহপ্রাঙ্গন হইতে বাহির হইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

আর একদিনের কথা। একটি ক্ষুদ্র সন্ন্যাসীজমায়েতের সঙ্গে হংসবাবা মধ্যপ্রদেশের এক অরণ্যাঞ্চলের ভিতর দিয়া চলিতেছেন। হঠাৎ এক বৃহদাকার ব্যাঘ্র উপস্থিত হইয়া বনভূমি কম্পিত করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি হংসবাবা অকুতো-ভয়ে আগাইয়া গিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, “তোমার ভোজনের জন্য আমি নিজকে উৎসর্গ করিতেছি। তুমি আমাকে নিয়া আমার সঙ্গীদের ছাড়িয়া দাও। ব্যাঘ্র এই সহজলভ্য শিকার গ্রহণ করিলনা। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইবার পর ধীরে ধীরে ব্যাঘ্রটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। ঐশ্বরিক কৃপা ও আত্মত্যাগের দীপ্তিতে হংসবাবার পরিব্রাজক জীবন অত্যুজ্জ্বল ছিল।

হিমালয়ের নিম্নভূমিতে পরিব্রাজনকালে এক সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার ভক্ত হন। হংসবাবার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি বাবাজীকে একটী ছোট তাঁবু ও একজন চৌকিদার সঙ্গে দেন। তিনি কিন্তু চৌকিদারকে তাঁবুতে শোয়াইয়া নিজে বাহিরে থাকিতেন ও

নিরালায় সাধনভজন করিতেন। বার বৎসর অতীত হইলে তিনি গুরু হীরানন্দ অবধূতের নিকট ফিরিয়া আসেন। গুরুর কাছে থাকিয়া তিনি পরমাত্মবোধ, ব্রহ্মসাধনা ও নানা সাধন ভজন আয়ত্ত করেন। তারপর হীরানন্দ হংসবাবাকে আপ্তকাম হইয়াছে দেখিয়া আচার্য্য জীবন যাপন করিতে বলেন। তিনি গুরুর চরণে প্রণতি জানাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরেশনাথ পর্ব্বতের কাছে, যশিডির এক প্রান্তে, ক্ষুদ্র পাহাড়ের এক শৃঙ্গে হংসবাবা আশ্রম স্থাপন করেন। ভক্তেরা শ্রদ্ধাভরে আশ্রমের নাম দেন, "কৈলাস"।

যশিডি পাহাড়ে অত্যন্ত সাপের উপদ্রব ছিল। একবার একটি সাপ তাঁহার সম্মুখে পড়ে এবং কয়েকবার ফোঁস ফোঁস করিয়া মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। এক ভক্ত একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, এই প্রকার জঙ্গলে সাপ ও বাঘের মধ্যে তিনি কি করিয়া বাস করেন। বাবাজী সহাস্যে উত্তর দিলেন, "সাপ, বাঘ ও সাধু—এরাই যে প্রকৃত জঙ্গলবাসী"।

তাঁহার আশ্রম ধীরে ধীরে খ্যাত হইয়া গেল। ক্রমশঃ বহু ভক্ত ও সেবকের সমাগম হইতে লাগিল। সাধু সন্ন্যাসীরা আশ্রমে ভিক্ষা করিতে আসিলে হংসবাবা অগ্রসর হইয়া বলিতেন, "আও মেরে নারায়ণ, আও মেরে প্রাণ"। প্রতি বেলায় হাজার হাজার মানুষ প্রসাদ পাইত। কোথা হইতে আটা, ময়দা, চিনি, টাকাকড়ি আসিত, কি করিয়া এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সমাধা হইত, তাহা বিস্ময়ের বস্তু ছিল। কোন কোন ভক্ত বলিতেন, "আপনি কখনও কিছু সঞ্চয় করেন না, অথচ আপনার আখড়ায় এত লোক কেমনে প্রসাদ পায়?" বাবাজী সহাস্যে বলিতেন, "সাঁঞি সংকো দেত্ হ্যায়, পোথিত হ্যায় দিন রয়েন।

লোক নাম মের কহে, তা'তে নীচে নয়েন"॥

অর্থাৎ পরমেশ্বরই সবাইকে পোষন করছেন। অন্ধলোক বলছে যে আমি দিচ্ছি। আমার নয়ন লজ্জায় আনত হচ্ছে।

সাধকের ব্রহ্মাভ্যাস ও আত্মসাধন সম্বন্ধে হংসবাবা বলিতেন—

"সতত ব্রহ্ম অভ্যাস্ সে মল বিক্ষেপকো নাশ্
জ্ঞান দৃঢ় নির্ব্বাসনা জীবমুক্তি প্রতিভাস্॥"

অর্থাৎ সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস বলবৎ রাখিবে। ইহার ফলে মনের ময়লা বিদূরিত হইবে। মন বাসনাহীন হইবে। এই পথেই জীব পরাজ্ঞান ও মুক্তি লাভ করিবে।

তাঁহার ভক্তেরা সেখানে এক বিরাট মঠ তৈয়ার করিতে চাহেন। কিন্তু তিনি বলিতেন, তিনি অর্দ্ধউলঙ্গ সন্ন্যাসী। মঠ মন্দিরে তাঁহার কি হইবে? তিনি শাহেন শাহ হইয়া আছেন। তাঁহার চিন্তা নাই, চাওয়া নাই। তিনি পরম শান্তিতে আছেন।

১৩৬৭ বাংলার ৪ঠা বৈশাখ (১৯৬০ ইং) তারিখে সহস্র ভক্তকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি যশিডির আশ্রমে চির-সমাধি গ্রহণ করেন। দীর্ঘ জীবনের অধ্যাত্মলীলার শেষ অঙ্কে এই জ্ঞানতাপস তাঁহার সংসার লীলার অবসান আনেন।

১৭। ভোলানন্দগিরি।

(১৮৩২ খৃষ্টাব্দ।)

পাঞ্জাবের মালেরকোটলার অন্তর্গত খুরদা গ্রামে এক সারস্বত ব্রাহ্মণপরিবার বাস করিত। ভক্তপ্রবর সারস্বত ব্রাহ্মণ "ভাইসাওল" প্রথমতঃ আসিয়া এই গ্রামে বসতি করেন। তাঁহারই সন্তান ব্রহ্মদাস। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রহ্মদাসজী ও তাঁহার পত্নী নন্দাদেবী দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা, অর্চ্চনা ও আরাধনায় দিনাতিপাত করিতেন।

সংসার তাঁহাদের এত স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না। তবুও সাধু সন্ন্যাসীর সেবায় ও চর্য্যায় এই ভক্ত দম্পতীর অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। তাঁহাদেরই দ্বিতীয় পুত্র এই শিবতুল্য মহাসাধক ভোলাগিরি। তাঁহার বড় ভাই রতনদাস শৈশবেই বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করেন এবং কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গেই এক রাত্রে ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যান। অতঃপর তাঁহার কোন সন্ধান মিলে নাই।

কথিত আছে, প্রথম পুত্র রতনদাস সংসার ছাড়িয়া যাওয়ার পর ব্রহ্মদাস ও তাঁহার পত্নী নন্দাদেবী অন্তরের শান্তি হারাইয়া ফেলেন। উভয়েই শিব উপাসক। তাঁহাদের অন্তরের বেদনা ইষ্টের চরণে নিবেদন করেন। এক নিশীথে নন্দাদেবী স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিতেছেন, "আমি তোমার ও তোমার স্বামীর ভক্তি ও নিষ্ঠায় পরম প্রীত হইয়াছি। তোমাদের আরও তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। দ্বিতীয়টিও বৈরাগ্যভাবাপন্ন মহাপুরুষ। সেও প্রথমটির পদানুসরণ করিবে এবং তৃতীয়টিই সংসারী হইবে।" অতঃপর শিবজী অন্তর্ধান করিলেন। নন্দাদেবী এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্বামীকে জানাইলেন। অদূরভবিষ্যতে এই স্বপ্ন সফল হইল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদাসের ঔরসে ও নন্দাদেবীর গর্ভে এক পরম সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই নবজাতকই উত্তরকালের ভারতবিখ্যাত ভোলাগিরি মহারাজ। ভোলানন্দের পরবর্ত্তী ভ্রাতাও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দরদাসজীই সংসারে গৃহীরূপে বাস করিয়া পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা করিয়া যান।

ভোলানন্দের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া পস্তানা আশ্রমের যোগীগুরু গোলাপজী মহারাজ বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে গোলাপগিরি মহারাজের নাম সর্ব্বত্র খ্যাত। তিনি এক বৃহৎ প্রাসাদে বাস করিতেন। তিনি চৌদ্দ শত গাভী ও পাঁচ শত মহিষ সহ এক বিস্তীর্ণ ভূমির মালিক ছিলেন। যোগ ও ভোগ দুইই এক সঙ্গে এই যোগীগুরু ধারণ করিতেন। যদিও তখন গোলাপগিরির বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে, তাঁহার যোগীদেহে বার্দ্ধক্যের কোন চিহ্ন ছিল না। দীর্ঘায়ত সুঠাম সুন্দর দেহখানিতে লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি ভোলাগিরির সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং শিষ্যত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার নব নামকরণ হইল "নারায়ণগিরি।"

আশ্রমে প্রবেশ করিবার পরই তিনি গোচারণে নিযুক্ত হইলেন। কঠোর পরিশ্রমী ভোলানন্দকে বেশী দিন এই পরীক্ষা দিতে হয় নাই। কিছুদিন পরেই গুরুদেব তাঁহার সাধনার জন্য এক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী তৈয়ার করিয়া দিলেন। আশ্রমের শিবপূজার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। উপরন্তু আশ্রমের সকলের আহার্য্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে হইত। মাঝে মাঝে গুরুজীর তিরস্কারও শুনিতে হইত। তিনি বুঝিতে পারিতেন যে তাঁহার ভক্তি ও নিষ্ঠার দৃঢ়তা নির্দ্ধারণ করার জন্য গুরুজীর এই কঠোর শাসন। এই তিরস্কার গুরুজীর প্রচ্ছন্ন কৃপা।

একবার মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে গুরুজীর আদেশে একমাত্র কৌপীন পরিধান করতঃ তাঁহাকে সারা রাত্রি বাহিরে কাটাইতে

হইয়াছিল। সকালবেলা পুনঃ গুরুজীর আদেশে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। সাধনা, শাস্ত্রপাঠ ও গুরুসেবায় পস্তানা আশ্রমে ভোলানন্দ দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার পর গুরুজী একদিন আদেশ দেন যে পরিচয় না দিয়া যেন স্বীয় জন্মভূমি ঘুরিয়া আসে ও নিজ জননীকে প্রণাম করিয়া আসে। গুরুর আদেশে তিনি জন্মভূমি দর্শন ও গর্ভধারিণী জননীর চরণ বন্দনা করিতে যান। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের নানাস্মৃতি বিজড়িত চিরপ্রিয় তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে গিয়া গৃহাঙ্গনে উপনীত হন। "জয় শিবশঙ্কর" বলিয়া উচ্চরবে ভিক্ষা চাহিতেই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান তাঁহার জননী নন্দাদেবী। ভিক্ষা গ্রহণের পর দণ্ডকমণ্ডলু-ধারী সন্ন্যাসী নন্দাদেবীকে প্রণাম করিতেছে দেখিয়া তিনি ভীতা হইলেন। বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, সর্ব্বজনবরেণ্য। আমায় কেন প্রণাম করিয়া পাপের মাত্রা বাড়াইতেছেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন—"ভয় নাই। মাতৃবুদ্ধিতে আমি এই প্রণাম করিলাম। কোন প্রকার পাপ স্পর্শ করিবে না।" ইহা বলিয়া সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। নন্দাদেবীর অন্তর স্পন্দিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই সন্ন্যাসী তাঁহারই পুত্র ভোলাদাস। তিনি শোকাভিভূতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

পস্তানা আশ্রমে দীর্ঘ বার বৎসর কৃচ্ছ্রব্রত ও সাধনার পর গুরুদেব তাঁহাকে অন্যত্র গিয়া আশ্রম স্থাপন করিতে আদেশ দিলেন। তিনি আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "ঋদ্ধি ও সিদ্ধি উভয়ই এই শিষ্যের করতলগত হইবে"। ইহার পর তিনি দেবতাত্মা হিমাচলে গমন করেন। নূতনতর তপস্যার জন্য হিমালয়ের নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে বসিয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। চারিদিকে বরফ। তুষারের শৈত্য ও পার্ব্বত্য বাতাসের আক্রমণ সহ্য হয়না। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপে তাঁহার নিউমোনিয়া হয়। ব্যাধির যন্ত্রণায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন,- তখন তিনি

বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত। ঘরে কোথায় ও পানীয় জল নাই। অদূরেই একটি পার্ব্বত্য নদী দেখিয়া তিনি গড়াইয়া গড়াইয়া নদীর কিনারে জল পান করিতে গেলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বলতাহেতু পদস্খলন হইয়া নদীতে পড়িয়া গেলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ভোলাগিরি মহারাজ দেখিতে পাইলেন একটি পাহাড়িয়া তাঁহার সেবায় ব্যস্ত। পার্ব্বত্য নদীর খরস্রোতে তিনি অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছেন। পাহাড়িয়া লোকটি তাঁহাকে জলস্রোতে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া অনেক কষ্টে তুলিয়া লয় এবং আন্তরিক সেবা শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করে। শরীর কতকটা শক্ত হইলে তিনি পস্তানায় গুরুর আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। গুরু গোলাপগিরিজী এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া যে পাহাড়িয়া শিষ্য তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছে তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেন। পাহাড়িয়া ভক্তটি প্রথমতঃ এই টাকা লইতে অস্বীকার করে। পরে সকলের অনুরোধে এই পারিতোষিক গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পর ভোলাগিরি পুনঃ তাঁহার তপস্যার পথে বাহির হন। কনখল, হরিদ্বারের বিল্বকেশ্বর পর্বত এবং হিমালয়ের গুহাগহ্বরে এই নবীন তপস্বী যোগসাধনায় ও ধ্যানে তন্ময় থাকিতেন। তাঁহার মতে সাধনারূপ পত্নীর সঙ্গ না করিলে অর্থাৎ কঠোর তপস্যায় ব্রতী না হইলে মোক্ষরূপ পুত্রলাভে সে সর্বদা বঞ্চিত থাকিবে।

ভোলানন্দগিরির সাধক জীবন অত্যন্ত কঠোর ছিল। বিল্বকেশ্বর পর্ব্বতগুহায় বহুবৎসর তিনি সাধন ভজনে অতিবাহিত করেন। একবার ভোলাগিরি মহারাজ তিনজন গুরুভ্রাতাসহ হিমালয়ের এক নির্জ্জন প্রদেশে যোগ সাধনায় রত আছেন। ধূনীর অদূরে সহসা এক বৃহদাকার ব্যাঘ্র উপস্থিত হইল। ভোলাগিরি মহারাজ ভীত না হইয়া সঙ্গীয় সাধুদের সাহস দিলেন এবং সকলকে নিজস্ব বীজমন্ত্র জপ করিতে বলিলেন। সকলেই তাহা করিতে লাগিলেন।

কেবল একজন সাধু ভীত হইয়া পলায়নের জন্য দৌড় দিলেন। বাঘটি তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর লাফ দিয়া পড়িয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। গুরুভ্রাতাটির এই শোচনীয় মৃত্যুতে সকলে মর্ম্মাহত হইলেন। বীরসাধক ভোলাগিরি মহারাজ বলিলেন, গুরুদত্ত বীজমন্ত্রে বিশ্বাস না থাকায় তাহার এই শোকাবহ পরিণাম হইয়াছে। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের শোক করিতে নাই। শোক না করিয়া সকলকে সাধনায় মনোনিবেশ করিতে বলিলেন।

আর একদিন দুর্গমঅরণ্যবেষ্টিত এক পাহাড়ের গুহায় বসিয়া তিনি ধ্যানাবিষ্ট আছেন। হঠাৎ একটি ভল্লুক আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয়। তিনি ভীত না হইয়া উপস্থিতবুদ্ধিবলে তাহার নাক ও মুখ জোর করিয়া চাপিয়া ধরেন। তারপর সেই অবস্থায় ভল্লুকটিকে বহন করিয়া পাহাড় হইতে নামিতে লাগিলেন। অদূরে একটি খাড়াই নীচুস্থানে ভল্লুকটিকে নিক্ষেপ করিয়া নিজের ধ্যান গুহায় ফিরিয়া আসিলেন। ভল্লুকটি অরণ্যমধ্যে চলিয়া গেল।

কঠোর তপস্যা ও গুরুকৃপায় ভোলাগিরি মহারাজ পরম প্রাপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। ধ্যানতন্ময়তার ফলে তাঁহার দেহবুদ্ধি বিলুপ্তপ্রায়। এই কঠোর তপস্যার ফল অবশেষে তিনি পাইলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহা আলোকিত করিয়া দেবাদিদেব শঙ্কর তরুণ সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইষ্টদর্শনে ও তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণে ভোলাগিরিজী সাধনায় সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিলেন।

একদা ভোলাগিরিজী বোম্বাই সহরে থাকাকালীন এক ধনীগৃহে মাধুকরীর জন্য যান। সেখানে তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার অপরূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া সেই ধনীভদ্রলোক তাঁহার কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে স্বামীজীকে অনুরোধ করেন। তিনি উত্তর করিলেন, "যে পার্থিব সম্পদ আপনাদিগকে সুখী করিতে পারে নাই, তাহাতে আমি কি করিয়া সুখী হইব ?" ভদ্রলোক নিরস্ত হইলেন।

আর একদিন ভিক্ষা করিতে গিয়া ভোলাগিরিজী এক গৃহীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহী দুয়ারে সাধু দেখিয়া অত্যন্ত রাগ করেন ও গালমন্দ দিতে থাকেন। তাহাতে ভোলাগিরিজী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "থামলেন কেন? আরও গাল দিন"। গৃহী অত্যন্ত বিস্মিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। পরে তিনি ভোলাগিরি মহারাজের কৃপালব্ধ শিষ্য হন।

আর একবার ভোলাগিরিজী মাধুকরীতে বাহির হইয়াছেন। গুরুজী আশ্রমে ধ্যানমগ্ন। একদল দুর্বৃত্ত আসিয়া গুরুজীর যোগসাধনা পরীক্ষার্থে একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ গুরুজীর পায়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। গুরুজী ধ্যানমগ্ন। পা পুড়িয়া যাইতেছে। তাহাতে ভ্রুক্ষেপও নাই। ভোলাগিরিজী ফিরিয়া আসিয়া ইহা দেখিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু গুরুজী নির্ব্বিকার। ভোলাগিরিজী তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত কাষ্ঠখানি ফেলিয়া দিলেন এবং তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় দুর্বৃত্তেরা তারপরদিন আসিয়া ক্ষমা চাহিল। কেহ বলিল তাহার আত্মীয় বিয়োগ হইয়াছে। কেহ ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং কেহ কেহ অনুশোচনায় কাতর। গোলাপগিরিজী মধুর বচনে বলিলেন, "আমার বিন্দুমাত্র রাগ হয় নাই। যাহা হইবার দৈবরোষে হইয়াছে। আমি অভয় দিচ্ছি, ইহার পর তোমাদের আর কোন অমঙ্গল হইবে না।"

লালতারাবাগে স্বামিজী আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। উত্তরখণ্ড অঞ্চলের বহু সাধু তাঁহার দর্শনার্থেই আসিতেন। সাধুদের ভাণ্ডারা তাঁহার আশ্রমে লাগিয়াই থাকিত। হরিদ্বার, কনখল, ভীমগোড়া, প্রভৃতি অঞ্চলের সাধুরা ও আসিয়া এই আশ্রম হইতে ভিক্ষা নিতেন।

১৮৯৩ সালে প্রয়াগ ক্ষেত্রে কুম্ভমেলায় সন্ন্যাসীসেবক পরিবৃত হইয়া ভোলাগিরি মহারাজ বাদ্য সহকারে সাড়ম্বরে

কুম্ভস্নানে যান। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সুগৌর সুন্দরকান্তি সৌম্যদর্শন গিরিমহারাজকে সাধুমণ্ডলীর মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দেখাইতেছিল। এইখানে তিনি সকলের সমাদর ও ভক্তিঅর্ঘ্য লাভ করেন। এইখানে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার ভক্ত হন।

লালতারা আশ্রমে গিরিমহারাজ নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে দেবাদ্দিদেব মহাদেব জ্যোতির্ম্ময়রূপে তাঁহাকে বলিতেছেন, "ভোলানন্দ। আমার এক বিগ্রহ এই আশ্রমের প্রান্তে মাটীর নীচে আছে। তাহা অগৌনে তুমি প্রতিষ্ঠা কর। তোমার মত প্রিয় ভক্তের নিত্যপূজার জন্য আমি অভিলাষী হইয়াছি।"

গিরিমহারাজ মৃত্তিকা খুঁড়িয়া শিবলিঙ্গ পাইলেন। এই পবিত্র শিলাপ্রতীককে বেষ্টন করিয়া এক বিষধর সাপ ছিল। সাপটি চলিয়া গেলে বিগ্রহটী আশ্রমে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার নাম দিলেন "গৌরিশঙ্কর" এবং তিনি নিজেই এই শিবের পূজা করিতেন। তিনি বলিতেন, "এই শিব বড়ই জাগ্রত। ভক্তিভরে ইহার পূজা করিলে মানবের সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইবে"।

১৯০২ সালে স্বামিজী এক দুরারোগ্য চক্ষু পীড়ায় উভয় চক্ষের দৃষ্টি হারান। এই সময়ে এক তরুণ মাড়োয়াড়ী শিষ্য একনিষ্ঠতার সহিত তাঁহার সেবায় ব্রতী হয়। তাহার নাম ও ভোলাগিরি ছিল।

ভোলাগিরি মহারাজের কোন ক্ষোভ নাই। দৃষ্টি তাঁহার অন্তর্মুখী। কিন্তু তাঁহার শিষ্য ভোলাগিরি বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। সে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বেও সে দেবাদিদেব আশুতোষের নিকট তাহার গুরু ভোলাগিরি মহারাজের অন্ধত্ব মোচনের জন্য প্রার্থনা করে।

কয়েক দিন পরের কথা। হঠাৎ এক দিবস কে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "চেয়ে দেখ, আমরা কে?" চোখ তুলিয়াই তিনি

দেখিলেন সম্মুখে তাঁহার ইষ্টদেবতা হরগৌরী। দর্শন দিয়াই তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন। ভোলাগিরি তখন হইতে এক চক্ষুর দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন।

ভোলাগিরি মহারাজ বড়ই কঠোর হস্তে শিষ্যদের শাসন করিতেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ধ্রুবানন্দজীকে মাঝে মাঝে মারিয়া বসিতেন। আশ্রমে কোন্ ত্রুটি বিচ্যুতি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না।

বিখ্যাত গনিতবিদ্ সোমেশ্বর বসুর স্ত্রী অকালে মারা যায়। তিনি বলিলেন যে সাধু তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে এক সঙ্গে দীক্ষা দিতে পারিবেন তাঁহার নিকট হইতে তিনি মন্ত্র শুনিবেন। বহু সাধু সন্ন্যাসীর নিকট ব্যর্থ হইয়া তিনি ভোলাগিরিজীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। গিরিজীও তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর দিলেন, "বেশ তো বেটা। তাঁর দীক্ষা ও একসঙ্গে হবে। কিন্তু তুমি স্পর্শ করতে পার্ব্বে না।"

দীক্ষার সময়ে নিভৃত দীক্ষাগৃহে তিনটি আসন পাতা হইল। গিরিজী ও সোমেশ বাবু দুইটি আসন গ্রহণ করিলেন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সোমেশবাবু দেখিতে পাইলেন, তৃতীয় আসনে তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রী সশরীরে উপবিষ্টা আছেন। আদেশ আছে, তিনি স্পর্শ করিতে পারিবেন না। মর্ত্ত্যলোকের বিরহী স্বামী আজ তাই অপার আগ্রহে সূক্ষ্মলোকবাসিনী সহধর্ম্মিনীর দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। দীক্ষান্তে মূর্ত্তিটা আকাশে মিলাইয়া গেল।

আসামের অত্যন্ত মান্য ব্যক্তি অমরনাথ ও স্বামিজীর শিষ্য ছিলেন। একবার তাঁহার ছেলের অসুখ হইলে স্থানীয় ডাক্তারেরা কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি হরিদ্বারে স্বামিজীকে তার করিলেন। তিনি নামজপ ও দান করিতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ভাল হইয়া উঠিল। ছেলে রোগশয্যায় বলিয়া উঠল কে যেন তাহার গায়ে কমণ্ডলুর জল

ছিটাইয়া দিতেছে। পরকালে স্বামিজী একদিন অমরনাথকে বলিলেন, "তোর ছেলেকে ভাল করিয়া দিলাম। আমার ভিজিট বাবতে সাধু সেবার জন্ম কিছু চাউল বেশী করিয়া পাঠাইয়া দিস্।"

আর একবার তাঁহার এক বাঙ্গালী শিষ্য সুন্দরবনে বাঘ শিকারে যান। বাঘটা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি ভীত হইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলেন, স্বামিজী তাঁহার পাশে দণ্ডায়মান। বলিলেন, 'সড়কী বাঘের মুখে ঢুকাইয়া দে'। শিষ্যটি তাহা করিলেন এবং উহাতে বাঘটা মারা পড়িল।

অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ও বহিরঙ্গজীবনের লীলাভিনয় দুইই স্বামিজীর বর্ত্তমান ছিল। তিনি শিষ্যদের মাঝে মাঝে তিরস্কার করিয়া বলিতেন "সব শিবজীর বাচ্ছা। সিদ্ধ পুরুষ হ'য়ে গেছে"। তাঁহার মধ্যে মহাশক্তিশালী যোগী ও লীলা-পরায়ণ মহাপুরুষের দ্বৈতভাব দেখা যাইত। তিনি সকলকে বলিতেন,

"কর নাম ও দান,
হবে কল্যাণ।"

সর্ব্বসাধারণের জন্ম রচিত ছড়াতেও রহিয়াছে, এই নাম জপের নির্দেশ,

"গৌরীশঙ্কর সীতারাম সদা বলো চারো নাম,
সদ্‌গুরু দিয়া হরকা নাম, খালি জিহ্বায় কোন কাম ?"

নামজপের এই মহিমা স্বামিজী তাঁহার খৃষ্টান ও মুসলমান ভক্তদের ও বলিতেন। "গড্" বা আল্লার নাম জপ করিতে তিনি উৎসাহ দিতেন।

দীর্ঘ লীলাভিনয়ের পর ভোলাগিরিজীর জড় জীবনের যবনিকা আসিয়া পড়িল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী

তিথিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শিব সাযুজ্য লাভ করিলেন।

উত্তরাখণ্ডের বিশিষ্ট সাধু, মোহান্ত, ও মণ্ডলীশ্বর এবং অগণিত ভক্ত ও সেবক হরিদ্বারের লালতারাবাগে সমবেত হইয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিলেন,

ওঁ নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে নমঃ, গঙ্গা মাঈকী জয়।

হর হর বম্ বম্ ধ্বনির মধ্যে মহাপুরুষের পুষ্পমাল্যশোভিত দেহখানি গঙ্গার কালীকুণ্ডে ধীরে ধীরে অতলে তলাইয়া গেল। শিবকল্প সাধু শিব সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

১৮। পওহারী বাবা।

(১৮৪০ খৃষ্টাব্দ।)

জৌনপুর জেলার অন্তর্গত প্রেমাপুর গ্রামের তেওয়ারীরা ভক্তিমান ও নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ হিসাবে সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। লছ্‌মীনারায়ণ ও অযোধ্যা তেওয়ারী নামধারী দুই ভ্রাতা এই পরিবারেরই লোক। লছ্‌মীনারায়ণ সহরের উপকণ্ঠে কুর্থাগ্রামে গঙ্গাতীরে বিজন অরণ্যে এক কুঠির বাঁধিয়া তথায় সেবা পূজা ও সাধন ভজন করিতেন। অযোধ্যা তেওয়ারী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃদ্ধ তপস্বী লছমীনারায়ণের একান্ত অনুগত ছিলেন। এই অযোধ্যা তেওয়ারীর দ্বিতীয় সন্তানরূপে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হরভজনের জন্ম হয়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লছমীনারায়ণ এক স্বনামধন্য সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাই তাঁহার প্রতি অযোধ্যাজীর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। সুযোগ পাইলেই অযোধ্যাজী গাজীপুর অঞ্চলে আসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লছ্‌মীনারায়ণকে দর্শন করিয়া যাইতেন।

বৃদ্ধ লছ্‌মীনারায়ণ এখন একেবারে চলৎশক্তিহীন। দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারাইয়াছেন। একেবারেই অন্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক তরুণ ব্রহ্মচারী শিষ্য কাছে থাকিয়া সর্ব্বদা সেবা শুশ্রূষা করেন। কিন্তু তাহাতে আশ্রমের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। এই সব দেখিয়া অযোধ্যা তেওয়ারী প্রস্তাব করিলেন, বৃদ্ধ মহারাজের সেবা শুশ্রূষার জন্য স্বীয় জ্যেষ্ট পুত্র গঙ্গারামকে পাঠাইয়া দিবেন। মহারাজ তাহাতে নারাজ। বহু সাধ্য সাধনার পর হঠাৎ একদিন বলিলেন, "যদি নিতান্তই কাহাকেও পাঠাইতে চাও, তবে তোমার ছোট ছেলে হরভজনকে পাঠাইয়া দিও।" অযোধ্যা তেওয়ারী বলিলেন, সে মাত্র দশ বৎসরের

বালক, এত সব ঝক্কি এই ছোট ছেলে কি করিয়া সামলাইবে? প্রবীন তপস্বী মৃদু হাসিলেন। বলিলেন "অযোধ্যা, ঠিক তাহাই নহে। এই বালকই আমার এবং আমার আশ্রমের এবং তথা সারা দেশের সেবা করতে পার্ব্বে। এবং সে একজন আধ্যাত্মিক রাজারূপে সর্ব্বত্র পূজিত হইবে।"

এই নিষ্ঠুর প্রস্তাব শুনিয়া হরভজনের মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন এবং পিতা ও বিষাদিত হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ তপস্বীর এই প্রস্তাব উপেক্ষা করা যায় না। বরং পরোক্ষে ইহা তাঁহারই আদেশ। ইহা অমান্য করা মহাপাপ। তাই মাতা পিতা উভয়েই চোখের জলে ছোট ছেলেটাকে বিদায় দিলেন। চিরতরে গৃহ ত্যাগ করিয়া দশ বছরের হরভজন কুর্থার সাধন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। উত্তরকালে তিনি তিতিক্ষার পথে এক মহাপুরুষরূপে উত্তরণ করেন। ইনিই ভারতবিশ্রুত বিখ্যাত সাধু পওহারী বাবা।

নূতন ব্রহ্মচারীর বেশে হরভজনকে বড় সুন্দর দেখায়। অবসর পাইলেই আশ্রমের সন্নিহিত অরণ্যে বা জাহ্নবীর কুলে কুলে ভজন গাহিয়া বেড়ায়। বালকের সারা অঙ্গে লাবণ্যের শ্রী, চোখে মুখে স্বপ্নময় আবেশ, বদনে বৈরাগ্যের চিহ্ন। যেন তিনি এই পৃথিবীর কেহই নহেন। গ্রামের লোক এই বালক সাধুর নাম দিল "ধ্রুব"।

সেবার জন্য বালক হরভজনকে আনা হইলেও বৃদ্ধ লছমী নারায়ণ তাহার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিলেন। আশ্রমের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে বালকের ধ্যান ভজন ও শাস্ত্রপাঠ নিয়মমত করিতে হইত। তাঁহার অভিভাবকত্বে পওহারী বাবার জীবনধারা ও শিক্ষাপদ্ধতি অতি সুন্দর ছিল। শেষ রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া বালক ব্রহ্মচারী গঙ্গাস্নান সমাপন করেন। তারপর পূজা অর্চ্চনা ও শাস্ত্রঅধ্যয়ন চলে। প্রাত্যহিক কার্য্যাদির পর ভোগ রান্না করেন। ইষ্টদেবকে ভোগ প্রসাদ নিবেদন করার পর বৃদ্ধ পিতৃব্যকে ও তাঁহার মন্ত্র-শিষ্যকে পরিবেশন করেন। তৎপর নিজে প্রসাদ পান। পিতৃব্যের

সুব্যবস্থায় তিনি সংস্কৃত, সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। এক প্রতিভাধর শিক্ষার্থীরূপে উচ্চতর বহুশাস্ত্রে ও ধর্ম্মতত্ত্বে অতি অল্প দিন মধ্যে অশেষ জ্ঞান লাভ করেন।

হরভজনের ষোল বৎসর বয়সে বৃদ্ধ লছমীনারায়ণ দেহত্যাগ করেন। ইহাতে হরভজন অত্যন্ত শোকার্ত্ত হন। তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া গেল। সংসার অসার বলিয়া মনে হইল। তাই আশ্রমের ভার এক মন্ত্রশিষ্যের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি দ্বারকায় আসিয়া পৌঁছিলেন। রণছোড়জী বিগ্রহ দর্শনের পর হরভজন গির্ণার পাহাড়স্থিত তীর্থগুলি দেখিতে গেলেন। সেইখানে শুনিতে পাইলেন, কয়েক মাইল দূরে অরণ্যময় পর্ব্বত গুহায় এক শক্তিধর বৃদ্ধযোগী বাস করেন। তিনি প্রায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন। তাই সেখানে সহসা কেহ যাইতে চাহে না। এই মহাত্মাজীর কথা শুনিয়া বালক হরভজন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরদিন প্রত্যূষে সঙ্গীদের মধ্যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই পর্ব্বত গুহায় গিয়া হরভজন উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে গুহার দ্বারপথেই মহাত্মা মহাযোগীর দর্শন পাইলেন। হরভজন ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি আমায় কৃপা করুন। আমি অধম। আপনার চরণতলে রাখিয়া আমায় যোগশিক্ষা দিন"। বালকের ব্যাকুলতা দেখিয়া মহাত্মা প্রসন্ন হইলেন। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া মহাত্মাজীর কাছে যোগশিক্ষা করিলেন এবং সম্পূর্ণ নূতন মানুষরূপে সেই পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলেন। অতঃপর হরভজন আরও কয়েকটী তীর্থদর্শনের পর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চেহারায় ও ব্যবহারে লোকে বুঝিল যে তাঁহার মধ্যে বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তপঃসিদ্ধ এই নবীন সাধককে দর্শনের জন্য সে দিন কুর্থাবাসী প্রায় সকলেই ছুটিয়া আসিল।

গাজীপুর ও কুর্থা অঞ্চলে সাধু লছমী নারায়ণ আশ্রমের অত্যন্ত সুনাম ছিল। ইহার পরিচালনার ভার হরভজনের উপর ন্যস্ত হইল। মুমুক্ষু, সংসারবিরাগী, যোগী ও আর্ত্তজনগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি সাধ্যমত সকলকে আদর, আলোচনা ও আপ্যায়ণে তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

আশৈশব তিনি রামানুজ পন্থী। তিনি বৈষ্ণব সাধনা করিতেছেন। তাহার সঙ্গে মিলিত হইল যোগসাধনা। অনুভূতি ও সিদ্ধির নব নব পথ তিনি অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ ভোগ ও প্রসাদ জ্যেষ্ঠতাতের মন্ত্রশিষ্যের নিকট পাঠাইয়া দিয়া নিজে বিল্বপত্র বাটা ও কিছু দুগ্ধ পান করিয়া থাকিতেন। আট নয় মাস কাল ৫০টী মরিচ জলদিয়া বাটিয়া ছাঁকিয়া সরবতের মত পান করিতেন। এত অল্পাহারী বলিয়া সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে পওহারী বাবা বলিতেন।

পওহারী বাবার মধ্যে বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও নিরভিমানতার অভাব ছিলনা। সাধনার দিক দিয়া ও তিনি মধুকর বৃত্তির পক্ষপাতী ছিলেন। যেখানেই তিনি প্রবীণ ও সমর্থ সাধুদের দেখা পাইয়াছেন তিনি সেখান হইতে অধ্যাত্ম জীবনের পরম পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গাজীপুরের গুহাবাসী এক মহাত্মা এবং কাশীর খ্যাতনামা নিরঞ্জন স্বামী তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "এই মহাত্মার বিশেষ গুণাবলী দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বারাণসীর সন্নিকটে তিনি ও তাঁহার গুরুর মত ভূমিতে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া প্রত্যহ অনেক ঘণ্টা তথায় বাস করিতেন। আহার সম্বন্ধে তাঁহার কঠোর সংযম ছিল। সারাদিন তাঁহার ছোট আশ্রমটীতে তিনি কাজ করিতেন। তাঁহার প্রাণপ্রিয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পূজা তিনি নিজে করিতেন। রান্নায় তিনি অত্যন্ত পটু ছিলেন। উত্তম

খাদ্য রন্ধন করিয়া তিনি প্রভু রামচন্দ্রকে ভোগ দিতেন। সেই প্রসাদ প্রত্যহ তিনি বন্ধু বান্ধবগণ ও উপস্থিত দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। অনেক রাত্র পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের সেবা পরিচর্য্যা করিতেন। তাহারা শয়ন করিলে এই যুবক গোপনে বাহির হইয়া, সন্তরণদ্বারা গঙ্গা পার হইয়া অপর তীরে যাইতেন। তথায় সাধন ভজনে সারারাত কাটাইয়া উষার পূর্ব্বে ফিরিয়া বন্ধুবর্গকে জাগাইতেন এবং নিত্যকর্ম্ম সমাধান করিয়া যাইতেন। ভারতে ইহাকে পরসেবা ও গণপূজা বলিয়া থাকে।"

প্রয়াগের মাঘ মেলায় ও এই কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতেন। সঙ্গীদের খাওয়াইয়া সর্ব্বশেষে ৩।৪ টী বেলপাতা বা একটু ঘৃতে একটু ঔষধ মিশাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন।

পওহারী বাবা কঠোরতপা শক্তিমান সাধক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চোখে মুখে সর্ব্বদা এক অপূর্ব্ব দৈন্য ও ভাবতন্ময়তা দেখা যাইত। সমাগত নরনারীদের কাছে তিনি নিজকে সেবানিষ্ঠ ভক্তরূপে "দাস" বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহার বৈষ্ণবীয় আদর্শ "জীবপ্রেম" ও সেবাব্রত সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী বর্ত্তমান আছে। দিনের পর দিন এমনই সেবানিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া পওহারী বাবার আধ্যাত্মিক সাধনা ও দিনচর্য্যা চলিত।

কুর্থার আশ্রমে মৃত্তিকা গুহা নির্ম্মাণ করিয়া প্রথমে এক ঘণ্টা পরে দিবস থেকে সপ্তাহ অবধি ঐ গুহায় ধ্যানে রত থাকিতেন। পূজা অর্চ্চনা, আহার পান কিছুই করিতেন না। সাধন পূর্ণ হইলে যখন বাহিরে আসিতেন, তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখা যাইত। পওহারী বাবা অঙ্গে ভস্ম বা ধূলি লেপন করিতেন না। মস্তকে জটাভারও ধারণ করেন নাই। পরিধানে কৌপিন এবং তদুপরি মলিদার "ঝুল" (আলখাল্লা) চরণ অবধি পরিতেন। লোকে কেবল মুখখানি দেখিতে পাইত। দৈবাৎ হস্ত

কিম্বা স্কন্ধদেশ হইতে আলখাল্লা সরিয়া গেলে তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল দেহকান্তি প্রকাশ পাইত।

এইবার তাঁহার মন পরমপ্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠে। অন্তরে অদম্য আশা নিয়ে তিনি গির্ণারের পাহাড়ে চলিলেন। কিন্তু অযোধ্যায় আসিয়া শুনিতে পাইলেন গির্ণারের মহাত্মা দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি সেখানে শুনিতে পাইলেন, রামানুজী সম্প্রদায়ের এক সাধক গঙ্গাতীরে এক নিভৃত আশ্রমে তপস্যারত আছেন। সেইদিন প্রত্যুষে তিনি সেই নবাগত সাধুর ভজন-গোফায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকাতরে পরম আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। এই কঠোরতপা বৈষ্ণবতাপসের নিকট পওহারীবাবা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই দীক্ষাদাতা মহাত্মার নাম কখনও জানা যায় নাই। গুরুর নাম ও পরিচয় পওহারীবাবা ও চিরদিন গোপন রাখিয়াছেন।

বাবাজীর প্রতি গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল। প্রতি গৃহস্থ প্রত্যেক লাঙ্গলে /৫ সের করিয়া শস্য তাঁহার আশ্রমে পাঠাইয়া দিত। ধনী ও ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে আটা, চিনি, ঘৃত প্রভৃতি ও টাকাকড়ি পাঠাইয়া দিত। আশ্রমের সম্মুখে এক হাঁয়সা বন্ ছিল। তাহা আশ্রমেরই অন্তর্ভুক্ত। হঠাৎ একদিন দেখা গেল জাহ্নবী নদী গতি পরিবর্ত্তন করিতেছে। তিনি সেদিকে নয়নাতিপাত করিতেই দেখা গেল, অল্পদিনের মধ্যে সেখানে এক বিরাট "চড়া" পড়িয়াছে। এই জমীতে প্রচুর ফলন ফলিত। এবং ইহা হইতে আশ্রমের সদাব্রত ও ভাণ্ডারা প্রভৃতি যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ করা হইত।

দীর্ঘকাল তিনি সূর্য্যতাপ ও বায়ুহীন গুহায় থাকিবার দরুণ তাঁহার দেহ হয় তুষারশুভ্র এবং কুসুমের মত কোমল। এই অবস্থায় তিনি একবার মাঘমেলা উপলক্ষে প্রয়াগে আসেন ও ত্রিবেণীর বালুচরে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন।

একদিন পরে সূর্য্যতাপ ও বায়ুর স্পর্শে তাঁহার দেহের চর্ম্ম স্থানে স্থানে উঠিয়া যায়। ফলে প্রবল জ্বর ও স্বরভঙ্গ হয়। তাঁহার শিষ্যসেবকেরা ও প্রয়াগের কয়েকজন শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঔষধি ও পথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি ঔষধি ও পথ্য দিতে বলিলেন। তাহারা খুশী হইয়া ঔষধ আনিল। কিন্তু তখন তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। দুইটী পাত্রে তাহা সযত্নে রাখিয়া দিলেন। ভক্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ সন্দিহান হইলেন এবং তাঁহার উপর নজর রাখিলেন। দেখা গেল নিশীথরাত্রে আশ্রমিকেরা যখন সকলেই নিদ্রামগ্ন পওহারীবাবা চুপি চুপি ঔষধ ও পথ্যের ভাণ্ড গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলেন। এবং স্নান সমাপন করিয়া নিজের পর্ণকুটীরে ধ্যানে বসিলেন। পরদিন ভোরে ভক্তেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "রোগীর জন্য ঔষধি ও পথ্য যাহা আপনারা দিয়াছিলেন, এ দাস তাহা "রোগকেই" দিয়াছে। এই দেখুন, এই দাসের দেহে রোগের আর কোন চিহ্নমাত্র নাই।" আশ্চর্য্য হইয়া সকলেই দেখিলেন মহারাজ নিরাময় হইয়াছেন। সমস্ত প্রকারের রোগ সারিয়াছে, জ্বরও নাই। গায়ে রক্তবর্ণ যে দাগ ছিল তাহাও মিলাইয়া গিয়াছে। এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া ভক্তদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

আশ্রমে কত রকমের অতিথি অভ্যাগত আসে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাবাজী আজকাল প্রায় মৌনী থাকেন। এই সময়ে হঠাৎ এক উন্মাদ বাবাজীর সম্মুখে আসিয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হয়। আশ্রমিকেরা ধরিয়া ফেলে ও বাবাজীর সম্মুখে হাজির করে। বাবাজী তাহার দিকে করুণানেত্রে চাওয়ার পর উন্মাদের রূপান্তর ঘটে এবং তৎপর তাহার রোগের কোন রকম চিহ্ন আর দেখা গেলনা।

আর একবার এক ভেকধারী সাধু আশ্রমে আসিয়া বাবাজীর

নিকট চারিতীর্থ পরিক্রমার সমস্ত খরচ চাহিয়া বসেন। বাবাজী দীনতার সহিত জানান যে তাঁহার সেই অর্থ নাই। তাহাতে রাগান্বিত হইয়া সেই সাধু বাবাজীকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে বলে। দেখা গেল বাবাজী আশ্রমের দরজায় তালা লাগাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আশ্রমের লোকেরা ও গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং ভেকধারী সাধুটিকে সন্দেহ করিল। ইহাদের ভয়ে ভেক্‌ধারী সাধু পলাইয়া গেল, কিন্তু বাবাজীকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এদিকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া পওহারীবাবা শ্রীক্ষেত্রের দিকে রওনা হন। কিন্তু গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইল না। পথে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। অবশেষে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রহ্মপুর গ্রামে আসেন। এইখানে থাকিয়া রোগমুক্ত হন এবং বৎসরাধিককাল এক ভক্তের সাহায্যে নদীতীরে এক সাধন-কুঠীর নির্ম্মাণ করিয়া সাধন ভজন করেন। এই সময়ে তিনি বাংলা শিখেন এবং চৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য লীলাগ্রন্থ পাঠ করেন।

অপরদিকে বাবাজীর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তালাস করিতে করিতে জানিলেন, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ব্রহ্মপুর গ্রামে তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন। ভক্তেরা বহু সাধ্য সাধনার পর তাঁহাকে গাজীপুর আশ্রমে ফিরাইয়া আনেন।

আশ্রমে আসার পর বাবাজী আরও অন্তর্মুখী হইয়া পড়েন। লোক সমক্ষে প্রায় বাহির হইতেন না। রুদ্ধদ্বার মৃত্তিকাগোফায় তিনি একাদিক্রমে চারিবৎসর অতিবাহিত করেন। তবে মাঝে মাঝে কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তদের সাথে কথা ও বলিতেন।

কয়েক বৎসর গুহাবাসের পর পওহারীবাবা ভক্তদের দর্শন দিতে অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়ান। সারা গাজীপুর তখন আনন্দে মগ্ন হয়। সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধ নরনারী তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আশ্রমে ভিড় করে। তাঁহার ইচ্ছায় এই সময়ে আশ্রমে এক বৃহৎ ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয়। তখন দেখা যায় কুর্থা গ্রামে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য।

ইহার পর পওহারী বাবা উত্তর ভারত অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেণীর সাধকদের মধ্যে যথেষ্ট সম্মান ও পরিচিতি লাভ করেন।

একবার গাজীপুরে তাঁহার আশ্রমে কতিপয় চোর চুরি করিতে আসিলে তিনি গোঁফা হইতে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। চোরেরা তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে সমস্ত দ্রব্য লইয়া যাইতে বলিলেন। ইহাতে চোরেরা আরও ভয় পাইল। তাহারা চলিয়া যাইতে চাহিলে তিনি বাধা দিলেন। অবশেষে তাহারা সমস্ত চৌর্য্যদ্রব্যাদি মাথায় করিয়া বাহিরে আসিলে তিনি দরজা ছাড়েন। বাহিরে আসিয়া চোরেরা জিনিষপত্র নামাইয়া রাখিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

আর একদিনের কথা। পওহারীবাবা কুঠীরের এক প্রান্তে বসিয়া ভজন করিতেছেন। হঠাৎ এক ইন্দুর আসিয়া তাঁহার কাঁধের উপর বসে। ইহাকে যত্নে নামাইয়া তিনি তাঁহার আলখাল্লার ভিতর লুকাইয়া রাখেন। এক বিষধর সর্প এই ইন্দুরের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সর্পটা আসিয়া পড়ে এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাজীকে দংশন করে। বাবাজী তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া যান ও কক্ষ মধ্যে ঢলিয়া পড়েন। নানা ওঝা, ঔষধ, ঝাড়্, ফুঁক্ কিছুতেই কোন প্রতিকার হইল না। সকলেই বুঝিল, বাবাজী বোধহয় আর বাঁচিবেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সকলে দেখিল, বাবাজী দুইদিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। শরীরে বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণ মাত্র নাই। ভক্তেরা নির্নিমেষ নেত্রে এই মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর স্বামী বিবেকানন্দ পাওহারীবাবার নিকট যোগশিক্ষা করেন এবং নানাবিষয়ের সন্ধান পান ও অন্তরে শান্তি পান। স্বামী বিবেকানন্দ দুইবার তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা নিতে সঙ্কল্প করেন। দুইবারই স্বপ্নে পরমহংসদেবের আবির্ভাব দেখিয়া ক্ষান্ত হন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে গোঁফার বাহিরে আসিয়া লোক-সমাজে তাঁহার সাধন ভজন ও অলৌকিক যোগক্রিয়া শিখাইতে বলেন। তিনি নাক-কান-কাটা সন্ন্যাসীর উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হন।

১৩৪৫ সালের জৈষ্ঠমাস। বাবাজী মহারাজ স্বকৃত গোম্ফায় হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বালিত করিয়া নিজে তাহার সম্মুখে ধ্যানে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল এবং তিনি তাঁহারই প্রজ্জ্বালিত হোমকুণ্ডে তাঁহার নরদেহ আহুতি দিলেন।

গাজীপুরের সহস্র সহস্র ভক্তমানব তাঁহার করুণাশ্রয় হারাইল। গাজীপুরে চিরতরে এই মহাপুরুষের জন্য শোকের কাল যবনিকা পতন হইল।

১৯। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ।

(১৮৪১ খৃষ্টাব্দ।)

শান্তিপুরের আনন্দচন্দ্র গোস্বামী বৈষ্ণবীয় দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি ও একজন পরম ভাগবত ছিলেন। গৃহ দেবতা ৺শ্যামসুন্দরের পূজা না করিয়া তিনি কখনও জল গ্রহণ করিতেন না। একবার শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে রক্তাক্তবক্ষে তিনি পুরীধামে পৌছান। এইভাবে পরম দীনতার মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন করিয়া তাঁহার মনে শান্তি হয়। তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণময়ী ও এক মহীয়সী নারী ছিলেন। বিপন্ন আর্ত্তজনের তিনি মূর্ত্তিমতী করুণা ছিলেন। গ্রামের হাট হইতে দরিদ্রা নারীরা বেচাকেনা করতঃ ফিরিতে দেরী হইলে তিনি তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া স্নান ও ভোজন করাইতেন। একবার এক পতিতা নারীকে শীতের রাত্রে রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে টাকাকড়ি যাহা ছিল সমস্ত দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "বাছা তুমি ঘরে ফিরে যাও"।

এতাদৃশ মাতাপিতার ঘরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে ঝুলন পুর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভূমিষ্ট হন। অল্প বয়সে বিজয়কৃষ্ণের পিতা ভক্তিভরে ভাগবৎ পাঠ করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। ইহাতে বিজয়কৃষ্ণ দিশাহারা হইয়া পড়েন।

শান্তিপুরের সহজ সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশে বিজয়কৃষ্ণের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। বালক বয়সেই তাঁহার চরিত্রে অপূর্ব সত্যনিষ্টা ও সরলতা প্রকাশ পায়। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কেহ অভিযোগ করিলে সত্যকথা নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিতেন। সেবার শান্তিপুরের জমিদার এক

গরীব প্রজাকে কাছারী বাড়ীতে ধরিয়া আনিয়া অত্যাচার করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ রাগিয়া যান এবং জমিদারকে রাক্ষস, ডাকাত বলিয়া গালি দিতে থাকেন। বালকের দুরন্ত সাহস দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হন। ফলে নির্যাতিত লোকটী মুক্তি পায়। আরও একবার জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা এক শিষ্যকে সমাজচ্যুত করিয়া তিনশত টাকা অর্থদণ্ড করেন। বিজয়কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া নিজ দায়িত্বে শিষ্যটীর পক্ষে মার্জ্জনা চাহেন এবং নিজে তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন।

শান্তিপুরের পাঠশালা ও টোলের পড়া শেষ হইলে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং উৎসাহের সহিত বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। বিজয়ের বয়স তখন মাত্র আঠারো বৎসর। তখন বাল্যবিবাহ প্রবলভাবে প্রচলন ছিল। মাতা অচিরে সুলক্ষণা কন্যা যোগমায়াকে বধূরূপে মনোনীত করিয়া বিজয়কৃষ্ণের বিবাহ দিলেন এবং নববধূকে ঘরে আনিলেন।

বাংলার সমাজ ও ধর্ম্ম জীবনের এক বিক্ষুব্ধ সন্ধিক্ষণে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ আর্বিভূত হন। অদ্বৈতবংশের নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের গৃহে বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বংশের ধারানুযায়ী তরুণ বয়সেই তাঁহার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা হয়, তিনি পরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবেন। তাঁহাকে ঈশ্বর লাভ করিতেই হইবে। এজন্য প্রয়োজন হইলে তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবেন।

সেবার রংপুরে তিনি এক শিষ্যবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। পথ চলিতে চলিতে তিনি দৈববাণী শুনিলেন "পরলোক চিন্তা কর।" এই অলৌকিক দৈববাণী বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে ভীষণ আলোড়ন আনিল। তিনি সংসারে আসক্তিহীন হইতে লাগিলেন। আর একদিন এক বৃদ্ধা শিষ্যা তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলে, "প্রভু! আমি ত্রিতাপ জ্বালায় পুড়িয়া মরিতেছি। আমায় উদ্ধার করুন।" এই আর্ত্তি, এই অশ্রুজল সত্যাশ্রয়ী বিজয়কৃষ্ণের

মর্ম্মে স্পর্শ করিল। তিনি বিচলিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "আমি নিজেই মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আছি, আমি কার জন্য কি করিতে পারি? যদি নাই বা পারি, তবে কেন এই গুরুগিরির মিথ্যা ব্যবসা?" তিনি সেদিন হইতে গুরুব্যবসা ত্যাগ পাইলেন। শান্তিপুর হইতে আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। এবার কলেজ ও ত্যাগ পাইলেন। স্থির করিলেন, তিনি মেডিকেল কলেজে বাংলা বিভাগে ভর্ত্তি হইবেন। এই সময়ে এক বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হইয়া তিনি দারুণ অর্থ সঙ্কটে পড়েন। এক এক দিন তাঁহাকে রাস্তার ধারে কলের জল পান করিয়া দিনাতিপাত করিতে হইত। অন্তরে তাঁহার ভগবৎ বৈরাগ্য, বাহিরে তাঁহার নিদারুণ দারিদ্র্য। তিনি একেবারেই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে নানা দুঃখ দৈন্যের মধ্যে পড়িয়া বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া উপস্থিত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব সেনের সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত হন। তিনি তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মীরূপে ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সত্যসন্ধ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

তিনি একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেই প্রশ্ন করেন, "যদি জাতিভেদই না মানি—তবে এই উপবীত কেন? ইহা কি কপটতা নহে?" দেবেন্দ্রনাথ উদার হইলেও এতটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বিজয়কৃষ্ণ সেদিন হইতে তাঁহার উপবীত ত্যাগ করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ প্রচারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "প্রচারের জন্য আমি যখন তোমায় যেখানে যেতে বল্‌ব, তোমায় সেখানে যেতে হবে।" তেজস্বী বিজয়কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া দীপ্ত দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলেন, "মানুষের আদেশে আমার চলা একান্ত অসম্ভব। ভগবানেরই আদেশ ও নিজের ধর্ম্মবুদ্ধি অনুযায়ী আমি চলব।" বিজয়ের নির্ভীকতা ও ভগবৎ প্রেমের পরিচয় মহর্ষিকে মুগ্ধ

করে। অতঃপর স্বাধীনভাবেই তিনি ধর্ম্ম প্রচারকের কাজ করিতে অনুমতি পান। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার আর মাত্র দুই মাস বাকী। ব্রাহ্মসমাজের কি এক আকস্মিক প্রয়োজনে তিনি কর্ত্তব্যজ্ঞানে পরীক্ষা না দিয়াই চলিয়া গেলেন। প্রচারকের কাজে তিনি যে অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা একান্ত দুর্ল্লভ। প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজ ভাঙ্গিয়া দুইভাগ হইল। রক্ষণশীল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদিব্রাহ্মসমাজকে ধরিয়া রহিলেন। আর নব্যদল কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। কলিকাতার এই দুই সমাজের ভেদ বিসম্বাদে বিজয়কৃষ্ণ ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য কিছুদিন শান্তিপুরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর এইসময়ে তাঁহাকে স্বপ্নযোগে দর্শন দেন। স্বপ্নে বা জাগরণে শ্যামসুন্দর মাঝে মাঝে অদ্ভুত ধরণের নির্দ্দেশ দিতেন ও আব্দার করিতেন। শ্যামসুন্দর বিগ্রহের অন্তরঙ্গতা বিজয়কৃষ্ণের সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে পাগিল। উত্তরকালে বিজয়কৃষ্ণ স্বমুখে শিষ্যদের বলিয়াছেন,"শ্যামসুন্দর একবার আমায় বলেন আমাকে সোনার চুড়ো গড়িয়ে দে।" বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করিনে। যারা তোমায় ভক্তি বিশ্বাস করে তাদের বল। আমি কোথায় টাকা পাব?" শ্যামসুন্দর বল্লেন "দেখ্‌ তোর খুড়িমাকে বল্‌গে। তাঁর ঝাঁপির ভেতর টাকা আছে। তাই নিয়ে নে।" খুড়িমাকে বলতেই তিনি বল্লেন, "শ্যাম-সুন্দরও আমায় এইরকম স্বপ্ন দেখিয়েছে।" খুড়িমা খুব কাঁদতে লাগলেন। বল্লেন, "সাতষট্টিটা টাকা আমি অতি গোপনে রেখেছিলাম"। ঐ টাকা খুড়িমা আমায় দিয়েছিলেন। আমি টাকা হইতে সোনার চুড়ো গড়িয়ে দেই। সেই চুড়া শ্যামসুন্দর এখনও পরছেন। সন্ধ্যার পর ছাদে গেলে শ্যামসুন্দর আমায় একলা পেয়ে বল্লেন, 'ওরে! দেখে যা চুড়ো পরে আমি কেমন সেজেছি, একবার

দেখে যা।' আমি বল্লাম ওসব আমি মানি না। 'নাই বা মান্‌লি' বল্লেন শ্যামসুন্দর, 'একবার দেখে যেতে আপত্তি কি?' আমি দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হলুম। বল্লাম 'তুমি আমায় কালাপাহাড় বানালে কেন?' শ্যামসুন্দর বল্লেন 'আপত্তি কি? তোমায় ভেঙ্গে গড়ে নুতন করে তৈয়ার করছি।'

প্রচারকার্য্যকালে মাকে দেখতে মাঝে মাঝে বাড়ী যেতুম। একবার মধ্যাহ্নে ঘরে বসে আছি। শ্যামসুন্দর এসে বল্লেন, 'আজ আমায় খাবার দিয়েছে। কিন্তু জল দেয় নাই।' এইরূপে শ্যামসুন্দর অনেক সময়ে অনেক কথা বলতেন। পূজারী কোন প্রকার ত্রুটী বা অনাচার করিলে শ্যামসুন্দর দর্শন দিয়ে বলে যেতেন।" ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট প্রেম, মধুর লীলা দেখাইবার জন্য এইরূপে শ্যামসুন্দর তাঁর লীলা দেখাইতেছিলেন। শ্যামসুন্দরের মুরলীধ্বনি বিজয়কৃষ্ণকে মাঝে মাঝে সচকিত করিত বটে, কিন্তু তখনও শ্যামসুন্দরের উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস জাগে নাই।

বিজয়কৃষ্ণ দ্বিধায় পড়িয়াছেন। কোথায় আলো? কোথায় অমৃত? কে দিবে সন্ধান? অতৃপ্তি, অবিশ্বাস, ও মানসিক অশান্তি নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার এক বৈষ্ণববন্ধু তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে বলেন। তিনি তাহা পাঠে অমৃত পথের সন্ধান পাইলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিজেই রচনা করিয়াছেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে,
জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিঃ অহৈতুকী ত্বয়ি।"

এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অহৈতুকী ভক্তিলাভের জন্য বিজয়কৃষ্ণের মনে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির রসধারা ধীরে ধীরে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনে নামিয়া আসে। সেবার বিজয়কৃষ্ণ নবদ্বীপের সিদ্ধ মহাপুরুষ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে

তিনি বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী, ভক্তি কিসে হয় ?" "ভক্তি" শব্দটী শুনিবামাত্রই বাবাজীর সারাদেহ কদম্বফুলের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আবেগভরে তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, তোমার মুখে এ প্রশ্ন সাজে না গোঁসাই। ভক্তি তোমাদেরই ঘরের বস্তু। এ যে আমার অদ্বৈতেরই ভাণ্ডারের ধন। তবে ইহা ঠিক যে দীনহীন কাঙ্গাল না হলে, অভিমান উৎপাটিত না হলে, ভক্তি-দেবীর কৃপালাভ হয় না। শক্তিধর মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী তৎপর কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে গোঁসাইজীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "প্রভু! আমি যে তোমার ললাটে তিলক ও গলায় কণ্ঠি দেখলাম। কালে এই দুইটি বস্তু তোমায় যে ধারণ করতেই হবে।" বাবাজী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই বিজয়কৃষ্ণের চমক ভাঙ্গিল। দ্রুতপদে তিনি সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলেন।

আর একদিন কালনায় ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়েন। জলপান করিতে চাহিলে বাবাজী কিছু মিষ্টি ও জলপূর্ণ কমণ্ডলুটী আগাইয়া দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "বাবাজী আমি যার তার হাতে খাই। আমি জাত মানি না। আপনি এ কি করছেন? আপনার নিজ ব্যবহারের কমণ্ডলুটী আমায় দেবেন না।" বাবাজী বলিলেন, "প্রভু, আমার জাত বিচার না গেলে, খণ্ডবুদ্ধি নাশ না হ'লে, ভক্তিদেবীর কৃপা কেন হ'বে? আমায় আর পরীক্ষা কর্বেন না। আপনি জল পান করুন"। গোস্বামী প্রভু জলপান করিলে তিনি ভক্তিভরে ঐ কমণ্ডলু তাঁহার নিজের মাথায় ছোঁয়াইলেন ও প্রসাদ হিসাবে অবশিষ্ট জলটুকু পান করিলেন।

এই সময়ে এক ভক্ত বাবাজীকে বলেন যে গোঁসাই প্রভু গলার পৈতেটাও বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ভগবান দাস উত্তর করিলেন, "আমার অদ্বৈতেরও যে গলায় পৈতে থাকত না। অদ্বৈত-সন্তান নিজের নেতৃত্বটী বজায় রেখেছেন। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকে আচার্য্য হ'য়ে

বসে আছেন।" এক ব্যক্তি অমনি বলিয়া উঠিল, "তিনি জামা-জুতা-পরা আধুনিক আচার্য্য"। ইহা শুনিয়া বাবাজী অশ্রুসজল হইলেন। বলিলেন, "ভাই! প্রভুকে মনোহর বেশে সাজিয়ে রাখাই আমাদের এক পবিত্র দায়িত্ব। আমরা দুর্ভাগা বলে এই দায়িত্ব পালন করিনে। তাই প্রভুকে নিজের সজ্জা নিজেই করিতে হয়। চৈতন্যদাস ও ভগবানদাস বাবাজীর এই বিনয় নম্র আবেদন অদ্বৈত-বংশের সন্তান বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে এক বিরাট আলোড়ন আনে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। এই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি চরম ত্যাগ ও বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন। দেবেন্দ্রনাথ তজ্জন্য তাঁহাকে মাসিক বৃত্তি দিতে চাহিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ভাগবত জীবনের কোন আদর্শ প্রচারের জন্য কোন অর্থ নিতে চাহেন না; অথচ নিতান্ত দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইতেছেন। তিনি সপরিবারে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে অনেকদিন অতিবাহিত করিতেন। পত্নী যোগমায়া দেবীকেও দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। এতকষ্ট ও ত্যাগ সত্ত্বেও তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার কার্য্য করিতেছেন। রাত্রির পর রাত্রি তীব্র সাধন ভজন ও উপাসনায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতেছে। তবুও তৃষ্ণা মিটিতেছে না। তাই কেশব সেনের মত তিনিও দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পরমহংসদেবের কাছে উপবেশন করিতেন। সাময়িকভাবে মন কতকটা শান্ত হইত। কিন্তু পরে আবার মনের উদ্বেগ ও চিত্তের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইত। বিজয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুন্দর কীর্ত্তন করিতেন। সেই গান কেশব সেনকে শোনাইয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে মৃদঙ্গ করতাল সহকারে কীর্ত্তনগানের প্রবর্ত্তন করেন। এই কীর্ত্তন গানে মহাভক্ত বিজয়কৃষ্ণের আকুতি ও ক্রন্দনে ব্রাহ্ম-সমাজের সভায় ভক্তিরসের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইত। কেশবচন্দ্র প্রায় বলিতেন, "গোঁসাইজী ভক্তিসিদ্ধ হইয়াছেন।" তবুও বিজয়কৃষ্ণের মনে শান্তি নাই। তাই তিনি সদা সর্ব্বদা সাধু সন্ন্যাসী খুঁজিয়া বেড়াইতেন।

একদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বলেন, "মেছো-বাজার ষ্ট্রীট দিয়া যাওয়ার সময় আমার জুতা ছিঁড়ে যায়। রাস্তার পাশে একটি চামারকে দেখিয়া জুতা সেলাই করিতে দিলাম। কোন দর চুক্তি কিছুই করিল না। জুতা সেলাই হ'য়ে গেলে আমি তাহাকে পারিশ্রমিক দিলাম। সেই পয়সা হইতে সে আমাকে তুইটী পয়সা ফেরৎ দিল এবং তার যন্ত্রাদি গুটিয়ে চলল। আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হল। আমি তার পিছু নলাম। সে গঙ্গাতীরে বাবুঘাটে গেল। তল্পীতল্পা রাস্তার নীচে একটী ভাঙ্গা খিলানের মধ্যে গুঁজে রেখে গঙ্গা স্নান করল। পরে তিলক করে সন্ধ্যা তর্পনাদি সেরে খিদিরপুরের দিকে চলল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলাম। সে একটী বাড়ীতে প্রবেশ করল। আমিও সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলে একটী বালক আমায় অতিথি মনে করে ভিতরে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি যে চামারটী প্রকৃতপক্ষে চামার নহে। একজন উচুদরের "মোহান্ত"। বিস্তর শিষ্য সেবক। আখড়ায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। খুব ধুমধাম ব্যাপার। আমি দেখে শুনে একেবারে বিস্মিত হ'য়ে গেলাম। মোহান্তকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। আপনার এত শিষ্য সেবক, নিজে মোহান্ত, জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিছুরই অভাব নাই। আপনি জুতা সেলাই করেন কেন? মোহান্তজী আমার প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেল্লেন। হাতজোর করে, তাঁর গুরুদেবকে বারবার স্মরণ করে, পুনঃ পুনঃ নমস্কার করে বল্লেন, "গুরু আমার বড়ই দয়ালু ছিলেন। একদিন অতিথিকে ভোজন করাবার আগেই আমি আহার করেছিলাম। তাতে তিনি আমায় শাসন করে বল্লেন, "আরে তু কাহে সাধু হুয়া। তু তো চামার হো"। আমার গুরুবাক্য আমাহ'তে কেন অন্যথা হবে? সেদিন হ'তে আমি চামারী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। সারাদিন চামারী করে আমার আহারোপযোগী চারি আনা পয়সা পেলেই আমি

চ'লে আসি। গুরুদেব দয়া করে আমাকে তাঁর গদীতে বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন গুরুদেবের সেই বাক্য শেষদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারি।"

এপ্রকার ছদ্মবেশে বহু মহাত্মা যেখানে সেখানে থাকেন। একদিন মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট দিয়ে যাওয়ার সময় বিজয়কৃষ্ণ এক সাধুর দর্শন পান। সেই সাধু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁর সঙ্গে ইডেন পর্য্যন্ত গেলেন। দীক্ষা চাইলেন। কিন্তু গুরু নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া তিনি হাওড়া পুলের কাছে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এ ঘটনার পর সাধুদের উপর তাঁহার বিশ্বাস বাড়িয়া গেল।

গোঁসাইজীর সাধনজীবনে আত্মতুষ্টি নাই। তিনি নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ভাবিয়া, লাহোরে নদীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হন। এক মুসলমান ফকির কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "অন্তরে খেদ রেখোনা। তোমার প্রার্থিত ধন তোমার নির্দ্দিষ্ট গুরুর কাছে পাইবে।" প্রাণের পিপাসা বিজয়কৃষ্ণকে আকুল করিল। তিনি এই সময়ে অঘোরপন্থী, কর্ত্তাভজা, রামাইৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, বৌদ্ধ, যোগী প্রভৃতি কত সাধকের কাছে গিয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তারপর তিনি কলিকাতায় ঠন্‌ঠনিয়ার মোড়ে এক শান্ত সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর দর্শন পান। দার্জ্জিলিংএর সন্নিকটে এক বৌদ্ধযোগীর ও দর্শন লাভ করেন। সকলেই বলিলেন, "অপেক্ষা কর। তোমার গুরু উপযুক্ত সময়েই আসিয়া দর্শন দিবেন। তিনি নিজে এসেই তোমায় কৃপা কর্ব্বেন।"

ব্যাকুল অন্তরে একবার গোঁসাইজী কাশী গিয়া ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই যোগীরাজের আকর্ষণশক্তি অদ্ভুত। প্রায় সারাদিনই বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গ করিয়া বেড়ান। বেলা গড়াইয়া যায়। ক্ষুৎ পিপাসার দিকে লক্ষ্য নাই। তাঁহার শ্রান্ত

ও শুষ্ক মুখ দেখিয়া স্বামীজী এক একদিন ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ভক্তদের দিয়া আহার্য্য আনাইয়া দেন। স্বামীজী ইচ্ছাময়। খেয়াল খুসীমত গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া বেড়ান। অসিঘাটে ডুব দিয়া মনিকর্ণিকার ঘাটে উঠেন। গঙ্গার তীরে তীরে হাঁটিয়া বিজয়কৃষ্ণও স্বামীজীর পিছু পিছু চলেন। কখনও দেখা যায় স্বামীজী নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া আছেন আর ভক্তগণ দলে দলে আসিয়া উলঙ্গ যোগীরাজের শিরে গঙ্গাবারি ও বিল্বপত্র ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্র বলিয়া ঢালিয়া দিতেছেন। এই দৃশ্য বড়ই প্রাণস্পর্শী। গোঁসাইজী এইসব দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া থাকেন।

সেদিন গঙ্গাতীরে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বিজয়কৃষ্ণ শ্রান্ত হইয়াছেন। বিশ্রামের জন্য মনিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন গঙ্গাগর্ভ হইতে স্বামীজী উঠিয়া আসিতেছেন। গোঁসাইজীর সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "ওহে স্নান সেরে এসো। তোমায় আজ একটা মন্ত্র দেবো"। বিজয়কৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন; "আমার মায়ের কাছে আমার প্রাথমিক দীক্ষা হইয়াছে। আমি এখন ব্রাহ্ম সমাজের লোক। মন্ত্রে তন্ত্রে আমার বিশ্বাস নাই"। কিন্তু স্বামীজী হঠিবার পাত্র নহেন। তখন বিজয়কৃষ্ণকে টানিয়া আনিয়া গঙ্গায় স্নান করাইলেন, তৎপর মন্ত্র শুনাইলেন। বলিলেন, "এই মন্ত্র দিলাম। কারণ তোমার শরীর শুদ্ধির প্রয়োজন আছে। আমি তোমার দীক্ষাগুরু নহি। তোমার যিনি দীক্ষাগুরু তাঁর সঙ্গে শীঘ্রই তোমার দেখা হবে।" ত্রৈলিঙ্গ মহারাজের দেওয়া এই মন্ত্রটী ভক্তিভরে গোঁসাইজী বহুদিন যাবৎ জপ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার কার্য্যে বিজয়কৃষ্ণ গয়ায় যান। সেখানে অদূরের "আকাশ গঙ্গা" পাহাড়ে সিদ্ধ রামাইত সাধু রঘুবীর দাসের আশ্রম। গোঁসাইজী তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। বাবাজীর

পদতলে পড়িয়া "পরাভক্তি" উদয়ের জন্য আশীর্ব্বাদ মাগিলেন। এই শান্ত মনোরম পর্ব্বতে থাকিয়া গোঁসাইজী কিছুকাল সাধন ভজন করিলেন। সেখানে শুনিলেন, পর্ব্বত শীর্ষে এক শক্তিধর মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতে বিজয়কৃষ্ণের প্রবল বাসনা জাগিল।

১৯২০ সালের আষাঢ় মাস। বিজয়কৃষ্ণ হাতে কিছু ফলমূল লইয়া পর্ব্বতশীর্ষে সেই দিব্যকান্তি মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দর্শন মাত্রই গোঁসাইজী নিস্পলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। সেই মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। দীক্ষা নিবার প্রার্থনা জানাইলে তিনি সানন্দে স্বীকার করিলেন ও বিজয়কৃষ্ণের বাসনা পূর্ণ করিলেন। দীক্ষা নিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার আত্মজ্ঞান লোপ পাইল। তিনি গুরুর চরণে পড়িয়া গেলেন। চেতনা ফিরিয়া পাইলে তিনি দেখিলেন গুরুদেব নাই। তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। গোঁসাইজী ইহাতে দিশাহারা হইয়া উন্মত্তের মত হইলেন। এতদিন পরে যদিও সদ্গুরু পাইলেন, তিনি কোথায় গেলেন? গুরুদেবকে পুণঃ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহার জীবনই বৃথা এবং তিনি শান্তি পাইবেন না। গয়া অঞ্চলে পাহাড়ে পাহাড়ে তিনি ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে রামশীলা পাহাড়ের এক নির্জ্জন অরণ্যে গুরুজী হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন। সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"বাচ্চা ঘাবড়াও মৎ। জোরছে সাধন অউর ভজন কর্‌তে রহো। বখৎমে তুমহারি পুরি সিদ্ধি মিল যায়গা।" অতর্কিতে মহাপুরুষ আবার অদৃশ্য হইলেন। এই গুরুজীর নাম ব্রহ্মানন্দ স্বামী। সাধু মহলে তিনি পরমহংসজী নামে পরিচিত। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম পাঞ্জাব। প্রথমাবস্থায় তিনি নানকপন্থী এক উদাসীসম্প্রদায়ভুক্ত হন। তারপর ভক্তি সাধক নানকপন্থীমতে

সাধনা করেন। উত্তরকালে এই মহাযোগীর আশ্রয় লাভ করিয়া তিনি এক ব্রহ্মবিদ্ মহাসাধকে পরিণত হন। তাঁহার আশ্রম ছিল মানস সরোবরে। এই পরমহংসজীর কৃপায় বিজয়কৃষ্ণ সিদ্ধি লাভ করেন ও আপ্তকাম হন। যখনই তাঁহার কোন বিভূতি বা অলৌকিক দর্শন হইত, অন্তরযামী শক্তিধর গুরু তাঁহাকে অন্তরাল হইতে নিয়ন্ত্রণ করিতেন। প্রয়োজন মত তাঁহাকে নিগূঢ় সাধনের নির্দ্দেশ দিতেন।

দীক্ষার পর হঠাৎ একদিন গোঁসাইজীর গতজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। রামগয়ায় তিনি নৃসিংহমন্দিরে বসিতে গিয়াই তাঁহার চেতনার পর্দ্দাটি সরিয়া গেল।

মনশ্চক্ষে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সন্ন্যাস জীবনের স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল। এই নৃসিংহমন্দিরে আরও তিনজন সাধুর সঙ্গে তিনি পূর্ব্বজন্মে সাধন ভজন করিতেন। সেই জন্মে এখানকার এক বটবৃক্ষে "ওঁ রাম" এই মন্ত্রটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। খোঁজ করিয়া দেখা গেল, বৃক্ষের গায়ে খোদাই করা লেখাটি তখনও রহিয়াছে। একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ের এক নির্জ্জন গুহায় বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার আসন পাতিয়া বসিলেন। তাঁহার জীবনের একটা বৈশিষ্ট যে তিনি যে কাজে ব্রতী হন, তাহার শেষ না দেখিয়া ছাড়েন না। আহার নিদ্রার কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি সাধনার গভীরে ডুবিয়া যান। গুরুর নির্দ্দেশিত পন্থায় তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন। রঘুবরদাস বাবাজী বলিয়াছেন, শেষের দিকে বিজয়কৃষ্ণ এক আসনে এগার দিন পর্য্যন্ত ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। বাবাজীর যত্নেই এই কঠোরতপা সাধকের প্রাণ রক্ষা হয়। পরমহংসজী অতঃপর বিজয়কৃষ্ণকে কাশী যাইতে নির্দ্দেশ দেন। সেখানে গিয়া তিনি হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। ইহার পর তিনি সংসার ত্যাগ

করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু গুরুর নির্দ্দেশক্রমে তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইল। কাশী হইতে গোঁসাইজী পুনঃ আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ফিরিয়া আসিলেন। আবার কঠোর তপস্যা আরম্ভ হইল। গুরু পরমহংসজীকে এই সময়ে প্রায় আবির্ভূত হইতে দেখা যাইত। উত্তম অধিকারী শিষ্যকে যোগের দুরূহ সাধনাদি তিনি সত্বর শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

গোঁসাইজী একদিন কথা প্রসঙ্গে যোগীদের অলৌকিক শক্তি ও যোগবিভুতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। পরমহংসজী বুঝিলেন, যুক্তিবাদী শিষ্যের প্রত্যয় সহজে হইবে না। কিছুটা যোগৈশ্বর্য্য তাঁহাকে দেখান দরকার। গুরুজী সেদিন তাঁহাকে অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি অষ্ট সিদ্ধির ক্রিয়া দর্শন করান। সাধক বিজয়কৃষ্ণ যোগশক্তির এক একটি প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন, আর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার সর্ব্ববিদ্যা বুদ্ধি ও অভিমান শিথিল হইয়া পড়ে।

গুরু মহারাজের আর একদিনের লীলা দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ আরও বিস্মিত হন। আকাশগঙ্গা পাহাড়ের গহন বনে এক প্রান্তে সেদিন একটি লোক মারা যায়। পরমহংসজী যোগবলে সূক্ষ্মদেহে সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। শবটি ধীরে ধীরে প্রাণ পাইল এবং জীবন্ত হইয়া একেবারে গোঁসাইজীর সম্মুখে আসিয়া বসিল। তিনি এই জীবন্ত শবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পুনরায় এই দেহ হইতে বাহির হইয়া পরমহংসজী নিজদেহে প্রবেশ করিলেন এবং সহাস্যে শিষ্যকে বলিলেন, “ক্যা, অব্ তুমহারা বিশ্বাস হুঁয়া ?”

অল্পদিন মধ্যে গুরুজীর কৃপায় গোস্বামীজি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। এই সময়ে গয়ায় এক তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ আসেন। গুরুর নির্দ্দেশে এই শক্তিমান তান্ত্রিকের ভৈরবীচক্রে গোঁসাইজী এক দিবস যোগদান করেন। তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত ধারণা অর্জ্জিত

হয়। তাঁহার এই দুশ্চর তপস্যা দেখিয়া আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে জোর করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসেন। বিজয়কৃষ্ণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ভক্তি-ভরে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন। গোসাইজীর মুখের দিকে চাহিয়া দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তোমায় যে নূতন মানুষ দেখিতেছি। তুমি নিশ্চয় কোন অমূল্য নিধি পাইয়াছ। ইহা ত্যাগ করোনা।"

একবার বিজয়কৃষ্ণের দেহে দুঃসহ জ্বালা সুরু হয়। অন্তর ও শুষ্ক হইয়া যায়। গুরু পরমহংসজী হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে শান্তি পাইতে জ্বালামুখী যাইতে বলেন। গুরুর নির্দ্দেশমত তিনি জ্বালামুখী যান এবং তথায় সাধনা করিয়া শান্তি লাভ করেন।

সদ্‌গুরুর কৃপা ও কঠোর তপস্যার ফল অচিরেই ফলে। সাধক বিজয়কৃষ্ণের দেহে ও জীবনে দিব্য জ্যোতি স্ফুরিত হয়। ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বসিয়া তিনি সিদ্ধকাম হন ও ভগবৎদর্শন লাভ করেন। তাঁহার সিদ্ধ দেহে দিব্যকান্তি ফুটিয়া ওঠে। যে কেহ তাঁহার দর্শনে আসিয়া মুগ্ধ হইত।

সাধনজীবনের শেষে বিজয়কৃষ্ণের আরম্ভ হইল আচার্য্যের পালা। গুরু পরমহংসজী তাঁহাকে দীক্ষাদানের অনুমতি দিলেন। যে কেহ দীক্ষা প্রার্থী হইয়া আসিলে তিনি নেপথ্যস্থিত গুরুদেবকে আবেদন করিতেন। অনুমতি মিলিলে তিনি নিঃসঙ্কোচে দীক্ষা দিতেন।

ব্রাহ্ম প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার এই অলৌকিক দর্শনের কথা বলিয়াছেন। তিনি দীক্ষা নিবার কালে দেখিতে পাইলেন, গোস্বামী প্রভুর পিছনে দীর্ঘকায় শুভ্র শ্মশ্রুযুক্ত এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। এসম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে গোস্বামী প্রভু বলিলেন, "আপনি আমার গুরুদেব

পরমহংজীকে দেখিয়াছেন। প্রত্যেক দীক্ষাদানের কালে তিনি আমার দেহে আশ্রয় করেন। তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র মাত্র।"

গোস্বামীজীর সাধন প্রণালী সহজসাধ্য ছিল। প্রতিশ্বাসে গুরুদত্ত নাম সাধন করিতে হইবে। এতৎসঙ্গে প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া ও যুক্ত থাকিত। আহার বিহারে সদাচার ও ধৰ্ম্মনিষ্ঠা বজায় রাখিতে তিনি কঠোর নির্দ্দেশ দিতেন। ইহাতে নিজস্ব ধৰ্ম্ম-সাধনা ক্ষুণ্ন হইতনা। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহুলোক তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইয়াছেন। ভোলাগিরি মহারাজ বিজয়-কৃষ্ণকে সাধক ও আচাৰ্য্য হিসাবে যথেষ্ট মৰ্য্যাদা দিতেন। একদা এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক গিরিজীর নিকট সাধন প্রার্থী হন। তিনি উত্তর দিলেন, "আরে। হামারা পাশ কেঁও আয়া। উঁহা তো আশুতোষ হ্যায়। উন্‌সে লে লেও।" তিনি স্নেহবশতঃ বিজয়কৃষ্ণকে আশুতোষ বলিতেন। বিজয়কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি বাঙ্গালী শিষ্যদের দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেই সময়ে বারদীগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার বয়স তখন প্রায় ১৭৫ বৎসর। কঠোরস্বভাব, শক্তিধর এই মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ ও তাঁহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। উভয়ের মিলনে বড়ই আনন্দ হইত। একবার বিজয়কৃষ্ণ লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দেখিতে গিয়াছেন। ব্রহ্মচারী তখন এক বৈষ্ণবকে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো। দেখ, তোমাদের গৌরাঙ্গ হচ্ছে মাটীর। আমার গৌরাঙ্গ হচ্ছে এই জীবন্ত সাধু।"

সাধনস্তরে গোঁসাইজী এমন পৰ্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিলেন, যেখানে যাবতীয় গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা ও ভেদরেখা বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরমহংসজীর কথা ফলিল। সাপের খোলসের মত ব্রাহ্ম সমাজের আবরণ খসিয়া পড়িল। ১৯০৮ সালে তিনি চিরতরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন। শিষ্যদের উৎসাহে ঢাকা গেণ্ডারিয়া

আশ্রম পুনঃ গড়িয়া উঠিল। সিদ্ধপুরুষ গোঁসাইজীকে কেন্দ্র করিয়া যোগ, তপ, ভজন, শাস্ত্রপাঠ, ধর্ম্মালোচনা ও নামকীর্ত্তনের ধারা প্রবাহিত হইল।

সেবার দ্বারভাঙ্গায় গিয়া শূল বেদনায় গোঁসাইজী খুব কাতর হইয়া পড়েন। ডাক্তারদের ঔষধে কোন ফল হইল না। স্পষ্ট বুঝা গেল রোগীর বাঁচিবার কোন আশা নাই। বন্ধু বান্ধব ও ভক্তেরা হতাশ হইলেন। এমন সময় দেখা গেল বাড়ীর বারান্দায় এক গৌরতনু দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই চঞ্চল, বিষাদগ্রস্ত। কেহই এই সাধুটীকে লক্ষ্য করিলেন না। অপরাহ্ন হইতে দেখা গেল গোঁসাইজী দ্রুত আরোগ্য লাভ করিতেছেন। সঙ্কট কাটিয়া গেল; রোগী অল্প সময় মধ্যে সুস্থ হইলেন। শুধু তাহাই নহে। সকলকে বিস্মিত করিয়া গোঁসাইজী সেইদিনই সন্ধ্যাকালে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন শুরু করিলেন। ডাক্তার ও ভক্তেরা এইসব দেখিয়া অবাক হইল। পরে গোস্বামীজী ভক্তদের কাছে বলিয়াছেন, বারান্দায় নিভৃতে যে সাধু বসিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার গুরুদেব পরমহংসজী। তিনি এসে মৃত্যুযোগ কাটিয়া দিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন বহুজনের হিতার্থে তাহাকে আরও কিছুদিন বাঁচিতে হইবে।

আপদকালে তিনি শিষ্যদের রক্ষা করিতেন। একবার মহেন্দ্রনাথ মিত্র নামক এক শিষ্যকে তিনি কলিকাতা পাঠান। কলিকাতায় বড়বাজার দিয়া তিনি যখন যাইতেছিলেন তখন তাঁহার বেজায় ক্ষুধা পায়। ভাবিলেন, সঙ্গে চারিটী মাত্র পয়সা আছে। তাহা দিয়া দুধ কিনিয়া খাইবেন। এই সময়ে এক ভিখারী ভিক্ষা চাওয়ায় তাহাকে সেই চারিটী পয়সা দিয়া দিলেন। কিছু আর খাওয়া হইল না।

ঢাকায় ফিরিলে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "সেদিন বড়বাজারে পয়সা চারিটী ভিখারীকে দিয়া ভালই করিয়াছ। এই

দুধ খাইলে কলেরা হইত।” মহেন্দ্রবাবু অবাক হইলেন। বুঝিতে পারিলেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বমঙ্গলময়।

এই সময়ে সিদ্ধাবস্থায় গোস্বামীপাদের জীবনে অলৌকিক ঘটনা প্রায় ঘটিত। একদিন ঠাকুর বলিলেন এই আম গাছ থেকে মধু ক্ষরণ হচ্ছে। ভক্তেরা গিয়া দেখেন তাই হচ্ছে। খাইয়া দেখিলেন প্রকৃতই মধু। প্রভুপাদ বলিলেন যে সব গাছের তলায় সাধুরা থাকেন, যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি হইয়া থাকে, সেইসব বৃক্ষ মধুময় হয়।

আর একবার একটি কৃষ্ণবর্ণ সাপ ঠাকুরের বাম অঙ্গ বাহিয়া মস্তকে উঠিল। একটু ফনা বিস্তার করিল। তারপর ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঙ্গ বাহিয়া নামিয়া গেল। ঠাকুর তাঁহার পরমভক্ত কুলদানন্দকে বলিলেন, ইনি আসনের জাত-সাপ। সুবিধা পেলেই আসেন। গা বেয়ে মাথায় উঠে কিছুক্ষণ ফণা বিস্তার করে চলে যান। ঠাকুর বলিলেন, সরুনালে স্বাভাবিক ভাবে প্রাণায়াম চল্‌তে থাক্‌লে, এক রকম মধুর শব্দ হয়। সাপ তাহা বড়ই ভালবাসে। তাই সাপ আসে। মহাদেবের এমন্‌টা হত।

সেবার ঢাকায় শিষ্যদের নিয়া গোঁসাইজী বৈষ্ণবদের পবিত্র “ধূলট” উৎসব যাপন করেন। শত শত মৃদঙ্গ, করতাল বাজিতেছে, আর বিপুল জনতা প্রভুপাদকে ঘিরিয়া গাহিতেছে।

“হরি বল্‌ব মুখে, যাব সুখে ব্রজধাম ; কলিতে লও
তারকব্রহ্ম হরি নাম।
এই নাম শিব জপেছেন পঞ্চমুখে, নারদ করেন বীণায় গান।
এইবার গুরু নামে দিয়ে ডঙ্কা, রাধা নামে দাও বাদাম (পাল)।”

এই ধূলট উৎসবে বিজয়কৃষ্ণ মাতোয়ারা হইয়া পড়েন। অষ্টসিদ্ধি প্রেমবিকার তাঁহার ভক্তিসিদ্ধ দেহে প্রকটিত হয়। এই কীর্ত্তন উৎসবে গোঁসাইজীর শক্তি সঞ্চারের কথা ঢাকাবাসী বহুদিন বিস্মৃত হন নাই।

গোস্বামীজী কাশীতে অবস্থানকালে স্বামীজী বিশুদ্ধানন্দের সহিত গোস্বামীজীর দেখা হয়। তিনি ইহার পর বলিতেন, "বহু সাধু ম্যয় দর্শন কিয়া, লেকিন, ইয়ে বাঙ্গালী সাধুকা মাফিক আওর কোই সাধু নেহি দেখা।" কাশীতে তখন ভাস্করানন্দ স্বামীর খুব খ্যাতি। তিনি উচ্চকোটি যোগ-বিভূতি-সম্পন্ন সাধু ছিলেন। একদিন গোস্বামীজী ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করিতে যান। ভাস্করানন্দজী ধ্যানে আছেন জানিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিলেন। ধ্যানভঙ্গে ভাস্করানন্দজী বলিলেন, "বাগানের বৃক্ষতলে এক শক্তিমান পুরুষ বসিয়া আছেন। চল্ দেখা করে আসি।"

আর একদিন গোস্বামীজী প্রসিদ্ধ সাধক দ্বারকাদাস বাবাজীর সহিত দেখা করিতে যান। দেখা না পাওয়ায় নাম ঠিকানা দিয়া ফিরিয়া আসেন। তারপর দিন দেখেন দ্বারকাদাস বাবাজী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। উভয়ে পরম আনন্দে আলাপ বিচার করিলে পর দ্বারকাদাস বাবাজী বিদায় গ্রহণ করেন। এই সময়ে গুরু পরমহংসজীর নির্দ্দেশমতে বিজয়কৃষ্ণ কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া ব্রহ্মভূমিতে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা প্রত্যক্ষ করেন।

শান্তিপুরে বাব্‌লায় অদ্বৈত প্রভুর সাধন স্থানে আসিয়া প্রভুপাদ গোঁসাইজী ছোটবেলায় মাঝে মাঝে বসিতেন এবং চুপ করিয়া ঠাকুরের নাম নিলে, এক মধুর কীর্ত্তনধ্বনি শুনিতে পাইতেন। তাই শান্তিপুর আসিলেই গোঁসাইজী এখানে কিছুকাল ধ্যান-ভজন-জপে অতিবাহিত করিতেন।

সেবার শিষ্যগণ সহ তিনি বাব্‌লায় আসিয়াছেন। শিষ্যদের বলিলেন, "এখানকার আবহাওয়া অপূর্ব্ব। এখানে নিত্য কীর্ত্তন হয়। একটু স্থির হ'য়ে বস্‌লে তাই শুন্‌তে পাবে।" শিষ্যেরা প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা প্রভুর সঙ্গে ধ্যানে বসিলেন এবং শুনিতে পাইলেন এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তন ধ্বনি ক্রমশঃ আগাইয়া

আসিতেছে। তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন এই কীর্ত্তন সাধারণ কীর্ত্তন নহে। তোমরা খুব ভাগ্যবান। মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন ধ্বনি শুনিয়াছ।

এক দিবস প্রভুপাদ গোস্বামীজি চৌদ্দ মাদল লইয়া কীর্ত্তন করিতে বাব্‌লায় চলিলেন। বহুলোকের সমাবেশ। সঙ্গে গৃহপালিত কুকুরটিও চলিল। প্রভুপাদ তাহাকে ভক্তরাজ বলিয়া ডাকিতেন। প্রভুপাদ বলিতেন কুকুর "কেলে" একজন মহাপুরুষ। বিশেষ কোন কার্য্য সাধনের জন্য সংসারে আসিয়াছে। সঙ্গীতের সঙ্গে আনন্দ করিয়া কুকুরটীও প্রভুপাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কীর্ত্তন বাব্‌লার অঙ্গনে পৌছিলে "কেলে" প্রভুপাদের বহির্বাস ধরিয়া টানিয়া একস্থানে লইয়া গেল। সেখানে কুকুরটী মাটী আঁচড়াইতে লাগিল। প্রভুপাদ তখন শিষ্যদের সে স্থানটী খনন করিতে বলিলেন। মাটী খুঁড়িয়া দেখা গেল একটা পিতলের হাঁড়ি রহিয়াছে। উহার মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতের নামাঙ্কিত একজোড়া কাষ্ঠপাদুকা, একটী মাটীর করোয়া এবং হস্তলিখিত একখানি ছিন্ন পুঁথি একটী বাক্সের ভিতর রহিয়াছে। তাহা আনিয়া ঐ পাদুকা উঠাইলেন এবং মস্তকে ধরিয়া প্রভুপাদ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন আবার আরম্ভ হইল। প্রভুপাদ ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন ভক্তরাজ "কেলে" ও অচৈতন্য। প্রভুপাদ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি যে কাজের জন্য আসিয়াছিলে সে কাজ ফুরাইয়াছে। তুমি এখন গঙ্গালাভ কর।" তৎপরদিন দেখা গেল 'কেলে'র দেহ গঙ্গাজলে ভাসিতেছে। প্রভুপাদ নিজহস্তে গঙ্গাতীরের বালুকা খনন করিয়া ভক্তরাজ 'কেলে'র নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করিলেন।

বৃন্দাবনে পৌছিবার পর পরম ভাগবত গোবিন্দদাসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। উত্তরকালে প্রভুপাদ বলিতেন, একটু অন্তর্মুখী হইলে বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা দেখা যায়। তাঁহার

স্ত্রী যোগমায়া দেবী বৃন্দাবনে আসেন। ব্রজবিদেহী রামদাস কাঠিয়াবাবার কানে এইকথা পৌঁছায়। বাবাজী মহারাজ বিজয়কৃষ্ণের মর্ম্ম জানিতেন। তিনি বিদ্রূপকারীদের তিরস্কার করিয়া বলিতেন, এই মহাত্মা এক তেজস্বী যোগীপুরুষ। ইনি ঠিক আগুনের মত। ইঁহার কাছে আসিলে সব ভস্ম হইয়া যায়। বৃন্দাবনে থাকাকালে গোঁসাইজীর পত্নী যোগমায়া দেবী বৃন্দাবনের রজঃপ্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে এইখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শুদ্ধাত্মা সাধিকা যোগমায়া দেবী অল্পদিন পরেই নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণকে একজন উচ্চস্তরের সাধক বলিয়া জানিতেন। প্রভুপাদ একবার সশিষ্য মহর্ষিকে দেখিতে যান। প্রভুপাদ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি ঘনঘন কাঁপিতে থাকেন এবং গোবিন্দায় নমঃ, গোবিন্দায় নমঃ বলিতে থাকেন। পরে সংজ্ঞা হইলে প্রভুপাদকে বলিলেন, জ্ঞান দ্বারা ভগবৎদর্শন হয় না, ইহা ঠিক। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রেমভক্তির আবশ্যক। মহর্ষি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতে পারি না। আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হউক"। সকলে মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন।

আর একবার কুম্ভমেলায় বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যগণসহ উপস্থিত হন। বৈষ্ণব সাধুমণ্ডলীমধ্যে তাঁবু খাটাইয়া আসন করিয়াছেন। ইহার মধ্যস্থলে পূজাবেদী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দুই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিষ্যদের মধ্যে কাজের বণ্টন করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "আমার কাজ হবে ভিক্ষা। তোমাদের ভরণ পোষণের ভার আমার উপর থাক্‌বে।"

সঞ্চিত কোন টাকা কড়ি তাঁবুতে নাই। কিন্তু দৈনিক শতশত টাকা ব্যয় হইতেছে। আটা, চিনি, ঘি ভারে ভারে আসিতেছে।

মেলায় সমাগত শতশত লোককে নিয়মিত খাওয়ান হইতেছে। কোন অভাব নাই।

উচ্চকোটী সাধুসন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যেই গোঁসাইজীর মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। মৌনীবাবা, অমরেশ্বরানন্দপুরী, নরসিংহদাসবাবাজী, গম্ভীরনাথজী, দয়ালদাসবাবা, অর্জ্জুনদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতেন। যোগশক্তির সাথে ভক্তির ঐশ্বর্য্যের সাথে দৈন্যের, গোস্বামীজীর জীবনে সুন্দরভাবে সংমিশ্রণ ঘটে।

অতি স্বাভাবিকভাবে বিজয়কৃষ্ণ নিজের যোগৈশ্বর্য্যকে বহন করিতেন। শুধু কৃপার ক্ষেত্রে, ধ্যানের ক্ষেত্রে তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইত। হাজার হাজার ভক্ত লোকগুরুরূপে তাঁহার প্রেমভক্তি ও ভাবব্যঞ্জনা দর্শন করিত। এই ভাব নিয়া তিনি বাঙ্গালীর অধ্যাত্মজীবনে যে প্রেম-তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যযুগের পর খুব কম লোকই করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বোলপুরের উকীল শ্রীহরিদাস বসু প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন। পরে তিনি বিজয়কৃষ্ণের কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হন। হরিদাসবাবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "আহা! হনুমানের কি অপূর্ব্ব ভক্তি। বুক চিরে ইষ্টদেবতা রামসীতা দেখিয়েছিলেন।" ভক্তের ভক্তির কথা শুনিয়া গোস্বামীজী বলিলেন, "সেকি গো! বুক আবার চিরতে হয়?" হরিদাস গুরুদেবের কথার অর্থ কি ভাবিতেছিলেন। ক্ষণপরে বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, গুরুদেবের আসনে হরেকৃষ্ণ এই মন্ত্রটি ধীরে ধীরে অঙ্কিত হইয়া গেল। শুধু তাহা নহে, সেখানে ফুটিয়া উঠিল "রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি।"

আর একদিন তিনি বৃন্দাবনে থাকিতে এক অভূতপূর্ব্ব ধ্যানাবেশে দেখিলেন, হিমাচলের কয়েকজন ঋষি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, "ভারতের অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তন

হইবে। ধর্ম্মজীবন আরও অবনত হইবে। তারপর ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া মানবজীবনে যুগান্তর ঘটাবে।"

দীর্ঘ সাধনার শেষে পরম ভাগবত বিজয়কৃষ্ণের জীবনে নীলাচলের দারুব্রহ্মের আহ্বান আসিয়াছে। গুরু পরমহংসজীর অনুজ্ঞা মিলিয়াছে। তাঁহাকে শীঘ্রই পুরীধামে পৌছিতে হইবে। দীর্ঘ কৃচ্ছ্রব্রতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাই অল্প কয়েকজন শিষ্য সঙ্গে নিলেন। যাত্রাকালে ভক্তদের বলিলেন, "তোমরা আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দাও। আমি যেন আমার প্রাণের নীলাচলনাথের দর্শন পাই। আমার যেন মহাধাম প্রাপ্তি ঘটে।" কলিকাতার বাসায় একটি মেথর কাজ করে। প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভাই! আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন দারুব্রহ্মের কৃপা পাই।"

গোস্বামীজি নীলাচলে পৌছিয়া মহা উল্লসিত হইলেন। তখনই নীলমাধবের অঙ্গনে ছুটিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়া সেখানে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। বহুদিন পরে নীলাচলে প্রেমের বন্যা বহে। এক বৎসরের অধিককাল গোস্বামীজি এইখানে বাস করেন। জটাজুট-সমন্বিত দিব্যকান্তি এই মহাপুরুষকে উৎকলবাসীরা নাম দিলেন জটিয়া বাবা। কৌপিনধারী কপর্দ্দকহীন জটিয়াবাবার যোগৈশ্বর্য্য ও নিত্যকার অনুষ্ঠানের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল।

সেদিন ঝুলন দোলের আনন্দ উৎসব। মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিত নীলমাধবের শোভা যেন অনির্ব্বচনীয়। প্রভুর নামকীর্ত্তনে গোস্বামীজি প্রেমের বন্যা বহাইলেন। মহাভাবে মাতোয়ারা গোঁসাইজীর অঙ্গে অশ্রু, পুলক ও কম্প প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ পাইল। চোখেমুখে দিব্য জ্যোতির আভা। এই দেবোপম মূর্ত্তি দেখিয়া জগন্নাথদেবের ছত্রধরও আত্মহারা হইয়া পড়ে। গোস্বামীজীর শিরে ছত্রধারণ করিয়া সে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকে। চারিদিকে স্বর্গীয় ভাবরস উদ্গত হইতে থাকে।

মহাধামের মিলনক্ষেত্রে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ প্রাণ ভরিয়া দারু-ব্রহ্মের লীলা উৎসব উপভোগ করিতেছেন। চন্দ্রযাত্রা, রথযাত্রা, পদ্মবেশ, দোলযাত্রা একের পর এক আবর্ত্তিত হইয়া আসে। প্রভুপাদ এইসব পর্ব্বদিনে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া পড়েন।

ক্রমশঃ তাঁহার শরীর খারাপ হইতে থাকে। পুরীধামের ভক্ত-সমাজে এই সময়ে তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা। ইহাতে কোন কোন বৈষ্ণবমঠের মোহান্ত এবং স্থানীয় কয়েকজন প্রতাপবান ব্যক্তির ঈর্ষা হয়। বিজয়কৃষ্ণের প্রাণনাশের জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইল।

সেদিন ভোরবেলায় প্রভুপাদ সাঙ্গোপাঙ্গসহ তাঁহার ভক্ত নীলমণি ব্রহ্মের বাড়ীতে বসিয়া আছেন। সাধুবেশধারী অপরিচিত একটি লোক জগন্নাথদেবের প্রসাদী নাড়ুর একটি ঝাপি লইয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ গোঁসাইজী এই গোপন তথ্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন, ইহাতে সাঙ্ঘাতিক বিষ আছে। তবুও প্রভুর মহাপ্রসাদ বলিয়া যখন আনিয়াছে তিনি তাহা গলাধঃকরণ করিলেন। ধীরে ধীরে তিনি চেতনা হারাইলেন। চিকিৎসকের প্রাণপণ চেষ্টার পর তিনি একমাসকাল জীবিত ছিলেন ; কিন্তু সারাদেহে বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হইল।

১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের রাত্রিতে তিনি ভক্তদের কাছে বিদায় লইয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন।

ভারতের অধ্যাত্ম আকাশ হইতে এক মহান তারকা চিরতরে লুপ্ত হইল।

২১। তান্ত্রিক সাধক রাজা রামকৃষ্ণ।

(১৭৫০ খৃষ্টাব্দ)।

রাজসাহীর ক্ষুদ্র পল্লী অষ্টগ্রামে হরিদেব রায় একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্রাহ্মণ। এই রায় পরিবার নাটোর রাজবংশের জ্ঞাতি হন। হরিদেব রায়ের কনিষ্ঠ পুত্রই সাধক রাজা রামকৃষ্ণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। একটি অজ্ঞাত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের পূর্ব্বাভাস সারা বাঙ্গলায় ধূম্রায়মান। নাটোর রাজবংশে কোন পুত্র সন্তান নাই। নাটোরের মহারাণী ভবানী দেবী ও দেওয়ান দয়ারাম রায় নাটোরের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, নাটোরের রাজবংশের রীতি ও ভূম্যধিকার যাহাতে রক্ষা পায় তাহাই করিতে হইবে। মহারাণী স্থির করিলেন দত্তক গ্রহণ করিবেন।

দেশ বিদেশ হইতে সুলক্ষণযুক্ত বহুব্রাহ্মণ বালক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। দ্বিতলকক্ষে রাণীর সম্মুখে শিশুদের ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মহারাণী সকলকে সেখানেই দেখিবেন এবং তৎপর দত্তক নির্ব্বাচন করিবেন।

দেওয়ানজী দয়ারাম রায় আসিয়া সকলকে আহ্বান জানাইলেন ; সকলেই উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক অতি প্রিয়দর্শন তেজস্বী বালক যায় নাই। সে তাহার বাবা ও সঙ্গীয় ভৃত্যটিকে খুঁজিতেছে। দেওয়ান দয়ারাম রায় স্বয়ং আসিয়া তাঁহার গুরুগম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন। কি খোকা! তুমি এখনও যাও নাই? শীঘ্রই রাণীমার কাছে খেতে যাও। বালক তখনও চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। প্রিয়দর্শন অপরূপ রূপলাবণ্যযুক্ত এই বালককে দেখিয়া দেওয়ান তাহাকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। বালকের পিতৃ-পরিচয় পাইয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং রাণীমার কাছে গিয়া

বলিলেন, 'ছেলে নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছে।' নাটোরের রাজগদীতে শুধু এই বালকই বসিবার উপযুক্ত। এই ছেলে নাটোরের জ্ঞাতি সম্পর্ক। রাণী বালককে কোলে নিয়া মুখচুম্বন করিলেন। এই বালকই পরবর্ত্তীকালে শক্তিধর তন্ত্রসাধক রাজা রামকৃষ্ণ।

রাণী ভবানী পরম সমারোহে রামকৃষ্ণকে দত্তক নিলেন। বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিশ্বরী হইয়াও তাঁহার মনে শান্তি নাই। ভাগীরথীর উভয় তীরেই তীব্র অশান্তি। নবাব সিরাজদ্দৌল্লা অব্যবস্থিতচিত্ত। শাসন ব্যাপারে দুর্ব্বলতার সুযোগে সকলেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও রাণী তাঁহার জমিদারীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু রাণীর প্রতিভা ও বৈষয়িক বুদ্ধি প্রজাবর্গের কল্যাণ কামনায় তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিল। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যে ও প্রবল প্রতাপে বালক রামকৃষ্ণ দিন দিন সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইয়া অসামান্য পুরুষ হিসাবে তৈয়ার হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মজীবনও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইতে লাগিল।

তখন নাটোরে জ্ঞানী, গুণী সাধু ও সন্ন্যাসী সকল রকমের লোকের নিত্য আনাগোনা ছিল। রাণীমা ও রামকৃষ্ণ সদাসর্ব্বদা তাঁহাদের উপদেশবাণী শ্রবণ করিতেন। কিন্তু এই অগাধ ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি, ধর্ম্মাচরণ ও জনসেবা কিছুই তাঁহাকে আকর্ষণ করিল না। তিনি রাজপুরীর কোলাহল হইতে দূরে একা উদাসীনের মত থাকিতে চাহিতেন।

প্রখর বুদ্ধিশালিনী রাণীর দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। কুমারের আচরণে ও উদাসীনতায় তিনি ক্ষুণ্ণা হইলেন। গুরুদেব রঘুনাথ তর্কবাগীশের পরামর্শে কুমারের দীক্ষা ও বিবাহ কার্য্য সহসা সমাধা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

তর্কবাগীশের নির্দ্দেশমত রাণী ভবানীই রামকৃষ্ণকে দীক্ষা দিলেন। তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, দত্তকপুত্র

রামকৃষ্ণ অন্ততঃ গুরুজ্ঞানে হইলেও মাতার প্রতি ভক্তিমান থাকিবে। দীক্ষান্তে পুত্রের বিবাহ দিয়া সুলক্ষণা ও পরমা রূপবতী বধূ ঘরে নিয়া আসিলেন। রাণী ছেলেকে সাংসারিক হইয়াছে বুঝিয়া প্রায়শই বারাণসীধামে থাকিতেন। নতুবা মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে বাস করিতেন।

রাজা রামকৃষ্ণ এখন বিপুল সম্পত্তি ও অতুল কীর্ত্তির অধিকারী। সুন্দরী স্ত্রীর সাহচর্য্য, নবজাত পুত্রের আকর্ষণ, প্রাসাদের আনন্দ উৎসব, কিছুই তাঁহার অন্তরের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে পারিতেছে না। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বিলাস ও আড়ম্বর হইতে তিনি সর্ব্বদা দূরে থাকিতে প্রয়াসী হইতেন।

নাটোরের জয়কালী বড়ই জাগ্রতা বিগ্রহ। উদ্বেল ও অশান্ত হৃদয়ে রাজা রামকৃষ্ণ তথায় ছুটিয়া যাইতেন ও জপ ও ধ্যানে প্রহরের পর প্রহর কাটাইয়া দিতেন। মাঝে মাঝে বাগসরের শ্মশানে গিয়াও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। ভবানীপুর একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম। নাটোর হইতে বেশী দূরেও নয়। অমাবস্যা তিথিতে ও বিশেষ বিশেষ রজনীতে তিনি সেখানে গিয়া পঞ্চমুণ্ডির আসনে ধ্যানাবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। তিনি তারাপীঠেও গিয়া তন্ত্রসাধনা ও নিগূঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়াদি শিক্ষা করেন। এই সময়ে ভবানীপুরে এক মহা শক্তিমান্ কৈলাচার্য্যের দর্শন পাইয়া রাজা রামকৃষ্ণ পূর্ণাভিষিক্ত হন এবং শব সাধনা অনুষ্ঠান করেন।

শক্তিপীঠ ভবানীপুর নাটোর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। শাক্ত আগমে কথিত আছে যে করতোয়া নদীর নিকট এই পবিত্র তীর্থে "সতীর" গুল্‌ফ পতিত হয়। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অপর্ণা দেবী। কিন্তু জনসাধারণের কাছে ইনি ভবানী দেবী নামে পরিচিতা। এইখানে মন্দিরের চারিদিকে রাজা রামকৃষ্ণ চারিটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করেন। শক্তিপীঠে সমাগত কৌল সাধক

ও যাত্রীদের সুবিধার্থে নাটোর সরকার হইতে যাবতীয় ব্যয়ের ব্যবস্থাও ছিল।

একদা এক অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার রজনীর নিশীথে রাজা রামকৃষ্ণ মন্দির মধ্যে মহামায়ার ধ্যানে মগ্ন। অঞ্জলি ভরিয়া রক্তজবা আর বিল্বদল তিনি মায়ের চরণে দিতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে চারিদিক কম্পিত করিয়া "মা, মা" রবে হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। বাহিরে তাঁহার অনুগত অনুচর ভোলা ও মন্দিরের পুরোহিত পাহারা দিতেছে। হঠাৎ এই সময়ে দণ্ড কমণ্ডলু ও ত্রিশূল হস্তে এক সন্ন্যাসী আসিয়া রাজা রামকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থী হন। কিন্তু পাহারাদারেরা বাধা দেন। বাধা প্রাপ্ত হইয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন "রাজা রামকৃষ্ণ। তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়া আছ। তুমি কি ছিলে সেই পূর্ব্ব কথা স্মরণ কর।" এই উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া রাজা রামকৃষ্ণ বিচলিত হইলেন। তাড়াতাড়ি মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন কেহ নাই। সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহার পর সাধক রামকৃষ্ণ স্থির করিলেন, "মায়া পাশ ও রাজত্ব বন্ধন সবলে ছিন্ন করিতেই হইবে।"

এই গোপনচারী পরম সুহৃদ সন্ন্যাসী আরও একবার রাজা রামকৃষ্ণ হস্তীপৃষ্ঠে উৎসবের শোভাযাত্রায় যাইবার কালে দর্শন দেন। সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে রাজা রামকৃষ্ণ হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া আসেন। সন্ন্যাসী আত্মপরিচয় দেন। তিনি রাজপুতানার বুঁধি রাজবংশ সম্ভূত ও উচ্চকোটি সাধক সমাজে "শ্রী"জি নামে পরিচিত। শ্রীজি বহুক্ষণ যাবৎ নিষ্পলক নেত্রে রাজা রামকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া রাজার মেরুদণ্ডটি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। রাজার দেহে নূতন এক বিদ্যুৎ শিহরণ অনুভূত হইল। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন এই শ্রীজি তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মের গুরু ভ্রাতা। তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের পথ প্রদর্শক।

তাঁহাকে সাবধান করিতে আসিয়াছেন এবং মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন।

মুক্তির সুযোগও অচিরে আসিয়া গেল। কোম্পানীর রাজস্বের দায়ে জমিদারীর মহাল ক্রমে ক্রমে নীলাম হইতে লাগিল। এক একটি মহাল রাজস্বের দায়ে নীলাম হইয়া যায়, আর রাজা রামকৃষ্ণ ও নিষ্কৃতির হাঁফ ছাড়েন ও জয়কালী বাড়ীতে মহা-সমারোহে পূজা দেন।

প্রচণ্ড আকুলতা নিয়া তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বড় নগরের কিরীটেশ্বরী মন্দিরে কখনো দিব্যোন্মাদের অবস্থায় তাঁহাকে দেখা যাইত। এক এক দিন ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া তিনি ভবানীপুরের শক্তিপীঠে ছুটিয়া যাইতেন। তন্ত্র সাধনার মহাকেন্দ্র, বশিষ্টদেবের সাধনপূত তারাপীঠেও গিয়া মাঝে মাঝে তিনি সাধন ভজন করিতেন। এখানকার দেবীপূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নাটোর সরকার হইতে বহু সম্পত্তি "দেবত্র" করা হয়।

অবশেষে এক শুভ লগ্নে শক্তি সাধনার সাফল্য তাঁহার জীবনে উদিত হইল। ভবানীপুরের পীঠস্থলিতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসিয়া ইষ্টদেবী আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন।

ভবানীপুরের অপর্ণা বিগ্রহ তন্ত্রাচার্য্যদের পরম প্রিয় স্থান। সমসাময়িক বহু বিখ্যাত শক্তি সাধক এখানে সমবেত হইতেন। রাজা রামকৃষ্ণের সিদ্ধির কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিলেন।

ভবানীপুর পীঠে সেবার রামনবমী উৎসব। দেবী বিগ্রহের অঙ্গে বহু মূল্যবান আভরণ শোভা পাইতেছে। রাজপুরীর বহু মহিলারা ও বিচিত্র বসন ভূষণে সাঁজিয়া উৎসবে আসিয়াছেন। উৎসবের হাসি, আনন্দ ও জগজ্জননীর স্তুতিতে চারিদিক মুখরিত হইতেছে।

অমাবস্যার নিশীথে মহাপূজা অনুষ্ঠিত হইবে। এখনও একটু

বিলম্ব আছে। রাজা রামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইয়া স্বরচিত একটি গান গাহিতেছেন :—

ভবে, সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীকে জানে,
সে যে যায় না তীর্থ পর্য্যটনে, কালী কথা শুধু শুনে কাণে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী তাই ভাবে মনে
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কুল, বল! সে মুখ হারাবে কেমনে?
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে?
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে, কালী নামামৃত পীযুষ পানে।

মাতৃনামে বিভোর রাজা রামকৃষ্ণ প্রাসাদের ছাদে বসিয়া গান করিতেছেন। নয়নে অশ্রুধারা ঝরিতেছে। হঠাৎ সম্মুখের বনপ্রান্তর হইতে বিকটধ্বনি উত্থিত হইল। এই আনন্দময় উৎসবের দিনে দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর দল মন্দির লুট করিতে আসিতেছে। তাহারা জানে উৎসবের দিনে মন্দিরে বহু স্বর্ণাভরণ এবং প্রণামীর টাকা থাকিবে। কিন্তু একি আশ্চর্য্য! রাত্রির গভীর অন্ধকারে ছাদে দাঁড়াইয়া রাজা রামকৃষ্ণ দেখিতে পাইলেন, দস্যুরা মশাল জ্বালাইয়া বিরাট ধ্বনি সহকারে একবার আগাইয়া আসিতেছে আর একবার পিছু হঠিতেছে। মন্দিরের রক্ষীর সংখ্যা ত বেশী নয়। তবে কে এই দস্যুদের বাধা দিতেছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন ডাকাতেরা উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। দস্যুদের এই আকস্মিক আগমনে ও পলায়নে রাজা রামকৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া গাহিয়াছিলেন—

কা'র রমণী সমরে বিরাজে,
কে গো লজ্জারূপা দিগম্বরী অসুর সমাজে
মায়ের পদতল বরণ জিনি তরুণ অরুণ,
নখরে নিশাকর লুকাইল লাজে।

সিদ্ধ রাজা রামকৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলেন। দস্যুদের ভীতি সঞ্চার করিয়া তিনি স্বয়ং মন্দির, বিগ্রহ ও ভক্ত সকল ডাকাতদের হাত হইতে রক্ষা করিলেন।

ডাকাতদের দলপতি পরদিন মন্দিরে আসিয়া রাজা রামকৃষ্ণের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। গতরাত্রে সে ও তাহার সঙ্গীরা মায়ের লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। যে দিক্ দিয়া তাহারা মন্দির আক্রমণ করিতে যায়, সেই দিকেই অসুর-সংহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা পিছু হঠিয়া পড়ে। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাহারা পলায়ন করে। উত্তর বঙ্গের দুর্দ্ধর্ষ দস্যু "শঙ্করা" এই দলপতি। শঙ্করার সেই আসুরিক মূর্ত্তি আর নাই, পাষণ্ডী হইয়াছে আজ পরম ভক্ত। সে বলিল, "একবার ও আমি ভাবি নাই যে সকলকে যিনি সংহার ও পালন করেন সেই জগজ্জননী আপনার হ'য়ে মন্দির রক্ষা কর্ব্বেন। আজ বুঝিতে পারিলাম, আপনার আশ্রয়ই আমার পরম আশ্রয়।"

নয়নজলে রাজা রামকৃষ্ণের বক্ষ ভাসিয়া গেল। শঙ্করাকে তিনি প্রেমালিঙ্গন দিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমিই জগন্মাতাকে অসি ধরিয়েছ। তুমি মা'কে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ। তোমার সবদোষ আমি ক্ষমা করিলাম। আজ থেকে মায়ের নাম গাহিয়া তুমি জীবন সার্থক কর।" তাঁহার প্রভাবে এই পরাক্রান্ত দস্যুনেতার জীবনে এক অপ্রত্যাশিত ভাবান্তর সঞ্চারিত হয়।

রাজা রামকৃষ্ণ আজ নিস্পৃহ, মুক্ত পুরুষ। তাঁহার নিকট এখন রাজভাণ্ডার ও কৌপীন এক সমান।

এবার তাঁহার চরম সাধনা আরম্ভ হইল। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প মহামায়াকে চিরতরে তাঁহার অন্তর বেদীতে স্থাপন করিবেন।

অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার। সাধক আসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ পঞ্চমুণ্ডির আসন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সম্মুখে আদ্যাশক্তি জগজ্জননী আবির্ভূতা হইলেন। দেবী কহিলেন, "বাবা রামকৃষ্ণ! তোমায় আমি আপনার করিয়া আমার কাছে নিতে এসেছি। তৎপূর্ব্বে তোমার মায়ের সঙ্গে যে মতান্তর

হইয়াছে তাহা মিঠাইতে হইবে। তিনি তোমার মা, পালয়িত্রী ও দীক্ষাদাত্রী। তোমার মা তোমায় প্রজারঞ্জক রাজা ও শক্তিমান্ সাধক দুইই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজত্ব ফেলিয়া তুমি শক্তিমান্ সাধক হইলে। এই জন্য মতান্তর। তুমি তাঁর কাছে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। লৌকিক জীবনের দাবী দাওয়া সব মিটাইয়া ফেলিয়া আমার কোলে চলে এসো।" দেবী আদ্যাশক্তি ইহা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

তখন মা রাণী ভবানী আছেন, মুর্শিদাবাদের বড়নগরে। সেখানে রাজা রামকৃষ্ণকে এখনই পৌছিতে হইবে। কিম্বদন্তী আছে যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার সিদ্ধ দেহটী পঞ্চমুণ্ডির ধ্যানের আসন হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঝড়ের বেগে বড়নগরের দিকে ধাবিত হয়। চকিতে রামকৃষ্ণ কোথায় শূন্যমার্গে অন্তর্দ্ধান করেন, ভোলা ভাবিয়া পায় না। কেহ বলে মহারাজ সশরীরে কৈলাসে গিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন তাঁহার অলৌকিক শক্তিলীলা প্রদর্শন করিয়া আকাশে বিহার করিতেছেন।

ইহার পর সংবাদ আসে যে মহারাজের দেহ নিশীথে ভবানীপুর হইতে বহু দূরে পাকুরিয়া অঞ্চলের এক সেতুর সম্মুখে সবেগে পতিত হয়। পাকুরিয়া অবধি এই দীর্ঘ রাস্তা তিনি কি করিয়া অতিক্রম করিলেন, অদ্যাবধি এই রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারে নাই। পাকুড়িয়ায় নাটোরের গুরুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। খবর লইয়া তাঁহারা ছুটিয়া আসেন এবং সযত্নে পাল্কীযোগে রাজা রামকৃষ্ণকে রাণী ভবানীর নিকট পৌছাইয়া দেন।

মাতাপুত্রের সেদিনকার মিলন বড়ই প্রাণস্পর্শী হয়। মায়ের নিকট হইতে ক্ষমা লাভ করিবার পর তাঁহার পরম প্রাপ্তির লগ্ন উপস্থিত হইল।

বড়নগরের গঙ্গাতীরে তিনি ত্রিরাত্র বাস করার পর শেষবারের মত জননী আদ্যাশক্তির দর্শন পান। সর্ব্বসত্তা তাঁহার মাতৃময়

হইয়া উঠে। শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগের বেশী দেরী নাই। আপ্তকাম সাধক অস্ফুট স্বরে গাহিলেন—

যদিও মোর মন ভুলে তবুও এই বালির শয্যায়
কালীর নাম দিও কর্ণমূলে
এ দেহ আপনার নয় রিপু সঙ্গে চলে
আন্‌রে ভোলা জপের মালা
ভাসি গঙ্গা জলে।

উত্তর সাধক ভোলানাথ, তাঁহার কর্ণে বারবার মাতৃনাম শোনায়। ইষ্টলগ্নে জপের মালাটি রামকৃষ্ণের হাতে চিরতরে নিশ্চল হইয়া যায়।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার তন্ত্র সাধক এই দিক্‌পাল পুরুষের তিরোধান ঘটে।

আপ্তকাম মহাসাধকের সর্ব্বসত্তা জগজ্জননীর জ্যোতিঃ সমুদ্রে চিরতরে বিলীন হইয়া যায়।

২২। চরণদাস বাবাজী।

(১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ।)

যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমার মহিষখোলা গ্রামের কায়স্থেরা বেশ বিত্তশালী। এই কায়স্থ বংশের মোহনচন্দ্র ঘোষের অপর পুত্র রাইচরণ ঘোষ ১২৬০ সালের (১৮৫৪ ইং) ২৯শে চৈত্র তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রায় পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা মোহনচন্দ্র ঘোষ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মাতা কণকসুন্দরী ও খুল্লতাত ঈশানচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে বালক রাইচরণ বর্দ্ধিত হয়। দুইটী পুত্রের পরপর মৃত্যুর পর রাইচরণ মাত্র জীবিত। তাই তাঁহাকে পরম যত্নে ও স্নেহে লালন পালন করা হয়। মাতা কণকসুন্দরী উদার হৃদয়া ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। এই বিশেষ গুণগুলি ধীরে ধীরে ছেলেতেও প্রতিলক্ষিত হয়।

রাইচরণের অন্তর অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপরায়ণ ছিল। যদি তিনি দেখেন কাহারও ছাতা নাই, কেহ বা শীতে কষ্ট পাইতেছে, বা কেহ রুগ্ন, পীড়িত ও বৃদ্ধ, তিনি নিজে উপযাচক হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। বালক পুত্রের এইসব সৎকাজের জন্য স্নেহশীলা জননী সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন।

যুবক বয়সে রাইচরণের বিবাহ হয়। নববধূ স্বর্ণময়ীকে নিয়া বেশ আনন্দে তাঁহার দিন কাটিতেছিল। অতঃপর তাঁহার দুইটী সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় তিনি শোকাভিভূত হইয়া পড়েন এবং উহা তাঁহার মনস্তাপের কারণ হয়। ইহার পর বংশ রক্ষার জন্য রাইচরণকে পরপর আরও দুইটী বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক জীবন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাঁহার পৈত্রিক অর্থ ও বিত্ত যথেষ্ঠ ছিল। তদুপরি তিনি নিজেও ভাল উপার্জ্জন করেন। জমিদারী সরকারে চাকরী নেওয়ার পর উত্তরোত্তর তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। নায়েব ও পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে রাইচরণ জমিদার

ও প্রজা উভয়েরই কাছে অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। কৌশলী ও দক্ষ এই কর্ম্মচারীকে সকলেই সমীহ করিত। যদিও প্রাচুর্য্য ও শান্তি তাঁহার পরিবারে ছিল, তথাপি অন্তরে ছিল তাঁহার প্রবল বৈরাগ্য।

পুরাতন এক বিলের স্বত্ব লইয়া বিরোধ হওয়ায়, জমিদার বাবু রাইচরণকে সেখানে পাঠাইলেন। যেমন করিয়া হউক, বিরোধী প্রজাদের দমন করিতেই হইবে। এবং তাহাদের দখল করা ক্ষেতের আউস ধান জোর করিয়া কাটিয়া আনিতেই হইবে।

লাঠি, ঢাল ও সড়কী লইয়া বরকন্দাজেরা ও বন্দুকহস্তে স্বয়ং রাইচরণ বাবু মাঠে গেলেন। এ পক্ষের সাজ-সজ্জায় প্রজারা ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। কাছাড়ী বাড়ীর প্রাঙ্গনে স্তূপীকৃত কাটা ধান এবং চারিদিকে জয়ের উল্লাসধ্বনি দেখিয়া রাইচরণ কেমন হইয়া গেলেন। ধান্যস্তূপের দিকে তাকাইয়া রাইচরণের বুক বেদনায় আর্ত্ত হইল। তিনি বুঝিলেন এইভাবে প্রজাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনা মহাপাপ। চাকুরীর দায়ে সেই মহাপাপ আজ তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর নয়, এই ঘৃণিত জীবনের শেষ এখানেই হউক।" বিষাদপূর্ণ অন্তরে তিনি সেদিনই সংসার ত্যাগ করিলেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি দীক্ষাগুরু কৌল সাধক যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এবং মা ভবাণীর প্রত্যাদেশ মনে করিলেন। তিনি ভবানীপুরে দেবী ভবানীর সম্মুখে বসিয়া পুরশ্চরণ করিলেন এবং তৎপর সরযূতীরে যাইয়া শঙ্করারণ্যপুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। নবদীক্ষিত শিষ্যের এই সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া গুরুদেবের অপার আনন্দ হইল। গুরুদেবের উপদিষ্ট বৈষ্ণব সাধন প্রণালী তিনি আয়ত্ত করা আরম্ভ করিলেন। তৎপর রাইচরণ ঘোষ সর্ব্বজনবন্দিত চরণদাস বাবাজী-রূপে সর্ব্বত্র খ্যাত হন। এক জীবন্ত সর্ব্বজনীন বৈষ্ণব আন্দোলন তাঁহার প্রেমশক্তি ও নামকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে।

দীক্ষার কতককাল পরে গুরুজী তাঁহাকে অযোধ্যায় না থাকিয়া দেশে দেশে নগরে নগরে নামকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে আদেশ দিলেন। নাম প্রচার করিতে তাঁহাকে বাহির হইতে হইল। বিদায়ের ক্ষণে চরণদাস জানিতে চাহিলেন, গুরুজীর সঙ্গে দেখা আর কবে হইবে। গুরুজী বলিলেন শীঘ্র নহে। প্রভুর ইচ্ছা হইলে পরে হইবে।

উত্তর ভারতের বহুতীর্থ দর্শন করিয়া তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে আসেন। গৌরলীলার পবিত্রস্থানগুলি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রেম উচ্ছ্বসিত হয় এবং নয়নে অশ্রু গড়াইতে থাকে।

এইখানে নবদ্বীপদাস ও আরও কয়েকজন ভক্ত তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠেন। তৎপর তিনি নীলাচলের পথে যাত্রা করেন। নীলাচলে আসিয়া চরণদাস বাবাজী স্বরচিত মধুময় কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রভুর লীলাগান করিতে থাকেন। একদিন কীর্ত্তনের পর তিনি মন্দির চত্বরে ঘুমাইয়া পড়েন। সেখানে তিনি স্বতন্ত্র দ্বাবিংশ অক্ষরযুক্ত এক গৌরমন্ত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর চরণদাস বাবাজীর মধ্যে এক দিব্য আবেশ দেখা দিল। বড় বাবাজী চরণদাসের সুধাকণ্ঠে সুমধুর কীর্ত্তন ও নৃত্য অহরহ চলিতেছে। ভাবাবেশে জগন্নাথদেবের পাণ্ডা প্রসাদীচন্দন ও তুলসীমালা চরণদাস বাবাজীর ললাটে ও কণ্ঠে পরাইয়া দেন। দীনহীন কাঙ্গালের বেশে চরণদাসজী নীলাচলের লীলাস্থানগুলি পরিক্রমা করেন। নীলাচলে তাঁহার বেশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জন্মে। তৎপর তিনি পুনঃ নবদ্বীপে আসিলেন। এইখানে আসিয়া তিনি গৌরহরি দাসজীর নিকট দীক্ষা নেন। অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে চরণদাস মহারাজ সবিনয়ে কহিলেন, "বাবা! কিছুদিন আগে আমি স্বপ্নে আমার মন্ত্র পাইয়াছি। আপনি আমায় সেই মন্ত্রই দিন।" সেই মন্ত্রই তাঁহাকে দেওয়া হইল, এবং তাঁহার ভেকের নাম হইল "রাধারমণ চরণদাস।"

মুণ্ডিতমস্তক ডোরকৌপিনধারী চরণদাসজী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা

করেন। বলেন"আপনারা সকলেই আমাকে ক্ষমা ভিক্ষা দিন। আমি ঘোর বৈষ্ণবাপরাধী। আপনাদের কৃপাভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই।"

মন্দিরের দর্শন ও ভজন কীর্ত্তন অন্তে চরণদাস বাবাজী সাঙ্গো-পাঙ্গসহ গৃহে ফিরিতেছেন। কীর্ত্তনাঙ্গনে তাঁহার সঙ্গে এক কুকুরী জুটিল। ভজন কীর্ত্তন শুনিতে তাহার পরম আনন্দ। তাই বাবাজী তাহার নাম দিলেন "ভক্তিমা।" তাঁহার আশ্রমে এই কুকুরী শ্রদ্ধেয়া বৈষ্ণবীর মর্য্যাদা পাইতে থাকে। কিছুদিন রোগভোগের পর এই কুকুরীর দেহত্যাগ হয়। গঙ্গাগর্ভে তাহার দেহ সমাধি দেওয়ার পর বাবাজীর অভিলাষ হইল, ভক্তিমায়ের শ্রীধামপ্রাপ্তি উপলক্ষে এক মহোৎসব করিবেন। সারা নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইল। তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল ভক্তিমায়ের স্বজাতি নবদ্বীপের কুকুর সমাজকেও নিমন্ত্রণ করা হউক। চরণদাস বাবাজীর ভক্তগণ ও সঙ্গীরা ইহা শুনিয়া অবাক্। এমনিইত কুকুরীর শ্রাদ্ধ, তদুপরি কুকুরদের ভোজন। লোকে পাগল ছাড়া আর কি বলিবে?

একনিষ্ঠ ভক্ত নবদ্বীপদাসের উপর এই নিমন্ত্রণ ভার পড়িয়াছে। আশ্রম হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নবদ্বীপদাস বাবাজীর চরণে প্রণাম করিলেন। বাবাজী এই সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া অন্তরঙ্গ ভক্তের পীঠে হঠাৎ এক "চড়" মারিলেন। এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। টলিতে টলিতে নবদ্বীপদাস তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। পথে যেখানে যত কুকুর দেখেন গললগ্নীবাসে করযোড়ে, "আগামী কল্য ভক্তিমায়ের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ—বড়ালঘাটে—বাবাজীর আশ্রমে" নিবেদন করিলেন।

তৎপরদিন বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দলে দলে কুকুর মহোৎসবের চত্বরে সমাগত হইতেছে। কুকুরের চিরাচরিত অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই। সকলে সারিবদ্ধ হইয়া মহোৎসবের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইতেছে। আর চরণদাস মহারাজ "জয় নিতাইচান্দের জয়"

বলিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেছেন। প্রেমাবেশে তাঁহার দুইনয়ন আরক্তিম। দেহ টলমল করিতেছে। অভ্যাগত কুকুরদের তিনি ভোজন ও আপ্যায়নে ব্যস্ত। পঙক্তি ভোজন শেষ হইলে কুকুরের দল নিঃশব্দে একে একে স্থান ত্যাগ করিল।

সহস্র সহস্র লোক বাবাজীর এই অলৌকিক বিভূতি লীলা দর্শন করিলেন এবং সকলেই অতঃপর শ্রদ্ধাভরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। চারিদিকে চরণদাসবাবাজীর জয় জয়কার পড়িল।

একবার তিনি কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে বাস করিতে গেলেন। একদিন রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া প্রসিদ্ধ সাধক হরিচরণদাস বাবাজীর ভজন কুটিরে উপস্থিত হইলেন। বড় বাবাজীর আগমনে সেখানে বৈষ্ণবদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। বৈষ্ণবদের ত্যাগনিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রব্রতের কথা বলিতে গিয়া বড়বাবাজী হরিচরণদাসকে বলিলেন, "ভাই। তোমার এই শ্রীকুণ্ডে বাস, মাধুকরী বৃত্তি ও নিষ্কিঞ্চনভাব দেখিয়া আমি আনন্দ পাইয়াছি। কিন্তু তোমার ত্রুটি আছে।" হরিচরণ বলিলেন, "আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। দয়া করে আমার দোষত্রুটী দেখাইয়া দেন।" তখন বড় বাবাজী বলিলেন, "তুমি সুপণ্ডিত। তোমায় কি বলিব? তুমি শ্রীবিনোদের মন্দিরে মাধুকরীর জন্য গিয়াছিলে। আমি দেখে বড়কষ্ট পাইলাম যে তুমি সেখানে এক দোনা অন্ন ও একদোনা তরকারী নিলে। কিন্তু একস্থানে এত আহার্য্য নেওয়া কি সাধকের উচিত? মাধুকরীর অর্থ তাহা নহে। মধুকরের মত নানাস্থান থেকে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে হবে। পুনঃ যে গৃহে তোমার প্রতিপত্তি আছে, সেখানে মাধুকরী করাও ঠিক নহে। জানতো, প্রভু নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "যেই জন ভজে মোরে অনন্য হইয়া, তারে ভিক্ষা দেই মুঞি মাথায় বহিয়া।"

বৈষ্ণব জীবন যে নিষ্কিঞ্চন কাঙ্গালের ব্রত, বড়বাবাজীর উপদেশে সকলেই সেদিন স্পষ্টভাবে বুঝিলেন। একদিন তাঁহার ভক্ত

কাঙ্গালদাস তাঁহার পদসেবায় রত। তাঁহার অলৌকিক জ্যোতিঃ দেখিয়া কাঁদিয়া তাহার পায়ে পড়িল। বলিল নিতাই গৌর তাঁহাকে দেখাইতেই হইবে। বাবাজী বলিলেন, "নিতাই গৌর, রাধাকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। তাঁরা নিরন্তর তাদের সম্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হৃদয় মধ্যে উপযুক্ত আসন তৈয়ার না হলে তাঁদের বসাবি কোথায়? আগে তৈরী হও, তৎপর দর্শন পাবে। যোগ্য হইলে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ দর্শন হবেই হবে।"

একবার কলিকাতা থাকাকালে গিরীশ ঘোষের নিমন্ত্রণে বাবাজী "চৈতন্য লীলা" নাটক দেখিতে যান। চরণদাসজী ভাবে বিভোর হইয়া নাটক দেখিতেছেন। কিন্তু মাধাই যখন কলসীর কানা লইয়া নিতাইকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। দর্শকদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। সেদিন প্রেক্ষাগৃহে দেখা গেল বাবার অলৌকিক শক্তির এক বিশেষ প্রকাশ। সম্বিৎ হারাইয়া তিনি ভূতলে গড়াগড়ি দিতেছেন। আর যে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে, সে আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছে। বাবাজী মহারাজকে কোনরকমে সুস্থ করাইয়া উঠাইয়া গিরীশ ঘোষ করজোড়ে বলিলেন, "বাবাজী! আমার মনে কিছু অভিমান ছিল, আমি বৈষ্ণবলীলা কিছু বুঝি। তাহার প্রভাবে আমি এই নাটকখানি লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এই অভিমান আজ তিরোহিত হইল।

প্রেমসিদ্ধ মহাবৈষ্ণবের সর্ব্বসত্তা এক অপার্থিব আনন্দধারায় প্রবাহিত হইতেছে। দিব্যোন্মাদ ও মহাভাবের মধ্য দিয়া লোক-লোচনের সম্মুখে এক অপূর্ব্বরূপান্তর আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই সময়ে তিনি কখনও একেবারে উলঙ্গ থাকেন, কখনও বা থাকেন ডোর কৌপিনধারী।

নামের ধারক ও বাহকরূপে চরণদাস বাবাজীর আবির্ভাব। এই নামেরই প্রচার করিতে করিতে তাঁহার তিরোধান ঘটে।

পরম লগ্নটী এবার আসিয়াছে। তিনি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইবার আর বেশী দেরী নাই। এইসময়ে চরণদাস বাবাজী একদিন ধ্যান হইতে উঠিয়া ভক্তদের সকলকে তাঁহার নিকট ডাকিলেন। তাঁহার আননে স্বর্গীয় জ্যোতিঃর আভা। ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন, "স্মরণ রেখো প্রেমভক্তি, রাসলীলা ও রাসবিলাসাদি সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। এর নিগূঢ়তত্ব কেবল সমর্থগুরুর মুখেই শুন্‌তে হয়। সর্ব্বকালের জন্য সর্ব্বসাধারণের জন্য রয়েছে কেবল নাম, নাম, নাম।

২০। পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ।

(১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ।)

হুগলী জেলার অন্তর্গত 'দেরে' নামক গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুলদেবতা রঘুবীরের পূজা না হইলে জলগ্রহণ করিতেন না। তিনি সত্যবাদী ছিলেন। মিথ্যাকে প্রবল ঘৃণা করিতেন। এক মিথ্যা মোকর্দ্দমায় তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে সংঘাত বাঁধে। কিন্তু কোনরকম অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ধর্ম্মপ্রাণ ক্ষুদিরামকে বশীভূত করিতে বা টলাইতে পারে নাই। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তিনি 'দেরে' গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং কামারপুকুরের শান্ত পরিবেশে নূতন বসতি স্থাপন করেন।

অনেকদিন পরে একদা ক্ষুদিরাম গ্রামান্তর হইতে ফিরিতেছেন। পথে শ্রান্ত হইয়া মাঠের কোণে এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার নিদ্রা আসিল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন, ইষ্টদেব রঘুনাথজী কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং একটী স্থান দেখাইয়া বলিতেছেন, "ওরে! ওখান থেকে আমায় নিয়ে চল। বাড়ীতে নিয়ে আমার সেবা পূজা কর।" ঘুম ভাঙিলে পর স্বপ্নের কথা মনে হইল। স্বপ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিলেন, এক শালগ্রাম শিলা অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় আছে ও তাহার উপর এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া সাপটি সরিয়া গেল। ভক্তিভরে তিনি এই শীলা আনিয়া গৃহে স্থাপন করিলেন। দেখা গেল ইহা রঘুবীর চক্র। তৎপর হইতে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী চন্দ্রাদেবী এই বিগ্রহের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

ইষ্ট সেবার শুভফল সহসা ফলিল। ক্ষুদিরাম সে'বার গয়ায় তীর্থ করিতে গিয়াছেন। রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন যে

জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে গদাধর রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট। ক্ষুদিরামের দিকে সহাস্যে চাহিয়া বলিলেন তিনি পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইবেন। পরে জানা গেল ঠিক এই সময়ে কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবীরও এক অদ্ভুত দৈব আবেশ ঘটে।

১৮৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শুভমূহূর্ত্তে ক্ষুদিরামের গৃহ আলোকিত করিয়া এক সুদর্শন শিশু চন্দ্রাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। প্রভু গদাধরের কৃপায় এই পুত্রের জন্ম বলিয়া, ক্ষুদিরাম আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন গদাধর।

কামারপুকুরে গদাধরের বাল্যজীবন নিজের ইচ্ছানুযায়ী আনন্দে অতিবাহিত হয়। ধর্ম্মযাত্রা, শিবের গান, মনসার ভাসান, হরিবাসরের গীত, কীর্ত্তন—কোন কিছু তিনি বাদ দিতেন না। যে কোন গান যে কোন অভিনয় একবার শুনিলেই এই মেধাবী বালকের কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে গ্রামের সকলেরই তিনি পরমপ্রিয় ও আনন্দের ধন হইয়া উঠিলেন।

বড় অদ্ভুত এই বালক। এই বয়সে মাঝে মাঝে তাঁহার ভাবাবেশ হয়। সেদিন মাঠে বেড়াইতেছে, আকাশপথে এক উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক দেখিয়া আত্মসম্বিৎ হারাইয়া ফেলে। অসীমের ছোঁয়া তাঁহার মগ্ন চৈতন্যে দোলা দিয়া তাঁহাকে কোন গভীরে তলাইয়া ফেলিয়াছে। মাঠ হইতে পুত্রের অচেতন দেহ আনা হইল। মাতা চন্দ্রাদেবী আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠেন। তৎপর শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়া স্থির হন।

আর একদিনের কথা। গ্রামের মেয়েরা বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাইতেছে। গদাধরও তাদের সঙ্গ নেয়। পথিমধ্যে তাহার ভাবাবেশ হয়। সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে মেয়েরা বিশালাক্ষীর ভর হইয়াছে ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়ে ও সকলে গদাধরের স্তবস্তুতি আরম্ভ করে।

আর একবার গ্রামে যাত্রাগান হইতেছে। গদাধর উহাতে শিব সাজিলেন। জটা, বাঘছাল ও মালা পরার সঙ্গে সঙ্গেই

অভিনয়ের কথা ভুলিয়া গেল। শিবের সাজসজ্জা শিবের দৈবী আবেশ জাগাইয়া তুলিল। গদাধর সম্বিৎ হারাইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

গদাধরের পিতার মৃত্যুর পর তাহার এক অপ্রত্যাশিত ভাবান্তর ঘটে। এখন অনেক সময় সে ভূতির খালের শ্মশানে বা নির্জ্জন আম বাগানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কামারপুকুরের পাশ দিয়াই পুরী যাত্রীদের পথ। লাহাবাবুদের পান্থনিবাসেও অনেক পরিব্রাজক সাধু ও বৈষ্ণবের সমাগম হয়। গদাধর তাহাদের কাছে আসিয়া তাহাদের ভাব, আচার ও ব্যবহার লক্ষ্য করে। ভজন শিখে এবং সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থাকিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করে।

গদাধর নিজের খেয়ালমত যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। পাঠশালার পড়ায় একেবারেই মন বসে না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "ওসব চা'ল কলা বাঁধার পড়ায় কি লাভ? বালককে নিয়া সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়েন। মাঝে মাঝে গদাধরের ভাবাবেশও ঘটে। তাহা দেখিয়া পড়ার জন্য কেহ তেমন জোরও করেন না। গদাধরের কণ্ঠ বড়ই মধুর। তাহার কীর্ত্তন ও যাত্রা গান যে শোনে সে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সহজ সুন্দর গ্রাম্য জীবনের মাঝে তাহার বাল্যকালের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে থাকে এবং প্রকৃতির আনন্দ আলোকে গদাধর দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়িতেছে। তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার বিরক্ত হইলেন, সংসারে ভীষণ অনাটন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার অবশেষে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। গদাধরের তখন সতের বৎসর বয়স। কলিকাতায় সেই সময়ে গদাধরের দাদা রামকুমারের এক টোল ছিল। কিন্তু ছাত্রাভাবে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ঠিক এই সময়ে রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে এক পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। রামকুমার শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাকে ডাকা হইল। শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তিনি

পূজা করিতে দ্বিধা করেন না। তিনি মন্দিরের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলেন। গদাধর ও সেই উপলক্ষে দাদার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। তিনি কখনও মায়ের মন্দিরে তন্ময় হইয়া থাকেন, আবার কখনও গঙ্গারতীরে আপনমনে ঘুরিয়া বেড়ান। রামকুমার পীড়াপীড়ি করিলে গদাধর বলেন ভগবানের কাজ ছাড়া তিনি আর কারও কাজ করিবেন না। এই সময়ে গদাধরের মন সদা সর্ব্বদা ভবতারিণীর মন্দিরে পড়িয়া থাকে। ক্রমশঃ তাহার অন্তর নরম হয়। গদাধর মন্দিরে দেবীর বেশকারীর কাজ গ্রহণ করেন। তৎপর মন্দিরের পূজারীর পদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

পূজাকার্য্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত গদাধরের সাথে মাতা ভবতারিণী বিগ্রহের আকর্ষণ ক্রমশঃ গাঢ় হইল। জগন্মাতার আত্মিক যোগাযোগের মধ্য দিয়া পরমভক্ত সাধক গদাধরের এক অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়িয়া উঠে।

শক্তি দীক্ষা না হইলে দেবী পূজা ঠিক হয় না। তাই গদাধর তন্ত্রাচার্য্য কেনারাম ভট্টাচার্য্যের কাছে দীক্ষা নিলেন। এই দীক্ষার পর তিনি ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অতঃপর গদাধর মনের মত করিয়া নিজের ভাবে ভবতারিণীর পূজা করিতে থাকেন। দেহ-মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া মায়ের কাছে আত্মনিবেদন করেন। প্রাণে জাগ্রত হয় মুমুক্ষুর আর্ত্তি। শুদ্ধসত্ত্ব, অপাপবিদ্ধ সাধকের অন্তরে পূর্ব্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার স্ফুরিত হয়। তিনি ক্রমে ক্রমে নানা বিভূতি দেখিতে থাকেন।

দেবীর অর্চ্চনায় বসিয়াছেন। অঙ্গন্যাস ও করন্যাসের সময় দেখিতে পান নিজ অঙ্গের নানাস্থানে জ্যোতির ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মায়ের আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সারা দেহ দিব্য সত্ত্বায় পূর্ণ হইতেছে। ভাবাবিষ্ট তেজঃপুঞ্জ পূজারীকে যে তখন দেখে সে বিস্মিত হয়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব

আবির্ভূত হইয়া যেন ব্রহ্মময়ীর পূজায় বসিয়াছেন। পূজা শেষে মন্দিরের এক কোণে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া মা'কে সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান শুনান। অশ্রুজলে প্রেমবিহ্বল সাধকের চক্ষু ভাসিয়া যায়। রাত্রে মন্দির বন্ধ হইলে সংলগ্ন পঞ্চবটীর বনে ঠাকুর ধ্যানস্থ থাকেন। ইষ্টদেবী জগন্মাতার পাদপদ্মে নিঃশেষে নিজকে সমর্পণ করিয়াছেন। এখন হইতে তিনি সর্ব্বদা মাতৃধ্যানে বিভোর থাকেন।

তাঁহার সাধন জীবনের মূলকথা "সমলোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ" হইতে হইবে। মাটী টাকা, টাকা মাটী বলিয়া গঙ্গায় ছুঁড়িতে থাকেন। "অহং" ভাব থাকিবে না। সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান আনিতে হইবে। ঠাকুর কালীবাড়ীর কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে বসিয়া পড়েন। ভিখারীদের পাতা ও উচ্ছিষ্ট নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেন।

জগন্মাতার দর্শন তাঁহাকে পাইতেই হইবে। চরম প্রাপ্তির পথে ঠাকুর ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহার আর্ত্তি শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। দুঃসহ কাতরতায় তিনি অধীর হইয়া বলেন, "মা! এত ডাক্‌ছি, তুই কি শুনছিস না, ভক্ত রামপ্রসাদকে যেমন দেখা দিয়েছিস, তেমন কি আমায় দেখা দিবিনে?

অস্থির হইয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। খড়গাঘাতে নিজের জীবন নাশ করিবেন। চৈতন্যঘন মহাসত্ত্বার মুলে আকর্ষণ পড়িল। দেবী আদ্যাশক্তি জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে তাঁহার নয়ন সমক্ষে আবির্ভূর্তা হইলেন। এইতো তাঁহার চিন্ময়ী ইষ্টদেবী। এইতো তাঁহার মা! গদাধর সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। এই দিব্য-দর্শনের পর দুইদিন নিরন্তর তিনি ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাহীন ছিলেন।

গদাধরের (রামকৃষ্ণের) দিব্যদর্শন হইল। দর্শনশেষে ঠাকুর মা মা রবে ক্রন্দন করিতে থাকেন। অদর্শনে আবার বিরহজ্বালা বাড়িতে থাকে। এইভাবে রামকৃষ্ণের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল।

তাই মায়ের চরণে তিনি নিজকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিলেন। আগে ঠাকুর পূজার বা ধ্যানের সময় মায়ের দর্শন পাইতেন। এখন মায়ের সান্নিধ্য লাভ তাঁহার প্রায় ঘটে। পূজাঘরে, মন্দিরে চত্বরে, বাগানে বা চাঁদনীতে যখন যেখানে যান আনন্দময়ী ভবতারিণী সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ইষ্টদেবীর সহিত একাত্মতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জবা বিল্বদলের অর্ঘ্য নিয়া ঠাকুর কখনও নিজের মাথায় দেন। আবার ভাবাবেশে কখনও নিজের বুকে বা পায়ে দেন। কখনও বিগ্রহের হাত ধরিয়া সোল্লাসে নৃত্য করিতে থাকেন। নিবেদিত অন্নব্যঞ্জনের থালা তুলিয়া ঠাকুর নিজহাতে ভবতারিণীকে খাওয়াইতে থাকেন। কখনও বা নিজের মুখে দেন। পুনঃ উচ্ছিষ্ট অন্নের অংশ মায়ের মুখে দেন।

কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নালিশ গেল, ঠাকুর পাগল হইয়াছেন। মায়ের পূজা ভোগ ও আরতি সব ওলট পালট করিয়া ফেলিতেছে। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু এষ্টেটের কর্ত্তা। তিনি স্বয়ং তদন্তে আসিলেন। লুকাইয়া সবকিছু নিজচক্ষে দেখিলেন। বুঝিতে পারিলেন, এই তরুণ পূজকের ভক্তি ও ব্যাকুলতায় মন্দিরের বিগ্রহ জাগ্রতা হইয়াছেন। রাণী রাসমণি ও মথুর উভয়েই উপলব্ধি করিলেন, বহুপুণ্যের ফলে তাঁহারা এমন পূজারী পাইয়াছেন। আদেশ প্রচারিত হইল, গদাধর ভট্টাচার্য্য স্বেচ্ছামত মা ভবতারিণীর পূজা করিবেন। তাঁহার কাজে ও চলাফেরায় কেহ যেন বাধা না জন্মায়। ঠাকুরের পক্ষে এখন বিধিবিহিত পূজা সম্ভব নহে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। তাই আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজা ও কাজকর্ম্মের দায়িত্ব আর একজনকে দেওয়া হইল।

গঙ্গার বুকে সেদিন সন্ধ্যার ছায়া তখনও নামে নাই। ভবতারিণীর মন্দিরে আরতির কাসর ঘণ্টা বাজিতেছে। ঘাটের একপাশে সাধক গদাধর ভাবতন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এক কৌপিনধারী অর্দ্ধউলঙ্গ সাধু দেখা

দিলেন। সুন্দর সুডৌল দীর্ঘায়ত দেহ। আননে দিব্য প্রশান্তি। চোখে আনন্দের দ্যুতি। আপনমনে তিনি চলিতেছেন। হঠাৎ তিনি বালক গদাধরকে দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। তন্ত্র ও ভক্তিবাদের দেশ বাংলায়, বেদান্তের এমন উত্তম আধার সচরাচর দেখা যায় না। তিনি গদাধরকে বলিলেন, "ম্যায় তুম্‌কো বেদান্ত সিদ্ধি অওর নির্ব্বিকল্প সমাধি দুঙ্গা। তুম্ লেওগে?" (আমি তোমাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি ও বেদান্তসিদ্ধি দেব। তুমি নেবে? গদাধর ভাবিলেন, এই জটাজুটধারী নাগা সন্ন্যাসী নিরাকারের দৌত্য নিয়া আসিয়াছে। মাতৃবিরহের আশঙ্কায় গদাধরের বুক কাঁপিয়া উঠিল। গদাধর উত্তর দিলেন, "সব মা জানেন। তাঁহার আদেশ যদি পাই তোমার মতানুযায়ী কাজ করব।" মায়ের আদেশ মিলিল। এই সন্ন্যাসী দূতই ভারত বিখ্যাত মহাবৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী স্বামী। পঞ্চবটীবনে তোতাপুরী আনুষ্ঠানিক ভাবে কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও নিজ পিণ্ড প্রদান করিয়া সাধক গদাধর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বিরজা হোম সমাপ্তির পর তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইল "রামকৃষ্ণ"।

জ্ঞানবাদী, সর্ব্বপাশমুক্ত তোতাপুরী স্বামী এই মহাঅধিকারী শিষ্যের নিকট বাঁধা পড়িলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একাদিক্রমে প্রায় ছয়মাসকাল পূরী মহারাজ অবস্থান করেন। দিনের পর দিন রামকৃষ্ণের উচ্চতম উপলব্ধিগুলি তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। নিরাকারের আকারকে, ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মশক্তিকে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হাতে করতালি দিয়া জগন্মাতার নাম কীর্ত্তন করা রামকৃষ্ণের নিত্যকার অভ্যাস। তাহাতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠেন। মায়াবাদী তোতাপুরী একদিন পরিহাস করিয়া শিষ্যকে বলেন, "ক্যা, রোটী ঠুক্‌তে হো।" বালকস্বভাব রামকৃষ্ণ খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলেন, "শালা বলে কি? আমি প্রাণের টানে মা ব্রহ্মময়ীর নাম করি, আর ও তা বুঝতে চায় না।" ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-

শক্তি নিয়ে গুরুশিষ্যের প্রায় প্রণয় কলহ হইত। সেদিন তোতাপুরী তাঁহার ধূনীর সম্মুখে বসিয়া আছেন। মন্দিরের পরিচারক ধুনী হইতে কিছুটা কাঠ সরাইয়া নিল। পবিত্র হোমাগ্নির অমর্য্যাদায় তোতাপুরী ক্রোধান্ধ হইলেন। কৌতুকপ্রিয় রামকৃষ্ণ ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এমন মহাজ্ঞানীরও ক্রোধ আছে।" তিনি বলিলেন, "মায়াশক্তির কাছে তুমিও হারিয়া গেলে।"

নাগা সন্ন্যাসী তোতাপুরীর দেহ বাঙ্গলার জলবায়ুতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি দুরন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অবশেষে তিনি গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জ্জন দিবেন স্থির করিলেন। গঙ্গার মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু একি? ডুবিয়া মরিবার মত জল তিনি গঙ্গায় পাইলেন না। শুধু "এপার ওপার" সার হইল। মহামায়ার মায়ায় তোতাপুরীর সঙ্কল্প টুটিয়া গেল। তোতাপুরী হার মানিলেন। রামকৃষ্ণের নিকট স্বীকার করিলেন, "ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তি অভিন্ন। জগন্মাতা ভবতারিণীকে রামকৃষ্ণের মাতৃশক্তি বলিয়া তিনি মানিয়া লইলেন। রামকৃষ্ণের সাধনাকে তোতাপুরী পূর্ণাঙ্গ করিলেন।

মথুরানাথ রাণীর জামাতা। রাণীর সমস্ত কাজের পরিচালক। ঠাকুরের একনিষ্ঠা ও পরাভক্তি দেখিয়া ঠাকুরের উপর মথুরবাবুর শ্রদ্ধা জন্মে। সেবার মন্দিরের পুরোহিতের অসাবধানতা বশতঃ গোবিন্দজী বিগ্রহের পা ভাঙ্গিয়া যায়। সকলেই ভীত হইলেন। রাণী ও মথুরবাবু পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের মতামত চাহিলেন। সকলেই মত দিলেন, ভগ্নবিগ্রহ পূজা করিতে নাই। এই বিগ্রহ বিসর্জ্জন দিয়া নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হউক। মথুরানাথ শুদ্ধসত্ত্ব সাধক ছোট ভট্টাচার্য্যের কথা মনে করিলেন এবং তাঁহার মত কি জানিতে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুরের সহজাত প্রজ্ঞা সকল সমস্যার সমাধান তখনই করিয়া দিল। তিনি বলিলেন, "এ বিগ্রহ ফেলে দেবে, সে কি কথা গো? রাণীর

জামাইদের মধ্যে কাহারও পা ভাঙ্গিয়া গেলে কি হবে বল তো? তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আর এক জামাই আন্‌বে, না, তার চিকিৎসা চালাবে। গোবিন্দজীর ভাঙ্গা পা জোড়া লাগিয়ে দাও। সব ঠিক হ'য়ে যাবে?" যেমন সহজ সরল কথা তেমনি অকাট্য যুক্তি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া রাণী ও মথুরবাবু ঠাকুরের কথা মানিয়া লইলেন।

ঠাকুর প্রায় মায়ের ধ্যানে বিভোর ও ভাবতন্ময় হইয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহাকে একবার বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। সেদিন রাণী রাসমণি দর্শনে আসিয়াছেন। ঠাকুরের প্রাণগলানো গান শুনিতে তিনি ভালবাসেন, তাই ঠাকুরকে গান করিতে বলিলেন। ঠাকুর তখনই পরমানন্দে মাতৃসঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাণী তখন কি এক জটিল মামলার বিষয় ভাবিতেছিলেন। মন দিয়া গান শুনিতেছিলেন না। অন্তর্যামী ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া বিরক্ত হইলেন। সরোষে কহিলেন, "এখানেও ওসব চিন্তা"? সঙ্গে সঙ্গে রাণী রাসমণির গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। কি সর্ব্বনাশ! গদাধর কি পাগল হইল? মন্দিরের কর্ম্মচারীরা মারমুখী হইয়া ছুটিয়া আসিল। কিন্তু রাণীর অঙ্গুলি সঙ্কেতে সকল নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রাণী বুঝিতে পারিলেন, শুদ্ধাচারী সাধকের কাছে তাঁহার বিষয়ী মন ধরা পড়িয়াছে। সত্যই তো। কালীর ঘরে বসিয়া কালীর গান শুনিতেছেন। এখানে অন্য চিন্তা কেন? রাণী নিজেই লজ্জিতা হইলেন।

মথুরবাবু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। মথুরবাবু ঠাকুরের সর্ব্বপ্রথম ভক্ত। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী ঠাকুরকে বাবা ডাকিতেন। বাবার ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পাইলে তাঁহাদের বড়ই আনন্দ হইত।

অনেকদিন আগেকার কথা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন। হঠাৎ মথুরবাবু তাঁহাকে দেখিয়া চমকিয়া

উঠিলেন। বাবার মধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন, ভবতারিণীর ও মহাদেবের মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে। যতই তাকান ততই এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পান। অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইতে থাকে। তিনি ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ইহার পর মথুরবাবু, ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলী মন্দিরের ও ঠাকুরের সমস্ত পরিবেশকে সাধনার সহায়ক বলিয়া ধারণা করিলেন।

মথুরবাবুর সহিত একবার ঠাকুর তীর্থভ্রমণে যান। বৈদ্যনাথ আসিয়া কাঙ্গালীদের দুঃখ দেখিয়া ঠাকুর বিগলিত হন। মথুর বাবুকে বলেন এইসব দীন দুঃখীদের খাওয়াইতে হইবে। সবাইকে কাপড় দিতে হইবে। মথুরবাবু দেখিলেন, মহাবিপদ। দূরতীর্থে চলিয়াছেন। যেখানে সেখানে এমন অর্থব্যয় করিলে চলিবে কেন? মথুরবাবু যতই বুঝাইতে থাকেন, ঠাকুর ততই বাঁকিয়া বসেন। উত্তেজিত হইয়া ঠাকুর মথুরকে বলেন, "তুমি হচ্ছ মায়ের দেওয়ান। তবে কেন এদের দেবে না?" শেষটা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যাঃ, তোদের সঙ্গে আমি কাশী যাব না। আমি এদের কাছে থাকবো। এদের যে দেখবার কেউ নেই।" অগত্যা মথুরবাবুকে সম্মত হইতে হইল।

মথুরের সঙ্গে একবার ঠাকুরের তর্ক হয়। মথুর বলিলেন, "ঈশ্বর আইন করেছেন ঠিক। কিন্তু তাঁকেও তাঁর নিজের বিধান মেনে চলতে হয়।" ঠাকুর উত্তর দিলেন "সে কি গো, এ আবার কি কথা? তাঁর আইন তিনি সবসময় রদ করতে পারেন"। যুক্তি-বাদী মথুর বলিলেন, "তা কি করে হয় বাবা! লালফুলের গাছে লালফুলই হ'বে। সেখানে সাদা ফুল কি ক'রে ফুটবে"? পরের দিনই এই বিতর্কের সমাধান হইল। প্রত্যুষে বাগানে গিয়া মথুর-বাবু দেখেন এক লাল জবা গাছে শ্বেত জবাও ফুটিয়া রহিয়াছে। মথুরবাবুকে হার মানিতে হইল।

ভক্ত মথুরানাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী। বালকস্বভাব ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে বলেন, "মা আমায় বলেছেন, এখানে অনেক অন্তরঙ্গ ভক্ত আসবে। এখান থেকেই তা'রা ঈশ্বরকে লাভ করবে। তা'রা দেরী করছে কেন" ? মথুর আশ্বাস দেন, "তা'রা আস্‌বে "।

এইসময়ে ঠাকুরের দিব্যোন্মাদের ভাব বৃদ্ধি পায়। দিন রাত তিনি মাতৃভাবনায় উন্মাদ। বায়ু ঊর্দ্ধগতি, চক্ষু রক্তবর্ণ, চুল রুক্ষ, জট পাকাইয়া আছে। পরিধানের বসন বিস্রস্ত।

এঁড়েদার বৈষ্ণবপণ্ডিত একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন "তাঁহার উপবীত কোথায় ?" ঠাকুর জবাব দিলেন, "আমার যখন ভাবাবেশ, কি একটা এসে আশ্বিনের ঝড়ের মত সব কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। আগের চিহ্ন কিছুই রহিল না। হুঁস নেই। কাপড় পড়ে যাচ্ছে তা পৈতে থাকবে কি করে ? তোমার দিব্যোন্মাদ হ'লে তবে তুমি বুঝতে পারতে।"

হলধারী, ঠাকুরের আত্মীয়। তিনি মন্দিরের অন্যতম পুরোহিত। জ্ঞানমার্গীয় এক গ্রন্থ পড়িয়া তিনি ঠাকুরকে বুঝাইলেন, ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে ভাবাতীত। নামরূপাদি উপাধিবর্জ্জিত। ভাবভক্তির দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুভূতি হয়, তাহা মিথ্যা। একথা শুনিয়া তিনি বালকের মত ব্যাকুল হইলেন। মা ভবতারিণীর কাছে কাঁদিয়া বলিলেন, "মাগো ! নিরক্ষর মুর্খ বলে আমায় কি এম্নি ফাঁকি দিতে হয় ?" কান্নার বেগ আর থামিতে চাহে না। অকস্মাৎ কুয়াসার ধোঁয়ার মত কি যেন উঠিতে থাকে। তাহার মধ্য হইতে এক দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হয়। ঠাকুরকে সান্ত্বনা দিয়া সেই দিব্যপুরুষ কহিল, "ওরে ! তুই ভাবমুখে থাক। ভাবমুখে থাক।" ইহা বলিয়া আকস্মিকভাবে এই অলৌকিক মূর্ত্তি অন্তর্হিত হয়।

ঠাকুর দিব্যোন্মাদগ্রস্ত। তাঁহার সম্বন্ধে নানাকথা মাতা চন্দ্রমণির কাছে পৌঁছিল। গদাধর কি সত্যই পাগল হইল ? মাতা

উৎকণ্ঠিতা হইলেন। জননীকে শান্ত করা দরকার। তাই ঠাকুর কামারপুকুরে আসিলেন। এখানে আসিয়া ঠাকুর কতকটা শান্ত হইয়াছেন। আগের সেই উদ্দামতা নাই। গ্রামে আসিয়া সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান। মাঝে মাঝে ভূতির খালে বা বুধই মোড়লের নিভৃত শ্মশানে গিয়া ধ্যানস্থ হন। জননী পুত্রের শান্তভাব দেখিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন। চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু পাত্রী পাওয়া যাইতেছে না। দেখা গেল ভবিষ্যৎ জীবন সঙ্গিনীর কথা ঠাকুরের অগোচর নাই। তিনি মাতাকে জয়রামবাটীর রামমুখুজ্জের বাড়ীর খোঁজ লইতে বলিলেন। সত্যই সন্ধান মিলিল। বালিকাবধূ সারদামণিকে মা সানন্দে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। বধূর বয়স পাঁচ এবং ঠাকুরের বয়স তখন তেইশ বৎসর। তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন। পুনঃ তাঁহার ভাবোন্মাদ দেখা দিল। সকলেই বলিলেন, ইহা বায়ুরোগ নহে। ইহা যোগজব্যাধি। সহজে সারান কঠিন।

১৮৬১ ইংর শেষ ভাগ। গঙ্গাতীরে ছোট বাগানটীতে ঠাকুর সেদিন ফুল তুলিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন, বকুলতলার ঘাটে একটা নৌকা ভিড়িল। ভিতর হইতে এক ভৈরবী বাহির হইলেন। বয়স তাঁহার প্রায় চল্লিশ। পরিধানে গৈরিক বস্ত্র। দীর্ঘ আলুলায়িত কেশ। সুন্দর সুঠাম দেহে অঙ্গকান্তি ঠিকড়াইয়া পড়িতেছে। ঠাকুর তাড়াতাড়ি তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়কে বলিলেন, ভৈরবীকে যেন তাঁহার নাম করিয়া ডাকিয়া আনে। ভৈরবী আসিলেন। যদিও কেহ কাহাকে ও জানেন না, কি এক সূক্ষ্ম যোগসূত্রে উভয়ে উভয়কে খুজিয়া পাইলেন, তাহা কে বলিবে ?

ভৈরবী এখন ঠাকুরের নূতন অভিভাবিকা। ঠাকুরও হইয়াছেন বালক, দিব্যোন্মাদের দশা তখন চলিতেছে। ব্যাকুল আগ্রহে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি পাগল হলুম? আমার এ সকল কি হয় ?"

ভৈরবী উত্তর দিলেন, "তোমায় কে পাগল বলে বাবা? তোমার যে মহাভাব হইয়াছে। রাধারাণী, চৈতন্যদেব এঁদের যাহা হ'য়েছিল।" ভক্তিশাস্ত্র ও তন্ত্রগ্রন্থ হইতে ভৈরবী ঠাকুরকে নানাতথ্য ও প্রমাণ পড়িয়া শুনান ও তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন। আলাপ আলোচনায় সেদিন বেলা অনেক গড়াইয়া গেল। ভৈরবীর কণ্ঠলগ্ন ইষ্টদেব রঘূবীর চক্র তখন ও অভুক্ত। মন্দির হইতে ভিক্ষা লইয়া তিনি পঞ্চবটীতে রান্না করিলেন। ভোগ নিবেদন করিয়া ভৈরবী ধ্যানে বসিয়াছেন। দুই নয়নে প্রেমাশ্রুর ধারা বহিতেছে। বাহ্যজ্ঞান নাই। এ সময়ে ঠাকুর এক অলৌকিক আকর্ষণে পঞ্চবটীতে আসিলেন। ভাবাবেশে উদ্বেল। ভৈরবীর ইষ্টকে নিবেদন করা অন্ন কখন যে নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন হুঁস্ নাই। স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া পাইলে ঠাকুর লজ্জিত হইলেন। ভৈরবী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "এ কাজ তুমি করনি বাবা। তোমার ভিতর যিনি আছেন তিনিই করেছেন। ধ্যানে যাঁকে দেখেছি, এ যে তাঁরই কাজ ; আমার আর পূজায় কাজ নাই। পূজা আমার সার্থক হ'য়েছে। সেদিনকার ভোগ প্রসাদ ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী পুজিত রঘূবীর চক্র গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন।

ঠাকুরের দিব্যভাব দেখিয়া, দেহলক্ষণ মিলাইয়া ভৈরবী চমৎকৃত হন। শাস্ত্রে ভৈরবীর অসাধারণ অধিকার। সাধ্যসাধন-তত্ত্ব ও কম জানেন না। সবদিক বিচার করিয়া ভৈরবী বুঝিলেন এই তরুণ সাধকের চরম সাধনাবস্থা হইয়াছে। এই তত্ত্ব শুধু তিনি নিজে বিশ্বাস করা নহে, আশে পাশে সকলের নিকট ভৈরবী উহা প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন "রামকৃষ্ণ অবতার। এবার নিতাইএর 'খোলে' চৈতন্যের অবতরণ।" ভৈরবী এসব কি বলিতেছে? কালী বাড়ীতে এসব উক্তির ফলে সকলের দৃষ্টি দক্ষিণেশ্বরের উন্মাদ ব্রাহ্মণের উপর পতিত হইল

ভৈরবীর কথা ঠিক কিনা যাচাই করিতে মথুরবাবু ইন্দেশের বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক গৌরী পণ্ডিতকে আহ্বান করিলেন। গৌরী পণ্ডিতের সিদ্ধাইএর তখন খুব নাম। ঠাকুর ইহা স্বচক্ষে দেখেন। গৌরী পণ্ডিত এক অলৌকিক ধরণের হোম করিতেন। বামহস্তটী শূন্যে প্রসারিত করিয়া করতলের উপর প্রায় একমণ যজ্ঞকাট তিনি সাঁজাইতেন। তারপর উহাতে অগ্নিসংযোগ করিতেন। এই অদ্ভুত ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান চলিত, অথচ হাতের তালু অক্ষতই থাকিত। আর একটী সিদ্ধাই ছিল, প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার একটী বিশেষ প্রক্রিয়া। এই সিদ্ধাই নিয়া গৌরী পণ্ডিতের সঙ্গে ঠাকুরের বিশেষ সংঘাত হয় এবং পণ্ডিত পরাস্ত হন। দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়াই গৌরী পণ্ডিত "হা-রে-রে-রে নিরালম্বো লম্বোদর জননী ত্বাম্ যামি শরণং" প্রভৃতি মন্ত্র ঘোর রবে বলিয়া চলেন। ইহা শুনিলে অপর পক্ষের সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। আর গৌরী পণ্ডিত অবলীলায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হন। এইদিন, কেন জানা যায় নাই, ঠাকুরও সেইভাবে চীৎকার করিতে থাকেন। তারস্বরে এমন "রে-রে" শব্দ কেন? মন্দিরে ডাকাত পড়িয়াছে কি? দরওয়ানেরা লাটী সোটা হস্তে ছুটিয়া আসিল। ক্ষণপরেই আসল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিল। গৌরী পণ্ডিতের সমস্ত শক্তি ও সিদ্ধাই কোথায় পলাইল। তিনি হতবীর্য্য হইয়া বিষণ্ণ মনে মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন। অতঃপর গৌরী পণ্ডিত মন্দিরে কয়েকদিন অবস্থান করেন ও ঠাকুরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আত্মসমর্পণ করেন। অল্পকাল পরে গৌরী পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অভীষ্ট পথে যাত্রা করিলেন।

ঠাকুরের প্রতি মথুরবাবুর শ্রদ্ধা অপরিসীম। তদুপরি ভৈরবী ঠাকুরের ভগবত্তা প্রমাণ করিতে চাওয়ায় মথুরবাবু আরও উৎসাহিত হইলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি এক সভা আহ্বান করিলেন।

বৈষ্ণবচরণ কলিকাতার চৈতন্য সভার সভাপতি। তিনি সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। সভা আরম্ভ হইবে। বেশী দেরী নাই। ঠাকুর ভবতারিণীকে প্রণাম করিতে গেলেন। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই দেহে দিব্যভাব প্রকাশ পাইল। তাঁহার ভাবমূর্ত্তি অপূর্ব্ব। চোখে মুখে স্বর্গীয় আনন্দচ্ছটা। প্রেমোম্মত্ত হইয়া ঠাকুর বৈষ্ণবচরণের কাঁধের উপর বসিলেন ; পণ্ডিত আনন্দে একেবারে মাতোয়ারা ও কৃতকৃতার্থ। অপরে উৎসাহে ঠাকুরের স্তুতিগান আরম্ভ করিলেন। সভার শেষে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "ঠাকুর ঈশ্বরাবতার।"

শুদ্ধা ভক্তির বলে ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এইবার ভৈরবী তাঁহার মধ্যে নূতনতর শক্তিসাধনার ধারা প্রবাহিত করেন। তারপর তন্ত্রমতে ঠাকুরের পূর্ণাভিষেক হয়। বেলতলা ও পঞ্চবটীতে দুইটী পঞ্চমুণ্ডির আসন তৈয়ার করাইয়া ভৈরবী নিখুঁতভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান।

পূর্ণাভিষেক বা তান্ত্রিক সন্ন্যাস গ্রহণের পর ঠাকুরের দ্বারা বহু সাধনক্রিয়া করানো হয়। এই সাধনকালে বহু অলৌকিক দর্শন ও তাঁহার হইতে থাকে। একদিন শবের খর্পরে মৎস্য রান্না করিয়া মা জগদম্বাকে ভোগ দিলেন। নিজেও প্রসাদ পাইলেন। আর একদিন ভৈরবী তাঁহাকে নরমাংস খাইতে দিলেন। ঠাকুর প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। অবশেষে চণ্ডিকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া সেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আর একদিনের কথা। গভীর অমানিশায় বিশেষ একটী তান্ত্রিক অনুষ্ঠান হইবে। ভৈরবী কোথা হইতে এক পূর্ণযৌবনা রূপসী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা। ইহাকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর। পূজা শেষ হইল। ভৈরবী এইবার এই নারীকে বিবস্ত্রা করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরকে নির্দ্দেশ দিলেন, "এখন এই মেয়ের কোলে বসিয়া তোমায় জপসাধন করিতে হইবে।"

সুবিধার্থে ঠাকুর রামমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এইবার সেই রঘুবীরের জন্য বাৎসল্য ভাব জাগিয়া উঠে। তিনি জটাধারীর নিকট হইতে নূতন মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং বালক শ্রীরামের ধ্যানে সদা মগ্ন থাকেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন

"যো রাম দশরথকা বেটা
ওহি রাম ঘটমে লেটা,
ওহি রাম জগৎ পসেরা
ওহি রাম সব্‌সে পেয়ারা।"

ভক্ত জটাধারীর ক্ষোভ হইল। জটাধারীর বহুদিনের সেবা পূজা "রামলালা" কি ভুলিলেন? তাঁহার ক্ষোভ মিটিল। জটাধারী বুঝিতে পারিলেন তাঁহার ইষ্টদেব চৈতন্যময়। সমস্ত বিশ্বসংসারে তিনি ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাই এখন তাঁহার মনে দুঃখ বা খেদ নাই। তিনি যখন বুঝিলেন রামলালা ঠাকুরের নিকট বেশী আনন্দ পান, তিনি এই জাগ্রত বিগ্রহ 'রামলালা'কে ঠাকুরের নিকট রাখিয়া বিদায় লইলেন।

বাৎসল্যভাবের সিদ্ধির পর ঠাকুর মধুরভাবের সাধনায় ব্রতী হন। তিনি সখীভাবে দেহসজ্জা করেন। প্রেমভাবে ভাবিত হন। তাঁহার মধুর রসের রাগানুসাধন আরম্ভ হয়। ভাবনা ও সাধনা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের বেশী দেরী হয় নাই। জানবাজারের রাজবাড়ীতে ঠাকুর কিছুদিন নারীবেশে বাস করেন। তিনি যে পুরুষ, অনেক সময়ে পুরমহিলারা ও ভুলিয়া যাইতেন। ঠাকুরের মধ্যে কান্তাভাব ফুটিয়া উঠে। প্রেমভক্তির এই সাধন মহাভাবে পরিণত হয়। বিভিন্ন সাধনার অন্তর্নিহিত সূত্র যে এক, তাহা ঠাকুর অল্পকাল মধ্যেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "হাতীর বাহিরের দাঁত থাকে শত্রুকে আক্রমণের জন্য। আর ভেতরের দাঁত দিয়ে খাবার চিবিয়ে খায়, শরীর পোষণের জন্য। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে এই দুই ভাবের প্রকাশ ছিল।

বাহিরের মধুর ভাব দিয়ে তিনি মানবের কল্যাণ করতেন, আর তাঁর ভেতরে থাকতো অদ্বৈতভাব। প্রেমের চরম অবস্থায় তিনি ভূমানন্দে আবিষ্ট থাকতেন। তখন তিনি ব্রহ্মভাবে অধিষ্ঠিত থাকতেন।

এই মধুর সাধনার পর তাঁহার জীবনে ঘটে তোতাপুরীর আবির্ভাব। বেদান্তের পরম উপলব্ধি তিনি উপভোগ করেন। অদ্বৈতবোধের প্রবাহ ঠাকুরের জীবনে মাসের পর মাস চলিতে থাকে। ঠাকুর নিজেই বলিয়াছেন, "যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারেনা, একুশদিন মাত্র শরীর টেকে, শুক্‌নো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝড়ে পড়ে, তেম্‌নি মানুষ ও পড়ে যায়, আমি সেখানে ছয় মাস ছিলুম্। কখন যে দিন আস্‌তো, রাত হতো তার ও ঠিকানা ছিল না। মরা মানুষের মত নাক দিয়ে মাছি ঢুক্‌তো। অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তার ও হুঁস্ হয়নি। এই ভাবে ছ'মাস গেল। তারপর একদিন মার কথা শুনতে পেলাম "ভাবমুখে থাক্। লোক শিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক্।" তারপর অসুখ হল রক্ত আমাশয়। পেঠে খুব মোচড় আর খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় ছমাস ভুগলাম। একটু একটু করে মন নেমে এল। সাধারণ মানুষের মত হুঁস এল। নতুবা আমায় সেই নির্বিকল্প অবস্থায় থাকৃতে হোত।"

ঠাকুরের স্ত্রী সারদামণি ও যৌবনে পদার্পণ করেছেন। স্বামীর সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা শুনতেন। মস্ত বড় সাধক। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। অন্তরের কথা গুমরিয়া উঠে। এমন স্বামীর সেবার অধিকার তিনি কি পাইবেন না? তিনি তাঁহার পিতাকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিলেন। সেদিন স্ত্রীর প্রতি ঠাকুরের ব্যবহার খুব স্বাভাবিক দেখা গেল। পরম সমাদরে তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। নিজের কক্ষে নিজেরই শয্যায় স্থান দিলেন। বিবাহিতা তরুণী স্ত্রীকে নিজের কাছে নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিয়া ইন্দ্রিয় সংযমের পরাকাষ্ঠা

দেখাইলেন। উভয়ের দাম্পত্য জীবনে এক শুদ্ধসত্ত্ব দিব্যভাব পরিলক্ষিত হইল। ইহা বড়ই দুর্ল্লভ। দাম্পত্য জীবনের এই ঐশীরূপায়নে ঠাকুরের তুলনায় সারদামণির কৃতিত্ব ও কম নহে। আপন সংযম, ত্যাগ ও বৈরাগ্য দিয়া তিনি স্বামীর সাধনব্রতকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। উত্তরকালে পত্নী সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন, "ও যদি এত ভালো না হোতো, আত্মহারা হয়ে আমায় আক্রমণ করতো, তা'হলে আমার সংযমের বাঁধ থাক্‌তো কিনা, দেহবুদ্ধি আসতো কিনা, কে বলতে পারে? বিয়ের পর মা জগদম্বাকে ব্যাকুল হয়ে বলেছিলাম, "মা আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কামভাব একেবারে দূর করে দে"। ওর সঙ্গে একত্রে বাস করে বুঝেছিলাম, মা আমার সে কথা সত্যই শুনেছিলেন।"

একদিন সারদামণি ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগো ঠিক করে বলতো, আমায় তোমার কি মনে হয়?" ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "মন্দিরে যে মায়ের পূজা হয় সেই মা-ই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং আজকাল নহবত ঘরে বাস করছেন। আবার তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তি বলেই যে আমি তোমায় সব সময় দেখি।"

সেদিন অমাবস্যা। ফলহারিণী কালীপূজা। ঠাকুর নিজের ঘরে ষোড়শী পূজার আয়োজন করেছেন। পত্নী সারদামণিকে তিনি মহামায়া জ্ঞানে পূজা করিবেন। জপ, তপ, ধ্যান ও ধারণার ফল তাঁহার চরণে সমর্পণ করিবেন। গঙ্গাজলে অভিষেকের পর সারদামণিকে নববস্ত্র পরাইলেন। পুষ্প চন্দনে সাজাইয়া তাঁহাকে বেদীতে বসান হইল। এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে সারদামণিও ভাবাবিষ্টা হইলেন। পূজা শেষে মা, মা, রবে চারিদিক কাঁপাইয়া রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। আসনে উপবিষ্টা সারদামণির ও তখন বাহ্যজ্ঞান নাই।

স্বামী সারদানন্দ তাঁহার রচিত লীলাগ্রন্থে লিখিয়াছেন "পূর্ণ যৌবন ঠাকুর ও নব যৌবনা শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর এই সময়ের দিব্যলীলাবিলাস জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে শ্রুত হয় নাই।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। এই সময় হইতে ঠাকুরের জীবন নাট্যে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। আত্মসমাহিত সাধক এইবার লোক-গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কলিকাতায় তখন মণীষী, বাগ্মী ও ধর্মনেতারূপে কেশব সেনের বিরাট প্রতিষ্ঠা। তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরের প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ক্রমশঃ তাহা ঘনিষ্টতর হয়। তাঁহার দেখাদেখি বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ও ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। এই সময় হইতে দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনের ভগবৎ কথা শুনিতে সকলেই কৌতুহলী হন এবং এই ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের দিকে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি ক্রমশঃ নিবদ্ধ হয়। ধীরেধীরে তাঁহার চরণতলে ভক্তবৃন্দ ও শিষ্যদল সমবেত হইতে থাকে। দেশের সমাজজীবন তখন বেজায় সঙ্কটাপন্ন। একদিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ সংঘাত, অপর দিকে জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কোথায় আলো? কোথায় পথ? বিভ্রান্ত মানবদের পথের সন্ধান কে দিবে? ঠিক এই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিল। সংশয়াচ্ছন্ন জড়বাদী মানুষকে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর দূরের বস্তু নহে। তিনি পর নহেন। তিনি একান্তই আপনার জন। তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলে, সর্ব্বত্যাগী হইলে, তাঁহাকে পাওয়া যায়। ঠাকুর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ধান ও পাইয়াছেন। তাই শত শত ঈশ্বরবিমুখ মানব তাঁহার দর্শনার্থ আসে। ঈশ্বরমুখী, ত্যাগ ও বৈরাগ্যবান সাধকেরা ও আসেন। তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। এই পরম পুরুষকে তাঁহারা আরও আকড়াইয়া ধরেন। একদিন কেশব সেন

সখেদে ঠাকুরকে কহিলেন, "মশাই! বলুন, আমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে না কেন?" ঠাকুর ঈশ্বরময়। তিনি মনরাখা কথা বলেন না। সোজা বলিয়া দিলেন, "লোকমান্য, বিদ্যা এ সব নিয়ে তুমি আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষী নিয়ে যতক্ষণ মুখে চোষে, ততক্ষণ মা আসেনা। খানিক পরে চুষী ফেলে দিয়ে, যখন চীৎকার করে কেঁদে উঠে, তখনই মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে, দৌড়ে উপস্থিত হন। তুমি মোড়লী করছো, মা ভাবছে ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো তাই থাক।" শিবনাথ শাস্ত্রী প্রায় ঠাকুরের কাছে আসতেন। কিন্তু ঠাকুরের ভাবসমাধি কি বুঝতেন না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন "এই ভাব সমাধি, স্নায়ুবিকার প্রসূত"। সে দিন শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁকে বলিলেন, "হ্যাঁ গা শিবনাথ! তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বল? আর বল যে ঐ সময়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। তোমার ইট, কাট, মাটি, টাকা, কড়ি এসব জিনিষ গুলোতে দিনরাত ঠিক থাকবে, আর যার চৈতন্যে জগৎ সংসার চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে তাঁকে দিন রাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম। এ কোন দেশী বুদ্ধি তোমার?" শিবনাথ নির্ব্বাক নতশির হয়ে রইলেন।

বিষয়ী ও অর্দ্ধবিষয়ীর ভিড়ে ঠাকুর হাঁফাইয়া উঠিয়াছেন। যে শুদ্ধসত্ত্ব বৈরাগ্যবান সাধকদের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন, তাহাদের কাহারও দেখা নাই। জগজ্জননী নিজেই তাহাদের আসার কথা বলিয়াছেন। সে কথা যে মিথ্যা হইতে পারে না। ঠাকুর আর ধৈর্য্য রাখিতে পারেন না। তাঁহার বিরহকাতরতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহাদের আসিবার কথা তাহারা যে আজও আসিল না?

আকাশে অন্ধকার নামিয়া আসে। মন্দিরের আরতির শব্দ দূরে মিলাইয়া যায়। রামকৃষ্ণ কুঠিবাড়ীর ছাদে চুপি চুপি উঠিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "ওরে! তোরা সব কে

কোথায় আছিস্ আয়। তোদের না দেখে যে আমি আর একদিনও থাকতে পারছিনে।”

মিলনের লগ্ন আসিয়া পড়িল। একের পর এক এইবার আসিতে থাকে শুদ্ধসত্ত্ব, মুমুক্ষু ভক্তের দল। ঠাকুরের আদর্শের ইহারা ধারক, বাহক এবং এই নব ধর্ম্ম আন্দোলনের এক একজন এক একটি স্তম্ভ। চিহ্নিত শিষ্যদের কাহার কি পরিচয়, কে কোন দিক হইতে আসিতেছে, ঠাকুরের অজ্ঞাত নহে। এক একদিন মনের আনন্দে দু'এক কথা প্রকাশও করেন। তারপর, এই ভক্ত সাধকদের গড়িয়া তোলার পর্ব্ব আরম্ভ হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ অদ্ভুত অধ্যাত্ম-শিল্পি। অমোঘ তাঁহার অলৌকিক স্পর্শ। নিপুণ হস্তে তিনি প্রত্যেক শিষ্যকে রূপান্তরিত করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ ও শক্তিধর গুরুরূপে তিনি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

সাধক ভক্তদের উপর ঠাকুরের কৃপা বর্ষিত হয়। তাহাদের জিহ্বা, বক্ষ, প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থানে দিব্য আবেশে ঠাকুর স্পর্শ করিতেছেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদের মন অন্তর্মুখী হইল। কাহারও দেবদেবীর জ্যোতির্ম্ময় দর্শন, কাহারও গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, কাহারও হৃদয়গ্রন্থি সকল উন্মেষিত হইয়া ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, কাহারও ভাবাবেশ ও সবিকল্প সমাধি, কাহারও নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্বাভাস আসিয়া উপস্থিত হইত।

তারকের মনে এইরূপ ব্যাকুলতা ও কান্নার উদ্রেক হয়। তাহার অন্তরের গ্রন্থিসকল উন্মোচিত হয়। ছোট নরেন উহার প্রভাবে নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল। ঠাকুরের স্পর্শে এককালে নির্ব্বিকল্প সমাধি একমাত্র নরেন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল।

ভক্তদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর ঐরূপে স্পর্শ করা ব্যতীত কখন কখন আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও দিতেন। যোগদৃষ্টি সহায়ে তাহার জন্ম জন্মাগত মানসিক সংস্কারাদি বিচার করিয়া

"তোর এই মন্ত্র" বলিয়া নির্দ্দেশ দিতেন। তিনি ভক্তদের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসিয়া একান্ত অন্তরঙ্গতায় সহিত আশ্রিতের হাত ধরেন। তারপর ধীরে ধীরে তাহাকে পরমপ্রাপ্তির দিকে টানিয়া নেন।

অনেক সময় ঠাকুর বলতেন, "ওরে! ভগবৎদর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। কি জানিস তোদের এখন যৌবনের বন্যা আসিয়াছে। তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস না। বন্যা এলে কি বাঁধ মানে? কলিতে মনের পাপ, পাপ নহে। মনে কুভাব এলো বলে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসিস্ না। মায়ের নিকট খুব প্রার্থনা করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ওগুলো ক্রমে ক্রমে নাশ হ'য়ে যাবে।"

রামকৃষ্ণ গম্ভীরাত্মা বৈরাগ্যবান পুরুষ। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও চরিতকার লিখিয়াছেন "ঠাকুর রামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদের সঙ্গে আনন্দে ভাসিতেন।"

ভক্ত নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) তখন জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। চরম দারিদ্র্যের আঘাতে মুহ্যমান। পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িয়াছে। সেদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। সারা দেহে ক্লান্তি ও বিষাদের ছাপ। ভক্ত মহেন্দ্রমাষ্টার মহাশয় কাছেই আছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিয়া কহিলেন "দ্যাখো, যে বড়ঘরের ছেলে তার খাবার ভাবনা হয় না। সে মাসে মাসে মাসোয়ারা পায়। আচ্ছা, নরেনের এত উঁচু ঘর। তবুও হয় না কেন বলতো? ভগবানে মন সবটা সমর্পণ করলে তবে তো তিনি সব জোগাড় করে দেবেন"। সব সময় তিনি এইরূপ মূল্যবান উপদেশ দিতেন এবং তীক্ষ্ণ সজাগদৃষ্টিতে শিষ্যদের সর্ব্বদা পাহারা দিতেন।

রাখাল মহারাজ ঠাকুরের মানসপুত্র। ঠাকুর তাহাকে অত্যন্ত আদর ও স্নেহ করেন। হঠাৎ রহস্যচ্ছলে কোন সঙ্গীর কাছে রাখাল মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। অন্তর্যামী ঠাকুরের তাহা অজানা রহে

নাই। দোষ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন ভক্তদের কল্যাণের জন্য তাহা সংশোধন দরকার। কঠোর স্বরে তিনি রাখালকে বলিলেন, "তোর মুখ ওরকম দেখছি কেন? তুই নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলেছিস।" দোষ স্বীকার করে রাখাল নিষ্কৃতি পান।

ভাতের সঙ্গে একটু বেশী ঘি খাওয়া ভক্ত নিরঞ্জনের চিরকালের অভ্যাস। ব্যাপারটি তুচ্ছ। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ ইহা নিয়া বিরক্ত হইলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"অ্যা! অত ঘি খাওয়া। শেষকালে তুই কি বাড়ীর বউঝি বার করবি।"

রাখাল তখন খুব কঠোর সাধনা করিতেছেন। অলৌকিক কিছু দর্শনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুর বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যা, মা তোকে কিছু দেখাবেন"। সেইদিনই রাখাল মহারাজ মন্দিরের মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিবার সময় দেখিলেন, একটা দিব্যজ্যোতির স্রোতধারা তাঁহার দিকে ধাইয়া আসিতেছে। সাধক ভয় পাইলেন। ঠাকুরের নিকট আসিলে, ঠাকুর বলিলেন "ওরে তোর এত হীনবুদ্ধি কেন? কোথায় শুদ্ধাভক্তি নিয়ে সাধনভজনে থাকবি, তা না করে শুধু অষ্টসিদ্ধির দিকে মন দিয়েছিস।"

প্রথম সাক্ষাতের মাসখানেক পরে নরেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসিয়াছেন। অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে ঠাকুর দক্ষিণপদদ্বারা নরেনকে স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেনের এক মহাভাবান্তর হইল। দেখিলেন কক্ষের সব কিছু ঘুরিয়া অসীম আকাশে মিশিয়া গেল। আমিত্ব লোপ পাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিলুপ্তি ঘটিতেছে। নরেন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো! তুমি আমার একি করিলে? আমার যে মা ভাই সব রয়েছে।" স্মিত হাস্যে ঠাকুর কহিলেন, "আচ্ছা! এখন তবে থাক। কালে সব হ'বে।"

অতঃপর নরেনের রূপান্তর হইতে দেরী হয় নাই। ভক্ত ও

শিষ্যদের মধ্যে "সহস্র কমলদল" এর মত নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দরূপে আধুনিক ভারতের প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তোলেন। প্রতীচীর দুয়ারে এই মহাসাধক ভারতের শাশ্বত বাণী পৌঁছাইয়া দেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মহামিলনের সেতু তিনিই প্রস্তুত করেন।

সাধনরত তারকের বুকে সেদিন রামকৃষ্ণ পাদস্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ ভক্ত ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। বাহ্যজ্ঞান হইলে তিনি দেখিতে পান ঠাকুর তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন আর অস্ফুষ্ট স্বরে বলিতেছেন "মা নেমে এসো, মা নেমে এসো।"

ভক্ত কালী একাগ্রমনে সাধনা করিতেছেন। ধ্যানে বসিয়া ইষ্ট ও দেবদেবীর কত চিন্ময় মূর্ত্তি দর্শন করেন। এসব কথা ঠাকুরকে জানাইলে তিনি বলিলেন "ওরে! তোর এসব দর্শন আর হবে না।" নবীন সাধক ইহার পর হইতে আর কোন চিন্ময় মূর্ত্তি দেখেন নাই।

রামকৃষ্ণরূপী সদগুরুর এই মহাসমুদ্র বিশাল ও বিচিত্র। সেদিন এক গৃহীভক্ত লাঠু মহারাজকে একজোড়া নূতন চটী দিয়া যান। উহার এক পাটি কোথায় হারিয়ে গেল। পরদিন দেখা গেল, ঠাকুর ঐ হারান "চটী" বাগানে খুঁজিতেছেন। পুত্রপ্রতিম শিষ্যের জন্য তাঁহার এই আকুলতা দেখিয়া লাঠু মহারাজ সখেদে বলিলেন "ওতে আমার পাপ হবে। আমার দিন খারাপ যাবে।" ঠাকুর বলিলেন "এতে দিন খারাপ যায় না। যেদিন ভগবানের নাম নিবিনে সেদিনই খারাপ যাবে। সেদিন সায়াহ্নে লাঠু মহারাজ ধ্যানে বসার পর চৈতন্য হারান। শিবনেত্র হইয়া গোঁ গোঁ করিতে থাকেন। সংবাদ শুনিয়া ঠাকুর ছুটিয়া আসিলেন, এবং নিজের হাঁঠু লাঠুর বুকে ঘসিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান হইলে ঠাকুর বলিলেন, "তুই আজ মা কালীকে দেখেছিস। চুপ করে থাক।"

ভক্ত যোগীন সেবার বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার বড় ভয় হইল। কামিনী কাঞ্চন যিনি ত্যাগ করিতে বলেন, শিষ্যের এই

ত্রুটী তিনি ক্ষমা করিবেন না। যোগীন ভয়ে ভয়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঢুকিতে যাইতেছেন। ঠাকুর দেখিতে পাইয়া বলিলেন "ওরে! আয় আয়। ভয় কি? এখানকার আশীর্ব্বাদ থাকলে ওরকম একলাখ বিয়ে করলে ও কোন ক্ষতি হয় না।" যোগীনের দুশ্চিন্তা দূর হইল।

গিরীশ ঘোষ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। নাট্যকার ও পটের অসামান্য প্রতিভা নিয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঘোর মাতাল ও দুরন্ত। দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের সাম্নে মাতলামি করেছেন। কিন্তু ঠাকুর করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ। শুধু বলিতেন "খাক্না-শালা—ক'দিন খাবে।" এই করুণা ও সহৃদয়তা গিরীশের কাছে ঠাকুরের ভগবৎশক্তি প্রমাণ করিল। তিনি ঠাকুরকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তারপর একদিন ঠাকুরকে "বকল্মা" দিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পন করিলেন। এই "বকল্মা" গিরীশকে রক্ষা করে। জীবন তাঁহার রামকৃষ্ণময় হয়।

বাহিরের লোকের কাছে ঠাকুর বড়ই প্রচ্ছন্ন থাকেন। সেবার পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এত বড় পণ্ডিত আসিয়াছে ভাবিয়া ঠাকুর চিন্তিত হইলেন। মা'কে বলিলেন, "মা! দেখিস, আমি মূর্খ লোক। পণ্ডিতের সাম্নে কি না বলিয়া বসি।" "কিন্তু পণ্ডিত এসেই আমাকে দেখিয়া কাঁদতে লাগল। একেবারে ভিজে গেছে। ঐ রকম অবস্থা ওর মাঝে মাঝে হয়।"

"আর একদিন কেশব সেন খবর পাঠালে, জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে। পাদরী কুক নামক একজন সাহেবকে সঙ্গে আনবে। আমি কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গেলাম। পরে যখন জাহাজে উঠলাম, সবাই বল্লে খুব উপদেশ দিয়েছে সে।"

নরেন হইতেছে, ঠাকুরের শুদ্ধসত্ত্ব বৈরাগ্যবান শিষ্যদের "মধ্যমণি।" একদিন সোৎসাহে ঠাকুর বলিলেন, "দেখলাম, কেশবের মধ্যে রয়েছে একটা শক্তি। যার ফলে সে জগৎ বিখ্যাত হ'য়েছে।

নরেনের ভিতরে সেই রকম আঠারোটা শক্তি রয়েছে।" এক একদিন তিনি বলিতেন "নরেন খাপ খোলা তলোয়ার।" এই শক্তিমান সাধককে ঠাকুর ভালবাসার বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া নরেন তাঁহার সাধন নির্দ্দেশ আয়ত্ত করিয়া অধ্যাত্ম জীবন পূর্ণতম করিলেন।

কঠোরতপা নরেন একদিন ঠাকুরকে কহিলেন "আমার ইচ্ছা হয় সুখদেবের মত একেবারে পাঁচ ছয়দিন সমাধিতে ডুবিয়া থাকি। তারপর শরীর রক্ষার জন্য নীচে নেমে এসে, পুনঃ সমাধিতে চলে যাই।" ঠাকুর বলিলেন "ছি ছি! তুই এত বড় আধার? তোর মুখে এই কথা? তুই বটগাছ। তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তাই না হয়ে তুই নিজে মুক্তি চাস্? অত ছোট নজর করিস্‌নি।"

আর একদিন নরেনের সমাধি ও উচ্চতম অধ্যাত্ম উপলব্ধির পর ঠাকুর তাঁহাকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "কেমন রে! মা তো তোকে আজ সব দেখিয়ে দিলেন। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। তোকে কাজ করতে হবে। আমার এই কাজ যখন শেষ হবে, চাবি তোকে খুলে দিয়ে দেব।"

রামকৃষ্ণমণ্ডলীর নেতৃত্ব ও ঐশ্বরীয় কর্ম্মের দায়িত্বভার নিবার উপযুক্ত করিয়া নরেনকে কর্ম্মময় মহাজীবনের শেষ অঙ্কে সেদিনকার কথিত চাবিটাও খুলিয়া দেন।

১৮৮৫ সাল। রামকৃষ্ণের লীলাময় জীবনের শেষ অধ্যায় আসিয়া পড়িল। মারাত্মক "ক্যান্সার" রোগে তিনি আক্রান্ত হন। ভক্তদের অন্তরে বিষাদের অন্ধকার নামিয়া আসে। প্রথমে কলিকাতায় কিছুদিন ঠাকুরের চিকিৎসা হয়। তারপর তাঁহাকে কাশীপুরে আনা হয়। আসন্ন গুরুবিচ্ছেদের শোক ভক্তদের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য প্রাণের বন্ধন গড়িয়া তোলে। এই যোগসূত্রের মধ্য দিয়া উত্তরকালের রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সূচনা হয়।

দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরে ঠাকুর দিনের পর দিন কত উপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের অমৃতময় বাণী শুনিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। ঠাকুরের এক ভক্ত একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।" ঠাকুর বলিলেন "ওরে! তিনি সাকার ও বটে, আবার নিরাকার ও বটে। যেমন জল আর বরফ। বরফ জল ছাড়া আর কিছুই নহে। বরফের আকার আছে, জলের নেই। ভক্তিহিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের জল বরফের মত নানা আকার ধারণ করে।"

সেদিন ভক্ত পরিবৃত হইয়া রামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গক্রমে "সর্ব্বজীবে দয়া" কথাটি তাঁহার কাণে গেল। তিনি বলিলেন, "জীবে দয়া, জীবে দয়া, এ কি বলিস? কীটানুকীট তুই। তুই জীবকে কি দয়া করবি? না, না, জীবকে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা"। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া অভিভূত হইলেন। এ যে বেদান্তের প্রজ্ঞানময় ভাষ্য।

গলরোগের চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে শ্যামপুকুরে আনা হইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসময়ে একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন ঢাকায় থাকিতে কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া গোস্বামীজী ভগবৎচিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সশরীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত। কলিকাতা হইতে ঢাকায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তিনি কি করিয়া আসিলেন? দৃষ্টিভ্রম নয় তো? হঠাৎ বালকের মত হাসিয়া ঠাকুর বলিলেন, "বিজয় এসব বলে কি গো?"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "মনের বাইরে জড়শক্তিগুলোকে কোন রকমে আয়ত্ত করিয়া একটা অলৌকিক ব্যাপার দেখান বড় কথা নহে। কিন্তু এ যে পাগলা বামুন মানুষের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে নিয়ে ভাঙ্গতো, পিটতো, গড়তো, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতনভাবে পূর্ণ করতো, এর চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখিনে।"

ভক্ত বুড়োগোপাল সেবার তীর্থদর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। তাঁহার খুব ইচ্ছা এই উপলক্ষে সাধু সন্ন্যাসীদের ভোজন করান, বস্ত্রাদি দান করেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন "ওরে। কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াবি? এখানকার ছেলেরা খুব বৈরাগ্যবান। এদের খাইয়ে দে। তা'তে তোর কাজ হ'বে।"

ভোজন ও দানের ব্যবস্থাদি সমস্তই ঠাকুরের নির্দ্দেশমত সম্পন্ন হইল। নিজেই তিনি তরুণ ভক্তদের হাতে তুলিয়া দিলেন, গৈরিক বস্ত্র, একগাছা করিয়া মালা আর কমণ্ডলু। শিষ্যদের জীবনে অন্তঃ-সন্ন্যাসের ধারা সেদিন ঠাকুর নিজেই উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী। অপরাহ্ন কাল। কয়েকদিন ঘরে আবদ্ধ থাকিবার পর ঠাকুর বাগানে বেড়াইতেছেন। সেদিন গিরীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহার স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। তাঁহার মতে রামকৃষ্ণ অবতার। সেদিন অনেক গৃহী ভক্ত ও কাশীপুর আসিয়াছেন। সকলকে ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের চৈতন্য হউক।"

ঠাকুরের সমাধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ভক্ত ও শিষ্যদের মনে তাই অত্যন্ত দুশ্চিন্তা। আপ্রাণ ভাবে থাকলে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণিও সেদিন ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা! আপনার মত লোক ইচ্ছামাত্রই ব্যাধি দুর করিতে পারে। তা করেন না কেন?" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "তুমি পণ্ডিত মানুষ। এ কি বলছো? যে মন প্রাণ সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তা, সেখান থেকে এনে, এ ভাঙ্গা হাড় মাংসের খাঁচাটায় রাখতে কি প্রবৃত্তি হয়"? শশধর পণ্ডিত এই দেবমানবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুখে কোন কথা সরিল না।

কিন্তু ভক্তেরা ছাড়েন না। নরেন ও অন্যান্য গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলেন, অন্ততঃ ভক্তদের জন্য ঠাকুরকে তাঁহার এই রোগ সারাইতে হইবে। তিনি নিজে কিছু করিতে না চান, অন্ততঃ মাকে তো বলতে পারেন।

অগত্যা ঠাকুরকে রাজি হইতে হইল। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা'কে বলেছেন তো? কি জবাব পেলেন? ঠাকুর বলিলেন, "মা'কে বলেছিলুম, গলার ক্ষতের জন্য খেতে পারিনে। যাতে দুটি খেতে পারি তাই করে দে। তা মা তোমাদের সবাইকে দেখিয়ে বল্লেন, 'কেন, এই যে তুই এত সুখে খাচ্ছিস?' দেহাত্মবোধের উর্দ্ধে, অদ্বৈতজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যে মহাসাধক, জগন্মাতা তাঁহাকে ইহা ছাড়া আর কি বলিবেন?

অধ্যাত্মশিল্পি ঠাকুরের এই তরুণ ভক্তগণ এক একটি অপরূপ সৃষ্টি। ইহাদের তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এখন দরকার ইহাদের কেন্দ্রীভূত করা। এইজন্য ঠাকুরের অত্যন্ত তৎপরতা।

সেদিন রোগশয্যায় শায়িত নিজের দেহটি অঙ্গুলীসঙ্কেতে দেখাইয়া ঠাকুর বলেন, "ওরে! যে রাম কৃষ্ণ হ'য়েছিল, ইদানীং সে এই খোলটার মধ্যে আছে। তবে এবার গুপ্তভাবে আসা।" যেমন রাজা ছদ্মভাবে নিজরাজ্য পরিদর্শনে আসেন। যেমনি জানাজানি, অমনি সেখান থেকে সব সরে প'ড়ে।"

মহাপ্রস্থানের দিনটি আর দেরী নাই। ঠাকুর সেইদিন নরেন্দ্রকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া আনিলেন। আর কেহ সেখানে উপস্থিত নাই। স্থিরদৃষ্টিতে প্রিয়তম শিষ্যের দিকে তাকাইয়া তিনি ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথও ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া নরেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। জ্ঞান হইলে নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে সংক্ষেপে বলিলেন, "আজ থেকে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমি ফকির

ভক্ত বুড়োগোপাল সেবার তীর্থদর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। তাঁহার খুব ইচ্ছা এই উপলক্ষে সাধু সন্ন্যাসীদের ভোজন করান, বস্ত্রাদি দান করেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন "ওরে। কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াবি? এখানকার ছেলেরা খুব বৈরাগ্যবান। এদের খাইয়ে দে। তা'তে তোর কাজ হ'বে।"

ভোজন ও দানের ব্যবস্থাদি সমস্তই ঠাকুরের নির্দ্দেশমত সম্পন্ন হইল। নিজেই তিনি তরুণ ভক্তদের হাতে তুলিয়া দিলেন, গৈরিক বস্ত্র, একগাছা করিয়া মালা আর কমণ্ডলু। শিষ্যদের জীবনে অন্তঃ-সন্ন্যাসের ধারা সেদিন ঠাকুর নিজেই উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী। অপরাহ্ন কাল। কয়েকদিন ঘরে আবদ্ধ থাকিবার পর ঠাকুর বাগানে বেড়াইতেছেন। সেদিন গিরীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহার স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। তাঁহার মতে রামকৃষ্ণ অবতার। সেদিন অনেক গৃহী ভক্ত ও কাশীপুর আসিয়াছেন। সকলকে ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের চৈতন্য হউক।"

ঠাকুরের সমাধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ভক্ত ও শিষ্যদের মনে তাই অত্যন্ত দুশ্চিন্তা। আপ্রাণ ভাবে থাকলে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিও সেদিন ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা! আপনার মত লোক ইচ্ছামাত্রই ব্যাধি দূর করিতে পারে। তা করেন না কেন?" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "তুমি পণ্ডিত মানুষ। এ কি বলছো? যে মন প্রাণ সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তা, সেখান থেকে এনে, এ ভাঙ্গা হাড় মাংসের খাঁচাটায় রাখতে কি প্রবৃত্তি হয়"? শশধর পণ্ডিত এই দেবমানবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুখে কোন কথা সরিল না।

কিন্তু ভক্তেরা ছাড়েন না। নরেন ও অন্যান্য গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলেন, অন্ততঃ ভক্তদের জন্য ঠাকুরকে তাঁহার এই রোগ সারাইতে হইবে। তিনি নিজে কিছু করিতে না চান, অন্ততঃ মাকে তো বলতে পারেন।

অগত্যা ঠাকুরকে রাজি হইতে হইল। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা'কে বলেছেন তো? কি জবাব পেলেন? ঠাকুর বলিলেন, "মা'কে বলেছিলুম, গলার ক্ষতের জন্য খেতে পারিনে। যাতে দুটি খেতে পারি তাই করে দে। তা মা তোমাদের সবাইকে দেখিয়ে বল্লেন, 'কেন, এই যে তুই এত সুখে খাচ্ছিস?' দেহাত্মবোধের উর্দ্ধে, অদ্বৈতজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যে মহাসাধক, জগন্মাতা তাঁহাকে ইহা ছাড়া আর কি বলিবেন?

অধ্যাত্মশিল্পি ঠাকুরের এই তরুণ ভক্তগণ এক একটি অপরূপ সৃষ্টি। ইহাদের তিনি গ'ড়িয়া তুলিয়াছেন। এখন দরকার ইহাদের কেন্দ্রীভূত করা। এইজন্য ঠাকুরের অত্যন্ত তৎপরতা।

সেদিন রোগশয্যায় শায়িত নিজের দেহটি অঙ্গুলীসঙ্কেতে দেখাইয়া ঠাকুর বলেন, "ওরে! যে রাম কৃষ্ণ হ'য়েছিল, ইদানীং সে এই খোলটার মধ্যে আছে। তবে এবার গুপ্তভাবে আসা।" যেমন রাজা ছদ্মভাবে নিজরাজ্য পরিদর্শনে আসেন। যেমনি জানাজানি, অমনি সেখান থেকে সব সরে প'ড়ে।"

মহাপ্রস্থানের দিনটি আর দেরী নাই। ঠাকুর সেইদিন নরেন্দ্রকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া আনিলেন। আর কেহ সেখানে উপস্থিত নাই। স্থিরদৃষ্টিতে প্রিয়তম শিষ্যের দিকে তাকাইয়া তিনি ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথও ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া নরেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। জ্ঞান হইলে নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে সংক্ষেপে বলিলেন, "আজ থেকে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমি ফকির

হলুম। এই শক্তিতে তুই অনেক কাজ করবি। তারপর ফিরে যাবি।”

চিহ্নিত প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ঠাকুর তাঁহার সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিত করিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অগাষ্ট। ঠাকুরের নরলীলার শেষ দৃশ্য। মধ্যাহ্নের কিছুপূর্ব্বে যোগারূঢ় অবস্থায় এই মহাসাধক জগন্মাতার অমৃতময় ক্রোড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যুগাচার্য্যের ভূমিকায় শেষ অঙ্কের যবনিকা নামিয়া আসিল।

২৩। সন্তদাস মহারাজ।

(১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ।)

শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বামৈগ্রামের (ব্রাহ্মণ) চৌধুরীগণ বনেদী পরিবার। ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য চৌধুরীদের খ্যাতি যথেষ্ট। ইহাদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ হিমালয় গিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই বংশের একমাত্র বৈষ্ণব হরকিশোর চৌধুরী অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ও তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গিরিজাসুন্দরী ও বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। ইহাদের পুত্ররূপে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন শুক্রবার তারাকিশোর জন্মগ্রহণ করেন। ধনীগৃহের আদর যত্নে, ধর্ম ও নিষ্টার পরিবেশে তারাকিশোর বর্দ্ধিত হন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার মাত্র নয় বৎসর বয়সে তাঁহার জননী গিরিজা সুন্দরী দেবী স্বর্গগতা হন।

তখন বাল্যবিবাহ প্রচলন ছিল। তারাকিশোর যে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, সেই বৎসরেই বিখ্যাত বিশারদ বংশীয় হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা অন্নদাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই নিষ্ঠাবতী মহিলার মধ্যে পিতৃকুলের বহুতর সদগুণ বর্ত্তমান ছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষা তিনি কৃতিত্বের সহিত পাশ করিলেন। তৎপর কলেজে পড়িবার জন্য তিনি কলিকাতায় আসিলেন। শ্রীহট্টের সুন্দরী মোহন দাস, বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতি ছাত্রদের সঙ্গে তিনি একই মেসে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। তখন বাঙ্গলার সমাজ জীবনে ও রাজনীতিতে নবজাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। মনস্বী, উন্নতচেতা তারাকিশোর ইহাতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনে ও এই তরুণ ছিল অগ্রণী। রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক বিষয়ে তিনি গণতান্ত্রিকতা ভালবাসিতেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন একমাত্র কেশবচন্দ্র

সেন মহোদয়ের শাসনাধীনে বলিয়া সকলেই মনে করিত, তখন তৎবিরুদ্ধে তারাকিশোর সর্ব্বপ্রথম আপত্তি জানান এবং তরুণদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হন।

ইহাতে তাঁহার পিতা হরকিশোর চৌধুরী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং কলিকাতায় আসিয়া পুত্রকে অভিযোগ করেন। তারাকিশোর নির্ভীকচিত্তে, দৃঢ়কণ্ঠে ও শান্তস্বরে উত্তর দিলেন, "আমার এই শরীর আপনার থেকে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু আত্মা আমার। তাহার কল্যাণের জন্য যে পথ উত্তম মনে হয়, তাহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না। পিতাপুত্রের এই আদর্শগত কলহ বেশ কিছুদিন চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে নানা সংগ্রাম ও কর্ম্ম ব্যস্ততার মধ্যে তারাকিশোর "এম, এ" পাশ করেন। তৎপর রায়চাঁদ, প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নানা বিপর্য্যয়ের দরুণ শেষ পর্য্যন্ত তাহা তিনি বাদ দেন। শিক্ষকতা ও বহুজনহিতকর কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

একদা কাশীতে পিতা হর কিশোরের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি সেখানে যান। উত্তম চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ফলে হরকিশোর সত্বর আরোগ্য লাভ করেন। এই সময়ে পিতা ও তাঁহার বন্ধুদের সঙ্গে তারাকিশোরকে নানা দেবালয়ে ও সাধু সন্দর্শনে যাইতে হইত। মহাযোগী ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ স্বামীজির সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য ও এই সময়ে তাঁহার হয়। তরুণ ব্রাহ্ম তারাকিশোর এই যোগীদ্বয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে থাকেন যে কোন সাধনার বলে এই মহাপুরুষদ্বয় এমন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়াছেন এবং অতীন্দ্রিয় লোকের বার্ত্তা মানব লোকে এমন অবলীলাক্রমে বলিয়া দেন। ইহা যতই তিনি ভাবেন ততই হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার প্রতীতি জন্মে এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করা তাঁহার সঙ্গত হয় নাই বলিয়া ধারণা হয়।

তাই তিনি এক যোগী শিক্ষাদাতা জগৎচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট মন্ত্র লইয়া আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ও ধারণা শিক্ষা করিতে থাকেন। ইহাতে অন্তরের পিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রাহ্ম বলিয়া তিনি ব্রাহ্ম সমাজ অন্তর্গত সিটি কলেজের অধ্যাপক হন। ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহার মনঃপুত হইতেছেনা বলিয়া তিনি এই অধ্যাপকতা ও ছাড়িয়া দিলেন। সুতরাং তিনি অর্থহীন হইয়া পড়িলেন।

অধ্যাপক থাকা কালীন তিনি আইন পড়িতেন। তাহা যথাক্রমে পাশ করিয়া তিনি শ্রীহট্টে উকীল হইয়া বসিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পশার হইল। অর্থের সেবায়, অধ্যাত্ম আলোচনায়, হরিসভায়, নগরকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র তারাকিশোরের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। এইসব কারণে এবং তাহার প্রতাপশালী ও সম্মানিত পিতার চেষ্টায় তিনি হিন্দু সমাজে পুনঃ গৃহীত হন।

নিজ জেলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জনের পর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। স্বীয় ধর্ম্মনিষ্ঠা ও প্রতিভাবলে তিনি হাইকোর্টের আইনজীবিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ব্যবহারিক জীবনে তাঁহার যতই পরিবর্তন দেখা যাক্ না কেন অধ্যাত্মজীবনের ফল্গুধারাটি তাঁহার অন্তরে অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "যোগ সাধনায় একটি শক্তি হয় তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। কাহারও দিকে তাকিয়ে তাহাকে রোগমুক্ত করেছি, আমাকে স্পর্শ করে অনেকেই ভাবাবিষ্ট হয়েছে এমন কি মূর্চ্ছা ও গিয়েছে। কিন্তু ইহাতে সিদ্ধি কোথায়?" তাই তিনি গুরুলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজনে ও তীর্থদর্শনে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু নানা কারণে তাহাতে বাধা পড়ে।

তারাকিশোর প্রায় প্রত্যহই গঙ্গাস্নান করিতেন। গঙ্গাতীরে

বসিয়া ধ্যান, জপ, প্রার্থনা ও নিবেদনে তাঁহার বহুসময় অতিবাহিত হইত।

১৮৯১ সালের গ্রীষ্মকাল। তিনি সন্তাপিত চিত্তে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আছেন। হঠাৎ প্রবল আর্ত্তি ও ক্রন্দনে তাঁহার সারা অন্তর মথিত হইয়া উঠিল। তিনি সখেদে গঙ্গাদেবীকে আবেদন করিলেন "মা! ত্রিতাপনাশিনী কলুষহারিণী বলিয়া তোমার প্রসিদ্ধি। কিন্তু, মা! আমার পাপ এতই বেশী যে তোমার ত্রিলোক-পাবনী ধারা তাহা শুদ্ধ করতে পারল না।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিতে পাইলেন, হিমালয়ের যে স্থান হইতে গঙ্গা উত্থিত হইয়াছে, সেই মূল গোমুখী গঙ্গোত্রী তাঁহার চোখের সামনে উপস্থিত এবং সঙ্গে সঙ্গে উমা মহেশ্বর ও দৃষ্টিগোচর হইল। মহেশ্বর তাঁহাকে একাক্ষরী বীজমন্ত্র দেন এবং বলেন এই মন্ত্র জপের দ্বারা তিনি যথার্থ সদ্‌গুরু লাভ করিবেন।

অপ্রাকৃতিক দৃশ্যটি অন্তর্হিত হইল। পথ প্রদর্শক ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে তিনি যে নিশ্চয় পাইবেন, ইহাতে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। ইহার তিন বৎসর মধ্যেই তিনি গুরুকৃপা লাভ করেন।

হাইকোর্টের উকীল হিসাবে তিনি শুধু আইনজীবিদেরই নহে, প্রবীন বিচারকদের ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। রাসবিহারী ঘোষ, যিনি আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তিনি ও বলিতেন "মামলা ঠিক তৈয়ার হইয়াছে বটে, কিন্তু ভয় অপর পক্ষের উকীল তারাকিশোরকে। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তিনিও মক্কেলদের তারাকিশোরের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলিতেন। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ছিলেন। তিনি একবার হাইকোর্টের বিচার-পতি জষ্টিস নরিসকে বলিয়াছিলেন তাঁহাকে না শুনিয়া জষ্টিস কিরূপে মন্তব্য করেন। যদিও আইন ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেন, তিনি স্বভাবতঃ উদাসীন ও সাধনভজন পরায়ণ ছিলেন।

তাঁহার বাড়ীতে অনেক দরিদ্র পোষ্য ছিল। এদের জন্য ঝামেলাও কম ছিল না। কেহ কিছু বলিলে, তিনি বলিতেন, "এই সংসার আমার নহে। ইহা হচ্ছে ঠাকুরের। তিনিই এদের খাওয়া পরা সব যোগাচ্ছেন।" চাকরবাকরদের আব্দারও তিনি সহ্য করিয়া যাইতেন। কি দৈনন্দিন জীবনে, কি হাইকোর্টের সংগ্রাম-ময় ক্ষেত্রে, তিনি নিজকে পৃথক করিয়া নিতে পারিতেন। এক অন্তঃসঞ্চারী আনন্দ স্রোতে তিনি সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকিতেন। একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া "গড়গড়া" টানিবার সময় নলটি তাঁহার বামচোখের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। ইহার ফলে ক্ষত ও যন্ত্রণা হয় ও পরে এই চক্ষুটি দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে। এই সময়ে তিনি মহাভারতের পাঠ শুনিতেন। ঘটনাবলীর চিত্রগুলি তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিত।

১৮৯৪ইংর জানুয়ারী মাস। ১৩০০ সালের মাঘমাসে প্রয়াগ সঙ্গমে কুম্ভমেলা আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসীর জমায়েত ও ছাউনি। তারাকিশোরও সেইদিন কুম্ভ-মেলায় আসিয়াছেন, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ আইনজীবি-হিসাবে তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা। দানব্রতী, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মনস্বী সমাজনেতা হিসাবেও তিনি খ্যাত। তথাপি ব্যবহারিক জীবনের জন্য কোন আকর্ষণই তাঁহার ছিল না। ভগবৎ দর্শনের জন্য তারাকিশোরের সর্ব্বসত্তা ব্যাকুল ও উন্মুখ। এজন্য সর্ব্বাগ্রে তাঁহার একান্ত প্রয়োজন সৎগুরুর কৃপা। কুম্ভমেলার পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া তিনি গুরুর সন্ধানে ঘুরিতেছেন। তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর তাঁবুতে গেলেন। বিজয়কৃষ্ণ তারাকিশোরকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। তারাকিশোর তাঁহাকে দর্শনান্তে প্রণাম করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ আশীর্ব্বাদ করিলেন "সদ্‌গুরু লাভ হউক।" ইহা শুনিয়া তারাকিশোরের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পাইল।

তৎপর তিনি কাঠিয়াবাবাকে দর্শন করিতে গেলেন। বৃদ্ধ সাধুর

শিরে শুভ্র জটাভার, দেহটি দিব্য লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত, আননে স্মিত হাসির রেখা। প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই, তারাকিশোরকে কাঠিয়া বাবাজী বলিলেন "ইনকো তো হম্ বৃন্দাবনমে দর্শন কিয়া।"

কয়েক মাস পূর্ব্বে তারাকিশোর বৃন্দাবন গিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু এই মহাত্মার সহিত তারাকিশোরের দেখা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে পড়ে না। তবুও শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত কাঠিয়া বাবাজীর আলাপ আলোচনা শুনিয়া তারাকিশোর তাঁহার শিষ্য হইতে চাহিল। পরের দিন তাঁবুতে গেলে. বাবাজী নিজ হইতে বলিলেন, সুপাত্র পাইলে চেলা করিতে আপত্তি নাই। তাঁহাকে বাবাজী বলিলেন চৈত্রমাসে বৃন্দাবনে গিয়া যেন দেখা করেন। হাইকোর্টের তখন কোন ছুটি নাই বলিয়া বলিলে, বাবাজী চিন্তা করিতে নিষেধ করেন এবং বলিলেন মহাবীরজী ছুটি মিলাইয়া দিবেন।

চৈত্রমাসে সত্য সত্যই সুযোগ আসিল। তারাকিশোর বৃন্দাবনে গিয়া বাবাজী মহারাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে বাবাজীর বাহ্যিক স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, বাবাজী একজন পাকা বিষয়ী ব্যক্তি। সেখানে অবস্থান কালে তারাকিশোরের এই ধারণা বদ্ধমূল হইল। মনের এই অবস্থায় একদিন দীক্ষার কথা বলিতে বাবাজী বলিলেন, এবার তারাকিশোরকে দীক্ষা দেবেন না। স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া শ্রাবণ মাসে যেন পুনঃ আসেন। বাবাজীর কথা শুনিয়া তারাকিশোর পুনঃ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

নিশীথ রাত্রি। সাধন ভজনের পর তারাকিশোর ছাদে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার তন্দ্রার মত হইয়াছে। হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিলে উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখে তাকাইয়া দেখিলেন, আকাশমার্গ হইতে কাঠিয়া বাবাজীর জ্যোতিঃপুঞ্জ দেহখানি অগ্রসর হইয়া তাঁহার দিকে আসিল ও তাঁহার কানে এক মন্ত্র প্রদান করিয়া পুনঃ আকাশ-মার্গে অন্তর্হিত হইল। ইহার পর শ্রাবণ মাসে তিনি বৃন্দাবন গিয়া

কাঠিয়া বাবার নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। যে মন্ত্র তিনি কলিকাতায় পাইয়াছিলেন পুনঃ সেই মন্ত্রই আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি পুনঃ প্রাপ্ত হন।

তারাকিশোরের সাধন জীবনের বৈশিষ্ট্য তাঁহার দীর্ঘকালের আর্ত্তি, ত্যাগ ও একনিষ্ঠা। ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কাঠিয়া বাবার কৃপায় তিনি ক্রমে ক্রমে এক সার্থকনামা সাধকরূপে খ্যাত হন।

কাঠিয়া বাবাজীর এক আলোক চিত্র তারাকিশোর ও তাঁহার স্ত্রী শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "এই চিত্র বড়ই জাগ্রত। গুরু মহারাজ এর ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হন, কত মধুর লীলা আমাদের দেখান।" আলোক চিত্রের সম্মুখে বাতি জ্বালান, ও ধূপধুনা দেওয়া তাঁহার পুরাতন ভৃত্য তুলারামের উপর ন্যস্ত ছিল। একদিন সে ধূপধুনা ও বাতি লইয়া গিয়া দেখে, আলোকচিত্রের মত জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ও তাহার হাত হইতে ধূনুচী লইয়া আলোকচিত্রের আরতি করিতে থাকেন। সে ভয়ে তারাকিশোর ও তাঁহার স্ত্রীকে এই বৃত্তান্ত জানায়। তাঁহারা আসিয়া দেখেন সেখানে কেহ নাই। সেই দিন হইতে প্রত্যহ আলোকচিত্রের সম্মুখে ধূপধুনা দিয়া আরতি করা হইত।

একবার তিনি হাতীতে চড়িয়া শ্বশুরবাড়ী যাইবার কালে পথে এক গাছের নীচু ডালের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া তাঁহার প্রাণ নাশ হওয়ার উপক্রম হয়। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন হাতী পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পেছনে ফিরিয়া দেখিলেন গাছের ডাল তেমনি নীচু রহিয়াছে। ইহার অল্পদিন পরে তারাকিশোর বৃন্দাবনে আসিয়া গুরুদেবের পদপ্রান্তে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ কাঠিয়া বাবা বলিয়া উঠিলেন "বেটা! গাছের ডাল কি করে তোমায় প্রাণে নাশ কর্ব্বে। ভগবান যে সর্ব্বদা ছায়ার মত তোমায় রক্ষা করছেন।"

বৃন্দাবনের আশ্রমে কাঠিয়া বাবাজী এক সর্পসঙ্কুল প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। ইহা দেখিয়া তারাকিশোরের দুঃখ হয়। সত্বর গুরুদেবের জন্য একটি আশ্রম ভবনের জন্য উদ্যোগী হইয়া পড়েন। তিনি কলিকাতা হইতে টাকা পাঠাইতেন আর বাবাজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে আশ্রম নির্ম্মাণ কার্য্য চলিত। ১৮৯৯ ইং-তে এই আশ্রম সম্পূর্ণ হয় এবং তথায় সাড়ম্বরে যুগল শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হন। একদিন কাঠিয়াবাবা তারাকিশোরকে বলিলেন "আশ্রমে যে যুগল বিগ্রহ আছে তাহা বড়ই জাগ্রত। তোমার মনে যে আকাঙ্ক্ষা আছে তাহা জানাইয়া বর মেগে নাও।" তারাকিশোর সবিনয়ে বলিলেন "বাবা! আপনার সন্তোষই আমার প্রার্থণীয়। আপনি প্রসন্ন থাকলে আমার কোন অভাব থাকতে পারে না।" বাবাজী বলিলেন "ঠিক বলেছ। তবে কিছু কিছু পরীক্ষাও প্রয়োজন। তখন গুরুর আদেশে তারাকিশোর যুগল শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণতঃ হইয়া স্বীয় প্রার্থনা জানাইলেন। "দয়াময়! গীতায় তুমি শ্রীমুখে বলিয়াছ ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মার কথা। যাঁর শোক নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, সর্ব্বভূতে যিনি সমদর্শী, তিনি তোমার পরাভক্তি লাভ করে ও তোমার পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তোমাতেই প্রবিষ্ট হন।" তোমার শ্রীমুখে বর্ণিত শ্লোকে যে পরম অবস্থার কথা বর্ণনা করেছ, তাই যেন আমি প্রাপ্ত হই। এই কৃপাই তুমি আজ আমায় কর। (গীতা ১৮।৫৪ ও ৫৫ শ্লোক)

তারাকিশোর মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিলে বাবাজী প্রসন্ন উদার দৃষ্টিতে বলিলেন, "বেটা! তুম্‌হারা অভীষ্ট সিদ্ধ হোগা। তুম্‌নে ঋদ্ধি সিদ্ধি দো মিলেগা। হাঁ মহান্তভী মিলেগা।" বাবাজী আবার বলিলেন "ভগবৎদর্শন ভি তুমকো মিলেগা। তারাকিশোর আনন্দে গুরুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

এবার তারাকিশোর সংসারত্যাগের বাসনা করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প স্থির। পত্নী অন্নদাদেবীও তাঁহার এই সঙ্কল্পে বাধা দিলেন

না। তিনিও সম্মতি দিলেন। চূড়ান্ত ব্যবস্থাদিতে তারাকিশোর নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু রাত্রে শয়নগৃহে ঢুকিতে গিয়াই বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, দিব্যজ্যোতিঃমূর্ত্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দণ্ডায়মান। পরমপ্রভু মধুর হাসি হাসিতেছেন আর তাঁহার শয়নকক্ষ স্বর্গীয় আলোকে দীপ্ত হইয়াছে। এই অতিন্দ্রিয় দর্শনে তারাকিশোর নিজেই লিখিয়াছেন, "তখন আমার হৃদয়ে আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল। আমি সমস্ত জগৎকে আনন্দময় মনে করিলাম। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শ্রীভগবানকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলাম। উঠিয়া দেখিলাম তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।"

তাঁহার শয়নকক্ষেই শ্রীভগবান দর্শন দিয়াছেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন, এখনও সংসার ত্যাগের সময় হয় নাই। তাই তিনি আপাততঃ রহিয়া গেলেন। অতঃপর কয়েকমাস পরে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহার শয়নগৃহে এই অপ্রাকৃতিক দর্শনের কথা কাঠিয়া বাবাজীকে বলিলেন। বাবাজী সবকথা শুনিয়া বলিলেন "বহুৎ ভাগ্যফলে এইরকম দর্শন মিলে। কিন্তু ইহা ছায়া দর্শন। এর পরেও বহুতর দর্শন রয়েছে।"

কাঠিয়া বাবাজীর সঙ্গে তারাকিশোর ব্রজপরিক্রমায় বাহির হন। গুরুদেবের সেবার সকলরকমের ব্যবস্থা, অনুগামী সাধুদের খাওয়া দাওয়া ও পরিব্রাজনের ব্যয় ভার তিনি নিজেই বহন করেন।

সেবার পরিক্রমাকালে তারাকিশোর নন্দগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। হঠাৎ কতকগুলি গ্রাম্য বালক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং সকলকে জিলাপী খাওয়াইতে বলিল। তারাকিশোরের আদেশে দোকানী ভিয়ান চড়াইল। মিষ্টি তৈয়ার হইবার পর কোথা হইতে দুইটি অপূর্ব্ব দর্শন বালক এই বালকদের সঙ্গে আসিয়া জুটিল। যেমন নয়নাভিরাম রূপ তেমনই মধুর কণ্ঠস্বর। বালক দুইটিকে দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর হইল। তাহারা তারাকিশোরের দিকে চাহিয়া বঙ্কিম হাসিতে বলিল "বাবা!

ইয়ে সব বড়া উপদ্রবী। তুম হম দোনোকো জিলাপী দে দোও। হম সবকো বাট দেঙ্গে।" চারিদিকে বালকদের হৈ চৈ। তারাকিশোর সব ভুলিয়া নির্নিমেষ নেত্রে এই দিব্যদর্শন বালক দুইটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলরাম। তিনি সমস্ত জিলাপী এই বালক দুইটির হাতে তুলিয়া দিলেন। উপস্থিত সমস্ত বালকেরা তাহাদের নেতৃত্ব মানিয়া লইল। সকলকে ভাগ করিয়া দিয়া তাহারাও কতেক খাইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল এই দিব্যদর্শন বালক দুইটি সেই ভিড়ের মধ্যে নাই। কোন্ সময়ে তাহারা অদৃশ্য হইল কেহ বলিতে পারে না। তারাকিশোরের নয়নে প্রেমাশ্রুর ধারা বহিতে লাগিল। লীলাপর কৃষ্ণবলরাম কৃপা করিয়া ছদ্মবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়া গেলেন ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি অতীব আনন্দিত হইলেন।

আর একবার ব্রজ পরিক্রমার সময় পূর্ব্বদিন একাদশী থাকায় পরের দিন গুরুজীও অপর সকলকে খাওয়াইয়া, তিনি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিছু খাওয়ার সময় পাইলেন না। নিজের মনকে বুঝাইলেন যে, আজ বোধ হয় শ্রীঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে তাঁহার কোন আহার হউক। কাজকর্ম্ম ও সাধন ভজনের পর তারাকিশোর মধ্য রাত্রে সবে মাত্র গা এলাইয়া দিয়াছেন। একটু তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে। হঠাৎ তাঁবুর বাহিরে এক বালকের ডাক শোনা গেল। "বাবুজী কাঁহা হ্যায়" বলিয়া তার স্বরে চীৎকার করিতেছে। কাঠিয়া বাবা তখনও জাগিয়া আছেন। তিনি ডাক শুনিয়া সব বুঝিতে পারিলেন। রহস্যময় হাসি হাসিয়া তাঁহার সেবক ও শিষ্য বালকদাসকে বলিলেন—"ওরে! শুনছিস্ না, তারাকিশোরকে ডাকছে। তা'কে ডেকে দে।" বালকদাস ব্যাপার কি জানিতে বাহিরে আসিলে একটি বালক এক লোটা দুধ দিয়া অন্তরঙ্গভাবে জানাইল, "ইহা বাবুজীর জন্য। তাহাকে যেন এখনই পান করিতে দেওয়া হয়।" নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আহার্য্যের ব্যবস্থা

দেখিয়া তারাকিশোর অবাক হইলেন। ছুটিয়া গিয়া আগন্তুক বালককে ধরিতে গেলেন। কিন্তু সে চকিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। তারাকিশোর পরমতৃপ্তির সহিত সমস্ত দুগ্ধই পান করিলেন। দুগ্ধবাহী এই রহস্যময় বালকের সন্ধান পরের দিনও মিলিল না।

অতঃপর তারাকিশোর ও তাঁহার স্ত্রীর উপর নানারকম পরীক্ষা চলে। সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষায় তাঁহারা উত্তীর্ণ হন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গুরুদেব তাহাদের কার্য্যে ও ব্যবহারে প্রসন্ন হন এবং আশীর্ব্বাদ করেন যে তাহাদের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

গুরুজীর আশ্রমের জন্য ও বৃন্দাবন থাকাকালীন ব্যয়হেতু তারাকিশোরের যথেষ্ট ঋণ হয়। এইবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর তিনি এক বড় মোকর্দ্দমায় নিযুক্ত হন। ইহাতে তাঁহার অজস্র অর্থাগম হইতে থাকে। তাই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে তাঁহার বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। এইসময়ে তিনি হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তিনি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ ও প্রচার পুস্তিকা প্রণয়ণ করেন। তাঁহার রচিত "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা," "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা" কল্যানকর আধ্যাত্মিক সাহিত্যরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। তারাকিশোরের তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির নিদর্শনে এই গ্রন্থগুলি ভরপুর।

তারাকিশোর আধ্যাত্মিক জীবনে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন। তারাকিশোর একদা বক্ষের মাঝে একটি শক্তির উর্দ্ধগতি অনুভব করেন। গুরুজীর নিকট জানাইলে তিনি বলেন "তা হবারই কথা। ভেতরকার কমল যে তাকে বাধা দিচ্ছে। চিন্তা নাই। ঠিক সময় মত তা আমি খুলে দেব।" সেই ক্ষণটী আসিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই।

তিনি ১৯১৫ ইংরাজীর আগষ্ট মাসে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী হইতে বিদায় নেন। যে শেষ মামলাটি তিনি হাতে নেন, তাহা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। তারাকিশোরের সহকর্মীদের নিকট হইতে

হাসিমুখে বিদায় নেবার জন্য হাসিমুখে অপেক্ষা করিতেছেন। একে একে বিদায়ের অভিবাদন ও আলিঙ্গন আরম্ভ হইল। সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত। কেহ কেহ উদ্গত অশ্রু গোপন করিতেছেন। ভীড় ঠেলিয়া স্যার রাসবিহারী ঘোষ তারাকিশোরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নীচু হইয়া তারাকিশোরকে প্রণাম করিতে গেলে তারাকিশোর তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—ইহাতে তাঁহার অপরাধ হইবে। স্যার রাসবিহারী বলিলেন—"আমি বয়োবৃদ্ধ এবং সংসারে জড়িত। তুমি সর্ব্বস্ব পাইয়াও আজ সর্ব্বত্যাগী মুক্তপুরুষ। আমায় তোমায় প্রণাম করিতে দাও।" এই বলিয়া তিনি তারাকিশোরকে প্রণাম করিলেন। মাঝে মাঝে স্যার রাসবিহারী ঘোষ তারাকিশোরকে বলিতেন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। শরীর অপটু হইয়াছে। কিছুদিন অপেক্ষা করিলে তিনি কয়েক লাখ টাকা দিতে পারিতেন। তাহাতে বৃন্দাবনে গুরুজীর আশ্রম হইতে পারিবে। তারাকিশোর মৃদু হাসিতেন।

অতঃপর তিনি আরও দুইমাস কলিকাতায় থাকেন। যাবতীয় জিনিষ পত্র, গৃহ প্রভৃতি বিক্রয় ও দান করিয়া সমস্ত পোষ্য বর্গের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি বৃন্দাবনের আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। সমস্ত দিন একনিষ্ঠ হইয়া তিনি সাধন ভজন করেন। রাধাবিহারীজীর নিয়মমত সেবা, রান্না, বাসন মাজা, শ্রীবিগ্রহের পূজা, শৃঙ্গার বেশ, সমস্তই তিনি নিজের হাতে করিতেন। আশ্রমে বসিয়া এই প্রকার তপস্যার কালে তারাকিশোর তাঁহার অতীত জীবন ভুলিয়া যান। অন্তর্জ্জীবনের এক নূতন উদ্দীপনার ফলে তাঁহার চেহারা ও বদলাইয়া যায়। তাঁহার পরিচিত কোন এক ভদ্রলোক এই নিম্বার্ক আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তারাকিশোর চৌধুরী কোথায়?" তিনি উত্তর দেন, "সে মরিয়া গিয়াছে।" ভদ্রলোক শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে চলিয়া যান।

বাহ্যতঃ দেখা যাইত, তারাকিশোর গুরুধাম বৃন্দাবনে বসিয়া নিতান্ত এক সাধারণ ভক্ত ও আশ্রমিকেরই জীবন যাপন করিতেন। অন্তরে তাঁহার যে জ্ঞানময় রূপটি উদ্ভাসিত তাহা সাধকের সন্ধানী দৃষ্টিছাড়া অন্য কেহ ধরিতে পারিত না।

বৃন্দাবনের ব্রজবিদেহী মোহন্তের পদমর্য্যাদা অসাধারণ। ব্রজধামের বৈষ্ণবমণ্ডলীর তিনি একচ্ছত্র নেতা। তাঁহার নির্দ্দেশাদি সকলকে মানিয়া চলিতে হয়। মঠ, আশ্রম, বিত্ত, বৈভব কিছু থাক্ বা না থাক্, সাম্প্রদায়িক গুরুরূপে তাঁহার পদমর্য্যাদা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে গুরু মহারাজ নরদেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি নিজে আশ্রমের সমস্ত ভার ও দায়িত্ব-গ্রহণ করিলেন। মঠাধীশ হিসাবে পদমর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব-ভার ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রজ পরিক্রমার সময়ে নানাস্থান হইতে আগত বৈষ্ণব, সাধু ও জমায়েতের পরিচালনা, তাঁহাদের দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের মীমাংসা, অনেক কিছু তাঁহাকেই করিতে হইত। কাঠিয়া বাবাজীর তিরোধানের পর মোহান্তপদ লইয়া সমস্যা উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান মোহান্ত বিষ্ণুদাসজী বয়সে নবীন। বড় সাধক ও নহেন। তাই তিনি নেতার গুরুভার বহনে অক্ষম। সকলে তারাকিশোরকে মোহান্ত করিতে চাহেন। কিন্তু তিনি দূরে সরিয়া থাকিতে চাহেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঝুলন পূর্ণিমার পরের দিন বৃন্দাবনের সকল মোহান্তকে কাঠিয়া বাবার নূতন আস্তানা, নিম্বার্ক আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিলেন।

আগের দিনই নিম্বার্ক আশ্রমে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। সারা আশ্রম, মন্দির, প্রাঙ্গন, শুভ্র জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। সাধক তারাকিশোর গভীর ধ্যানে মগ্ন। হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে বিদেহী কাঠিয়াবাবার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিটি উদ্ভাসিত হইল। সস্নেহ বচনে তিনি কহিলেন, "তোমার সকল কর্ম্মের ভার আমার

উপর। তুমি নিজে কিছু করিতেছ, এ কথা ভেবোনা।" কিছুক্ষণ পরে বাবাজীর মূর্ত্তি ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়া গেল। পরদিন তিনি মোহান্তদের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত তাঁহার মূর্ত্তিটা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে মোহান্তপদে বরণ করিলেন। তাহা তিনি গুরুদেবেরই নির্দ্দেশ বলিয়া মানিয়া নিলেন। তিনি এতদিন কৌপীন ধারণ করেন নাই। বৈষ্ণব প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠান অগোনে সম্পন্ন হইল। মোহান্তের মালা ও নূতন চাদর পরাইয়া তাঁহারা তারাকিশোরকে অভিনন্দন করিলেন। সমস্ত মোহান্তগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে বৈরাগ্য আশ্রম প্রদান করিলেন। তাঁহার নূতন নামকরণ হইল "সন্তদাস"। ১৩২৫ সালের (১৯১৯ ইংরেজী) এই শুভদিনটা তারাকিশোরের জীবনে নূতন অধ্যায়ের সুচনা আনিয়া দিল।

মোহান্তপদ প্রাপ্তির পর সন্তদাসের জীবনে নূতনতর দায়িত্ব আরম্ভ হইল। আশ্রমে আগত সাধু, অতিথিদের সেবা, ব্রজপরিক্রমা ও কুম্ভমেলায় আগত বৈষ্ণবমণ্ডলীর দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল।

১৩২৭ সালে (১৯২১ ইংরেজী) সন্তদাস নাসিক কুম্ভমেলায় যান। সেখানে নিম্বার্ক, শ্রী, বিষ্ণুস্বামী ও মাধ্ব, চারিটা সম্প্রদায়েরই মোহান্তগণ তাঁহাকে চার সম্প্রদায়ের মোহান্তরূপে বরণ করিলেন। এখানকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও কার্য্যাদি তিনি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেন।

হরিদ্বার কুম্ভমেলার তুইমাস পূর্ব্বে বৃন্দাবনে এক অর্দ্ধকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। যমুনার পুণ্য সলিলে সহস্র সহস্র বৈষ্ণব সাধু অবগাহন স্নান করেন। বিস্তৃত তটভূমিতে অপার আনন্দের মেলা বসে। তারপর আরম্ভ হয় পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। সোৎসাহে সকলে সুদৃশ্য হস্তীর উপর চড়াইয়া, ছত্রধরিয়া রাজোচিত সম্মানে মোহান্ত মহারাজকে পরিক্রমায় নিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি বাঁকিয়া বসিলেন। ইষ্টদেব রাধাবিহারীজি ও গুরুদেব উভয়েই

এই পবিত্র ভূমিতে সাক্ষাৎ ভাবে বিরাজমান। তাই তিনি কোন মতেই হস্তীতে আরোহণ করিবেন না। অগত্যা পদব্রজেই পরিক্রমা আরম্ভ হইল।

হরিদ্বার কুম্ভমেলায় এই সৌম্যদর্শন তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্তদাস মহারাজকে ভোলাগিরি মহারাজ স্বয়ং মাল্য চন্দনে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া সাধুসম্মেলনের সভাপতি করিলেন। তিনি সভাপতির ভাষণে নানাকথার মধ্যে বলিলেন, "ভগবৎ উপাসনাই যেন মুখ্যকর্ম্মরূপে সকলের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে। মানুষের অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি কর্ম্মের সিদ্ধি ভগবৎজীবনের উপর নির্ভরশীল।"

কুম্ভমেলা হইতে ফিরিবার সময় সন্তদাস বাবাজী ভোলাগিরি মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে যান। খবর পাইবামাত্রই ভোলাগিরি মহারাজ গুম্ফা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্তদাস বাবাজীকে অভ্যর্থনা জানান এবং উভয়েই গুম্ফা মধ্যে প্রবেশ করেন। উভয়ে যখন সেখান হইতে বাহির হইলেন, উভয়ের আনন আনন্দে পূর্ণ। প্রস্থানের সময় নূতন তসরের কাপড় ও চাদর উপঢোকন দিয়া ভোলাগিরি মহারাজ স্বয়ং দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

সন্তদাস বাবাজীকে সকলেই গুরুস্থানীয় বলিয়া মান্য করিত। কুম্ভমেলায় তিনি মোহান্ত প্রধানের মর্য্যাদা পাইতেন। তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। এক স্খলিতচরিত্র ব্যক্তি তাঁহার কাছে গিয়া তাহার জীবনের সমস্ত পাপের কথা অকপটে খুলিয়া বলে। তিনি তাহা শুনিয়া বলেন, "ভয় কি? নাম কর। নাম কর। নামের শক্তি অমোঘ। সব ঠিক হয়ে যাবে।" পরে সেই ব্যক্তি তাঁহার পরমভক্ত ও শিষ্যরূপে গণ্য হন।

সন্তদাসজী মহারাজের ক্ষমতা অসীম ছিল। একদা ভুবনেশ্বরে তাঁহার শিষ্য নির্ম্মলবাবু ও কয়েকজন গুরুভ্রাতা কয়েকটি সাধু দেখিয়া তাঁহাদের হাত উচু করিয়া নমস্কার করিলেন। তারপর

গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সন্তদাস বাবাজীর সহিত দেখা হইবামাত্রই তিনি বলিলেন, "সাধু সন্ন্যাসীদের সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করিতে হয়।" মহারাজের দিব্যদৃষ্টি সর্ব্বত্র আছে বুঝিতে পারিয়া শিষ্যগণ লজ্জিত হইল।

উজ্জয়িনীর কুম্ভে সেবার সন্তদাসজী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বাবাজী মহারাজের ছত্রের নীচে তাঁহার আসনটী রাখিয়াছে। অনন্তদাসজী তাহার নিকট বসিয়া আছেন। মেলাক্ষেত্রে সমাগত ভক্ত ও সুরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী শূন্য আসন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন। তাঁহার এই আকুলতা সম্পূর্ণ আন্তরিক। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখিতে পান, সন্তদাসজী ঐ শূন্য আসনে সশরীরে উপবেশন করিয়া আছেন।

সন্তদাসজীর শিষ্য ধীরেন্দ্র দাসগুপ্তের কন্যা অত্যন্ত পীড়িতা। তাঁহার স্ত্রী কাতরে গুরুজীকে ডাকিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল সন্তদাসজী সম্মুখে উপস্থিত। কন্যার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। কিছুদিন পরে কন্যা সুস্থা হইল।

ইতিমধ্যে তিনি একবার গৌহাটী ও কলিকাতা আসেন। কলিকাতা আসিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে সহসা দেহরক্ষা করিতে হইবে। তাই তিনি বৃন্দাবনে গুরুর আশ্রমে যাইতে ব্যস্ত হইলেন।

১৩৪২ সালের (১৯৩৬ ইং) ২২শে কার্ত্তিক তারিখে শিষ্য-সেবকগণসহ সন্তদাসবাবাজী শ্রীবৃন্দাবনধামে রওনা হইলেন। মহাপ্রয়াণের লগ্নটী আসিয়া গেল। মরজীবনের লীলা শেষ করিয়া মহাপুরুষ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। দেহটা শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিবার পর আশ্রম লোকে লোকারণ্য হইল। মহাসমারোহে যমুনার যুগলঘাটে দেহের অগ্নিসংস্কার করতঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মথুরায় বনওয়ারীলাল ভাটনগর সন্তদাসজীর শিষ্য। বাবাজী

মহারাজের শেষকৃত্য সমাপন হওয়ার পর তিনি খবর পান ও অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়েন। বাবাজী মহারাজের শেষ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে হইল না বলিয়া মথুরায় নিজগৃহে বসিয়া কাঁদিতে থাকেন। সন্ধ্যার পর তিনি এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পান। তিনি দেখিলেন বাবাজী মহারাজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তিনি সস্নেহে কহিলেন—"লৌকিক দৃষ্টিতে আমার এই দেহ পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তোমরা সর্ব্বদাই আমার সম্মুখেই আছ জানিবে। বৃন্দাবনের আশ্রমে মাঝে মাঝে যাইও। আমায় দর্শন করিয়া আসিও"।

একা বনওয়ারীলাল নহে, আরও বহুতর শিষ্য সন্তদাসজীর তিরোভাবের পর তাঁহার এই অলৌকিক দর্শন পাইয়াছেন।

সন্তদাসজী মহারাজের বহুশিষ্য ভারত ও বাঙ্গলার নানাস্থানে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

২৫। ভগিনী নিবেদিতা।

(১৮৬৭-১৯১১)

উত্তর আয়ার্লণ্ডের ডানগ্যানন সহরের স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল ও মেরী ইসাবেল হ্যামিল্টনের বহু আকাঙ্ক্ষিত ১মা কন্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ১৮৬৭ সালে ২৮শে অক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নীলনয়না ও স্বর্ণকেশী ছিলেন, এবং তাঁহার গায়ের রঙ ছিল কাঁচা সোনার মত। ঠাকুরমার আদর যত্নে তিনি বড় হ'তে লাগলেন এবং চার বৎসর বয়সে ঠাকুরমার মুখে শুনে বাইবেলের অনেকাংশ তিনি মুখস্থ বলিতে পারিতেন। অবশেষে একদিন বাবা স্যামুয়েল মার্গারেটকে তার মা'র কাছে নিয়ে গেলেন। মার্গারেট এলেন ডেভনের গ্রেট টরেন্টনে। এই জায়গার পল্লীছায়ায় স্নিগ্ধ পরিবেশ দেখিয়া মার্গারেট মুগ্ধ হন। মার্গারেট তাহার প্রায় দশ বৎসর বয়স হইতে গীর্জ্জায় বসে ধর্ম্মযাজক বাবার দেওয়া ভাষণে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংল্যাণ্ডে বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন তাঁহার বাণী ও ব্যাখ্যা শুনিয়া ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের দিকে মার্গারেটের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ক্রমশঃ বেদান্ত ধর্ম্মের প্রাণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তিনি স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্টা হইলেন এবং তাঁহার সংস্রবে আসিয়া ভারতে চলিয়া আসিলেন ও তাঁহার শিষ্যা হইলেন। তাঁহার নতুন নামকরণ হইল সিষ্টার নিবেদিতা।

সেই হইতে ভারতীয় ধর্ম্মকে তিনি আপনার ধর্ম্ম বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন ও ভারতবাসীর হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি কলিকাতার বোসপাড়ায় যে বাড়ীতে বাস করিতেন সেখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প ছিল ভারতীয় রমণীগণের সর্ব্ববিধ শিক্ষাবিধান ও

আত্মিক উন্নতি সাধন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষার প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিৎ সে সম্বন্ধে তিনি চিন্তা ও স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনা করিতেন। তাঁহার মতে ত্যাগ ও প্রেমই ভারতবর্ষের শিক্ষার বৃত্তি। জাতীয়তার উদ্বোধনই সেই শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল। ভারতের ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পের উপর নিবেদিতার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ভারত শিল্পের প্রাণ যে আধ্যাত্মিকতা তাহা তিনি বিশ্বাস ও অনুভব করিতেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে বৈদেশিক চিত্রকরের অনুকরণে অঙ্কিত ছবি অপেক্ষা ভারতের মেয়েদের হাতের অঙ্কিত আল্পনা তাঁহার অধিক আদরের সামগ্রী ছিল। একটি বালিকার অঙ্কিত শতদল পদ্মের ছবি তিনি আপনার ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলেন। বিখ্যাত শিল্প সমালোচক ডাক্তার কুমারস্বামী একদিন তাহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ভগিনী নিবেদিতা ইহাতে বেশ আনন্দ পান।

সপ্তাহের মধ্যে একদিন অথবা দুইদিন ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ দিতেন ও তন্ময় হইয়া যাইতেন। রাজপুত রমণী পদ্মিনীর উপাখ্যান বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। ভারতবর্ষের কথা উঠিলে উনি ভাবে বিভোর হতেন।

ভারতবর্ষ তাঁহার ধ্যান ও তপস্যা ছিল। মেয়েদের বলিতেন "তোমরা সবাই জপ কর, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ।"

সত্য সত্যই নিবেদিতা ভারতকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেন। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতায় তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সুদূর বদরিকা আশ্রম পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সকল তীর্থে ভগিনী নিবেদিতা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। একজন ইয়ুরোপীয় রমণী কিরূপে গৃহ, সমাজ, আত্মীয়-স্বজন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভারতের ধর্ম্মকে

স্বধর্ম্ম বলিয়া এবং ভারতবাসীকে স্বজন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন তাহার গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রায়ই যাইতেন। যখনই যাইতেন দীনহীনভাবে প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পুরোহিতদের অন্যায় বাধা নিষেধের দরুণ তিনি দেবী দর্শনের অধিকারে বঞ্চিতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় যথার্থ অধিকারী তখন বোধ হয় আর কেহ ছিল না। তিনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের একান্ত ভক্ত ছিলেন। নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে গিয়া লিখিতেন "Nivedita of Ramkrishna—Vivekananda."

সিষ্টার নিবেদিতা ইংরাজীতে ধর্ম্ম ও শিক্ষাবিষয়ক বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "The master as I saw him", "Hints on Education", "Kali the mother", "The Cradle Tales of Hinduism", "An Indian study of love and Death", প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শেষের দিকে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ও পীড়িতা হইয়া পড়েন। নিবেদিতার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছে না দেখিয়া জগদীশ বসু ও লেডী অবলা বসু তাঁহাকে দার্জ্জিলিং লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু নিবেদিতা দার্জ্জিলিং আসিয়া জ্বর ও দুরারোগ্য আমাশায় ভুগিতে লাগিলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার তখন দার্জ্জিলিংএ ছিলেন, এবং সাধ্যাতীত চেষ্টা করিলেন। লেডী অবলা বসু দিবারাত্রি ভগিনী নিবেদিতার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া অক্লান্ত ভাবে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উপকার দৃষ্ট হইল না। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, তবুও মুখে কোথাও তাহার প্রকাশ নাই। চোখ বুজিয়া নীরব থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার শেষ সময় সমাগত। খবর পাইয়া বেলুর মঠ হইতে গনেন মহারাজ আসিলেন। তিনি প্রসাদ স্বরূপ

কিছু আম সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শেষবারের মতো ভগিনী নিবেদিতা সকলের সাথে মিলিয়া এই আম-প্রসাদ খাইলেন। তারপর জীবনের শেষ প্রার্থনা তিনি নিজেই উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, :—

"অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময়, আবিরাধীর্ম্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

"অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতি স্বরূপে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। হে রুদ্র, যাহার মুখ সদা প্রসন্ন তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা পোষন কর।"

অতি মৃদুস্বরে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মুখে শোনা গেল—"The boat is sinking down, but I could lift the sun."

"আমার দেহতরী ডুবিতেছে, কিন্তু আমি সূর্য্যকেও তুলিয়া ধরিতে পারি।" (ফরাসী জীবন চরিত)

১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে অতি ভোরে যখন হিমালয়ের শুভ্র তুষারশৃঙ্গে সবেমাত্র সূর্য্যের কিরণের স্পর্শ লাগিয়াছে সেই অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ শুভক্ষণটিতে নিবেদিতার নশ্বর দেহ হইতে অবিনশ্বর আত্মা অনন্ত অসীমে বিলীন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দার্জিলিংএ এই অশুভ খবর ছড়াইয়া পড়িল। কাতারে কাতারে শেষবারের মতো ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিতে লোক আসিতে লাগিল।

তাঁহার শব হলুদ ফুলে আবৃত করিয়া গনেন মহারাজ ভগিনী নিবেদিতার পায়ের ছাপ তুলিয়া লইলেন ও মুখাগ্নি করিলেন। শ্মশানে বেজায় ভীড়। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সবারই

আননে বিষণ্ণতার ছায়া। কি যেন হারাইয়া গিয়াছে তাহারই যেন অব্যক্ত বেদনা।

বেলুরমঠ, বাগবাজারের বশি সেনের মন্দিরে, আচার্য জগদীশ বসুর বিজ্ঞান মন্দিরে এবং আয়ার্লণ্ডে পারিবারিক সমাধি স্থানে তাঁহার চিতাভস্ম পাঠান হইল।

বিবেকানন্দের মানসকন্যা—ভগিনী নিবেদিতা; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা, বাঙ্গলা তথা ভারতের বিপ্লবী ভাইদের বিপ্লবী নিবেদিতা মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করিলেন।

ধর্ম্মের জন্য ইনি আজন্ম তপস্যা করিয়াছেন, সাহিত্য সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহার এই জীবনব্যাপী তপস্যাকে সতীর তপস্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

২৬। চৈতন্যদাস বাবাজী।

(১৮৬৮ খৃঃ)

ময়মনসিংহ জেলার ভাদরা গ্রামের ঘোষ-রায় বংশে শ্রীজগদ্বন্ধুর জন্ম। এই পরিবার বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা ও শুদ্ধা ভক্তির জন্য সর্ব্বত্র খ্যাত ছিল। তাঁহাদের স্থাপিত গোবিন্দ-রায় বিগ্রহের মন্দির বহু ভক্তজনের আশ্রয়স্থল ছিল। জগদ্বন্ধুর পিতামহ গোবিন্দনাথ চিরকাল এই বংশের দেবার্চ্চনা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

সাত বৎসর বয়সে জগদ্বন্ধুর মারাত্মক কলেরা হয়। ধনীবংশের একমাত্র পুত্র। রোগের আক্রমণে প্রাণও সংশয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য কোন চিকিৎসককে ডাকিলেন না। একান্ত-ভাবে শ্রীবিগ্রহের শরণ লইলেন। বালককে শুধু চরণামৃত পান করাইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। ভগবানের অপার কৃপায় জগদ্বন্ধুর রোগ এ যাত্রায় সারিয়া গেল।

সেদিন হইতে বালকের মনে অপূর্ব্ব ভক্তি ও বিশ্বাস জাগিয়া উঠে। ৺ঠাকুরের প্রসাদের উপর তাহার প্রবল আস্থা জন্মে। ৺ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া কোন জিনিষ মুখে দিত না। এমন কি জলখাবারের সামান্য পয়সা বাঁচাইয়া হরির লুঠ দিত। জগদ্বন্ধুর পিতৃব্য তাঁহার লেখাপড়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। জগদ্বন্ধুকে এক মুন্সীর অধীনে রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মেধাবী বালক অল্প সময় মধ্যে বাংলা ও ফার্সীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

ঘোষ-রায়দের গৃহে প্রায়ই বৈষ্ণবসাধু ও আচার্য্যদের সমাগম হয়। জগদ্বন্ধু তাঁহাদের আলাপ আলোচনা শুনিয়া পাঠ, কথকতা ও কীর্ত্তনের ভাবাবেশে মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে। তাহার সংসার-বৈরাগ্য জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৌর ভজনের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। রোজ একবার চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ না করিয়া এই শুদ্ধাচারী তরুণ বৈষ্ণব জল পর্য্যন্ত পান করিত না। এইসব দেখিয়া

তাহার পিতৃব্য চিন্তিত হইলেন এবং তাহাকে সংসারী করিবার জন্য তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

এ সংবাদ শুনিয়া জগদ্বন্ধুর মন খারাপ হইল। তিনি কিছুতেই সংসার বন্ধনে বাধা পড়িবেন না। তাই এক নিশীথ রাত্রে এই বিষয়-বিরক্ত যুবক গৃহ ত্যাগ করিলেন। পদব্রজে তিনি নবদ্বীপ উপস্থিত হন ও সেখানে বৈষ্ণবীয় দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই বৈরাগ্যময় সাধন জীবনে তাঁহার নাম হয় চৈতন্যদাস। সাধনা, পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবীয় দৈন্য, সকল দিক দিয়া চৈতন্যদাস অচিরে নবদ্বীপে সুপরিচিত হন। সাধন-নিষ্ঠা ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সম্বলের মধ্যে ছিল একখানি ছিন্ন কন্থা, নারিকেলের মালা ও একটী মাটীর করোয়া। বাহিরের ভঙ্গীটি তাঁহার যতই কঠোর হউক না কেন, সাধারণতঃ তিনি ছিলেন রাগানুগ সাধক। নিজকে তিনি সর্ব্বদা গৌরনাগরী হিসাবে বিভাবিত রাখিতেন। প্রেমাবেশ হইলে দেখা যাইত তিনি নাগরীবেশে সজ্জিত হইয়া গৌরবিগ্রহের পাশে ব্যজন-রত থাকিতেন। তিনি সর্ব্বদা "গোরা" নাম জপ করিতেন। তিনি সব সময় নিজকে গৌর-নাগরী মনে করিতেন।

একদা নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িবার সময় বাতাসে তাঁহার কৌপীন ও বহির্বাস উড়াইয়া নেয়। ইহা দেখিয়া জগদীশ মৈত্র নামে এক উগ্রপ্রকৃতির বৈষ্ণববিদ্বেষী ব্রাহ্মণ গঙ্গাঘাটে স্নানরতা মেয়েদের সাম্নে কেন উলঙ্গ হইয়াছেন ইত্যাদি বলিয়া লম্পট প্রভৃতি গালমন্দ দিয়া তাঁহাকে এক চড় মারে। ইহাতে বাবাজী ক্ষুব্ধ না হইয়া ক্ষমা চাহেন। ইহার প্রায় তিন দিন পরে জগদীশ প্রবল জ্বরে সংজ্ঞাহারা হইয়া জীবনান্ত হওয়ার উপক্রম হয়। সকলে আসিয়া বাবাজীকে ধরিয়া পড়ে ও ক্ষমা চাহে। বাবাজী তাহাকে বহুপূর্ব্বে ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি গৌরবিগ্রহের একটী চরণ-তুলসী রোগীকে খাওয়াইতে দিলেন।

ইহাতে জগদীশ মৈত্র নীরোগ হইল এবং পরে বাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক বৈষ্ণব সাধকরূপে পরিণত হন।

কালনার সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর সঙ্গে চৈতন্যদাস বাবাজীর আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। উভয়েই রাগানুগ ভজনে সিদ্ধ। সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী একবার বৃন্দাবন যাইবার প্রাক্কালে চৈতন্যদাস বাবাজীকে সঙ্গে নিতে চাহেন। কিছুতেই প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ ধাম ছাড়িয়া 'গৌর নাগরী' চৈতন্যদাস অন্যত্র যাইতে সম্মত নহেন। ভগবানদাস বাবাজী অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন পর্য্যটনে রাজি করাইলেন। কিন্তু যাওয়ার পূর্ব্বেই সমস্ত ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইল। গৌরবিগ্রহের নিকট বিদায় নিতে আসিয়া মন্দিরের দুয়ারেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। গৌর-মন্দির প্রাঙ্গণে শোকাকুল চৈতন্যদাস বাবাজীকে দেখিয়া লোকের ভীড় জমিয়া যায়। তখন ভগবানদাস বাবাজী বলিলেন "তোমার বৃন্দাবনে কাজ নাই। নবদ্বীপই তোমার শ্রীবৃন্দাবন।" বলাবাহুল্য সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী নবদ্বীপেই রহিয়া গেলেন।

একবার ভক্তপ্রবর মহাত্মা শিশির ঘোষ চৈতন্যদাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। মহাত্মা ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবাজী, কিসে ভক্তি হয়।" উত্তর হইল, "দু'পয়সা খরচ কর, ভক্তি লাভ হবে। দু'পয়সা দিয়া বটতলার ছাপানো নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা পুস্তক পড়ুন। ভক্তিলাভ, প্রার্থনা এবং আর্ত্তির মধ্যেই নিশ্চয় হইবে। গৌরপ্রেমের সাধনায় প্রাণের আর্ত্তি ও প্রার্থনাই ছিল বাবাজীর কাছে সাধনার বড় জিনিষ।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মসমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা ও মুমুক্ষা তাঁহার অন্তরে জাগরূক। তিনি একদিন সিদ্ধ বাবাজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তিনি বাবাজীকে "কি করিয়া ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন" জিজ্ঞাসা করেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া

বাবাজী বলিলেন, "আপনি অদ্বৈতবংশের সন্তান। আপনার তিলক ও কণ্ঠীমালা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি ভক্তির অভাব আছে?" গোস্বামীজী সম্বন্ধে চৈতন্যদাস বাবাজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী উত্তরজীবনে প্রতিফলিত হয়।

ভীম নামে নবদ্বীপে এক দুরাচার পাষণ্ডী বাস করিত। সে একদিন চুপিচুপি গিয়া মন্দিরে শুনিতে পায়, বাবাজী কাহার সঙ্গে প্রেমালাপ করিতেছে। তাহার সন্দেহ হয় যে ভিতরে নিশ্চয় কোন স্ত্রীলোক আছে। সে লাথি মারিয়া দরজা ভাঙ্গে ও মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে। দেখিতে পায় বাবাজী ভাবাবিষ্ট, ধ্যানমগ্ন এবং এক দিব্য জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে এবং চারিদিকে এক অপূর্ব্ব সৌরভ ছড়াইতেছে। সে ইহা দেখিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তৎপর সে বাবাজীর একজন পরমভক্তরূপে পরিগণিত হয়।

সাধনজীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি গৌরধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। ৩৯২ গৌরাব্দের (১৮৬৮ খৃঃ) অগ্রহায়ণ:মাসের পূর্ণিমা। সেইদিন বাবাজী সারাদিনরাত্রি ভজন রসে ডুবিয়া আছেন। হঠাৎ ভাবতন্ময় হইয়া গৌরনাগরী বেশে সজ্জিত হন। তারপর প্রেমরসে উদ্বেলিত হইয়া প্রাণপ্রিয় গৌরবিগ্রহের বামে গিয়া দাঁড়ান। মন প্রাণ নিয়া গাহিলেন—

আমার ভজন হ'ল সারা আমার পূজন হ'ল সারা,
নদের চান্দের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা।

এই গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার দেহে এক দিব্যকান্তি ফুটিয়া উঠে। প্রেমাবিষ্ট নয়ন দুইটি গৌরবিগ্রহের দিকে নিবদ্ধ করিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিত্যলীলার দিব্যপথ এই মহা বৈষ্ণবের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়।

৩৯২ গৌরাব্দের অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় বাবাজীর মহাপ্রয়াণ অগণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অন্তরে চিরস্মৃতি হইয়া এখনও আছে।

২৭। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু।

(১৮৭১ খৃঃ)

প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। গোয়ালন্দের নিকটস্থ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোমরপুর গ্রাম তখন খুব খ্যাত। পদ্মাতীরের এই গ্রামটিতে সুপণ্ডিত ধর্ম্মনিষ্ঠ বাসুদেব চক্রবর্ত্তী বাস করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের কালে শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই বাসুদেবের গৃহে অতিথি হন। কোমর জলে দাঁড়াইয়া মহাপ্রভু এইখানে স্নান করেন। তাই এই স্থানের নাম হয় কোমরপুর।

দীননাথ ন্যায়রত্ন এই বংশেরই এক শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়া অঞ্চলে তিনি অধ্যাপকতা করিতেন। তিনি সাধননিষ্ঠ ও পরম ভাগবতরূপে সেই অঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বামাদেবীও অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। উভয়েই তাঁহাদের কুলবিগ্রহ রাধাগোবিন্দের সেবা-পূজায় পরম আনন্দে থাকিতেন।

এই আদর্শ দম্পতীর গৃহে সীতানবমীর মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁহাদের তৃতীয় সন্তান ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। পরমরূপলাবণ্যময় সর্ব্বলক্ষণযুক্ত শিশুর নামকরণ হইল "জগত"। ইনিই উত্তরকালের বহুভক্তজনের প্রাণবন্ধু জগদ্বন্ধু। জন্মের পর দুইজন সাধু শিশুকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, শিশু যোগীবর হইবে। তাহাই হইল।

এই আনন্দময় পরিবেশে দুর্দ্দৈব দেখা দিল। এই শিশুকে অসহায় করিয়া মাতা বামাদেবী শিশুর মাত্র চৌদ্দমাস বয়সে স্বর্গারোহণ করিলেন। মাতৃহীন শিশুকে নিয়া দীননাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় দারুণ চিন্তায় পড়িলেন। কি করিয়া লালনপালন করিবেন ভাবিয়া পান না। নিরুপায় হইয়া তিনি জগতকে লইয়া স্বগ্রামে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা দিগম্বরী দেবীর কাছে আসিলেন।

বাবাজী বলিলেন, "আপনি অদ্বৈতবংশের সন্তান। আপনার তিলক ও কণ্ঠীমালা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি ভক্তির অভাব আছে?" গোস্বামীজী সম্বন্ধে চৈতন্যদাস বাবাজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী উত্তরজীবনে প্রতিফলিত হয়।

ভীম নামে নবদ্বীপে এক দুরাচার পাষণ্ডী বাস করিত। সে একদিন চুপিচুপি গিয়া মন্দিরে শুনিতে পায়, বাবাজী কাহার সঙ্গে প্রেমালাপ করিতেছে। তাহার সন্দেহ হয় যে ভিতরে নিশ্চয় কোন স্ত্রীলোক আছে। সে লাথি মারিয়া দরজা ভাঙ্গে ও মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে। দেখিতে পায় বাবাজী ভাবাবিষ্ট, ধ্যানমগ্ন এবং এক দিব্য জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে এবং চারিদিকে এক অপূর্ব্ব সৌরভ ছড়াইতেছে। সে ইহা দেখিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তৎপর সে বাবাজীর একজন পরমভক্তরূপে পরিগণিত হয়।

সাধনজীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি গৌরধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। ৩৯২ গৌরাব্দের (১৮৬৮ খৃঃ) অগ্রহায়ণ:মাসের পূর্ণিমা। সেইদিন বাবাজী সারাদিনরাত্রি ভজন রসে ডুবিয়া আছেন। হঠাৎ ভাবতন্ময় হইয়া গৌরনাগরী বেশে সজ্জিত হন। তারপর প্রেমরসে উদ্বেলিত হইয়া প্রাণপ্রিয় গৌরবিগ্রহের বামে গিয়া দাঁড়ান। মন প্রাণ দিয়া গাহিলেন—

আমার ভজন হ'ল সারা আমার পূজন হ'ল সারা,
নদের চান্দের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা।

এই গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার দেহে এক দিব্যকান্তি ফুটিয়া উঠে। প্রেমাবিষ্ট নয়ন দুইটি গৌরবিগ্রহের দিকে নিবদ্ধ করিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিত্যলীলার দিব্যপথ এই মহা বৈষ্ণবের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়।

৩৯২ গৌরাব্দের অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় বাবাজীর মহাপ্রয়াণ অগণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অন্তরে চিরস্মৃতি হইয়া এখনও আছে।

২৭। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু।

(১৮৭১ খৃঃ)

প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। গোয়ালন্দের নিকটস্থ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোমরপুর গ্রাম তখন খুব খ্যাত। পদ্মাতীরের এই গ্রামটিতে সুপণ্ডিত ধর্ম্মনিষ্ঠ বাসুদেব চক্রবর্ত্তী বাস করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের কালে শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই বাসুদেবের গৃহে অতিথি হন। কোমর জলে দাঁড়াইয়া মহাপ্রভু এইখানে স্নান করেন। তাই এই স্থানের নাম হয় কোমরপুর।

দীননাথ ন্যায়রত্ন এই বংশেরই এক শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়া অঞ্চলে তিনি অধ্যাপকতা করিতেন। তিনি সাধননিষ্ঠ ও পরম ভাগবতরূপে সেই অঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বামাদেবীও অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। উভয়েই তাঁহাদের কুলবিগ্রহ রাধাগোবিন্দের সেবা-পূজায় পরম আনন্দে থাকিতেন।

এই আদর্শ দম্পতীর গৃহে সীতানবমীর মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁহাদের তৃতীয় সন্তান ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। পরমরূপলাবণ্যময় সর্ব্বলক্ষণযুক্ত শিশুর নামকরণ হইল "জগত"। ইনিই উত্তরকালের বহুভক্তজনের প্রাণবন্ধু জগদ্বন্ধু। জন্মের পর দুইজন সাধু শিশুকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, শিশু যোগীবর হইবে। তাহাই হইল।

এই আনন্দময় পরিবেশে দুর্দ্দৈব দেখা দিল। এই শিশুকে অসহায় করিয়া মাতা বামাদেবী শিশুর মাত্র চৌদ্দমাস বয়সে স্বর্গারোহণ করিলেন। মাতৃহীন শিশুকে নিয়া দীননাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় দারুণ চিন্তায় পড়িলেন। কি করিয়া লালনপালন করিবেন ভাবিয়া পান না। নিরুপায় হইয়া তিনি জগতকে লইয়া স্বগ্রামে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা দিগম্বরী দেবীর কাছে আসিলেন।

শিশুকে দেখিয়াই দিগম্বরী দেবী শিশুর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। কোমরপুর তখন পদ্মাগর্ভে। তাই তাঁহারা গোবিন্দপুরে থাকিতেন। পদ্মাবিধৌত গোবিন্দপুরের শ্যামল মাঠে জগত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শুধু দিদি দিগম্বরীর নহে, জগত হইল গ্রামের সকলেরই নয়নের মণি। বিপদের উপর বিপদ। জগতের বয়স যখন মাত্র চারি বৎসর তাহার পিতা দীননাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় হঠাৎ মারা গেলেন। জগতের সমস্ত বন্ধন মোচন হইল। গোবিন্দপুরের বাস্তুভিটাও পদ্মা গ্রাস করিল। অতঃপর সকলেই ফরিদপুরের শহরতলী ব্রাহ্মণকান্দায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জগত যখন ফরিদপুর জেলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে তখন তাহার বয়স মাত্র তের বৎসর। এইসময়ে তাহার উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর হইতেই বালকের অন্তর্লোকে বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে। রাত্রির অন্ধকারে বনে জঙ্গলে সে কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায় কেহ বলিতে পারে না। মাঝে মাঝে মৌনাবস্থা বা ধ্যানস্থ হইয়া ঘরে বসিয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গ সে বস্ত্রাবৃত করিয়া থাকে। এ যেন তাহার জন্মগত অভ্যাস। গৌরকান্তি সুন্দর দীর্ঘায়ত দেহখানি সহজেই সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরম পবিত্রতা ও ঈশ্বরভক্তির দিকে তাহার অত্যন্ত আগ্রহ। চরিত্রবলে সে সঙ্গীদের সকলকে আকর্ষণ করে ও তাহার হরিনামের অনুরাগ সকলকে উদ্বুদ্ধ করে।

অন্তরের প্রেম-উন্মাদনা ও তন্ময় ভাবের জন্য জগৎকে বেশ কষ্ট পাইতে হইয়াছে। অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা দিবার কালে সে হঠাৎ ভাবাবেশে উন্মনা হইয়া সামনের দিকে চাহিয়া থাকে। প্রধান শিক্ষক মনে করিলেন, সে অপর পরীক্ষার্থীর উত্তর জানিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রধান শিক্ষক তাহার পরীক্ষার খাতা লইয়া ফেলিলেন। তেজস্বী বালক গ্রীবা উন্নত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া সে দৃঢ় পদক্ষেপে স্কুল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পরে শিক্ষকেরা খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, সে কোন

অসাধুতা করে নাই। তখন তাহাকে সকলে ফিরাইয়া আনিতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত বালক আর ফিরিয়া আসিল না। ফরিদপুরের জেলা স্কুলের সম্পর্ক চিরতরে শেষ হইল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজের এই শোচনীয় ভুলের কথা শেষ পর্য্যন্ত ক্ষোভের সহিত মনে করিতেন।

জগৎ একবার তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা তারিণীচরণের নিকট রাঁচিতে গিয়াছে। এখানে এক প্রতিবেশীর একটী দুর্দ্দান্ত ঘোড়াকে কেহ বাগ মানাইতে পারে না। যে চড়ে তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দেয়। জগৎ সে ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে একদিনেই বশে আনিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, আরোহীদের নিয়া ঘোড়াটী আর অশান্ত আচরণ করে না। জগতের স্পর্শে একেবারে নিরীহ হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর সে পাবনায় পড়িতে আসে। এই অদ্ভুত বালকের ব্যক্তিত্ব ও সহজাত শক্তি দেখিয়া ভক্তিমান সহপাঠীরা ধীরে ধীরে তাহার ব্রহ্মচর্য্য সাধন ও নাম কীর্ত্তনের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। ইহাতে অনেক অভিভাবক ছেলে নষ্ট হইবে বলিয়া অনুযোগ করে। কিন্তু জগতের প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে এই বিরুদ্ধ ধারণা ক্রমশঃ তিরোহিত হয়।

জগৎ হরিনাম শুনিলে ভাবোন্মাদ হইয়া পড়ে। রূপবান এই প্রেমোন্মত্ত কিশোর সাধকের ভিতরে কোন বৈষ্ণব মহাপুরুষ রহিয়াছে বলিয়া সকলেই ধারণা করে। জগতের কীর্ত্তন শুনিতে যাহারা আসে, শুদ্ধাচারী এই কিশোরের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি তাহারা অকপটে অর্পণ করে।

পাবনার উপকণ্ঠে প্রাচীন বটের ছায়ায় এক পুরাতন গৃহের সর্পসঙ্কুল দুর্গন্ধময় এক অন্ধকার কক্ষে হারাণক্ষেপাকে জড়াইয়া ধরিয়া সে পড়িয়া থাকিত। এই ক্ষেপাকে জগৎ বুড়ো-শিব বলিয়া বলিত। ক্ষ্যাপাকে সকলেই বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিত। রোগ, শোক, মামলা মোকর্দ্দমা হইতে শুরু করিয়া সকল বিপদেই

আর্ত্ত ভক্তের দল তাঁহার শরণ লইত। এই ক্ষ্যাপাই একদিন জগতের দিদি গোলকমণির কাছে বলিয়াছিলেন "ভাখ্ দিদি! জগৎ মানুষ নহে, আমি ও মানুষ নহি। তবে জগা হ'ল রাজা আর আমরা সব প্রজা।" কিশোর জগতের আবরণ এইবার উন্মোচিত হইল। এই সময়েই তড়াসের ভূম্যধিকারী বনমালী রায়, নিত্যানন্দ কুলোদ্ভব শ্যামলাল গোস্বামী, অদ্বৈতবংশের রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এই শক্তিধর পুরুষকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকেন। এইবার লোকগুরু জগদ্বন্ধুর প্রকাশের সময় উপস্থিত হইল।

ঐশিক কোন প্রসঙ্গ, ভক্তিমূলক কোন সঙ্গীত শুনিলেই জগদ্বন্ধুর প্রেমবিকাশ ও ভাবাবেশ হইত। তাই তাঁহার সঙ্গীদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। সেবার সহরে ধ্রুবচরিত্র যাত্রাভিনয় হইতেছে। আসরের এক প্রান্তে কিশোর জগৎ তাঁহার কিশোর সঙ্গীগণসহ বসিয়া আছেন। "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি" বলিয়া ধ্রুব আকুল কণ্ঠে গান ধরিল। শোনামাত্রই ভক্ত জগদ্বন্ধুর অন্তরে ভাবাবেশ হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীর তখন তরুণ বয়স। সবেমাত্র ডাক্তারী পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনিও সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন "ইহা হিষ্টিরিয়া বা কৃত্রিম ভাবাবেগ।" ডাক্তার কালী সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাইবার পর বুঝিতে পারিলেন যে ইহা ভাবোন্মাদনা। এই ভগবৎপ্রেমিক সাধুকে এইভাবে টানিয়া আনিয়া ভাল কাজ করেন নাই। পুনঃ জগদ্বন্ধুকে গানের আসরে ফিরাইয়া আনিল। কিন্তু ডাঃ কালীর মনোলোকে সেদিন বোধ হইল মানবীয় জ্ঞানের উপরেও এক পরম চৈতন্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

আর একদিনের কথা। কীর্ত্তনের পর জগদ্বন্ধুর প্রেমাবেশ হইয়াছে। তিনি জ্ঞানহারা। জনৈক দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি পরীক্ষা করার

জন্য তাঁহার পায়ের অঙ্গুলির উপর এক জ্বলন্ত টীকা রাখিয়া দেয়। আঙ্গুলটী পুড়িয়া যাইতেছে। জগদ্বন্ধুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। হঠাৎ তাঁহার সঙ্গীরা এই জ্বলন্ত টিকা দেখিতে পাইয়া তখনি তাহা দূরে ফেলিয়া দিলেন। অগ্নিদগ্ধ এই ক্ষত শুকাইতে বহুদিন লাগে। উত্তরকালে এই দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি তাঁহার স্নেহাশ্রয় পাইয়া নিজের জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করে।

ভক্তপ্রবর বনমালী রায়ের আগ্রহে জগদ্বন্ধু তাড়াস রাজবাড়ীতে যান। সেখানে কীর্ত্তন, উর্দ্দণ্ড নর্ত্তনে চারিদিক আনন্দ চঞ্চল। বনমালীবাবু শুনিলেন যে একদল লোক তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে উচিত শাস্তি দিবার জন্য নাম জানিতে চাহিলেন। কিন্তু জগদ্বন্ধু কিছুতেই নাম জানাইলেন না। শুধু বলিলেন— "ওগো! আমি যে দণ্ড দিতে আসিনি। আমি এসেছি উদ্ধারণ দিতে।"

তাড়াসের রাজবাড়ীতে শ্রীরাধাবিনোদ স্থাপিত আছে। কবে, কোন সময়ে নাকি ঠাকুর রাধাবিনোদ জমিদার বংশের এক ভক্তিমতী নারীকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করেন। তিনি তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াও নেন। সেই হইতে এই বিগ্রহকে জামাই বিনোদ বলিয়া ভক্তগণ অভিহিত করেন। বিগ্রহ জামাই বিনোদের আদর আপ্যায়ণও জমিদার বাড়ীর জামাইএর মত। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত বনমালী এই সমস্ত কথা সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ করেন না। তাই জগদ্বন্ধু বনমালীকে তাঁহার ভ্রম শোধরাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মন্দিরে রাধাবিনোদের স্নান, অর্চ্চনা, ভোগ-প্রসাদ নিবেদন হইয়া গেল। এবার তামাকু সেবনের সময়। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী জামাইআদরে রাধাবিনোদ বিগ্রহকে তামাকু নিবেদন করিয়াছে। জগদ্বন্ধু বনমালী রায়কে বলিলেন—"চলুন! এবার জামাই বিনোদের গড়গড়া সেবন দেখিয়া আসি।" বনমালী রায় কোনদিনই এই তামাকু সেবন প্রথাটির উপর তেমন

গুরুত্ব দেন নাই। এবার প্রভু জগদ্বন্ধুর কথায় সকলকে নিয়া তিনি মন্দিরে গেলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া সকলেই দেখিলেন, ঠাকুরের সমীপে নিবেদিত গড়গড়া হইতে অনবরতঃ ধূম উঠিতেছে এবং "গড়গড়" শব্দ শোনা যাইতেছে। অলক্ষ্যে বসিয়া জামাই বিনোদ বিগ্রহ গড়গড়া সেবন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া বনমালীবাবুর গণ্ড বাহিয়া পুলকাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে থাকে। এই ঘটনার পর বনমালী বাবুর ধারণা বদলাইয়া গেল।

নানাতীর্থ ভ্রমণের পর প্রভু জগদ্বন্ধু দুইবৎসর পরে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিয়া তাঁহার প্রাণের আর্ত্তি আরও বাড়িয়া গেল। কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি রাধা। রাধারাণীর দর্শন ছাড়া তাঁহার জীবন বৃথা। কখনও অস্ফুটস্বরে গাহিতেছেন "এই ভবকুহক মাঝে রাধারাণী তুমি উদ্ধারণ।" কখনও ভূতলে আছড়াইয়া পড়িয়া বৃকভানুনন্দিনীর করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। রাধাকুণ্ডের তীরে তীরে তাঁহার আকুতি, কান্না ও পরিক্রমা চলিয়াছে। এমতাবস্থায় অপ্রাকৃত আনন্দ, পরমপ্রার্থিত কৃপাসম্পদ জগদ্বন্ধু পাইলেন। আরাধ্যা মহাভাবময়ী রাধারাণীর দর্শন মিলিল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সম্বিৎ পাইবার পর প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি নিজহস্তে লিখিলেন—

"জয় রাধে ধর্ম্ম জয় রাধে জয়,
জয় রাধে কর্ম্ম জয় রাধে রয়।"

ইহার পর হইতে জগদ্বন্ধুর জীবনে দিব্য আনন্দ আসিয়াছে। তিনি সর্ব্বদা অন্তরলোকের আনন্দে মগ্ন। এইসময়ে একদিন কৌতূহলী হইয়া অদ্বৈতভক্ত রঘুনন্দন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, আপনার গুরু কে? কে আপনাকে এই অপরূপ প্রেম সাধনায় দীক্ষা দিলেন?" প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলিলেন "আমার গুরু বৃকভানুনন্দিনী। তিনি আমাকে দীক্ষা-মন্ত্র দিয়াছেন।"

এই মন্ত্র পাওয়ার পর জগদ্বন্ধু "রাধা" নাম নিতেন না।

রাধাকুণ্ড না বলিয়া "অমুক কুণ্ড", "রাধা" না বলিয়া "তোদের কিশোরী" "রাধিকা" না বলিয়া "সারিকা" ইত্যাদি শব্দ কথার সময় ব্যবহার করিতেন। রাধানাম শুনিলেই তাঁহার ভাবাবেশ হইত।

বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারাণীর দর্শনলাভের পর প্রভু জগদ্বন্ধু স্বগ্রাম ব্রাহ্মণকাঁদায় আসেন। তরুণ সাধককে কেন্দ্র করিয়া অল্পকাল মধ্যে কীর্ত্তনানন্দ উৎসারিত হইল। তাঁহার বাল্য-সঙ্গী, গ্রামের জনসাধারণ, দূরদূরান্তরের লোকজন জড় হইয়া দিনের পর দিন কীর্ত্তন চালাইতেছে। তাহার বিরাম নাই। কে ইহার ব্যবস্থা করিতেছে, কে এই অসংখ্য জনতার আহার্য্য খরচ বহন করিতেছে তাহা বুঝা দুষ্কর। কীর্ত্তনস্থলীতে যাহারা আসে জগদ্বন্ধুর শ্রীরূপ দেখিয়া তাহারা বিহ্বল হয় ও ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়ে।

ফরিদপুর সহরের একপ্রান্তে বাগ্দীদের বাস। ইহারা রাস্তা, ঘাট ও ভিৎ বাঁধিয়া ও শূকর মারিয়া জীবন যাপন করে। জগদ্বন্ধু শুনিলেন ইহাদের খৃষ্টান করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। তখনই তিনি সেখানে গিয়া তাহাদের দলপতি রজনী সর্দ্দারকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং সগোষ্ঠী রাধাগোবিন্দের নামে মোহান্ত সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যা দিলেন। প্রভুর কৃপাবলে অল্পদিন মধ্যেই এই বুনো বাগ্দীরা গোপীচন্দন তিলক কণ্ঠী ভূষিত ভক্ত বৈষ্ণব হইয়া পড়ে। তিনি অনেক সময় তাঁহার ভক্তদের মনের কথা ও বাদ বিসম্বাদ স্বতঃই বুঝিতে পারিতেন এবং আশু তাহার প্রতিকার করিতেন। যুগল ভজনের প্রথম প্রস্তুতিরূপে প্রভু একদিকে শুদ্ধাচার ও ব্রহ্মচর্য্য, এবং অপরদিকে নামকীর্ত্তন ও নিত্য পরিক্রমাকে আদর্শ করিতে তাঁহার ভক্তগণকে উপদেশ দিতেন। বাল্যাবধি ইহা তাঁহার স্বীয়জীবনেও পরিলক্ষিত হয়। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ও অপাপবিদ্ধ-জীবন ও শুদ্ধচারিতা নিয়া তিনি তাঁহার সাধন জীবনে অগ্রসর হন।

অতুল চম্পটী নামক একজন প্রধান শিক্ষক প্রভু জগদ্বন্ধুর সান্নিধ্যে আসিয়া অপূর্ব্ব দৈন্য ও আর্ত্তি নিয়া প্রভুর চরণাশ্রয়

গ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাস না নিয়া গৈরিক পড়েন। চম্পটীকে গৈরিক বসনে দেখিয়া প্রভু বিরক্ত হন। চম্পটীকে একখানি সাদা ধুতি ও উত্তরীয় প্রদান করিয়া ভক্তিমার্গের প্রাথমিক নির্দ্দেশ দেন। প্রেমিক ভক্ত তাহা শিরোধার্য্য করিয়া নেন। এই ভক্ত চম্পটীকে প্রভু হারাণ ক্ষেপার হাতে দেন। ক্ষেপা একদিন চম্পটীকে বকু চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইতে আদেশ দেন। চম্পটী বুঝিলেন, ইহা তাহার পরীক্ষা। তিনি উচ্ছিষ্ট খাইলেন। তাঁহার অহমিকা টুটিয়া গেল। একবার প্রভু জগদ্বন্ধু বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন। চম্পটী মহাশয় প্রভুর থাকিবার জন্য জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়ীর বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভুকে দেখেন নাই। চম্পটী ও অন্যান্য ভক্তদের মুখে প্রভুর মহিমা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বাগানবাড়ীর বৃহৎ অট্টালিকার এক কোণে প্রভু জগদ্বন্ধুর থাকিবার স্থান করা হইল। কীর্ত্তনপ্রিয় জগদ্বন্ধুর ভক্তদের জন্য খোল করতাল কিনিতে তিনি টাকাও দিলেন। কিন্তু অচিরে এক গোলমাল বাধিল। প্রভু জগদ্বন্ধু জনসমক্ষে প্রায় বাহির হন না। প্রায়শঃ আপাদমস্তক শুভ্র বসনে আবৃত রাখেন ও অসূর্য্যম্পশ্য থাকিতে চাহেন। প্রত্যূষে গঙ্গায় অবগাহন স্নানের পর শয্যায় টাঙ্গানো মশারীর ভিতর ঢুকিয়া পড়েন। আর সারাদিন তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। জমিদারের জনৈক কর্ম্মচারী এইপ্রকার বৈষ্ণবদের বাগানবাড়ীতে থাকা অপছন্দ করেন। তা'ছাড়া প্রভুনামক ব্যক্তিটিকে বড়ই রহস্যময় ঠেকিতেছে। দিবারাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার কারণ কি? একদিন স্নানকালে ইহাদের একজন প্রভুকে দেখিবার চেষ্টা করে। তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মে এই লোকটি আদৌ জগদ্বন্ধু নহেন। ভক্তগণ কোথা হইতে এক রূপসী রমণীকে আনিয়া গোপনে এই বাগান-বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকেও প্রতারণা করিয়াছে ও কীর্ত্তনের সাজ সরঞ্জাম বাবদে

বহু টাকা আদায় করিয়াছে। এইসব কথা জমিদার কালীকৃষ্ণ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ফলে দরওয়ান বরকন্দাজসহ তিনি সেদিন বাগানবাড়ীতে স্বয়ং উপস্থিত হন। তাঁহার ধারণা হইল প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁহার বাগানবাড়ীতে নাই। তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। কোন এক সুন্দরী রমণীকে জগদ্বন্ধু নাম দিয়া এই বাগানবাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন। তাই তিনি ভক্তদের নানা গালমন্দ দিয়া প্রভুর কক্ষে ঢুকিয়া পড়িলেন।

প্রভু কিন্তু এইসব শোনা সত্ত্বেও নীরব নিশ্চল হইয়া তাঁহার মশারীর মধ্যে বসিয়া আছেন। কালীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে আসিলে আসন হইতে একবার শান্ত স্নেহমধুর কণ্ঠে ডাক দিলেন "কে রে! কালীকৃষ্ণ" ? সামান্য সংক্ষিপ্ত আহ্বান। ইহাতে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হইল। কালীকৃষ্ণ মুহূর্ত্তমধ্যে এক ভিন্ন মানুষ হইলেন। সমস্ত বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি প্রভুর নিকট মার্জ্জনা চাহিয়া বাগানবাড়ী ত্যাগ করিলেন। বলিয়া গেলেন, প্রভু যতদিন ইচ্ছা বাগানবাড়ীতে থাকুন। ইহাতে তিনি অনুগৃহীত হইবেন। কিন্তু প্রভু সেইদিনই বাগানবাড়ী ত্যাগ করিলেন। ডোমপাড়ায় তাঁহার এক অন্তরঙ্গ ভক্তের গৃহে আসন পাতিলেন।

এই সময়ে চুঁচুড়ায় অন্নদাচরণ দত্তের গৃহকে কেন্দ্র করিয়া প্রভুর নাম পশ্চিমবঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। অন্নদাবাবু নিজে একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ভাবাবেশে তিনি অনেক কথা বলিতেন। একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি বলেন "পূর্ব্ববঙ্গে জীব উদ্ধারের জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার নাম জগদ্বন্ধু।" অন্নদাবাবু আর একদিন আবিষ্ট অবস্থায় বলিলেন "প্রভু জগদ্বন্ধুর দর্শন কালই পাওয়া যাইবে। তিনি নবদ্বীপগামী ষ্টীমারে থাকিবেন। তাঁর মনোহর দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তিই তাঁহাকে চিনাইয়া দিবে।" এই সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি অন্নদাবাবুর বাড়ীতে প্রায় আসিতেন। অন্নদাবাবু, শিশিরবাবু

প্রভৃতি সকলে তৎপরদিন ষ্টীমারের ডেকে প্রভুকে দেখিতে পান এবং তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কৃতার্থ হন। জগদ্বন্ধুর আবির্ভাবের পর শিতিকণ্ঠের হরিসভা, কীর্ত্তনানন্দ ও হরিকথার স্রোত অবিরল ধারায় বহিতে থাকে।

রাজকৃষ্ণ নামক এক বৈষ্ণব ভক্ত, নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গনের সন্নিকটে বড়ালঘাটে গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহে। তিনি তাহা টের পাইয়া নবদ্বীপদাসকে পাঠাইয়া তাহাকে রক্ষা করেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু নারী সংশ্রব হইতে দূরে থাকিতেন। কামিনীকাঞ্চন হইতে সতর্ক থাকিতেন। তিনি বলিতেন শান্ত সমাহিত চিত্তে হরিনাম কর। নাম কীর্ত্তনই সত্য। এ যুগে হরিনামই সৃষ্টি রক্ষা করিবে। যদিও তিনি প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিতেন না, সুরতকুমারী-নাম্নী এক বারবণিতাকে তিনি চরণাশ্রয় দেন। দীক্ষার পর তাহার নাম হয় শ্রীসুরমাতা। এই সুরতমাতাকে তিনি একবারের বেশী দর্শন দেন নাই।

প্রভু সবসময় বস্ত্রাবৃত হইয়া থাকিতেন। পুলিশের লোক তাই তাঁহাকে সন্দেহ করিত। একবার এই সন্দেহ হেতু পুলিশের লোক তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে ও নাজিরের হেফাজতে রাখে। তৎপরদিন দেখা গেল, তালা প্রভৃতি সব ঠিক আছে, ঘরে কেহই নাই। প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন।

আর একদিন তিনি সাঙ্গোপাঙ্গসহ ভ্রমণে বাহির হইয়া ফরিদপুরের উপকণ্ঠে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে পদস্থাপন করিয়া বলেন, "আমি এইখানেই শ্রীঅঙ্গন করিব।" ইহা শুনিয়া জমির মালিক রামসুন্দর মল্লিক সানন্দে তাঁহাকে সেই জমি দান করিলেন। শ্রীঅঙ্গন ধীরে ধীরে প্রেমভক্তির উৎসরূপে খ্যাত হইল। রাস-পূর্ণিমা, দোল, ঝুলন, রাসযাত্রা প্রভৃতি প্রত্যেক উৎসবে শ্রীঅঙ্গনে নাম কীর্ত্তন হইত।

প্রভু বালক সাধুদের বলিতেন, "তোরা যেন আমার জড় অবস্থায় আমায় ছেড়ে না যাস্।" ভক্তেরা তাঁহার সেবার জন্য উন্মুখ থাকিতেন।

১৩২৮ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে প্রভু জগদ্বন্ধু অমৃতময় নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। তিনি বলিতেন "সকলই অনিত্য। দেবতারাও অনিত্য। ব্রজ সম্বন্ধীয় বস্তুই শুধু নিত্য।" তিনি বলিতেন "নিষ্ঠা ও ভক্তি ছড়াও, আমায় মুক্ত কর।" জগদ্বন্ধুর এই আধ্যাত্মিক জীবন, এই ভুবনমঙ্গল মহানাম হরিনামেরই অবতরণিকা।

বর্ত্তমানে শ্রীঅঙ্গনের সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা তাঁহার পরম ভক্ত ও শিষ্য ডাক্তার মহানামব্রতব্রহ্মচারী, শুদ্ধাচারী গোপীবন্ধু ও অন্যান্য শিষ্য সেবকগণের চেষ্টায় আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথায় বারমাস অহোরাত্র কীর্ত্তন চলে এবং তাহা কখনও বন্ধ হয় না।

২৮। শ্রীঅরবিন্দ।

(১৮৭২ খৃঃ)

বাঙ্গলার হুগলী জেলা ভারতের তিনটী বিখ্যাত ধর্ম্মনেতা—রাম-মোহন, রামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দকে এক শতাব্দীর মধ্যে উপহার দিয়াছে। এই হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশোদ্ভব ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বাড়ী। তিনি মনীষী, মহাপ্রাণ ও সমাজ সংস্কারক রামনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতাকে বিবাহ করেন। ১৮৭২ ইং ১৫ই আগষ্ট তারিখে এই ঘোষ দম্পতীরই তৃতীয় সন্তানরূপে শ্রীঅরবিন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। মাতৃপিতৃকুলের তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্ব শ্রীঅরবিন্দ পাইয়াছিলেন। ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির ধারক রাজনারায়ণের প্রভাব ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনধারার উগ্র সমর্থক ডাক্তার কৃষ্ণ-ধনের ব্যক্তিত্ব ও গতিবেগ সব গুণই শ্রীঅরবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের "এম্ ডি" ডিগ্রি নিয়া কৃষ্ণধন দেশে ফিরিলে কোন্নগরে সমাজ নেতারা মহা গোলমাল সৃষ্টি করিল। তাঁহারা বলিলেন "প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কৃষ্ণধনকে সমাজে নেওয়া হইবে না। কৃষ্ণধনের ও মহাপণ কিছুতেই তিনি নতি স্বীকার করিবেন না। অবশেষে ক্রোধে পৈত্রিক ভদ্রাসন নাম মাত্র মূল্যে জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করিয়া চিরতরে কোন্নগর ত্যাগ করিলেন। ডাক্তার কৃষ্ণধন তখন সরকারী বিভাগে উচ্চপদস্থ ডাক্তার। তাঁহার ছিল উৎকট সাহেবীয়ানা। স্বভাব ও ছিল একগুঁয়ে। কিন্তু অন্তর ছিল তাঁহার উদার। দরিদ্র ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য তিনি সর্ব্বদা কাতর থাকিতেন। তাঁহার ম্যালেরিয়া-গ্রস্থ গ্রামের একটি হাজা মজা খালের জন্য তিনি বহু টাকা দান করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে ঋণ দায়ে ও অর্থ কষ্টে পড়িতে হয়। মানবকল্যাণের জন্য নিঃস্ব হওয়ার এই শক্তি কৃষ্ণধনের পুত্র অরবিন্দের জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণধন ইংরেজী শিক্ষায় প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে অরবিন্দকে দার্জ্জিলিং ইংরেজী স্কুলে পাঠান হয়। মাত্র সাত বৎসর বয়সে ১৮৭৯ সালে তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার সহিত তিনি ইংলণ্ডে যান। অরবিন্দের অসাধারণ প্রতিভা ও মেধা। অল্প বয়সেই তিনি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তৎপর তিনি ইটালীয় ও জার্ম্মান ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জন করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি কিংস্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই মেধাবী তরুণ গ্রীক ও লাটীন ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দুই বৎসর তিনি বেশ দক্ষতার সহিত শিক্ষানবিশী করিলেন। তৎপর তিনি অশ্বারোহণের দিন ইচ্ছা করিয়াই উপস্থিত হইলেন না। অরবিন্দের ভগিনী সরোজিনী দেবী বলিয়াছেন, এ সময়ে তিনি উৎসাহের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। তিনি সিভিল সার্ভিসের কাঠামোর মধ্যে তাঁহার এই মহাজীবনকে বন্দী করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। ভবিষ্যতের মহা-মানব ও লোকগুরু, মুক্ত ও প্রশস্ত পরিধিতে আসিয়া প্রাণ পাইলেন।

বাস্তব জীবনের দুরূহ ক্ষেত্রে অরবিন্দের পারদর্শিতা ছিল। শ্রীযুক্ত চারু দত্ত তখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সিভিল সার্ভিসে কাজ করেন। তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দ সেদিন তাঁহার বাংলোতে আসিয়াছেন। কথা হইল—লক্ষ্য ভেদ করা। অরবিন্দকে বলা হইল, তাঁহাকে আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে। কিন্তু বন্দুক চালনায় অভ্যাস নাই বলিয়া তিনি আপত্তি করিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। কি করিয়া নিশানা করিতে হয় সামান্য একটু উপদেশ দেওয়া হইল। তারপরে বারবার তিনি লক্ষ্য ভেদ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্য ভেদ, দেশলাইএর কাঠীর ছোট কাল মাথাটা। শ্রীযুক্ত চারু দত্ত বলিয়াছেন "ও রকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না ত কি তোমার আমার হবে?" এইরূপ একাগ্রতা ও কর্ম্ম-তৎপরতা যাঁহার, অশ্বচালনা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।

বরোদা এষ্টেটে চাকুরী লইয়া অরবিন্দ ভারতে ফিরিলেন। মাতৃভাষায় তাঁহার দখল কম। কিন্তু নিজের দেশ, নিজের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে জানিতে তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ। তাঁহার প্রবল বাসনা, ভারতাত্মার মর্ম্ম তিনি উদ্ঘাটন করিবেন। আত্মোপলব্ধির পরম সাধনা দেশাত্মবোধের মধ্যে জাগাইয়া তুলিবেন। তের বৎসরের জ্ঞান সাধনার দ্বারা মনীষী অরবিন্দ প্রাচীন ভারতের কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কিছু অংশ এ সময়ে তিনি অনুবাদ করেন। শ্রীযুৎ রমেশচন্দ্র দত্ত বরোদায় গেলে, অরবিন্দ তাঁহার অনুবাদগুলি শ্রীযুৎ রমেশ বাবুকে পড়িয়া শুনাইলেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন "আজ কেবলি মনে হচ্ছে, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করিয়া আমি পণ্ডশ্রম করিয়াছি। তোমার কবিতাগুলি আগে দেখিলে আমার লেখা ছাপাতাম না। তোমার অনুবাদ দেখিয়া মনে হইতেছে, আমি ছেলে খেলা করিয়াছি"।

প্রথমে তিনি বরোদা এষ্টেটে রাজস্ব বিভাগে কাজ করিতেন। পরে শিক্ষা ব্রত গ্রহণ করিয়া ষ্টেট্ কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি ভাইস্ প্রিন্সিপাল হন। এই সময়ে তিনি বরোদার মারাঠী ছাত্রদের প্রিয় পাত্র হন এবং মারাঠাকেশরী বাল গঙ্গাধর তিলকের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। তিলকের এই বন্ধুত্ব পরকালে ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

বরোদা থাকা কালে অরবিন্দ মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন। এই ত্যাগ ও তিতিক্ষাময় জ্ঞানতপস্বীর জীবনে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী কোন অন্তরায় ঘটান নাই এবং সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। আত্মবিলুপ্তির এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত মৃনালিনী দেবী তাঁহার জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন।

বরোদাজীবনের শেষ পর্য্যায়ে অরবিন্দের মানসে দেশ-মাতৃকার ধ্যান ও সেবার প্রেরণা জাগে। রাজনৈতিক সাধনার আদর্শ ও সুপরিকল্পিত জাতীয় মুক্তির বাসনা তাঁহার অন্তরে ফুটিয়া উঠে। মুক্তির এই

পরমমন্ত্র যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। ভগবানের দেওয়া সমস্ত সমৃদ্ধিকে তিনি সমিধরূপে জ্বালাইয়া দেন। যে পরম উপলব্ধি তাঁহার জীবন সত্তায় উপজিত হয়, তাহা মানব কল্যাণে অবলীলায় জ্বালাইয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দই সর্ব্বপ্রথম দেশমাতার মধ্যে দেবীত্ব আরোপ করেন। ইহাকে জনচৈতন্যে তুলিয়া ধরেন শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের ধ্যান, কল্পনা ও সাধনা জনগণমনে সুস্পষ্টরূপে জাগাইয়া দেয় যে জগন্মাতা ও দেশমাতার মধ্যে কোন ভেদ নাই। এই মাতৃপূজায় পরমত্যাগ ও আত্মদানের কথা তিনি প্রথম প্রচার করেন। রাজনীতিতে অরবিন্দই পথিকৃৎরূপে আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োগ করেন এবং ইহাকে ব্যাপকতর আদর্শ করিয়া তোলেন। ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে অরবিন্দ ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া বলিতেন। তাই পুরুষোত্তম বাসুদেবকে পরম-পুরুষরূপে ভারতবাসীর পুরোভাগে তিনি স্থাপন করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে অধ্যাত্মচেতনা তিনি আনিয়াছেন। আলিপুরের কারাকক্ষে যে অলৌকিক চেতনা তাঁহার উন্মেষ হয় পরবর্ত্তীকালে তাহারই জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। মনীষী, শিক্ষাব্রতী অরবিন্দের মনে জাগে মুক্তি সংগ্রাম ও রাজনীতির একান্ত চিন্তা।

ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় হইয়াছে। ঠাকুর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন "আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তি হয়ত বলিবেন, ঠাকুর কি জানে, আমাকে সে কিই বা শেখাবে? কিন্তু শুধু ঈশ্বর জানেন যে, এই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরতলে বসিয়া ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রান্ত হইতে শিক্ষিত জনগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহারা দলে দলে এই তাপসের পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। আমি তাই বলি ভারতের মুক্তির কাজ সত্যই আরম্ভ হইয়াছে।"

১৯০৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা রচনা করেন। পুস্তিকাকারে ইহা এ সময়ে প্রকাশিত হয়। স্থির হয় যে দেশের দিকে দিকে মায়ের মন্দির স্থাপিত হইবে এবং তরুণ কর্ম্ম-

যোগীদের আশ্রম ভবানী মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিবে। আশ্রমের কর্ম্মীরা চারিদিকের জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং গঠনমূলক কাজে ব্রতী হইবে। তাহাদের সামাজিক সংগঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়কারী যোগাভ্যাস এই সঙ্গে চলিতে থাকিবে।

স্বাধীনতা সমরের তরুণ যোদ্ধা ও মা ভবানীর সেবকদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় অরবিন্দ স্বয়ং ব্রতী হন। প্রথমে নর্ম্মদাতীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে, তারপর কলিকাতায় মুরারীপুকুর বাগানে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। সেই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ গঙ্গোনাথ আশ্রমের গুরু ছিলেন। তিনি উচ্চকোটী ও শিবকল্প মহাপুরুষরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। তিনি প্রায় সময়েই ধ্যানাবিষ্ট থাকিতেন। তিনি সহসা কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সচরাচর দেখা যাইত না। শ্রীঅরবিন্দ ইঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন। অরবিন্দ যাওয়ার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। যোগীবরকে প্রণাম করিয়া উঠা মাত্রই তিনি চক্ষু উন্মীলন করেন ও অরবিন্দকে কৃপা করেন। তঁাহার কৃপাধন্য হইয়া অরবিন্দ ফিরিয়া আসেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর তঁাহার শিষ্য কেশবানন্দজীর সহিত ও অরবিন্দের ঘনিষ্টতা ও প্রীতি দীর্ঘদিন বর্ত্তমান ছিল। বরোদায় থাকাকালীন শ্রীযুৎ দেশপাণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। দেশপাণ্ডে ও স্বামী কেশবানন্দের সহযোগিতায় তঁাহার ভবানী মন্দির পরিকল্পনার কাজ সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। একদল কিশোর ছাত্রকে এই সময়ে গঙ্গোনাথ আশ্রমে রাখিয়া গড়িয়া তোলা হয়।

পুণ্যতোয়া নর্ম্মদার অপর পারে স্থিত রাজপিপ্‌লা রাজ্যের ছারোডী সহরের প্রসিদ্ধ যোগী সাখরিয়া বাবা সেখানে আসিয়া বাস করিবেন, প্রতিশ্রুতি দেন। ছারোডীর মহাত্মার লোকান্তর ঘটায় তাহা আর হইয়া উঠিল না। ভবানী মন্দিরের সঙ্গে অরবিন্দ নিজের আধ্যাত্মিক সাধনায় অগ্রসর হন। মন যতই অন্তর্মুখীন হইতেছে ততই সাধনপথের গূঢ়নির্দ্দেশ পাওয়ার জন্য অরবিন্দ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। মহারাষ্ট্রীয় যোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলে অরবিন্দের সাধন জীবনে যথেষ্ট সাহায্য

করেন। যোগ সাধনার বিভিন্ন ক্রম সম্বন্ধে লেলে অনেক মূল্যবান নির্দ্দেশ দেন।

শ্রীঅরবিন্দ এখন লোকগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বরোদা জীবনের ঘনিষ্ট বন্ধু ও রাজনৈতিক সহকর্ম্মী দেশপাণ্ডে ও মাধব রাওকে তিনি "ওঙ্কার জপ" শিক্ষা দেন। একাগ্রচিত্তে তাঁহারা এই জপ অভ্যাস করেন।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত (আই, সি, এস) অরবিন্দের অনুরাগী বন্ধু ও একজন ভক্ত ছিলেন। অরবিন্দের সাধন জীবনে যে অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই তিনি একদিন সাধন নির্দ্দেশ চাহিলেন। অরবিন্দ এবার "Not yet" বলিলেন না। দুই একদিন পরে তিনি বরোদা ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে একদিন শ্রীচারু দত্ত খেয়াল বশে আরাম কেদারায় সন্ধ্যা-বেলায় চোখ বুজিয়া বসিতেই একটু তন্দ্রার মত হইল। অকস্মাৎ তাঁহার বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ডের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় পদ্মাসনে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। মুখখানি অতি মধুর। তারপর থেকেই যতবার চেয়েছেন সেই মূর্ত্তি দেখেছেন। সেই মুখ শ্রীঅর-বিন্দের মুখের মাঝে মিলিয়ে গেল। ইহাতে বুঝা যায় শুদ্ধ ও শক্তিমান আধারে অধ্যাত্ম অনুভূতি জাগাইয়া তোলার ক্ষমতা শ্রীঅরবিন্দ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। অনুগামী সাধকের অনেক কিছু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এই নূতন যোগী শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে পড়িত।

১৯০৬ সালে তিনি শ্রীযুক্ত চারুবাবুকে লিখিলেন "আচ্ছা! তুমি যখন আন্‌মনা হ'য়ে চুপটী করে বসে থাক, কোন রং দেখতে পাও?" চারুবাবু উত্তরে জানাইলেন একটি সোনালী রং তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়।

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন" ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা করে। সমগ্র দেশের সুপ্ত শক্তি তখন জাগিয়া উঠে। শ্রীঅরবিন্দ সুযোগ বুঝিয়া বরোদা ত্যাগ করিয়া বিক্ষোভচঞ্চল বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। পরে

জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। মুক্তি যজ্ঞের পুরোধারূপে তিনি সর্ব্বত্র খ্যাত হন। "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁহার লেখনী হইতে যে অগ্নিবাণী নির্গত হইত তাহা দেশবাসীর চিন্তাধারায় বিপ্লব আনিয়া দেয়। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় সকলের আগে ঘোষনা করিলেন "পূর্ণ-স্বাধীনতা।"

স্বাধীনতার বাণীর সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ দেশের অধ্যাত্ম-চেতনা জাগাইয়া তোলেন। নবীন ভারতের অন্যতম চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক নেতারূপে তাঁহার অভ্যুদয় ঘটে। সুরাট কংগ্রেসের সংঘর্ষে তিলক ও অরবিন্দের জয় ঘোষিত হয়। তথাপি এই কর্মচাঞ্চল্য তাঁহার অন্তরের শান্তিকে ব্যাহত করে নাই। এই রাজনৈতিক কর্ম্মতৎপরতার মধ্যে যোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সঙ্গে তাঁহার সাহচর্য্য দেখা যায়। এই সময়ে লেলের নির্দ্দেশে অরবিন্দ বরোদার এক নির্জ্জন কক্ষে তিনদিন ধ্যানস্থ থাকেন। ধ্যানের ফলে তাঁহার সারা দেহে এক দিব্য অনুভূতি জাগে। তাঁহার সর্ব্বসত্তায় এক নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি ছড়াইয়া পড়ে।

এই সময়কার অরবিন্দের ভাষণগুলি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জনগণ মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন আনে। তিনি বলেন "আমাদের এই জাতীয়তা একটি ধর্ম্ম, যাকে আশ্রয় করে আমরা বাঁচবো। এ একটা ধৃতি—যার সাহায্যে আমরা জাতির মধ্যে ও দেশবাসীর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ কর্ব্ব। ভারতের এই তিরিশ কোটী মানবের মধ্যে আমরা তাঁকে পাবো।"

নবজাতীয়তার ইহা এক অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা, দেশমাতৃকার মধ্যে ভগবৎ-শক্তির আরোপ। মুক্তি যজ্ঞের এই ঋত্বিক দেশকে এক নূতন মন্ত্র ও মন্ত্রচৈতন্য দিতেছেন। বলা বাহুল্য বৃটিশ শাসক এই শক্তিধর নেতাকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হন।

১৯০৭ সালে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় এক প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ ধৃত হন। সমগ্র দেশময় সেদিন এক চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। কবি রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে অরবিন্দের প্রশস্তি লিখেন "অরবিন্দ! রবীন্দ্রের লহ

নমস্কার।" কবির সত্যদৃষ্টি সেদিন জাগ্রত ভারতের প্রাণপুরুষ অরবিন্দকে আবিষ্কার করে। আইনের দোহাই ও ফাঁকি দিয়া অরবিন্দ এই মামলা হইতে মুক্তি পান। মুক্তির পর তিনি তাঁহার ঘনিষ্টবন্ধু ও সহকর্ম্মী রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। সন্ত মুক্ত নেতাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতে কবি রবীন্দ্রনাথ ও সেখানে আসিয়াছেন। আলিঙ্গন ও অভিনন্দনের পর কবি রসিকতা করিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনি মুক্তি পেলেন ও আমার প্রশস্তিভরা কবিতা মাঠে মারা গেল।" অরবিন্দ সকৌতুকে উত্তর দিলেন "বেশী দিনের জন্য নয় অর্থাৎ রাজরোষ আসন্ন। আপনার কবিতা বৃথা যাইবেনা।"

কথাটি শীঘ্রই ফলিল। তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে নায়করূপে অরবিন্দকে ও গ্রেপ্তার করা হয়। তৎপর বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ হয়। এই মাম্‌লা অরবিন্দের মহত্তর জীবন উদ্ঘাটিত করে। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ আত্মপ্রকাশ করে।

এক নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর মহিমময় রূপ শ্রীঅরবিন্দের সর্ব্বস্তরেই দৃষ্ট হয়। তাঁহার দাম্পত্য জীবনে ও এক অদ্ভুত সংযম ও নির্লিপ্ত ভাব দেখা যায়। স্ত্রীকে তিনি এক চিঠিতে লেখেন "আমার বিশ্বাস, আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও ধন যাহা ভগবান দিয়াছেন, তাহা সমস্তই ভগবানের। আমার যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত ব্যয় করিবার অধিকার আমার নাই। তাহা করিলে আমি চোর। অতিরিক্ত যাহা তাহা ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। এই দুর্দিনে দেশের যাহারা অনাহারে মরিতেছে, তাহাদের হিত করা উচিত। কি বল? এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে কি?"

অধ্যাত্ম বিষয়ে তিনি স্ত্রীকে লেখেন, "যে কোন মতেই আমায় ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন করিতেই হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন তবে তাঁহার দর্শন করিবার কোন পথ নিশ্চয় থাকিবে। হিন্দু ধর্ম্ম বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে। আমি তাহা পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে বুঝিলাম হিন্দু ধর্মের কথা সত্য। যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে,

আমি সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই"।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার বহুবিধ সাধন-অনুভূতি হয়। তাই পত্নীর নিকট নিজের অন্তর্জীবনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন এবং এই নূতন জীবন গ্রহণ করিতে সস্নেহ আহ্বান জানাইতেছেন। এইভাবে পতি ও পত্নীর মধ্যে একটি সুন্দর বুঝাগড়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এ সময়কার এক মিলন কাহিনীতে তাহার নিদর্শন মিলে। তখন কলিকাতার রাজনৈতিক জীবন বিক্ষুব্ধ। রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহে শ্রীঅরবিন্দ তখন বাস করিতেছেন। চারিদিকে আসন্ন সংঘর্ষের প্রবল উত্তেজনা। এমন সময় অরবিন্দের শ্বশুর ভূপাল বাবু আসিয়া অরবিন্দকে সে রাত্রিতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাও জানাইলেন যে মৃনালিনী দেবী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি যেন রাত্রিতে সেখানে থাকেন। পতি পত্নীর আসন্ন মিলন সংবাদে সুবোধ বাবুর বাড়ীতে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ধব্‌ধবে গিলেকরা পাঞ্জাবী ও কোঁচানো ধূতি ও গলায় বেল ফুলের মালা দিয়া জামাই বেশে তাঁহাকে সাজাইল। চারুবাবুর স্ত্রী লীলাবতী আসিয়া দুইটি মালা হাতে দিল। বলিল "একটি আপনি দিদিকে পরাবেন। অপরটী দিদি আপনার গলায় দেবেন। ভুলবেন না যেন"। অরবিন্দ মিষ্টি হাসি হেসে বল্লেন "তুমি যেমন বল্‌ছ, তেমনই করব, লীলাবতী"। সুবোধ মল্লিক মহাশয়ও বলিয়া দিলেন, রাত্রিটা যেন সেখানে কাটায়। বাড়ীর দরোয়ানকে বলিয়া দিলেন "বাড়ীর ফটক যেন বন্ধ থাকে। ঘোষ সাহেব রাত্রে ফিরবেন না"।

পরদিন ভোরে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, অরবিন্দ রোজকার মত মল্লিক বাড়ীর চায়ের টেবিলে উপস্থিত। আগের রাত্রিতে তিনি ফিরিয়াছেন ও দেওয়াল টপকাইয়া বাড়ীতে ঢুকিয়াছেন। উৎসাহী বন্ধু-বান্ধবীদের প্রশ্নে তিনি বলিলেন "ভোজনের পর রাত্রি এগারটার সময় ফিরেছি। লীলাবতি! মালা দুটি সম্বন্ধে তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন

করেছি। আমি সব কথা বুঝিয়ে বলেছি। সে আমায় আস্‌তে অনুমতি দিলে, তবে আমি এসেছি।" মৃণালিনী দেবী শ্রীঅরবিন্দের শেষ জীবনের সাধনার অংশভাগিনী হইতে পারেন নাই। অরবিন্দের এই বিদায়ের প্রায় নয় বৎসর পরে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিনী সারদামণি দেবীর আশ্রয় ও আশীর্ব্বাদ মৃণালিনী দেবী লাভ করেন। চারু বাবুর নিকট এক চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন "আমি জেনে সুখী হলাম যে আমার স্ত্রী সাধন জীবনে এমন মহৎ আশ্রয় লাভ করেছে"।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের উপর অরবিন্দের বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। 'ধর্ম' পত্রিকায় অরবিন্দ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখেন "যিনি পুর্ণ, যিনি যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, তিনি মুখে যাহা বলেন নাই, তাহা কাজে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দকে নিজ হাতে গড়িয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রেমিকতা, তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবের দান"। আর এক প্রবন্ধে তিনি 'ধর্ম' পত্রিকায় লেখেন "বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মত দ্বিতীয় একটি পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন নাই"।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি লেখেন "তিনি জন্ম হইতেই বীর। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিতেন 'তুই বীর রে'। পরমহংসদেব জানিতেন যে বিবেকানন্দের ভিতর তিনি যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন কালে তাহা প্রখর শক্তি হইবে। আমাদের যুবকগণও এই বীরভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে 'বেপরোয়া' হইয়া দেশের কাজ করিতে হইবে এবং মনে করিতে হইবে "তুই বীর রে"।

আলীপুর বোমার মাম্‌লার প্রাক্কালে অরবিন্দের বাসা জোর খানাতল্লাসী হয়। এই সময়ে একটি হাস্যকর ব্যাপার ঘটে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপর শ্রদ্ধাশীল বলিয়া অরবিন্দ দক্ষিণেশ্বরের কিছু পবিত্র মাটী নিজের ঘরে রাখেন। পুলিশ অফিসার ক্লার্ক সাহেব তাহা কোন বিস্ফোরক পদার্থ বলিয়া সন্দেহ করেন। শেষ পর্য্যন্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা

বুঝা যায় তাহা মাটী। দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মাটীতে যে এ যুগের বিস্ফোরক শক্তি আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা শ্রীঅরবিন্দ জানিতেন।

আলিপুর বোমার মাম্‌লা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের সাধক। তাঁহার একেবারেই নির্ব্বিকার ভাব। এই সময়ে কারাকক্ষে থাকার কালে তাঁহার যে অলৌকিক অনুভূতি হয়, তৎসম্বন্ধে অরবিন্দ নিজ বর্ণনায় লিখিতেছেন "এই খানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়ালটি হইতেছে আমার সঙ্গী। ব্রহ্মময় হইয়া আমার নিকট আসিত ও আমায় আলিঙ্গন করিত। উদ্যানের দেওয়ালের গায়ে একটি গাছ ছিল। তাহার সবুজপাতা আমার নয়নরঞ্জন করিত। সান্ত্রীরা পাহারা দিত। মনে হইত আমার বন্ধু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গোয়ালঘরের কয়েদীরা আমার সম্মুখ দিয়া গরু চরাইতে যাইত। তাহা আমার প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলীপুরের কারাবাসে আমি অপূর্ব্ব প্রেমশিক্ষা পাইলাম। কারাগারের পরিবেশ আমার নিকট জীবন্ত ও চৈতন্যময় হইয়া উঠে। তার-পরদিন আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল। গীতার সাধনা আমি অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে কি চেয়েছিলেন। যখন আমি পদচারণা করতাম সেই সময়ে তাঁর শক্তি পুনরায় আমাতে প্রবেশ করত। যে জেল আমাকে মানব জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে, সেইদিকে আমি তাকালাম। কিন্তু দেখলাম, আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালগুলির মধ্যে বন্দী নই। আমাকে ঘিরে রয়েছেন স্বয়ং বাসুদেব"।

কংসের কারাগারে ভগবান বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হন। ইংরেজের কারাগারে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ভাসিয়া উঠে, সেই বাসুদেবেরই চৈতন্যময় সত্তা। তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ সর্ব্বদিকে স্ফুরিত হইতেছে। ইট, পাথর, কারাগারের লৌহদ্বার, জেলের কয়েদী, মাম্‌লার উকীল, বিচারক প্রভৃতি সবই সচ্চিদানন্দময় হইয়া উঠিয়াছে। সব কিছুতেই বিশ্ব-আত্মার প্রাণস্পন্দন রহিয়াছে।

এই সময়কার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "এক এক-বার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বাঁশীটী বাজাইতেছেন, দাঁড়াইয়া আছেন, এবং প্রেমময় মাধুরী দিয়ে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন। কে যেন আমায় আলিঙ্গন করিতেছে এবং আমায় কোলে করিয়া রাখিয়াছে।"

প্রতিভাবান কৌঁসুলী চিত্তরঞ্জন দাসের নিকট শ্রীঅরবিন্দের এই আধ্যাত্মিক ভাব ধরা পড়ে। বিচারক মিঃ বিচ্‌ক্রফ্‌টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন "এই বিতণ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হবার বহুকাল পরে, এঁর অন্তর্দ্ধানের দীর্ঘকাল পরে, মানব সমাজ এঁকে স্বদেশ প্রেমের মহাকবি, জাতীয়তার প্রবর্ত্তক ও মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর্ব্বে। এঁর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এঁর বাণী শুধু ভারতবর্ষে নহে, সাগরপারের দূরদূরান্তে ধ্বনিত হবে।" পরকালে চিত্তরঞ্জনের এই উক্তি সত্যে পরিণত হয়।

কারাগারের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ দুইটী বাণী প্রাপ্ত হন। একটী বাণী হচ্ছে জাতির পুনরুত্থানে সাহায্য করার নির্দ্দেশ, অপরটী হচ্ছে অধ্যাত্ম ভারতের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা। অরবিন্দ আদেশ পেলেন "যখন তুমি বাইরে যাবে, তুমি প্রচার কর্ব্বে, সনাতন ধর্ম্মের জন্য তথা সমস্ত জগতের জন্য তা'রা উঠ্‌ছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি, জগতের সেবার জন্য"।

কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া অরবিন্দ "কর্ম্মযোগিন" ও "ধর্ম্ম" এই দুইটা সাপ্তাহিকের মধ্য দিয়া তাঁহার আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন। মুক্তি-সংগ্রাম ও ইংরেজ সরকারের দমন-নীতি উভয়ই তখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। অপরদিকে শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্জীবনেও বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহকর্ম্মী শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার শ্রীঅরবিন্দের কলিকাতা ত্যাগের কাহিণীতে বলেন "আমি জনৈক সি, আই, ডি,র নিকট জানি—শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার কর্ব্বে। ছামছুল হকের

হত্যার মাম্‌লায় তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট হ'বে।" ভগিনী নিবেদিতাকে সব কথা বলিয়া জামিনদার ঠিক রাখা হইল, তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভগিনী নিবেদিতা কাগজগুলি চালাইবেন। অরবিন্দ কিছুকাল চন্দননগরে আত্ম-গোপন করেন। এই সময়ে তিনি মতিলাল রায়ের গৃহে লুকাইয়া থাকেন। মতিলাল বাবুর কোতুহলী প্রশ্নে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতে যে সব দেবতা আছে, তাঁদের অনেকেরই আকার ফুটিয়া উঠে।"

অলৌকিক জগতের অধ্যাত্মলোকের কবাট এবার খুলিয়া গিয়াছে, সেখানকার নানা ইঙ্গিত, নানা নিদর্শন সাধক অরবিন্দ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছিলেন ও পাইতেছিলেন।

১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হন। মুক্তি সংগ্রামের উন্মাদনা, সংসারের বন্ধন, আত্মীয় পরিজনের আকর্ষণ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া আপন সাধনায় নিমগ্ন হন। ক্রমশঃ পণ্ডি-চেরীর সাগর পারে তাঁহার অভিনব যোগাশ্রম গড়িয়া উঠে। নিজে যোগ-লব্ধ শক্তির প্রভাবে তিনি দেশের মুক্তি আনিবেন, মানবতার আত্মিক বিকাশকে সার্থক করিবেন, ইহাই তাঁহার বিরাট ধারণা। শ্রীযুৎ মতিলাল রায়কে তিনি লিখিয়াছিলেন "যে পর্য্যন্ত আমার অষ্টসিদ্ধি প্রবল না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বস্তুতন্ত্রবাদী মর্ত্ত্যের উপর তাহা সমগ্র ভাবে কাজ করিবে না"।

সাধনার আরও গভীরে প্রবেশ করিবার পর শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনে রূপান্তর ঘটে। ১৯১৪ ইংতে পণ্ডিচেরী হইতে "আর্য্য" পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং ইহার মাধ্যমে অরবিন্দ তাঁহার নবতম আদর্শ জন-চৈতন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন।

এই মহাসাধকের তপস্যার প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হয়। তাঁহার দার্শনিক আদর্শ এবং অধ্যাত্ম সাধনার নির্দ্দেশ সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে।

শ্রীঅরবিন্দ নিজের দর্শন তত্ত্ব তাঁহার অমূল্য "লাইফ ডিভাইন" গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দিব্য জীবনের অভিনব তত্ত্ব তিনি ইহার মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি দিব্যজীবনের বার্ত্তা ও

তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ দিয়াছেন। আদর্শ ও তত্ত্বের দিক হইতেছে দিব্য জীবন, আর "পূর্ণযোগ" হইতেছে সেই তত্ত্বেরই ব্যবহারিক প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বয় ধর্ম্মের যোগপদ্ধতি তিনি তাঁহার "সিন্‌থেসিস অব্-যোগ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অরবিন্দ দর্শনের মূল ভিত্তি হইতেছে "বিবর্ত্তন-ক্রিয়া"। তিনি বলিয়াছেন "মন ও প্রাণ যেমন 'জড়' হইতে মুক্তি পাইয়াছে, তেমনি যথাসময়ে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সুগোপন ভগবৎ সত্তার মহত্তর শক্তিগুলি আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিবে এবং উপর হইতে তাহাদের পরম জ্যোতিঃ আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইবে। পৃথিবীতে এম্‌নিভাবে সম্ভাবিত হইয়া উঠিবে অতি মানবের প্রকাশ।"

তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে লিখিয়াছেন, "এটা নিতান্ত অদ্ভুত কথা যে আমি অতিমানসসিদ্ধির উপযুক্ত মানসিক ধৃতি নিয়ে জন্মেছিলাম। ভগবান জানেন আমার সারা জীবনই নিষ্করুণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে এক মহাসংগ্রাম। আমার জীবন বরাবরই একটা যুদ্ধ বিশেষ। প্রতিদিন, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ব্যাপী, পাঁচ ছয় ঘণ্টার একাগ্র চিন্তার ফলেই আমার ভেতর ঐশী শক্তির অবতরণ ঘটতে পেরেছিল। যদি একাগ্র চিন্তাকে কঠোর ধ্যান বল, তা আমার জীবনে কখনো হয়নি। যা আমি নিয়মিত করেছি, তা হচ্ছে দৈনিক চার পাঁচ ঘণ্টা প্রানায়াম।"

শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব্ব প্রশস্তি বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ১৯০৮ সালে লিখিয়াছেন। ১৯২৮ সালের দর্শনে কবি তাঁহার সেই প্রশস্তিকে রূপান্তরিত হইতে দেখেন। কবিবর তাঁহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন "প্রথম দৃষ্টিতেই দেখ্‌লুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন এবং সত্য করে পেয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্য ওতপ্রোত। আমার মন বললে ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জ্বালাবেন। তিনি আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের বাণী "যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি"

অনুভব করিয়াছেন। আমি তাঁকে বলে এলুম্ "আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে'। প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে। দ্বিতীয় তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল, আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে, যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম, সেখানে তাঁকে জানিয়েছি, "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। আজ তাঁকে দেখ্‌লুম দ্বিতীয় "তপস্যার আসনে অপ্রগলভ স্তব্ধতায় আজিও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"।

এই শক্তিধর মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ১৯৫০ সালে ৫ই ডিসেম্বর মরদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে প্রয়ান করেন। মুক্তির যে অত্যুগ্র সাধনা প্রথম জীবনে রাজনৈতিকক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে সেই সাধনারই মহা উত্তরণ মানবাত্মার পরম মুক্তির পথে ঘটে।

২৯। ফকির সাইবাবা।

(১৮৭৩ খৃঃ)

আমেদাবাদ জেলার শিরডি গ্রামে হঠাৎ এক নূতন অল্পবয়স্ক ফকির দেখিতে পাওয়া যায়। বয়স বৎসর ষোল হইবে। পরণে মলিন বস্ত্র এবং মুখে শান্তির আবেশ। এই ফকির সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন। লোকালয়ের ধার ধারেন না। এই ফকির সম্বন্ধে প্রথমে কেহ কোন ঔৎসুক্য দেখায় নাই। ছন্নছাড়া ভবঘুরে লোকের প্রতি কে বা তেমন আগ্রহ দেখায়? এই গ্রামের একদিকে একটী স্থান জঙ্গলাকীর্ণ। ইহারই নিকটে একটি প্রকাণ্ড নিমগাছ। ইহারই গুঁড়ির প্রকাণ্ড কোটরটী আপাততঃ ফকিরের আশ্রয় বা বাসস্থান। সারাদিন যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ অযাচিতভাবে দুই একটি রুটী দিলে তাহা খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। রাত্রে এই বৃক্ষ কোটরে তাহার সাধন ভজন আরম্ভ হয়। এইভাবে কয়েক বৎসর অতীত হওয়ার পর ফকির গ্রামের মসজিদে আশ্রয় নিলেন। লোকের সঙ্গে ও এতদিনে কতক আলাপ পরিচয় হইল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ এই নবীন সাধকের নবরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। কয়েকজন উদাসী ও সংসার ত্যাগী ব্যক্তিও এই মসজিদে থাকে। গ্রামের একদল লোক মাঝে মাঝে ইহাদের কাছে আসিয়া নানা গল্প গুজব ও ধর্ম্মালোচনায় সময় কাটায়। সে রাত্রে ও এমনই একদল লোক উপস্থিত হয়। এই নবীন ফকিরকে সকলে ঘিরিয়া বসিয়াছে। তরুণ ফকিরের আননে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ, নয়নে প্রখর দীপ্তি। সকলকে নিয়া ধর্ম্মকথায় মত্ত। বহু বড় বড় ফকিরদের কেরামৎ-কাহিনী বলিয়া চলিয়াছে। কাহারও কোন ক্লান্তি নাই; হুঁস ও নাই। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। লেম্পের তেল ফুরাইল। কি করিবে, কোথায় কেরোসিন তৈল পাইবে ভাবিতেছে,

এমন সময় ফকির গিয়া লেম্পে লোটার জল ঢালিয়া দিল। যতই জল ঢালে, লেম্ফের আলো ততই উজ্জ্বল হয়। এমনি ভাবে রাত্রি পোহাইল। পরদিন শিরডি গ্রামে এই অলৌকিক কাহিনী ছড়াইয়া পড়িল। ফকিরকে তখন সকলে নূতনভাবে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাঁহার এই সাধনা ও সাফল্যের কথা শুনিয়া আর্ত্ত নরনারী সর্ব্বদা তাঁহার কাছে আসিত এবং তাহাদের সর্ব্ব-রোগহর "দাওয়াই" ছিল, ফকিরের সম্মুখে সর্ব্বদা যে ধুনী প্রজ্জ্বলিত থাকিত তাহার ভস্ম।

নিমগাছের কোটরের পাগলা ফকির এখন সর্ব্বজন পরিচিত "সাইবাবা।" বিশেষ উৎসবের দিনে জাকজমক করিয়া তাঁহাকে রৌপ্য নির্ম্মিত পাল্কীতে চড়ানো হইত। কত নজরানা দিত। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে তাঁহার ত্যাগ ও তিতিক্ষার ভাব সর্ব্বদা ফুটিয়া উঠিত। প্রতিদিন ভোরে দর্শনের জন্য তাঁহার দুয়ার খোলা হইত। প্রতিদিন বিস্তর নজরানা পাইতেন। কিন্তু দেখা যাইত, তৎপরদিন কিছুই নাই। সমস্ত তিনি বিলাইয়া দিয়াছেন।

তিনি লোকের অন্তরের কথা বলিতে পারিতেন। নানাসাহেব সাইবাবার নাম ও মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। সাইবাবা নানা-সাহেবকে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী জানিয়াও তাঁহার কাছে ডাকিয়া পাঠান। আসিলে বলেন যে তাঁহার সঙ্গে নানাসাহেবের জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

একদিন নানাসাহেব পথ চলিতে চলিতে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পরেন। কোথায়ও জল পাইতেছেন না। তাঁহার সঙ্গীটী নানাদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন; কিন্তু পানীয় জল কোথাও মিলিতেছে না। এমন সময় এক পাহাড়িয়া ভীল দেখা দিল। তাহাকে জলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "তুমি যে পাথরের উপর বসিয়াছ, তাহারই নীচে জল আছে।" তাঁহারা পাথর সরাইয়া দেখিলেন, প্রকৃতপক্ষে পাথরের নীচে জল আছে। তাঁহারা জল পান করিয়া

তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। কিছুদিন পরে নানাসাহেবের সাইবাবার সঙ্গে দেখা হইলে, সাইবাবা বলিলেন, "কিহে? জলের জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলে। ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকিলে পাথরের নীচে ও জল মিলে।" সাইবাবা নাকি সেদিন ভক্তদের বলিয়াছিলেন "আমাদের নানা তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে"। ভক্তেরা এতদিন পরে এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন।

বাবাজী আন্তর্যামী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক ঘটনার কিম্বদন্তী আছে।

একদিন ভক্তপ্রবর এন্‌, সি, চন্দোরকার বড়ই দুঃখিত অন্তরে বাবার কাছে আসিয়াছেন। প্রণাম করিয়া বলিলেন, "সংসার অত্যন্ত নিঃসার। কোন সারবত্তা নাই। এর সংস্পর্শ ছাড়িয়ে দূরে চলে যাব স্থির করেছি"। বাবাজী বলিলেন, "বনে চলে গেলেও তুমি সংসারকে এড়াবে কি করে? এই দেহ তোমার প্রারব্ধ পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মের ফলেই সৃষ্ট হইয়াছে। সংসারকে জোর করে ফেলে যাবে কি করে?" বাবার কথা কিছুই নূতন নয়। অলৌকিক কিছুই নাই। তবুও কথাগুলিতে মন্ত্র চৈতন্য আছে।

১৯১৯ ইংরেজীর অক্টোবর মাসে সাইবাবা পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুর করিয়া "রামবিজয় চম্পূ" পাঠ করিতেছেন। বাবাজী বারবার বলিতেছেন "এ পাঠে কল্যাণ হবে। মৃত্যুঞ্জয় শিব প্রসন্ন হবেন।" মুখে এই কথা বলিলেও সাইবাবা বুঝিলেন, সময় আসন্ন। তিনি তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে খবর দিলেন যে, এই দেহের আলো "আল্লাহ" এইবার নিবিয়ে দেবেন। ফকিরের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের প্রাণে বিষাদের ছায়া নামিল।

১৯১৯ ইংরেজীর ১৮ই অক্টোবর। সেদিন শারদীয়া দশমীর পুণ্যদিন। হিন্দুদের বিজয়াদশমী। অপরাহ্ণে হঠাৎ বাবাজী

"ভাইয়াজি" নামক এক ভক্তকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে এবার আমার ডাক এসেছে। আমি বিদায় নিচ্ছি। তোরা শোন্। আমার ভক্ত "বুটী" যে মন্দির তৈরী করেছে, তাহাতে যেন আমার এই দেহের সমাধি দেওয়া হয়।"

বেলা প্রায় ৩ টার সময় সাধক সাইবাবা জীবনলীলা সম্বরণ করেন। পশ্চিম ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ হইতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র স্খলিত হইল।

৩০। সন্ত মাধবদাস (মাধো বাবাজী)।

প্রয়াগের সন্ত সাধুচরণ একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্য ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশজাত এবং তাঁহার মাতা চৈতন্যদেবের বংশজাতা ছিলেন। সাধুচরণের দুই বিবাহ। সাধুচরণ দ্বিতীয়া স্ত্রী ও শিশুকন্যাসহ তীর্থযাত্রা করিয়া আর দেশে ফিরিলেন না। প্রয়াগেই রহিয়া গেলেন। এইখানে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে সন্ত মাধবদাস জন্মগ্রহণ করেন। মাধবদাস নামক জনৈক সাধুর উপদেশে সাধুচরণ পুত্রের নাম মাধবদাস রাখিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে মাধবদাস প্রথমে মহচু নামক এক হিন্দুস্থানী গুরু মহাশয়ের নিকট ও পরে মাধবদত্ত নামক জনৈক বাঙ্গালীর নিকট বাল্যশিক্ষা শেষ করেন। এই সময়ে এলাহাবাদে উচ্চ শিক্ষার উপযোগী একটি ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধবদাস ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী এবং অত্যন্ত সরল ছিলেন। তাঁহার সত্যবাদীতা, সরলতা ও চরিত্রবত্তা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া অধ্যাপক লুইস সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। লুইস সাহেবের তত্ত্বাবধানে মাধবদাস লেখাপড়া ভালভাবে করিতে লাগিলেন। মাধবদাসের বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলেও মহাপ্রাণা জননীর যত্নে ও সদ্‌উপদেশে মাধব-দাসের পবিত্র জীবন আরও সুন্দরভাবে গঠিত হইল। অপরদিকে অধ্যাপক লুইস্ সাহেবের নজরে পড়ায় পাঠে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি অধ্যাপক লুইস সাহেবের নিকট প্রায় আট বৎসর অধ্যয়ন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা, জ্যামিতি ও বীজগণিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন।

এইসময়ে লক্ষ্ণৌ মানমন্দিরের রাজজ্যোতির্ব্বিদ্ কর্ণেল উইলকক্স সাহেব লুইস সাহেবের নিকট তিনজন প্রতিভাবান ছাত্র প্রেরণ

করিতে অনুরোধ করেন। লুইস সাহেব আর দুইজন ছাত্রের সহিত মাধবদাসকেও তথায় প্রেরণ করেন। মাধবদাস ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশবৎসর বয়সে এই কার্যে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত উহা সম্পাদন করেন। তৎপর নবাব ওয়াজিদ্ আলী শাহ মান মন্দিরের কার্য্য স্থগিত রাখিলে ইনি কিছুদিন বেগমের কুঠিতে, পরে অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে ট্রেজারীতে কাজ করেন। বেতন তাঁহার মাসিক ৭০ টাকা হইয়াছিল। এখানে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে ইনি গুপ্তস্থানে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করেন।

লক্ষ্ণৌতে তখন কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির অবস্থান করিতেন। ইঁহাদের অনেকেই যোগী এবং বাকসিদ্ধ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আজম-শাহ নামক এক ফকির ছিলেন। মাধবদাস ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব ও উপদেশ লাভ করেন।

চৌধুরী শাহ নামক অপর এক ফকিরের নিকট ইনি যোগ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মাধবদাসকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মুসলমান হইলেও ইঁহারা সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিলেন। মাধবদাস ইঁহাদের সাহচর্য্যে থাকিয়া আত্মজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।

পরে তিনি পেন্‌সন্ লইয়া কার্য্য হইতে অব্যাহতি লইলেন। নিজবাটীতে ফিরিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি আজম শাহের নিকট থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু আজমশাহ তাঁহাকে জননীর সেবা করিবার জন্য বাটিতে ফিরিবার আদেশ দেওয়ায় মাধবদাস পুনরায় প্রয়াগ (এলাহাবাদ) ফিরিয়া আসিলেন।

মাধবদাসের সতের বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। তিনি একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ কন্যার পানিগ্রহণ করেন। বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তৎপর কয়েক বৎসর

পরে তাঁহার পত্নী পরলোকগমন করেন। পুত্রটিও দ্বাদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়। আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই।

মাতৃ বিয়োগের পর মাধবদাস সংসারের কর্ম্মকোলাহল হইতে অবসৃত হইয়া আপনার শান্তিময় কুঠিরে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। এই কুঠির অদ্যাপি "মাধো কুঞ্জ" নামে পরিচিত।

ইনি সকল ধর্ম্মেরই আলোচনা করিতেন; এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ইহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইত। ইনি বেদের সহিত বাইবেল এবং কোরাণেরও সম্যক চর্চ্চা করিতেন। বহু হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ইঁহার শিষ্য ছিল। জেমস্ স্যামুয়েল ও উকীল মিঃ সিমিয়ানের পিতা ইঁহার শিষ্য ছিলেন। জেমস্ সাহেব চার্চ্চের ভজনায় যোগ দিতেন। আবার বাবাজীর চরণপ্রান্তে বসিয়া ধর্ম্ম উপদেশ গ্রহণ ও নিয়মিত তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করিতেন। মাধবদাসের অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান ভক্ত ছিল। তৎকালীন বহু হিন্দু ও মুসলমান যোগী ও সাধুপুরুষ ধর্ম্মালোচনার জন্য "মাধো কুঞ্জে" উপস্থিত হইতেন। বিখ্যাত কর্ণেল অলকট সাহেব মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকদিন "মাধো কুঞ্জে" অবস্থান করিয়া ধর্ম্মালাপ ও সংকীর্ত্তন করেন। স্বামী বিবেকানন্দও ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

পরমহংসদেবের শিষ্যগণ, কাশীর মাতাজী, কাবুলের প্রসিদ্ধ ফকির আখোজী ও আমীর আহমান শাহ, রোদৌলী সরিফের শাহজাদা, কাশীর রাজা, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সাধু তাঁহার দর্শনলাভের জন্য এলাহাবাদ আসিতেন। মাধবদাস কখনও কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর অনেকবার ইঁহার মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিতে উদ্যত হন। কিন্তু ইনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

একবার কাশীর রাজা তাঁহার আশ্রমে আসিবার সংবাদ

পাঠাইলে বাবাজী বলিয়া দেন, যদি তিনি আসিয়া কিছু দান না করেন তাহলে তিনি আসিতে পারেন।

ইনি একান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার আদেশ ব্যতীত কিছু করিতেন না এবং মাতার নিকটেই মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। সর্ব্বদা সাধু সমাগম, অতিথি সৎকার, সংকীর্ত্তন, কাঙালীভোজন, শাস্ত্রালাপ প্রভৃতির দ্বারা "মাধো কুঞ্জ" আনন্দ কোলাহলে মুখরিত থাকিত।

মাধো বাবাজীর হিন্দুভক্তগণ তাঁহাকে পরমহিন্দু এবং মুসলমান ভক্তগণ তাঁহাকে স্থফী বলিয়া জানিত।

ইনি সকল ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়া "The Unitarian" নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মভট্ট ব্রজেশ প্রসাদ নামক জনৈক কবি ইঁহার মাহাত্ম্য ও জীবনী বর্ণনা করিয়া "মাধবদাস" নামক এক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মমতও তাঁহার উদার ছিল। মাতার মৃত্যুকালে ইঁহার উপর জপমালা ও রাধাশ্যামের পূজার ভার দিয়া যান। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সযত্নে মাতার আদেশ পালন করেন। তাঁহার সাধন জীবন অত্যন্ত কঠোর ছিল। এই কারণে প্রায় ৭০ বৎসরের দিকে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। তথাপি তাঁহার কঠোর জীবন যাপন ও অসংখ্য ভক্তগণের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা বন্ধ হয় নাই। ধীরে ধীরে নরলীলার ক্ষণটি আসিয়া পড়ে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুন তারিখের মধ্যাহ্নকালে বাবাজী সজ্ঞানে মাতৃচরণ স্মরণ করিতে করিতে নরলীলা সংবরণ করেন। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উদারতা ও সমন্বয়বাদী আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ধর্ম্মের গগন হইতে খসিয়া পড়িল। এই খবর পাইয়া তাঁহার অগণিত হিন্দু ভক্তগণ আসিয়া পড়েন ও তাঁহার নরদেহ লইয়া গঙ্গাভিমুখে গমন করেন। অর্দ্ধপথে মুসলমান ও খৃষ্টান ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হয় এবং সকলে মিলিয়া এই মহান্ সাধুপুরুষের পূত নশ্বর দেহ শ্বেত গঙ্গার পবিত্র নীরে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলেন।

৩১। মহীয়সী রাবেয়া।

(৭৫২ খৃঃ)

রাবেয়ার বয়স তখন অল্প। অনেক বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত যুবক, এমন কি বসোরার শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন। শোনা যায় বসোরার তখনকার দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষ হোসেন বসোরীও তাঁহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি একে একে সকলকে প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি সঙ্কল্প করিলেন চিরদিন কুমারী থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যকেই জীবনের ব্রত করিয়া লইবেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি, শুধু ব্রহ্মচর্য্যেই তিনি ভগবানের দর্শন পাইতে পারিবেন। তাই বিবাহ সম্বন্ধে রাবেয়া বলেন, "ভাইসব! একলা থাকার আনন্দই আমার বড় আনন্দ। কারণ আমার যিনি সবচেয়ে প্রিয়তম, তাঁর কথা আমি সবসময় মনে করতে পারি। তাঁহার প্রেমের মত এমন অকৃত্রিম প্রেম আর কোথাও পাইবনা। সেই উজ্জ্বল প্রেমের মাপকাটিতে আমি সমস্ত মানুষকে বিচার করি।" হাজার হাজার ভক্ত শিষ্য রাবেয়াকে ঘিরিয়া থাকিতেন। একদিন এক ভক্তসেবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ভগবানকে তো ভালবাসেন?" মহীয়সী রাবেয়া উত্তর দিলেন "বাসি"। "আপনি শয়তানকে মনে করেন?" রাবেয়া উত্তর দিলেন "না"। আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কেমন?" রাবেয়া উত্তর দিলেন "ভগবানকে আমি এত ভালবাসি যে, শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিবার সময়ও আমার থাকেনা, এবং সেই স্থানও আমার মনে আর নাই। সমস্ত মনখানি ভগবানের ভাবনায় পূর্ণ।"

রাবেয়া তাঁহার মন ও দেহ সম্বন্ধে অত্যন্ত সুন্দর কথা বলিয়াছেন। "আমার দেহ আছে, দর্শকের ক্ষণিকের সাথীরূপে। কিন্তু ভগবান আমার হৃদয়ের চিরসাথী। একমাত্র আমারই প্রিয়তম।"

রাবেয়ার জীবনের শেষদিনগুলির কথা সব ভাল করিয়া জানা যায় নাই। শুধু জানিতে পারা যায় শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মহিমা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান নরনারীগণ রাবেয়াকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আসনে বসাইয়া আন্তরিক ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন।

তারপর যেইদিন ৭৫২ খৃষ্টাব্দে পুণ্যময়ী নারী দেহত্যাগ করিয়া ভগবানের কোলে বিলীন হইয়া গেলেন, সেদিন ভক্তগণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার পবিত্র নশ্বর দেহখানি জেরুজালেম নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে "টরু" পর্ব্বতের চূড়ায় সমাধিস্থ করিয়া রাখা হয়।

অদ্যাপি অগণিত মুসলমান নরনারীর নিকট ইহা পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

৩২। সাধক তানসেন।

(নবরস ও দেবী সরস্বতীর ব্যাখ্যা।)

সঙ্গীতাচার্য্য সাধক তানসেন, সম্রাট আকবরের দরবারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। তিনি যে কত উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন তাহা সম্রাট আকবরের সহিত তাঁহার নিম্নোক্ত কথোপকথন হইতে বুঝা যায়। সঙ্গীতজ্ঞ সাধক তানসেন বলেন :—

"সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার শিল্পকলার মূলে রয়েছে নবরস। এই নবরস আয়ত্তকরণের জন্য প্রত্যেকেরই করতে হচ্ছে এক দুশ্চর তপস্যা। এই নবরস হচ্ছে, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রুদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।"

শিল্পীর কদর যিনি দিতে জানেন, তিনি আরও মহৎ শিল্পী। কিন্তু নবরস আয়ত্ত করতে এই জগতে কেহই পারে নাই। ত্রিজগতে একজন শুধু পেরেছিলেন। তিনি জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ। আর তাই তিনি গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করতে পেরেছিলেন, যমুনাকে বহাতে পেরেছিলেন উজান। তাঁর বাঁশীর সুরে নবরসের সাগরে তিনি ডুবিয়ে দিতে পেরেছিলেন, সমস্ত ব্রজগোপিনীদের। তাদের বাহ্যজ্ঞানকে তিনি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে পেরেছিলেন। শুধু তাদের কেন, তিনি সমস্ত ব্রজমণ্ডলকেই নবরসের বন্যায় প্লাবিত করে গিয়েছেন। তাই তাঁর মত শিল্পী, তাঁর মত সুরজ্ঞানী, তাঁর মত রাজনীতিজ্ঞ, তাঁর মত যোদ্ধা, তাঁর মত সমাজনীতিবিদ ও তাঁর মত লীলাবিশারদ, এই ত্রিজগতে আজও দ্বিতীয় কেহ জন্মায় নি।

যন্ত্র সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাগ্‌দেবী সরস্বতীও এই নবরসকে আয়ত্তে আনতে পারেন নাই। সরস্বতীর মূর্ত্তিটীকে কল্পনা করিলেই এই প্রশ্নের জবাব সেখানেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সরস্বতী প্রতিমায় দেখতে পাবেন, সরসীর বক্ষে পদ্মের আসনে বীণা-পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী। ইহার তাৎপর্য্য কি?

বীণাযন্ত্রে অপূর্ব্ব ধ্বনিতরঙ্গ জাগিয়ে তুললেন—দেবী সরস্বতী। এই ধ্বনিই হচ্ছে “নাদ-ব্রহ্ম।” নবরসের হিল্লোলে তাঁর হাতের বীণায় নাদব্রহ্মের উত্তাল তরঙ্গ উঠলো। নাদরূপী নৌকাসমেত সুররূপী সমুদ্রে তিনি তলিয়ে গেলেন। সুরের বন্যায় তিনি ভাসিয়া চলিলেন। সুরের উর্দ্ধে তিনি তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাই নবরস অর্জ্জনে তিনি বঞ্চিতা হইলেন। দেবীর এই প্রতীক মূর্ত্তির পূজা করেন হিন্দুরা। এইবার কল্পনা করুন সরস্বতীর হস্তধৃত বীণাকে নাদরূপী নৌকারূপে। আর তাঁর পাদমূলের সরোবরকে তুলনা করুন, সুররূপী সমুদ্রের সঙ্গে। তা'হলে সরস্বতী প্রতীকটী অনায়াসে উপলব্ধি হবে।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় নবরস একজন (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যতীত আর কেহ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

৩৩। শিবানন্দ সরস্বতী।

(১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ)

মাদ্রাজের তিরুনেলভেলি জেলার অন্তর্গত পাট্টামাদাই গ্রামে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে শিবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত ঋষি আপ্পায়া দীক্ষিতের বংশের সন্তান। তিনি অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ডাক্তারী চাকরী লইয়া তিনি মালয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। তিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নানাপুস্তক প্রণয়ণ করেন এবং স্বাস্থ্য সমাচার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯২৪ ইংতে যখন তাঁহার অর্থকরী বিদ্যার ডাক্তারী ব্যবসা অত্যন্ত উচু স্তরে, হঠাৎ তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ঋষিকেশে ধ্যানযোগ ও তপ অভ্যাস করিতে থাকেন। নানা কঠোরতার মধ্যে তিনি অগ্রসর হন এবং আধ্যাত্মিক জীবনে দ্রুত উন্নতি করেন।

১৯৩২ সালে তিনি গঙ্গাতীরে শিবানন্দ আশ্রম স্থাপন করেন ও ১৯৩৬ ইংতে তিনি দিব্যজীবন সোসাইটি এবং ১৯৪৮ইংতে তিনি যোগ-বেদান্ত-বনবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার যোগ ও বেদান্ত বিদ্যালয়ে বহুলোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯৫৩ ইংতে তিনি বিশ্বধর্ম্ম কংগ্রেস আহ্বান করেন। যদিও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মতবাদ সর্ব্বজনোপযোগী ছিল। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে সুন্দর ও সুললিত ভাষায় প্রায় ২০০ পুস্তক প্রণয়ণ করেন। প্রত্যেকটী পুস্তক জনমানব ও সমাজ কল্যাণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতের তাঁহার বহু শিষ্য ও ভক্তসেবক বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তিনি সেরিব্রেল থ্রম্বোসিস রোগে ১৯৬৩ ইংর ১৪ই জুলাই তারিখে ঋষিকেশধামে গঙ্গাতীরে নরলীলা সম্বরণ করেন।

বর্ত্তমান যুগের আত্মিক জগৎ হইতে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, শিষ্য, ভক্ত ও সেবকদের শোকসাগরে ভাসাইয়া তিরোহিত হইল।

৩৪। ত্রৈলিঙ্গ স্বামী।

(১৫২৯ খৃষ্টাব্দ।)

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ভিজিয়ানা গ্রামের হোলিয়া নামক স্থানে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নৃসিংহদেবের বাস। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে অনেকদিন কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। ইহাতে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী ক্ষুব্ধা হন এবং পুত্র প্রার্থীনী হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস অবিচলিত থাকায় ব্রতানুষ্ঠানের কয়েক বৎসর পরেই তিনি ১৫২৯ খৃষ্টাব্দের পৌষমাসে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। ঈশ্বরারাধনা করিয়া পুত্র লাভ করায় মাতা তাহার নাম রাখিলেন শিবরাম। ইনিই উত্তরকালের প্রসিদ্ধ মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী।

শিবরামের মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মশীলা ও গুণবতী ছিলেন। শিবরাম মাতার যাবতীয় সদ্‌গুণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবরাম শিশুকাল হইতে মিথ্যাকথা বলা বা কদাচার পছন্দ করিতেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পাঁচবৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর মাতা শিবরামকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি করাইয়া দেন। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি প্রখর ও মেধা অসাধারণ। তিনি অল্প-দিন মধ্যেই সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন।

তৎপর মাতার পীড়াপীড়িতে তিনি বিবাহ করেন এবং যতদিন তাঁহার মাতা বাঁচিয়াছিলেন তিনি সংসারাশ্রমও করেন। ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। জননীদেবীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিবার সময় তাঁহার মনে সংসার-বৈরাগ্য জাগে। তাই তিনি গৃহে না ফিরিয়া সেইস্থানে থাকিয়া যান। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজনের অনুরোধেও তিনি তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। শিবরামের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে

দান করিয়া বলিলেন তিনি এই পাপময় সংসারে প্রবেশ করিবেন না। এতদিন মাতার অনুজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন মাতার অনুমতি পাইয়াছেন। সুতরাং এই সুযোগ আর ছাড়িবেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা অটল দেখিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঐ সমাধিস্থলে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন ও আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন। শিবরাম সংসার বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া একমনে যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর পরে তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন। ঘটনাচক্রে তিনি এক যোগী সাধুর দর্শন পান এবং তাঁহাকে একজন উচ্চকোটী যোগী বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই গুরুই দীক্ষান্তে তাঁহাকে নাম দিলেন "ত্রৈলিঙ্গস্বামী।" তদবধি তিনি ত্রৈলিঙ্গস্বামী নামে সর্ব্বত্র খ্যাত হন।

এই গুরুর নিকট তিনি যোগ শিক্ষা করিতে থাকেন। গুরুও উপযুক্ত পাত্র পাইয়া সানন্দে যোগশিক্ষা দেন ও দেহরক্ষা করেন। তাঁহার গুরুদেব দেহরক্ষা করিলে তিনি রামেশ্বর সেতুবন্ধে যান। তথায় তাঁহার কয়েকজন শিষ্য হয়। তিনি সেই কারণে রামেশ্বর থাকিতে বাসনা করেন। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। সেইখানে জনৈক মান্যব্যক্তিকে তিনি কালের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করেন। অনেককে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা বলিতে বাধ্য হইতেন। ইহাতে তাঁহার নিকট বহু জনসমাগম হইতে থাকে এবং যোগাভ্যাসের বিঘ্ন হইতে থাকে। তিনি সেইহেতু নেপাল চলিয়া যান। সেখানেও তাঁহার গুণগরিমা প্রকাশ পাওয়ায় সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতে :থাকে। তাই তিনি আরও দূরে তিব্বতে চলিয়া যান। তথা হইতে মানস সরোবরে গিয়া নিভৃতে সানন্দে যোগাভ্যাস করিতঃ সিদ্ধি ও ঋদ্ধি দুই লাভ করেন। তৎপর তিনি মোক্ষক্ষেত্র বারাণসীধামে আসেন। এইখানে তিনি প্রথমতঃ দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর থাকেন। তারপর অসিঘাট, তুলসীঘাট

প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া পঞ্চগঙ্গার ঘাটে যোগাশ্রম নির্ম্মাণ করেন। এইসময়ে অনেকেই তাঁহার নিকট যোগশিক্ষা করেন এবং তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্তম্ভিত হন।

শ্রীরামপুরের জয়গোপাল কর্ম্মকারের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিষয় বিত্তাদি পুত্রদের হাতে দিয়া কাশীধামে যান। তিনি স্বামীজীর নাম শুনিয়া তাঁহার দর্শনার্থে প্রত্যহ কিছু ফলমূল ও দুগ্ধ লইয়া যাইতেন। ক্রমশঃ তিনি স্বামীজীর কৃপালাভ করেন। একদিন তাঁহার অন্তর অত্যন্ত আকুল হইয়াছে কেন বুঝিতে না পারিয়া স্বামীজীর কাছে ইহা বলেন। স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "আজ ভোরে ৬টার সময় তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র মারা গিয়াছে। তুমি আজ রাত্রেই তাহাকে স্বপ্নে দেখিবে।" স্বামীজীর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। স্বামীজী বলিলেন, "এক ঈশ্বর ব্যতীত সকলই অনিত্য। যাহা অনিত্য তাহার জন্য দুঃখ বা শোক করা অজ্ঞানের কার্য্য। আলো ও অন্ধকারে যেমন পার্থক্য, জ্ঞান ও অজ্ঞানেরও তদ্রূপ পার্থক্য। অন্ধকার ভ্রমাত্মক ও বিপজ্জনক। আলোক ভ্রান্তিনাশক ও সুখকর।" জয়গোপাল বাবু স্বামীজীর উপদেশবাণী শ্রবণান্তে বাসায় ফিরেন এবং রাত্রে পুত্রকে স্বপ্নে দেখিতে পান। পরে বাড়ী হইতে তার পাইয়া জানিতে পারিলেন, স্বামীজীর সকল কথাই সত্য।

অসিঘাটের নিকটে এক ব্যক্তির সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন তাহাকে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল। দৈবযোগে স্বামীজী সেইখানেই জলের উপর ভাসিতেছিলেন। তিনি ক্রন্দনরতা সদ্যবিধবার বিলাপ শুনিয়া শবদেহের নিকট আসিলেন এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা একটু গঙ্গামৃত্তিকা ক্ষতস্থানে লেপিয়া দিলেন। তারপর গঙ্গাজলে ডুব দিয়া অদৃশ্য হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই সর্পদষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানসঞ্চার হইল। মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইল। তখন আত্মীয় স্বজনের চমক

ভাঙ্গিল। তাহারা বুঝিল মৃতব্যক্তির জীবনদাতা স্বামীজী ব্যতীত আর কেহই নহেন।

অনেকেই স্বামীজীকে কাশীর প্রচণ্ড শীতে আহার নিদ্রা ছাড়া ২।৩ দিন পর্য্যন্ত গঙ্গার জলে ভাসিতে দেখিয়াছেন। আবার দারুণ গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত প্রস্তরোপরি বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। কাশীতে আসিয়া তিনি কয়েকজন শিষ্য ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেন না এবং অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাহারও নিকট কিছু চাহিয়া খাইতেন না। যে যাহা মুখে আনিয়া ধরিত তাহাই খাইতেন এবং উহাতেই জীবন-ধারণ করিতেন। কতকগুলো দুষ্ট লোক তাঁহাকে ভণ্ড সাধু মনে করিয়া "কলিচুণ" জলে গুলিয়া তাঁহার মুখে ধরেন। তিনি তাহাদের মনোভাব বুঝিয়া তাহা সমস্তই পান করেন। দুষ্টেরা দেখিতে পাইল, স্বামীজী কোনপ্রকার মুখবিকৃতিও করিলেন না। তাহারা তখন ভীত হইয়া স্বামীজীর পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদের সম্মুখেই সেই পরিমাণ কলিচুণ প্রস্রাবের সহিত বাহির করিয়া দিলেন।

স্বামীজী সর্ব্বসাধারণ্যে উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন। ইহাতে পুলিশ তাঁহাকে কয়েকবার সাবধান করিয়া দেয়। তাহা না শোনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে হাজির করে। তথায় সকলে ও উকিলেরা বলে যে তিনি উচ্চকোটী সাধু পুরুষ। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে যদি তাহা সত্য হয় তবে স্বামীজীকে আমার খানার উচ্ছিষ্টাংশ খাইতে বল। স্বামীজী বলিলেন "যদি আমার খাবারের অবশিষ্টাংশ ম্যাজিষ্ট্রেট খান, তবে তিনিও তাহা খাইবেন। এই বলিয়া তিনি নিজহাতে মলত্যাগ করিয়া মুখে দিলেন এবং হাকিমকে খাইতে বলিলেন। হাকিম এইসব দেখিয়া স্বামীজীকে ছাড়িয়া দিলেন এবং সর্ব্বত্র উলঙ্গঅবস্থায় বিচরণ করিতে স্বামীজীকে অনুমতি দিলেন।

একদা একজন সরকারী অফিসার নৌকাযোগে রামনগর হইতে আসিতেছিলেন। কিছুদূরে স্বামীজীকে গঙ্গাজলে ভাসিতে দেখিয়া অনেক অনুনয় করিয়া তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লন। স্বামীজী নিজের খেয়ালবশতঃ রাজপুরুষের নিকট যে তরবারিখানা ছিল তাহা দেখিতে চাহেন। রাজকর্ম্মচারী তাহা কোষমুক্ত করিয়া স্বামীজীর হাতে দিলেন। স্বামীজী তরবারি দেখিবার সময় হঠাৎ তাহা গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া যায়। উহাতে রাজপুরুষ অত্যন্ত রুষ্ট হন। রাজপুরুষের রাগ দেখিয়া স্বামীজীর প্রধান শিষ্য ভয় পাইলেন ও বলিলেন "আপনি রাগ করিবেন না—আমি ডুবুরী আনাইয়া তাহা তুলাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি ডুবুরীর খোঁজে যান। ইত্যবসরে স্বামীজী তাঁহার শিষ্যকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইবে ভাবিয়া, নৌকার উপর বসিয়া জলে হাত দিলে ৩ খানি তরবারি হাতে পান। এই তিনখানি তরবারি রাজপুরুষের হাতে দেন। কিন্তু কোনটি রাজপুরুষের সে নিজে বাছিতে না পারায় স্বামীজী নিজে বাছিয়া দেন এবং অপর দুইখানি জলে ফেলিয়া দেন।

এক সময়ে পৃথ্বিগিরির শিষ্য রাজঘাটে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তিনি একদিবস স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তখন অনেক লোক সেখানে ছিল। তিনি আসিয়া স্বামীজীকে কি বলিলেন, তারপর উভয়েই অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে সকলেই তাঁহাকে সেখানে দেখিতে পান। কিন্তু পৃথ্বীগিরির শিষ্যকে আর কেহই দেখিতে পাইল না।

সেই সময়ে দয়ানন্দ সরস্বতীনামীয় এক বিখ্যাত বাগ্মী ৺কাশীধামে আসিয়াছিলেন। হিন্দুদেবদেবীর অসারত্ব প্রমাণ করিতে তিনি প্রয়াসী হন। স্বামীজী ইহা শুনিয়া একটী ছোট কাগজে কি লিখিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দয়ানন্দ উহা পাঠ করিয়া কাশী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মুঙ্গের ডিস্‌পেন্সারীতে উমাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি

কম্পাউণ্ডারী করিতেন। তিনি পুনর্জন্ম আছে কিনা জানিতে চাহেন। প্রথম দুই তিনদিন স্বামীজীর আশ্রম হইতে তিনি বিতাড়িত হন। আর একদিন স্বামীজীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে থাকিলে তিনি বলেন "তুমি যাহা জানিতে চাহিতেছ তাহা সত্য। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ তপোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবলে যে সকল বিষয় চূড়ান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়।"

উমাচরণ বাবুর কতকগুলো খারাপ কাজের কথা জানিতে পারিয়া প্রথমতঃ স্বামীজী তাঁহাকে শিষ্য করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু তাঁহার দেবদ্বিজে অটল ভক্তি দেখিয়া উমাচরণবাবুকে স্বামীজী আশ্রয় দেন ও শিষ্য করেন।

ঠিক এই সময়ে ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্‌কি ও কর্ণেল আলকট বোম্বে আসিয়া থিওশফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। তাঁহারা অদ্ভুত যোগশাস্ত্র বিদ্যার মহিমা প্রচার করিতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে এক একটি যোগসাধন ক্রিয়ার অলৌকিকতা দেখাইয়া যোগসিদ্ধির শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। উমাচরণবাবু এই বিদুষী ম্লেচ্ছ মহিলার যোগসিদ্ধি কেমনে হইল, জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী বলিলেন "ওসব যোগসিদ্ধির ফল নহে। ইন্দ্রজাল মাত্র। শীঘ্রই ধরা পড়িবে।" বস্তুতঃই ম্যাডাম কুলুম নাম্নী এক খৃষ্টিয় মহিলা ম্যাডাম ব্যাভাটস্‌কির সহচরীরূপে থাকিয়া সব জানিতে পারেন, ও সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেন। ইহার পর ম্যাডাম ব্যাভাটস্‌কির কুহক বিদ্যার আর পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতার জনৈক উকিল কাশী বেড়াইতে যান। সাধু সন্ন্যাসী তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে তিনি ভণ্ড বলিয়া বলিতেন। একদিন স্বামীজী মণিকর্ণিকা ঘাটের ব্রহ্মনলের উপর বসিয়া আছেন। এই উকিলবাবু তখন তাঁহাকে দেখিতে যান। উকিল বাবুর উপর স্বামীজীর দৃষ্টি পতিত হওয়া মাত্র তিনি

উকিলবাবুকে সরিয়া যাইতে বলেন। কারণ কি জানিতে চাহিলে স্বামীজী শিষ্যের দ্বারা বলিয়া পাঠান "উকিলবাবু ভয়ানক পাপী। তিনি যাহার গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন তাহারই সঙ্গে তিনি রতিক্রিয়ায় লিপ্ত।" অনুসন্ধানে জানা যায়, স্বামীজীর কথা সত্য।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ৺কাশীধাম পঞ্চগঙ্গার গর্ভে ত্রৈলিঙ্গস্বামী "লাঠ" নামক এক প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তৎপর পঞ্চগঙ্গার উপরে যে আশ্রমে তিনি থাকিতেন সেখানে "ত্রৈলিঙ্গেশ্বর" নামে আর একটী শিবলিঙ্গ মহাসমারোহে স্থাপন করেন। মঙ্গলপ্রসাদ নামক একজন শিষ্য উহার সেবক হন। এই আশ্রমে স্বামীজীর একটি প্রতিমূর্ত্তিও স্থাপিত আছে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাসে শুক্লা একাদশীর সন্ধ্যায় স্বামীজী নরদেহ ত্যাগ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন সেইদিনই তাঁহার কালপূর্ণ হইবে। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থিরভাবে নরলীলা সম্বরণ করেন। তিনি ২৮০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। ইনি হিন্দুরীতিতে পবিত্র জীবন গঠন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গস্বামী নানা উপদেশ সম্বলিত "মহাবাক্য-রত্নাবলী" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান।

স্মরণে এই উৎসবের আয়োজন হয়। তদবধি বঙ্গদেশে নানাস্থানে এই তিথিতে জন্মোৎসব হইয়া আসিতেছে।

ঠাকুরের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ভক্তগণের আগ্রহে ও আনুকুল্যে তিনি নৈনিতাল, বৃন্দাবন, আসাম ও বঙ্গদেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তৎপর তিনি ভক্তদের ইচ্ছায় একটি স্থায়ী আশ্রমের জন্য মত দেন এবং চট্টগ্রাম পাহাড়তলী এলাকায় একটি টিলা পাহাড়ে "কৈবল্যধাম" নামে আশ্রম নির্ম্মিত হয়। ইহা এত জনপ্রিয় ও এখানে এত জনসমাগম হয় যে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ "কৈবল্যধাম" নাম দিয়া এই পাহাড়ের সানুদেশে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন খুলিয়াছে। নোয়াখালী, চান্দপুর, কুমিল্লা, ফেনী, চৌমুহনী প্রভৃতি স্থানে ঠাকুরের বহুভক্ত ছিলেন ও আছেন। ঠাকুরের বাণী ছিল "আমি পূজা করি—এই অহংজ্ঞানে যদি পূজা করিয়া থাকেন, তবে যেন পূজা না করেন। নারায়ণের পূজা নারায়ণ আপনার দ্বারা করাইতেছেন, যদি এইভাব লইয়া পূজা করিতে পারেন, তবেই পূজা করিবেন, এবং সেক্ষেত্রে তিনি আপনার পূজা গ্রহণ করিবেন। ঠাকুরের মতে নরনারী উভয়েরই পূজায় সমান অধিকার আছে। যে কোন ব্যক্তি শুচিদেহে একাগ্রচিত্তে ও একনিষ্ঠা ভক্তি সহকারে আরাধ্য দেবতার অর্চ্চনা করেন, দেবতা অবশ্যই তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষের বিচার নাই।" ভক্তেরা ঠাকুরের নামে ও স্মরণে চৌমুহনী, ডিঙ্গামাণিক, পাহাড়তলী (চট্টগ্রাম) ও কলিকাতায় বৃহৎ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইসব মন্দিরে প্রত্যহ বহু অতিথি সেবা হয় এবং উপস্থিত সকলেই প্রসাদ পায়।

ঠাকুর এই সময়ে হঠাৎ একদিন ফেনী হইতে চৌমুহানী আসিলেন। সেখানে আসিয়া অপ্রকট হইলেন। দুর্দ্দিন আসিয়া পড়িল। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১৮ই বৈশাখ (১।৫।১৯৪৯ ইং) রবিবার পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে মাহেন্দ্রক্ষণে অগণিত ভক্তের প্রাণের

ঠাকুর তাহাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। ৯০ বৎসর পূর্ব্বে এই শুভ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে তিনি মাতৃজঠরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আজ আবার সেই সত্যযুগাদ্যা পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়াতে সত্যের পূজারী শ্রীশ্রীরামঠাকুর বা রামভাই মহাপ্রয়াণ করিলেন। তিনি সেখানে যে কক্ষে বাস করিতেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই কক্ষেই তাঁহার সমাধি ক্ষেত্র নির্ব্বাচিত হইল। একাদশ দিবসে ভক্তগণ চৌমুহনীতে এক বিরাট উৎসব সম্পন্ন করিলেন।

ঠাকুর ভক্তগণের লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন সত্য। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে যে আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন, তাহা হইতে কখনও অন্তর্হিত হইতে পারিবেন না। আমরা আজ আবার নূতন করিয়াই সেই প্রার্থনাই তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি। তাঁহার শিক্ষা আমাদের যাত্রাপথে সহায় হউক।

সাধু তারাচরণ।

(১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ)

গুজরা-নয়াপাড়া চট্টগ্রাম জিলার একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। ইহা পুণ্য-সলিলা কর্ণফুলী ও হালদা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই পল্লীগ্রামে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২৯শে ফাল্গুন বুধবার কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সাধু তারাচরণ সম্ভ্রান্ত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺রসিকচন্দ্র দত্ত এবং মাতার নাম ৺অমলা দেবী।

শৈশবকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত শুদ্ধাচারী, সরল, সত্যনিষ্ঠ এবং অনাড়ম্বর ছিলেন। পিতামাতার প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য তাঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল।

বালক তারাচরণ যৌবনে পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতামাতা তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। পিতৃমাতৃভক্ত পুত্রের পক্ষে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইল না। তিনি বিবাহ ব্যাপারে নীরব রহিলেন। সুতরাং ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৯শে বৈশাখ তাহার বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইল। তিনি "মা" "মা" বলিয়া একান্তে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণ ক্রন্দনে প্রকৃতি দেবীর অন্তরও বোধহয় দ্রবীভূত হইল। বিবাহের পর নববধূ লইয়া ফিরিবার সময় ভীষণ ঝড়ে হালদা নদী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। উত্তাল তরঙ্গে যাবতীয় যৌতুকাদিসহ কন্যাকে ও অন্যান্য আরোহীগণকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। কন্যা ও লোকজন কোনপ্রকারে প্রাণে রক্ষা পাইলেন কিন্তু বরকে পাওয়া গেল না। ইহাতে সকলে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর নববিবাহিত যুবককে ধ্যানস্থ অবস্থায় চট্টগ্রাম জিলার ধলঘাট গ্রামে ৺বুড়াকালীবাড়ীতে পাওয়া গেল।

ধলঘাটস্থ বুড়াকালীর মন্দির প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বুড়াকালী সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে। ইহা কথিত আছে যে তিনি একদা এক বালিকার বেশে কোন পুণ্যবতী বালিকার অঙ্গে স্বীয় আভরণ পরাইয়া দিয়া তাহাকে তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গিনী করিয়াছিলেন।

মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গনে বহু পুরাতন এক অশ্বত্থবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরটী কালপ্রবাহে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অশ্বত্থ বৃক্ষ মন্দির প্রাচীর ভেদ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে গাঢ় অন্ধকার। ইহার ভিতর বিষধর সর্পের বিবর সকলের ভয়ের কারণ হইয়াছিল। পূজারী ব্রাহ্মণ ভীত শঙ্কিতচিত্তে কোনরূপে পূজা সমাপন করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিতেন। সেই নির্জ্জন ভুজঙ্গ-সঙ্কুল জীর্ণ কালী-মন্দিরে তারাচরণের সাধন-জীবন আরম্ভ হয়। বুড়াকালী বাড়ীর অদূরে একটী পুরাতন শিবমন্দির এবং ইহার পূর্ব্বদিকে একটী শ্মশান অবস্থিত। শ্মশানটী জঙ্গলাকীর্ণ এবং সর্প-শৃগাল অধ্যুষিত। এই শিবমন্দির ও শ্মশানভূমিতেও সাধু তারাচরণ সাধনা করিতেন। এই শ্মশানক্ষেত্রে শ্মশানকালীর সাধনা, শিববাড়ীতে উপাসনা ও ৺বুড়াকালীবাড়ীতে গভীররাত্রে আরাধনা তাঁহার নিত্যকর্ত্তব্য ছিল। এইভাবে তাঁহার সাধনা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহার উপাসনার মহামন্ত্র "মা, মা" ও পবিত্র অশ্রু-জল। তাঁহার "মা" "মা" রবে কাতর ক্রন্দনে উপাসনাস্থল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। তিনি ভাবের আবেশে তন্ময় হইয়া স্বরচিত গান করিতেন। এইভাবে কঠোর সাধনায় দেহ ক্ষয় করিতে করিতে, তিনি এক পবিত্র জীবন গঠন করিয়া লইলেন ; তাঁহার লজ্জা ভয় বিদূরিত হইল। মায়ের চরণে লুটাইতে লুটাইতে তাঁহার কপালে কাল দাগ পড়িয়া গেল। তাঁহার অন্তর্চক্ষু উন্মীলিত হইল এবং দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কোন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দেখিবা-মাত্র তাহার নাম ধাম ও জীবন-ইতিহাস অক্লেশে বলিয়া দিতে

পারিতেন। বহু বৎসর কালীমায়ের একনিষ্ঠ সাধনা করিতে করিতে তিনি মায়ের জন্য সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গেলেন। সকলে তাঁহাকে পাগল বলিয়া আখ্যা দিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর নিশিথে বুড়াকালীমার জীর্ণ মন্দিরে উপাসনা করিতে লাগিলে গ্রামস্থ লোকজন ইঁহার সন্ধান পাইয়া কালীমন্দিরের দ্বার তালাবদ্ধ করিয়া গোপনে তাঁহার পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন তারাচরণ গভীর রাত্রে আসিয়া "মা দ্বার খোল" বলিলে দ্বার তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত হয় এবং সাধক অক্লেশে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সাধনা করিতে থাকেন। ইহার পর হইতে তাঁহাকে জনসাধারণ প্রকৃত সাধু বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার জন্য মন্দির-দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা হইত। তিনি মায়ের অলৌকিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইলেন। তিনি শীত গ্রীষ্ম অভেদে বহুবার স্নান করিতেন এবং শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতেন। অসুখের সময় তিনি মায়ের চরণামৃত ছাড়া অন্য কোন ঔষধ খাইতেন না এবং ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেও কদাপি স্থান পরিত্যাগ করিতেন না। ব্যাধিগ্রস্ত লোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের কাকুতি মিনতিতে বিগলিত হইতেন এবং অনেক সময় তাহাদের ব্যাধি আকর্ষণ করিয়া নিজে গ্রহণ করিতেন।

অতঃপর পাগল তারাচরণ সাধু তারাচরণ নামে অভিহিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে ছাত্র সমাজ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার বাক্য ও আশীষের শক্তি সম্যক ক্রিয়াশীল ও ইহাতে সুফল হয় দেখিয়া ছাত্রেরা তাঁহাকে সিদ্ধবাক বলিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিলেন।

ক্রমশঃ বুড়াকালীর মন্দিরে ও সন্নিহিত শ্মশানপার্শ্বস্থ শিব-মন্দিরে বিপুল জনসমাগম হইতে লাগিল। অসংখ্য নরনারী নানা অভাব, অভিযোগ এবং আবেদন নিবেদন লইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। তিনি কাহাকেও নিরাশ করিতেন না।

একে একে সকলের আশা অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। মা-কালীর সাধক তারাচরণ সমবেত পাপীগণের পাপের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং শাসন দণ্ড ধারণ করিয়া বহু পাপী ব্যক্তির মস্তক মুণ্ডন করাইতে লাগিলেন। ইহাতে সমাজেও ব্যক্তিগত জীবনে বহুলোকের উপকার হইল।

পরোপকার তাঁহার স্বভাবগত স্পৃহা ছিল। তিনি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোন অতিথি যেন অভুক্ত না যায় তৎপ্রতি তাঁহার কঠোর দৃষ্টি থাকিত। তিনি সমবেত সকলকে মায়ের প্রসাদ বিতরণে পরিতৃপ্ত করিতেন। ইহাতে তিনি নিজেও পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন।

তিনি সাধক জীবনে বহুবৎসর অনাহারে ছিলেন। তারপর ইচ্ছা হইলে সামান্য ফলমূল আহার করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাতে তাঁহার দেহের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই।

মা চিরকালই একনিষ্ঠ ভক্ত সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কালক্রমে তাঁহার অপরিসীম দয়া সাধক তারাচরণের উপর বর্ষিত হইল। সাধক তারাচরণ মায়ের কোলে স্থান পাইলেন। মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন লাভে অস্পষ্টভাবে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মায়ের পূজা সমাপ্ত করিতেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি, বাংলার বহুসংখ্যক মহর্ষি সাধক তারাচরণের পদতলে আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য ধলঘাটের ধূলিকে পবিত্র করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তি ও দিব্যজ্ঞানের কথা শুনিয়া কয়েকজন প্রখ্যাত সন্ন্যাসী তাঁহার দশনার্থে ধলঘাট গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নোয়াখালির মঈনুদ্দিন বাউল, যোশীমঠের সন্ন্যাসী মহারাজ, চট্টগ্রাম দত্তাত্রেয় আখাড়ার শ্রীশ্রীমৎমঙ্গলগিরি, শ্রীশ্রীমৎসূর্য্যগিরি এবং কলিকাতার পিতাম্বর গিরির নাম উল্লেখ-

যোগ্য। কথিত আছে এক অন্ধ ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল। তখনকার সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুৎ রমেশচন্দ্র সেন প্রমুখ বহু গণ্য মান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য হইয়াছিলেন।

চট্টগ্রামের তদানীন্তন সিভিল সার্জ্জন মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর বাড়ী হইতে বহুমূল্যবান অলঙ্কার ও প্রচুর নগদ টাকাসহ লোহার সিন্ধুক চুরি যায়। বহু অনুসন্ধানের পর ও যখন পাওয়া গেল না এবং পুলিশের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও যখন ব্যর্থ হইল তখন মেজর মুখার্জ্জী সাধু তারাচরণের শরণ লইলেন এবং ধলঘাট বুড়াকালী বাড়িতে সাধু তারাচরণের নিকট যান। সাধু তারাচরণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অপহৃত সিন্ধুকটী চট্টগ্রাম সহরের কোন জলাশয়ে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। তদনুসারে অনুসন্ধান চালাইয়া কিছুদিন পরেই কোন এক বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে অপহৃত সিন্ধুকটী পান। তারপর মেজর মুখার্জ্জী সাধু তারাচরণের একজন পরম ভক্ত হইলেন।

কোন এক হিন্দু রমণী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া পিত্রালয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাহার ভগিনী সাধুর বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। এই মহিলাভক্তের অনুরোধে সাধু তারাচরণ সেই রমণীর এক পুত্রসন্তানলাভের জন্য বর দিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে রমণীটির স্বামী কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে ফিরিয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হইলেন। সাধুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণে সেই স্ত্রীকে লইয়া তিনি পুনরায় কলিকাতায় গেলেন। যথাসময়ে সেই স্ত্রীলোকটির এক পুত্রসন্তান লাভ হয়। এই পুত্রটি সাধুর কৃপাতেই পান। চট্টগ্রাম কোর্ট অব ওয়ার্ডসের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ ব্যানার্জ্জী সাধুর পরমভক্ত ছিলেন। তাঁহার একটি মেয়ে হইবার পর বহু বৎসর যাবৎ কোন সন্তানাদি না হওয়ায় সাধু তারাচরণ তাঁহাকে পুত্র সন্তান লাভের বর দিয়াছিলেন।

ইহার ফলে শ্যামানন্দবাবু এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। সাব-ডেপুটী মৌলবী মণিরুদ্দিন সাধুর অলৌকিক শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য কন্যাদায়গ্রস্থ এক মুসলমান ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া সাধুর নিকট যান। দরিদ্র মুসলমানটি তাঁহার মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য সাধুর নিকট নিবেদন করিলেন। মনিরুদ্দিনের অনুরোধে সাধু এই কার্য্য করিতে রাজী হইলেন এবং মাথার উপর কাপড় দিয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ক্রন্দনের পর সাধু গৃহ হইতে বাহির হইয়া চোখ মুখ ধুইয়া আসিয়া বলিলেন পরদিন মেয়েটির বিবাহ হইবে। তিনি আরও বলিলেন—"আপনারা এখনি গৃহে যান, বাড়ীতে বরপক্ষের লোক আসিয়া বসিয়া আছেন। মৌলবী মনিরুদ্দিন ও মুসলমান ভদ্রলোকটি সাধুর কথা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই বরপক্ষের লোক মুসলমান ভদ্রলোকটির বাড়ীতে বসিয়া আছে। সেই দিনই মেয়ের বিবাহের জবাব হইল এবং তৎপরদিন মেয়ের বিবাহ হইল।

কলিকাতার প্রতিভা প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর কমলা নাম্নী এক মেয়ে ছিল। দেবেনবাবু মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মেজর মুখার্জ্জী সাধুকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন এবং তিনি তাঁহার ভ্রাতা দেবেনবাবুকে সাধুর নিকট লইয়া আসিলেন। দেবেনবাবু সাধুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "মেজদা, এই কি তোমার সাধু? তাঁহার তো ভেক নাই।" মেজর মুখার্জ্জী বলিলেন প্রণাম কর। দেবেনবাবু সাধুকে অনিচ্ছার সহিত প্রণাম করিলেন। কয়েকদিন পরে তাঁহার কন্যা কমলার বসন্ত লুপ্ত হইয়া মেয়েটি মারা যাইবার উপক্রম হইলে পরিবারস্থ সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাত্রি বারটার সময় সাধু কোথা হইতে আসিয়া সকলকেই অভয় দান করিলেন। তিনি মেয়েটির গায়ে হাত বুলাইবামাত্র লুপ্ত বসন্ত উঠিয়া গেল।

মেয়েটি আরোগ্য লাভ করিল, এবং আজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পরে কমলা গুজরা গ্রামে সাধুর স্ত্রীর নিকট থাকিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন।

এইরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং অনেকে তাঁহার ভক্ত হইল। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের বহু লোক তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। তিনি শুধু মন্দিরেই প্রার্থনা করিতেন তাহা নহে, মস্‌জিদ এবং গির্জাতেও তিনি প্রণাম করিতেন। তাঁহার সিদ্ধিস্থান ধলঘাটে যে 'শ্রীতারাচরণ সিদ্ধাশ্রম' মন্দির নির্মিত হইয়াছে তাঁহারই নির্দ্দেশে ঐ মন্দিরে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বজাতির ভক্ত আপন ধর্মমন্দির মনে করিয়া সেখানে আপন আপন ধর্মানুযায়ী উপাসনা করিতে পারে। সত্যই ধর্ম্ম, অসত্য অধর্ম্ম। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি বলিতেন— "চাহিনা অর্থ চাহিনা মান, চাহি শুধু ধর্ম্মগতপ্রাণ। সত্যবাদী হও। চরিত্রবান হও। মানুষ সত্যের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হইবে সত্য অবলম্বন করিলে।" এই জন্য চট্টগ্রাম শহরে, কলিকাতা, গয়া, কাশী, তাঁহার সিদ্ধি স্থান ধলঘাট, জন্মস্থান গুজরা প্রভৃতি নানাস্থানে তারাচরণ সত্যসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে এই মহাপুরুষ দেহ রক্ষা করেন।

৩৭। ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

(১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ)

কানপুরের অন্তর্গত "মৈথেলালপুর" গ্রামে মিশ্রলাল মিশ্রের নিবাস। তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। বেদ ও পুরাণে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে শুক্লা-সপ্তমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে এই কনৌজ ব্রাহ্মণ মিশ্রলাল মিশ্রের ঔরসে মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী জন্মগ্রহণ করেন। মিশ্রলাল নবজাতকের নাম 'মতিরাম' রাখেন। অষ্টম বৎসরে মতিরামের উপনয়ন হয়। তৎপর পাঠাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে প্রেরিত হন। যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে সপ্তদশ বৎসর বয়সে মতিরাম একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। দ্বাদশবৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হয়। কিন্তু এই পুত্রটী শৈশবেই মারা যায়। ইহাতে মতিরামের অন্তরে বৈরাগ্য জন্মে। তিনি সংসার ত্যাগ করেন ও প্রথমে উজ্জয়িনীতে যান। এই স্থানে উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট "যোগমার্গনিদর্শক" গ্রন্থাবলী অধ্যয়ণ করেন ও যোগাভ্যাসে রত হন। কয়েক বৎসর উজ্জয়িনী নগরীতে বাস করিয়া গুজরাট ও মালব দেশে গমন করেন। তথায় সাত বৎসর থাকিয়া সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি উজ্জয়িনীতে আসেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ পরমহংস পূর্ণানন্দ সরস্বতীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। পূর্ণানন্দ সরস্বতী মতিরামকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া দীক্ষা দেন ও মতিরাম নামের পরিবর্ত্তে শ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতী নাম প্রদান করেন। সেই হইতে ইনি ভাস্করানন্দ সরস্বতী নামে সর্ব্বত্র বিদিত। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। ভাস্করানন্দ স্বামী ঐ আশ্রমে কিছুদিন থাকিবার পর কাশীধামে আসেন ও কাশীর দুর্গাবাড়ীর সন্নিকটস্থ আনন্দবাগে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করেন।

কয়েক মাস এই আশ্রমে থাকিয়া তিনি ফতেপুরের অন্তর্গত অশনিপুরে আসেন এবং তথা হইতে কানপুর হইয়া জন্মভূমি দর্শনে যান। ইহার পর স্বামীজি কেবলমাত্র কৌপীন পরিধান পূর্ব্বক ভারতের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া কাশীধামের আনন্দবাগ আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। ইহা কথিত আছে ভারতের প্রায় সকল তীর্থই তিনি পরিব্রাজন করেন।

বদরিকাশ্রমে যাওয়ার সময় পথে তুষার পতন হওয়ায় স্বামীজি অত্যন্ত কষ্ট পান। শীতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে ও তিনি মৃতপ্রায় হন। এই সময়ে এক মহাজন শেঠ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি সেবা শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহার জীবনরক্ষা করেন। এই স্থানে সাধু অনন্তরামের সহিত তাঁহার দেখা হয়। বেদান্ত বিত্তায় সাধু অনন্তরাম সুপণ্ডিত ছিলেন। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ধর্ম্মালোচনায় কয়েক বৎসর সেখানে অতিবাহিত করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি পুনঃ কাশীধামের আনন্দবাগ আশ্রমে আসেন। এইখানে আসিয়া তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কৌপীন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন। কাশীবাসী রাজন্যবর্গ ও বিদ্বৎমণ্ডলী তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলে তিনি বলেন "সমীচীন ব্যক্তি যে বস্তু একবার ত্যাগ করে তাহা পুনরায় গ্রহণ করে না।"

স্বামীজি অত্যন্ত ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন। ইঁহার যোগ ও তপস্যার খ্যাতি চারিদিকে এত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি নিরিবিলি থাকিতে পারিতেন না। জনশ্রুতি আছে যে স্বামীজির লক্ষাধিক শিষ্য ছিল। কেবল দেশস্থ ভক্তজনেরাই যে স্বামীজির মহত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, এমন নহে। নব্য, সভ্যতম, সুশিক্ষিত ইউরোপ ও আমেরিকার মহান ব্যক্তিগণ ইঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

তপঃপ্রভাবে ভাস্করানন্দ স্বামীর অনেক অমানুষিক ক্ষমতা

জন্মিয়াছিল। কিন্তু তিনি এই ঐশিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতেন না। দুই একটা ঘটনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

বরহরনগরের বেদশরণ কুমারীর কোন অভীষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে স্বামীজি ভবিষ্যৎ ফল বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হওয়ায় তিনি লক্ষাধিক টাকা স্বামীজিকে নজর দিতে আসেন। স্বামীজি তাহা গ্রহণ না করায় তিনি আনন্দবাগ উদ্যানের সন্নিকটে এক সুবৃহৎ শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

কাশীধামে শীতলপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি স্বামীজির শিষ্য ছিলেন। এক দিবস তাঁহার এক পুত্র দোতালার ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া মরণোন্মুখ হয়। তিনি ডাক্তারের কাছে না গিয়া গুরুদেবের নিকট হাজির হইলে, স্বামীজি পুত্রকে খাওয়াইতে কিছু গঙ্গাজল দেন। তাহাতেই ছেলেটী ভাল হইয়া যায়।

কলিকাতা হইতে এক ব্যক্তি স্বামীজির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে গেলে তিনি তাহাকে তাহার একান্ত গোপন কথা বলিয়া দেন এবং পাশের বাড়ীর যে রমনীটার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সে যে তাহার জ্ঞানদাত্রী তাহা বলেন। স্বামীজির অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া লোকটী স্বামীজির পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে থাকে ও পরে তাঁহার শিষ্য হয়।

স্বামীজির মতে সংসারী হইয়াও যোগসাধন করিতে পারা যায়। সাংসারিক যোগী, যদি উদাসীন যোগীর মত চিত্ত ও মন স্থির রাখিতে পারেন তবে ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন।

তিনি যোগ কাহাকে বলে, যোগশিক্ষা করিতে হইলে কি কি জানা আবশ্যক, এবং তজ্জন্য গুরু একান্ত প্রয়োজন, দেহ জ্ঞান, ষট্‌চক্র কাহাকে বলে, আসন কত প্রকার, সিদ্ধাসন কাহাকে বলে, মুদ্রা কত রকম আছে, প্রাণায়াম কিরূপে করিতে হয়, ইত্যাদি বহু উপদেশ দিয়াছেন। তাহা একমাত্র সদগুরুগম্য।

ধ্যান সম্বন্ধে স্বামীজি বলেন, ধ্যান দুই প্রকার। স্থূল ও সূক্ষ্ম।

মন্ত্রদ্বারা রূপাদি বর্ণনা করিয়া যে ধ্যান করা হয় তাহাকে স্থূল ধ্যান বলে। আর মন্ত্রশূন্য ধ্যানকে অর্থাৎ মানসপটে ব্রহ্মরূপ অঙ্কিত করিয়া তদ্গত থাকাকে সূক্ষ্মধ্যান বলে।

সূক্ষ্মধ্যানে মগ্ন হইয়া যোগবলে শ্বাস প্রশ্বাসাদি পরিত্যাগ করিয়া পরমব্রহ্মে চিত্ত স্থির করাকে সমাধি বলে। সমাধি সময়ে চিত্ত পৃথিবীর সঙ্গে সংস্পৃষ্ট থাকে না। তখন আর পার্থিবজ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না।

স্বামীজি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৫ আষাঢ় রবিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় সমাধি অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর রাত্রে সমাধিতে বসিবার পূর্বে স্বামীজি তাঁহার আশ্রমস্থ শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! এই আমার শেষ সমাধি। আমার সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে। অদ্য রাত্রেই এই নশ্বর দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে"।

স্বামীজির মরদেহ শিষ্যগণ ভাগীরথীর জলে স্নান করাইয়া ভাগীরথীর তীরে দাহ করেন। দাহান্তে অবশিষ্টাংশ, অস্থি ও কিছু ভস্ম আনন্দবাগে সমাধি দেন।

কাণপুর নিবাসী গয়াপ্রসাদ নামক একজন ভক্ত স্বামীজির সমাধিমন্দির নির্ম্মাণার্থে একলক্ষ টাকা দান করেন। সেই অর্থে স্বামীজির সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং তাহা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

৩৮। লালন শা ফকির।

(১৮৯০ খৃষ্টাব্দ)

লালন শা ফকির কুষ্টিয়া জিলার হিন্দুকায়স্থ পরিবারের সন্তান। তাঁহার জীবনীর কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। যতদূর জানা যায় তিনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন এবং শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের দর্শনের জন্য সঙ্গীগণ সহ পুরী যাত্রা করেন। পথে তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। বসন্তরোগ অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি বিধায় ভয়ে সঙ্গীয় তীর্থযাত্রিরা তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়।

ঘটনাচক্রে সিরাজনামক জনৈক মুসলমান ফকীর তাঁহাকে দেখিতে পান। তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পরম যত্ন সহকারে বসন্তরোগাক্রান্ত লালনকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে লইয়া আসেন। তৎপর তিনি ও তাঁহার স্ত্রী নানাবিধ চিকীৎসা ও বহু সেবাযত্ন করিয়া লালনকে সুস্থ করেন।

সিরাজ নিজেই একজন উচ্চস্তরের ফকীর। লালন সুস্থ হইবার পর সিরাজ ও তাঁহার স্ত্রীর আত্মত্যাগ দেখিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও সিরাজ ফকীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

সিরাজ বাউল ফকীর এবং সুফীভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তাঁহার শিষ্য লালন শা অল্পদিন মধ্যে 'বাউল' মতবাদে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি বৈরাগ্যভাবাপন্ন হইয়া বহু বাউল গান রচনা করিয়াছেন। ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে বাঙ্গলার বাউলগান রচয়িতাদের মধ্যে লালন ফকীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই সম্প্রদায়ের ফকীরের সাধনতত্ত্ব ও ক্রিয়াপদ্ধতি বাউল গানের মাধ্যমে নানারূপকের ছলে লালন ফকীর বিবৃত করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের সাধনা একান্তভাবেই দেহকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত

হয়। এইখানেই বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে ঐক্য দৃষ্ট হয়। বাউলেরা মায়াবাদীদের মত নিখিল বিশ্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে না। আত্মসাধনার ক্ষেত্রে তাঁহারা পরম পুরুষ বা পরমাত্মাকে অন্তরে খুঁজিয়া বেড়ান এবং তাঁহার সঙ্গে একাত্ম হইবার জন্ম আকুল ভাবে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে দেহ হইতেছে এই মিলনের ক্ষেত্র। নরনারীর মধ্যে যে সহজিয়া সম্পর্ক আছে তাহার ভিতর দিয়া ইঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত জগতে পৌছাইতে চাহেন।

লালন ফকিরের গানে এই একান্ত গুহ্য সাধনতত্ত্বের উল্লেখ আছে। যথা— অমবস্যার চন্দ্র উদয়

দেখ্‌তে যার বাসনা হৃদয়

লালন বলে থেকো সদায়

ত্রিবেণীতে থেকো বসে।

সাধন প্রণালীর বাহিরে জীবন ও জগত সম্বন্ধে বাউলদের যে দিব্য দৃষ্টি রহিয়াছে এবং যেভাবে সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হইতে তাঁহারা চেষ্টা করেন, তাহা জনসাধারণের চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করে। বাউলেরা বলেন জগৎ অনিত্য।

লালন ফকীর বলেছেন—

তুমি কার বা কে তোমার এই সংসারে,

মিছে মায়ায় মজে কেন, এমন করোরে।

এই অনিত্য সংসার হইতে নিত্যলোকে যাওয়ার জন্য তার প্রাণের আকুলতা তাঁরই করুণ গানে প্রকাশ পেয়েছে :—

পার করো, দয়াল আমায়, কেশ ধরে,

পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে,

মন-তরী তার দু'জন মাল্লায়,

সদা তা'রা কুকাণ্ড বাধায়

ডুবালো যে ঘাটায়, আজ আমারে।

তিনি পুনঃ নিজকে জিজ্ঞাসা করেন,

আমি আর কতদিন ঘুরব এমন নাগর দোলায়।

আবার সকলকে ডাকিয়া বলেন, আকুল আহ্বান করেন, নিত্যলোকে যাইতে।

আয়! কে যাবি ওপারে।

মানুষের মধ্যে তিনি দেবত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন,

অমন মানবজনম আর কি হবে?
মন যা করো, ত্বরায় করো, এ ভবে।
অনন্তরূপ সৃষ্টি কর্‌লেন, সাঁই,
শুনি, মানবের উত্তর কিছুই নাই
দেব দেবতাগণ করেন আরাধনা
জনম নিতে মানবে।

লালন ফকির সর্ব্বধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ও সর্ব্বমানবের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন। তিনি বলেন,

যে যা' ভাবে, সে সেরূপ হয়
রাম রহিম করিম কালা, এক আল্লা জগৎময়।
কথা কয়রে, দেখা দেয় না, নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে তারে, জনমভর মিলে না।
রাম রহিম সে কোন জন, মাটী কি পবন, জল কি হুতাশন,
শুধাইলে তার অন্বেষণ, মুর্খ দেখে আমায় কেউ বলে না।
হাতের কাছে হয় না খবর, কি দেখ্‌তে যাও দিল্লী লাহোর,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোর, সদায় মনের ভ্রম যায় না।

ফকিরি কর্‌বি ক্ষেপা কোন রাগে,
আছে হিন্দু মুসলমান দুই ভাগে
থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ,
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন,

ভেস্ত-স্বর্গ ফাটক সমান
কার বা তা' ভাল লাগে ?

লালন ফকির বলেন, প্রকৃত ধর্ম্ম পথে নাই। যেখানে সকল ভেদাভেদ বিস্মৃত হওয়া যায়, আছে সেখানে।

লালন বলেন,

সব লোক কয়, লালন কি জাত সংসারে,
লালন কয় জেতের কি রূপ দেখ্‌লাম না এ নজরে,
কেউ মালা, কেউ তস্‌বি গলায়, তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়,
জেতের চিহ্ন রয়, কার রে ?

মানব ধর্ম্মের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ পাওয়া যায় লালন ফকিরের বাউল গানে। তাই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাউলরূপে সর্ব্বত্র জ্ঞাত হন।

খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখী কেম্‌নে আসে যায়
ধর্‌তে পার্‌লে মন্‌বেড়ী, দিতাম তাহার পায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই প্রিয় চরণদ্বয় লালন ফকিরেরই রচনা। লালন ফকির অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সর্ব্বত্র বহুশিষ্য সাক্‌রেদ্ ছিল এবং তাঁহার রচিত বাউলগান বাঙ্গলা সাহিত্যে একটী বিশিষ্ট অবদান।

তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বহু-শিষ্য-সেবক-বেষ্টিত হইয়া স্বজ্ঞানে স্বরচিত গানের কলি,

ধর্‌তে পার্‌লে, মন-বেড়ী দিতাম তার' পায়,

অস্পষ্ট উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যলীলা সম্বরণ করেন।

(ডক্টর আনিসুজ্জমান সাহেবের "মুস্‌লিম মানস ও বাংলা সাহিত্য"—২০২ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত)

৩৯। গুরু নানক।

(১৪৬৯—১৫৩৯ খৃঃ)

লাহোর নগরের পাঁচক্রোশ দক্ষিণে তালকণ্ডী (এখন নান্‌কানা নামে খ্যাত) গ্রামে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে গুরু নানকের জন্ম হয়। ইনি আধুনিক শিখ ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক। ইঁহার পিতার নাম কালু এবং মাতার নাম ত্রিপতা। কালুবেদী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং গ্রাম্য ভূম্যধিকারীর পাটোয়ারীর কার্য্য করিতেন।

পিতামাতা এমন সুন্দর সুলক্ষণ পুত্রের জন্মকোষ্ঠী জানিতে জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ ও কুলপুরোহিত হরদয়ালকে ডাকাইলেন। হরদয়াল শিশুর কোষ্ঠী বিচার করিয়া এই শিশুর ভবিষ্যৎ অতীব মহৎ হইবে বলিলেন এবং সেইহেতু তাহার নামকরণ করিলেন নানক।

নানক মহাত্মা শংকরাচার্যের বিশবৎসর পরে এবং চৈতন্যদেবের বিশবৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহারা তিনজনই সমসাময়িক বলা যাইতে পারে।

নানক বাল্যকালে অতি শান্তস্বভাব ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত এবং কুতুবদ্দিন মোল্লার নিকট পারসী ও উর্দ্দু শিক্ষা করেন। সেই সময় হইতে তাঁহার মন ধর্ম্ম-পথের পথিক হইতে প্রয়াসী হয়। বাল্যে পাঠশালায় অধ্যয়নকালে তিনি প্রত্যেক বর্ণমালার আদ্য অক্ষর লইয়া অতি মনোহর বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক কবিতাবলী রচনা করেন। নবমবর্ষ বয়সে তিনি যজ্ঞ উপবীত গ্রহণ করেন ও দ্বিজ হন। সন্ন্যাসী, ফকির দেখিলে নানক সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও কথোপকথন শুনিতে ভালবাসিতেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কালুবেদী পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও একটি দোকানের ভার অর্পণ করিলেন। একদা দোকানের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য

তিনি জনৈক বিশ্বস্ত সহকারীর সহিত স্থানান্তরে গমন করিতে ছিলেন। কিন্তু পথে কয়েকজন সন্ন্যাসী দেখিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন ও সাধুপুরুষদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে এতো তন্ময় হইয়া গেলেন যে দোকানের কথা ভুলিয়া গেলেন। উপরন্তু তাঁহার ভক্তি এত বাড়িয়া গেল যে সহকারীর সহিত পরামর্শ করিয়া সঙ্গে যাহা কিছু অর্থ ছিল তদ্বারা খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে প্রদান করিলেন। পরিনামে শূন্য হস্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই ব্যাপারে নানকের পিতা অত্যন্ত দুঃখিত ও কুপিত হইলেন। এবং সংসারী না হইলে তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দিলেন।

অগত্যা নানক বিংশতি বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুলতানপুরে ভগিনী নানকীর গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় ভগিনী ও ভগ্নিপতির উপদেশ অনুযায়ী একটি মুদির দোকান খুলিয়া বসিলেন। ক্রমে দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। দোকানে ভাল আয় হইতেছে দেখিয়া ভগিনী নানকীর অনুরোধে ও চেষ্টায় চৌনী নাম্নী এক রমনীর সহিত নানকের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অতঃপর সুলতানপুরে পৃথক গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভার্য্যাসহ বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

দ্বিতীয় পুত্রের জন্মকালে নানকের চিরপোষিত ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন তিনি ক্রমশঃ মায়ায় জড়িত হইতেছেন এবং তাঁহাকে এই বন্ধন ছাড়িতেই হইবে। যুবতী পত্নী, শিশুসন্তান, আত্মীয়স্বজন সকলের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া নানক সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন এবং দেশদেশান্তরে সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া এবং কোথাও প্রকৃত আন্তরিকতা না পাইয়া তাঁহার মন অতিশয় ক্ষুণ্ন হয়। তদানীন্তন

কালে তিনি সুদূর আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মক্কা নগরী পর্যন্ত গমন করেন। কথিত আছে যে তথায় এতদিন তিনি এক মস্‌জিদের দিকে পা দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে জনৈক মোল্লা রোষাবিষ্ট হইয়া রূঢ় বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে তিনি অতি বিনীত ভাবে শুধাইলেন, "মোল্লা সাহেব, এত রাগ করিতেছেন কেন? যেদিকে পরমেশ্বর নাই দয়া করিয়া সেইদিকে আমার পা দুখানি সরাইয়া দিন।" প্রশ্ন শুনিয়া মোল্লা সাহেব নির্বাক হইলেন। এইভাবে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াও কোথাও মনের শান্তি না পাইয়া নানক ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এক সময়ে নানক নদীতে স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হন, তিনদিন পরে পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। কিংবদন্তী এই যে ঐ সময়ে তিনি বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হইয়া দীক্ষিত হন এবং পৃথিবীতে গুরু মহিমা প্রচারে আদিষ্ট হন।

নানক বিশুদ্ধ গুরুবাদী ছিলেন। ইঁহার মতে হিন্দু, মুসলমান ভেদ নাই। সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়া তাঁহার আদেশ মত চলিলেই সত্য ধর্ম্ম লাভ হইবে। ইহাই গুরু নানকের উপদেশাবলীর সারমর্ম।

অতঃপর, ধর্ম্মার্থে দেশ ভ্রমণের অসারতা উপলব্ধি করিয়া পরিজনবর্গের পরিত্যাগে সংসারমায়া হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া গৃহস্থাশ্রমের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নানক পুনরায় গৃহী হইবার জন্য অভিলাষী হইলেন। গুরুদাসপুর জেলার অধীন ইরাবতী তীরস্থ করতালপুর নামক গ্রামে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া তথায় পুত্র কলত্রাদি আনয়নপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে সংসার-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শেষ বয়সে তিনি একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্র, সরল অমায়িক ব্যবহার ও সদ্‌ উপদেশে অনেকে মোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন।

ধৰ্ম্মের বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের আরাধনা করিতে তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন, এবং নিজেও সেইরূপ করিতেন।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে সপ্ততিতম বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই মহাত্মা তাঁহার অগণিত শিষ্য ও ভক্ত জনমণ্ডলীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া মরলীলা সংবরণ করেন। পবিত্র জীবন এবং সাধু আচরণে তিনি হিন্দু মুসলমান সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বৰ্ত্তমানে নানকপন্থী, দণ্ডী ও উদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাবা ঠাকুরদাসজী প্রধান।

৪০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১৮১৭—১৯০৫ খৃঃ)

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং পরে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিনি পিতামহীর পরম স্নেহভাজন ছিলেন এবং পিতামহীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। পিতামহী তাঁহাকে লালন পালন করেন। এই কারণে তিনি পিতামহীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়সে পিতামহীর মৃত্যু হয়।

অন্যান্য লোকের সহিত দেবেন্দ্রনাথ ও পিতামহীর দাহকার্য্যের জন্য শ্মশানে গমন করেন। শ্মশানের দৃশ্যাবলী দেখিয়া দেবেন্দ্র-নাথের মনোমধ্যে বৈরাগ্যভাবের উদয় হইলে তিনি সত্যতত্ত্ব কি জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন।

এই সময়ে আকস্মিকভাবে ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্নপত্রে একটী শ্লোক পড়িয়াই দেবেন্দ্রনাথের মনে একেশ্বরবাদের ভাব উদয় হয়। তৎপর হইতে তিনি রামমোহন রায়ের সহিত যোগ দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হন।

এইহেতু ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুশাস্ত্র-অন্তর্গত ব্রহ্মপ্রতিপাদক তথ্য সমূহের বহুল প্রচারার্থ তত্ত্ববোধিনী নামক সভা স্থাপন করেন এবং পরে তত্ত্ববোধিনী নামক এক মাসিক পত্রিকায় উক্ত ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। প্রথমে অক্ষয় কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ জন সভ্যের সহিত ইনি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর পূর্বক ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। পূর্বে ব্রাহ্মসভায় উপাসনার কোনরূপ পদ্ধতি ছিল না; কেবল তথায় উপনিষদের শ্লোক পাঠ ও

ব্যাখ্যা করা হইত। দেবেন্দ্রনাথ তথায় উপাসনা পদ্ধতি প্রচলন করেন এবং উপাসনার জন্য একটি প্রার্থনাও প্রস্তুত করিয়া দেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী-দিগের কর্ত্তব্যাদি বহুবিধ বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়।

তাঁহার আন্তরিক ধর্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অতঃপর ইনি মুসৌরী পর্বতে গমন করিয়া তথায় চারি বৎসরকাল নির্জনে ব্রহ্ম সাধনায় নিযুক্ত থাকেন এবং জীবনের শেষ কয়েক বৎসর একরূপ সংসারত্যাগী হইয়া পারিবারিক বাটী হইতে দূরে অবস্থান করিতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম-তাৎপর্য্য সংহিতা ১ম ও ২য় খণ্ড, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা, ব্রাহ্মধর্মের-মত ও বিশ্বাস, উপদেশাবলী, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, বক্তৃতাবলী, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি, উপহার, আত্মজীবনী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ইনি ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদ এবং উপনিষদের সংস্কৃত ও বাংলায় বৃত্তি রচনা করেন।

তাঁহার দানশীলতা অপরিমেয় ছিল। মহর্ষি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী ও পারস্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্যতম পুত্র।

৪১। কেশব চন্দ্র সেন।

(১৮৩৮—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ)

কলিকাতা নগরীতে ঈশ্বর প্যারীমোহন সেন বৈষ্ণবমতাবলম্বী নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহারই ঔরসে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর তারিখে কলিকাতা নগরে কেশব চন্দ্র সেনের জন্ম হয়। পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া কেশব হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যকাল হইতে কেশবের মন ধর্ম্মপিপাসু ছিল। নয় দশ বৎসর বয়সকালে তিনি তিলক কাটিয়া সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়া মৃদঙ্গের সহিত হরি সংকীর্তন করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র, বাইবেল, ও অন্য ধর্মীয়-গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি ধর্ম্ম চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। সেই সময়ে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা নামক এক খানি ব্রাহ্ম পুস্তক পড়িয়া তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

তাহার দুই বৎসর পরে কেশব চন্দ্র মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে তাঁহার পদোন্নতি হইয়া তাঁহার বেতন মাসিক ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। অনন্যমনে ধর্ম্ম-চিন্তা করিবার জন্য কেশবচন্দ্র ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর কেশব চন্দ্র প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুশীলন করিতে লাগিলেন, ও ধর্ম্মের জন্য তিনি আত্মীয় স্বজনের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের বিশেষ প্রিয় পাত্র হইলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে

অভিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ আদিব্রাহ্ম সমাজে একরূপ সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন এবং সমাজে নতুন নিয়ম প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

ইহাতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মদিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশব আদি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তারপর কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপ্রচারে যত্নশীল হইয়া তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতায় শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্ম প্রচারার্থ কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কেশব চন্দ্র স্বয়ং শিমলায় গিয়া লর্ড লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ ব্রাহ্ম বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিবার পথ নির্দিষ্ট করিয়া আসেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। সেখানে তাঁহার বিশ্ববিমোহিনী বক্তৃতা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং তথায় ধর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়ে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মাদিগের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে আপনার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বাক্ষরিত ফটো ও পুস্তকাদি দিয়া সম্মানিত করেন।

তিনি নানাস্থানে অন্যূন ৭০টি বক্তৃতা করিয়া ছয়মাস পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে আসিয়া Indian Reform Association, নৈশ বিদ্যালয়, সুলভ সমাচার প্রচার, মাদকতা নিবারণ সভা প্রভৃতি নানা দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের কন্যার সহিত কোচবিহারের মহারাজের বিবাহের প্রস্তাব হয়। তৎপূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মদিগের বিবাহের বয়স কন্যার পক্ষে ১৪ বৎসর ও বরের পক্ষে ১৮ বৎসর নির্ধারিত করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে বর ও কন্যা

উক্ত বয়স প্রাপ্ত না হওয়ায় অনেক ব্রাহ্ম এই বিবাহকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকৃত হন। তখন কেশবচন্দ্র প্রকাশ করিলেন যে, বাগ্‌দান হইতেছে মাত্র সুতরাং ইহাতে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছেনা। অবশেষে বলেন যে আমি ঈশ্বরের "আদেশ" পাইয়া এই বিবাহ দিতেছি। এই সকল যুক্তিতে আপত্তিকারীরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় তিনি তাঁহাদের অনভিমতে এই উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহাতে অন্যান্য ব্রাহ্মরা অসন্তুষ্ট হন, এবং বিবাহের পরই শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাঁহার নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কেশব "নববিধান" নাম দিয়া এক অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তির উপর নববিধানের প্রতিষ্ঠা করিয়া অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কতকগুলি নিয়ম তাহার সহিত একত্র করিয়া দিলেন। কথিত আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত আলাপ হইবার পর এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে কেশবচন্দ্রের আগ্রহ জন্মে।

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্র বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকের উপদেশে এই সময়ে প্রত্যহ তিনি দুই ঘণ্টা করিয়া সুত্রধরের কার্য্য করিতেন। তাহাতে কোন উপশম হইল না। পরন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে অগণিত ভক্ত ও শিক্ষিত জনমানবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র বিশ্বজোড়া খ্যাতির মধ্যে মরলীলা সম্বরণ করিলেন। মহান উদার কেশবচন্দ্রের আত্মা উন্মুক্ত অনন্ত অসীমে মিশিয়া গেল।

কেশবের ধর্ম্মমতের সহিত অনেকের অনৈক্য থাকিলেও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, কেশবচন্দ্র একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ইঁহার ন্যায় একাধারে কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর অতি বিরল। তিনি দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন।

তাঁহার বাক্যে, ব্যবহারে ও দৃষ্টিতে এমনই একটী আকর্ষনী শক্তি ছিল যে, যিনি একবার কেশবচন্দ্রের সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনি প্রতিকুল মতাবলম্বী হইলেও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ও পুনঃ পুনঃ সংসর্গ লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইতেন।

কেশবচন্দ্রের অভিনয়পটুতা ও অনুকরণ শক্তি বাল্যকালেই দৃষ্ট হয়। হ্যামলেটের চরিত্র অভিনয় করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে "নববৃন্দাবন" নাটকের অভিনয় কার্য্য তাঁহারই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হয় এবং উহাতে তিনি স্বয়ং পাহাড়ীবাবার ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কীর্ত্তনের ঢঙে গান রচনা ও কীর্ত্তনের সুরে গান গাওয়া এবং নগরসঙ্কীর্ত্তনের প্রথা কেশবচন্দ্রই প্রথম প্রচলন করেন।

ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে তিনি প্রত্যেক বৎসরেই কলিকাতার টাউনহলে ইংরাজীভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক একটি বক্তৃতা করিতেন। সেই বক্তৃতা কলিকাতার শিক্ষিত দেশীয় সমাজ এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজগণ ও অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন।

বাঙ্গলাভাষায় বক্তৃতা করিতে ও কেশবের সমান শক্তি ছিল। কথিত ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে কোন কোন বৎসর কলিকাতা বিডনস্কোয়ারে কেশবের বাংলাভাষায় বক্তৃতা শ্রবণে হিন্দু শ্রোতৃগণকে ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া অশ্রুপাত করিতে দেখা গিয়াছে এবং সহস্র সহস্র কণ্ঠোত্থিত "হরি" ধ্বনিতে পল্লী মুখরিত হইয়াছে।

কেশবচন্দ্র অনেক হিন্দুযুবককে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পক্ষে বাধা দিয়াছিলেন। কেশবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীনচন্দ্র হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কেশবের কনিষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অগ্রজের কাজে সহায়তা করেন। তিনি কলিকাতা এলবার্ট কলেজের অধ্যক্ষ থাকিয়া যথেষ্ট অধ্যাপনা-নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষায়

তিনি "অশোকচরিত" নামক এক খানি "ইতিহাস" রচনা করেন। কয়েক বৎসর ইনি "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। তিনি ও এখন আর জীবিত নাই।

কেশবচন্দ্র সেনের নূতন ধর্ম্মনীতি ভারতে ধর্ম্মে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে ও তাঁহার নাম অমর হইয়া আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

অশুদ্ধি-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	১৬	উদাহরণ	উচ্চারণ
১৮	২৩	অব্যয়	অব্যয়।
১৯	৫	আসাতে	আমাতে
১৯	৯	দীপ্তিশাল	দীপ্তিশীল
২৩	২	রক্তের	রসের
২৪	১২	কারনজলে	কারণজলে
২৫	১৮	সংসারাশক্তি	সংসারাসক্তি
২৫	২৩	....	হিন্দিতে ঋষিক শব্দের অর্থ "ইন্দ্রিয় দমন"
২৬	২১	....	শ্রীযুক্তঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত অবলম্বনে
২৭	২২	শ্রাবনে	শ্রাবণে
২৮	৮	ঔষধী	ঔষধি
২৮	১২ ও ১৯	ঔষধী	ঔষধি
৩১	১২	পার্থঃ	পার্থ
৩৩	১৫	সাধ্য সাধন	সাধ্য ও সাধন
৩৯	১১	সঙ্গমাঃ	সঙ্গমঃ
৩৯	১৯	শঙ্খ	১৯ (ক)। শঙ্খ
৪৩	১	ক্ষেত্রমিত্যভিবীয়তে	ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে
৪৩	৪	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং
৪৩	৪	যত্তজ্জর্জ্ঞানং	যত্তজ্‌জ্ঞানং
৪৬	৪	সুক্ষ্ম	সুক্ষ্মদেহ
৪৯	২৩	বসেচ্ছক্তি	বসেৎশক্তিঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯	২৩	বসেচ্ছিবঃ	বসেৎশিবঃ
৪৯	২৭	....	শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র সেন অবলম্বনে
৫০	১৯	প্রণব	২১(ক)। প্রণব।
৫০	২৫	ওঁ	"ওঁ"
৫৬	৪	সাক্ষী	সাথী
৬০	১৯	সমলোকৈক	সর্ব্বলোকৈক
৬১	৩	ওঁ পুর্ণসদঃ...মিদমুচ্যতে	ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাদ্‌পূর্ণং মুদচ্চতে
৬১	৭	২৫। কাল অনন্ত	২৪। কাল অনন্ত।
৬১	১৯	হাওয়ায়	হওয়ায়
৬২	৯	২৪। উপাসনা	২৫। উপাসনা।
৬৪	২০	শোক	ইহা লুপ্ত হইবে
৬৫	২১	শোচিতুমহসি	শোচিতুমর্হসি
৬৮	২১	তহুঁ	তুহুঁ
৬৯	২	চণ্ডী।	চণ্ডী
৯৩	১৮	বীবেকানন্দ	বিবেকানন্দ
৯৩	১৯	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম	৬ক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম
৯৬	১৭	বিস্ত্রাদি	বস্ত্রাদি
১০১	১	১৪	১৫
১১৬	৮	সাথা	সাথী
১২১	১৫	সির্দ্ধার্থ	সিদ্ধার্থ
১৩২	২৭	ব্যালকু	ব্যাকুল
১৪৭	২৭	উগ্রভৈরকে	উগ্রভৈরবকে
১৪৮	১৪	আচার্য্য	আচার্য্য
১৬১	১১	Ranadie's	Ranade's

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬২	১১	অস্পৃষ্য	অস্পৃশ্য
১৬৪	৬	ঔরষে	ঔরসে
১৯২	৯	প্রাথিত	প্রার্থিত
১৯৭	৫	নোওয়াইতে	নেওয়াইতে
২০০	২৩	উন্মত	উন্মত্ত
২১৫	২৬	নিবির	নিবিড়
২৩৫	২০	হেখানে	যেখানে
২৩৮	১	২৪	১১
২৩৮	১২	দর্শশাস্ত্র	দর্শনশাস্ত্র
২৪৩	১	১১	১২
২৪৪	১১	ছিল	ছিল।
২৪৯	১	১২	১৩
২৫৭	১	১৩। সাধ্	১৪। সাধক
২৬৬	১	১৪	১৫
২৭৯	১	১৫	১৬
২৮০	১৯	যোগভ্রষ্টভিজায়তে	যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে
২৮৪	১	দর্শন। পান	দর্শন পান
২৮৬	১	১৬	১৭
২৯২	১	১৭	১৮
৩০২	১	১৮	১৯
৩১২	১	১৯	২০
৩১৬	২০	কবিতাং জগদীশ	কবিতাং বা জগদীশ
৩১৬	২১	জন্মনি জন্মনি	মম জন্মনি জন্মনি
৩৩৭	১৯	কৈলাচার্য্যের	কৌলাচার্য্যের
৩৫১	১	২০	২৩

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫১	২	১৮৪৬	১৮৩৩
৩৫২	৫	১৮৪৬ সালের ১৬ই	১৮৩৩ সালের ২০শে
৩৮৩	১	২৩	২৪
৪২৫	১০	অববিন্দু	অরবিন্দ
৪৩৪	৩	শ্বষন্ত বিশ্বে	শৃষন্ত বিশ্বে
৪৬২	১	সাধু তারাচরণ	৩৬। সাধু তারাচরণ